অর্পিতা সরকার
অনুভবে তুমি

অনুভবে তুমি

অর্পিতা সরকার

দীপ প্রকাশন

২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

যাঁর রক্ত ধমনীতে বইছে বলেই

নিজের কলমে কালো অক্ষরদের করতে পেরেছি কব্জা..

আমার মা

লেখিকা অদিতি ঘোষকে।

মুখবন্ধ

আমি মনে করি উপন্যাসের কোনো তথাকথিত ভূমিকা হয় না। উপন্যাসের চরিত্রগুলো নিজেরাই আলাপ করবে পাঠকবন্ধুদের সঙ্গে। প্রতিটা কালো অক্ষর বলবে নিজেদের কথা। "অনুভবে তুমি" একটি মনস্তাত্ত্বিক সামাজিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে অহনা নামের একজন টিভি রিপোর্টার। নামী সংবাদপত্রের সাংবাদিক অনিরুদ্ধ পালের কন্যা। অহনার জীবনের লড়াই-ই "অনুভবে তুমি"র বিষয়বস্তু।

নৈঋত বসু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের লেকচারার। যিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন অহনার জীবনের সঙ্গে, যিনি বারবার অহনার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু এ লড়াই শুধু অহনার।

রক্তপাত নেই এ যুদ্ধে, নেই ক্ষেপণাস্ত্র, শুধু একটাই অস্ত্র নিয়ে এগোচ্ছে অহনা, সেটা হলো অসীম মানসিক শক্তি।

তাই লক্ষ্যে স্থির থেকে অহনা এগিয়ে যেতে পারবে কিনা জানার জন্যই সামিল হতে হবে "অনুভবে তুমি" উপন্যাসটির সঙ্গে। অহনা, নৈঋত, কাবেরী, অনিরুদ্ধ, অনিক, প্রিয়াঙ্কাদের হয়তো আপনি চেনেন, হয়তো এরাই রয়েছে আপনার পরিচিত গন্ডির মধ্যে! জীবন থেকে উঠে আসা চরিত্র নিয়েই লেখা "অনুভবে তুমি"।

।।১।।

আকাশটা লালচে ঘোলাটে, ঘড়ির ডিজিটাল অক্ষরগুলো জানান দিচ্ছে সূর্য উঠতে এখনও বেশ খানিক দেরি আছে। যদিও নৈঋতের সকাল হয় বেলা নটার সময়। তাই এমন ঘোলাটে প্রভাতের দর্শন ও শেষ কবে করেছে কিছুতেই মনে করতে পারছে না। স্টেশনের এককোণে বসে আছে নৈঋত, একটা ঝাঁকড়া গাছের নিচে। গাছটা যে ঠিক কি গাছ চেনার চেষ্টা করলো একটু। অপারগ হয়ে আরেকবার তাকালো ঘড়ির দিকে। মুশকিল হচ্ছে মোবাইলটা অন করতে পারলে হয়তো অনেককিছুই আবিষ্কার করতে পারতো, বিশেষ করে এই স্টেশন থেকে বেরোনোর উপায়টাও, কিন্তু আপাতত ওকে মোবাইলটা সুইচড অফ রাখতে হয়েছে। এখনও ভাবলে গাটা কেমন শিরশির করছে, জীবনে এই প্রথমবার এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল ও। এখনও মেয়েটার চন্দন পরা মুখটা ভাসছে চোখের সামনে। বাংলায় কি যেন একটা কথা— আছে লগ্নভ্রষ্টা, ও কি ঐভাবেই ছেড়ে এলো মেয়েটাকে! জমকালো বিয়ে বাড়ি, মেয়ের পরণে লালচে বেনারসি, ফুল দিয়ে সাজানো বিবাহবাসর, মেয়ের মা এসে প্রায় হাতজোড় করে বলেছিল, নৈঋত বড় কষ্ট করে মানুষ করেছি মেয়েটাকে, একটু আগলে রেখো। সব তো ঠিকঠাকই এগোচ্ছিল, তারপর কেন যে কাউকে কিছু না বলে এতবড় সিদ্ধান্তটা একা নিয়ে ফেললো নৈঋত সেটা ও এখনও জানে না। বুকের ভিতরটা এখনও ধুকপুক করছে ওর। জীবনে প্রথম বার এলো এই রাইগঞ্জ নামক

মফঃস্বলে। এসেছিল তো বরের গাড়ি করে! এখান থেকে ট্রেনে করে কি ভাবে কলকাতা ফিরবে সেটাই চিন্তার বিষয়। তাছাড়া ওর পরনে আছে ধুতি আর পাঞ্জাবি। ধুতি জীবনে এই প্রথম পরলো নৈঋত, তাই অলরেডি বার তিনেক হোঁচট খেয়েছে ও। যে লোকটা স্কুটি করে ওকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়েই হাওয়া হয়ে গেল তাকে জিজ্ঞেস করলে হতো, ফার্স্ট ট্রেন কটায় আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে ও ওদের যাদবপুরের বাড়িতে যাবেই বা কি করে! আজ তো ওদের বাড়িতে ভর্তি লোকজন। নৈঋত বউ নিয়ে ফিরবে আর মা বরণ করবে এটাই প্ল্যান করা ছিল।

নৈঋত বসু, পেশায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের লেকচারার। স্বভাবে একটু উদাসীন। তবে মিশুকে বলেও নাম আছে ক্লোজ সার্কেলে। বিশেষ করে বসু পরিবারের আইডল হিসাবে নৈঋত বসুর নাম বরাবরই একবাক্যে উচ্চারিত হয় পিসি, মাসি, কাকু, জেঠু মহলে। নৈঋতের বাবা রেলের বড় অফিসার, মাও রেল কর্মী। একমাত্র সন্তানের বিয়েতে সব স্বাদ পূরণ করবার এক অদমনীয় নেশায় পেয়ে বসেছিলো কাবেরী বসু অর্থাৎ নৈঋতের মাকে। তাই বিয়ের তিনদিন আগে থেকেই ওদের যাদবপুরের বাড়ির গেটের ওপরে নহবৎখানা থেকে ভেসে আসছিল সুরেলা সানাইয়ের সুর। নীলাদ্রি বসু বরাবরই কথা কম কাজ বেশি মন্ত্রে বিশ্বাসী। একটু গভীরে ভাবতে ভালোবাসেন। তিনিও একমাত্র সন্তানের বিয়ে উপলক্ষ্যে কোনো ব্যবস্থার ত্রুটি রাখেননি।

শেষ অগ্রহায়ণের নরম শীতেও কুলকুল করে ঘেমে উঠছিলো নৈঋতের পাঞ্জাবিটা। বিয়ের আসর থেকে ড্রেস চেঞ্জ করার নাম করে ও পালিয়ে এসেছে, এখবর নিশ্চয়ই এতক্ষণে বসুবাড়িতে নাগাসাকির বোমার মতই উৎক্ষেপিত হয়েছে। পায়ে পায়ে স্টেশন মাস্টারের ঘরের দিকে এগোলো নৈঋত। হাওড়া ফেরার ব্যবস্থা তো করতে হবে। উঠে দুপা এগিয়েছে আর ঘোলা অন্ধকারে একটা মানুষের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা। এমনিতেই বর্তমান পরিস্থিতির আতঙ্কে ওর মাথা কাজ করছিল না, তাতে এমন জোরে ধাক্কাতে ও আরও ঘাবড়ে গিয়ে বলল, একটু তো সাবধানে চলুন। এভাবে মানুষকে মেরে জনসংখ্যা কমানোর পরিকল্পনা যদিও নিয়ে থাকেন তবুও বয়েস দেখে ধাক্কা মারুন। আমি সদ্য ঊনত্রিশ। নিজের হাঁটুর ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তেই কথাগুলো বললো নৈঋত। এতক্ষণে খেয়াল করলো, ধাক্কা দেওয়া পাবলিকটি পুরুষ নয়, মহিলা। জিন্স, পুলোভার পরে আছে বলে প্রথম চটকে এতটা খেয়াল করেনি নৈঋত। মেয়েটি বেশ ঝাঁঝালো গলায় বলল, আপনাদের মত কেয়ারলেস পাবলিকের জন্যই আজকাল রাস্তাঘাটে অ্যাক্সিডেন্টের পরিমান বেড়ে গেছে বুঝলেন! মেয়েটাও প্লাটফর্ম থেকে নিজের হাতের ব্যাগটা তুলে ধুলো ঝেড়ে নিলো।

একটা অন্তত সোয়েটার পেলে এতটা কষ্ট হতো না নৈঋতের, ফিনফিনে গরদের পাঞ্জাবিতে কেমন যেন কাঁপুনি ধরে যাচ্ছে ওর। নিজের পরিচিত গন্ডির বাইরে নৈঋত বরাবরই একটু অস্বস্তিতে ভোগে, আজও তার

ব্যতিক্রম নয়। কমফোর্টজোন থেকে বেরোতেই মনে হলো, পৃথিবীটা যেন কেমন থমকে আছে। সত্যি বলতে কি ও যে কত বছর ট্রেনে চাপেনি সেটাও মনে করতে পারলো না। নিজস্ব গাড়িতে সর্বত্র যাওয়ার অভ্যেসটা যে ঠিক কতটা খারাপ, সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে ও।

মেয়েটা হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেলো টিকিট কাউন্টারের দিকে। এতক্ষনে ওরও মনে হলো, টিকিট তো কাটতেই হবে। পায়ে পায়ে ঐদিকেই এগিয়ে গেল নৈঋত, যদিও এই মুহূর্তে ওর গন্তব্য ঠিক কোথায়, ও নিজেও জানে না!

।।২।।

ফোন করে বারবার অনুরোধ করেছিল সুচেতা, অনিরুদ্ধরও যে একেবারেই যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না এমন নয়। বরং একটু বেশিই ইচ্ছে ছিল, লাল বেনারসিতে মেয়েটাকে কেমন লাগবে সেই শুভ মুহূর্তে সেটা দেখার লোভ তো অবশ্যই ছিল। দাদাবাবু হিম পড়ছে তো, আপনি এখন উঠোনে কি করছেন! এখনও তো আপনার মর্নিং ওয়াকের সময় হয়নি! নাকি মাঝরাতেই হাঁটতে বেরোবেন? বছর পঞ্চাশের বেঁটেখাটো লোকটার যেন জন্মই হয়েছে অনিরুদ্ধর খেয়াল রাখবে বলে। বিজু, তুমি বিয়েটা কেন করলে না বলতো? যদি তোমার একখানা গোছানো সংসার থাকতো তাহলে তো আর চব্বিশঘণ্টা আমার প্রাইভেসিতে হস্তক্ষেপ করতে না! অনিরুদ্ধর মুখে এসব কথা বিজু মানে বিজয়চাঁদ এতবার শুনেছে যে, এখন আর তার মধ্যে বিশেষ হেলদোল হয় না। কিন্তু বিজু জানে, সে ছাড়া মানুষটার আর কেউ নেই। সংসার, সন্তান

সব থাকতেও মানুষটা বড্ড একা, তাই বিজুকে এখান থেকে চলে যেতে বললেও ও নিরুপায়। ও বাজারে গেলেও দাদাবাবু অস্থির হয়ে ওকেই ডাকে বারবার।

বিজু নিজের গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললো, সে আমি বিয়ে করলেই আপনার নিস্তার মিলতো এমন কেন ভাবছেন! অনিরুদ্ধর থেকে বছর নয়-দশের ছোট হবে বিজু, কিন্তু ওর গাট্টাগোট্টা গড়নের জন্যই বয়েসটা বোঝা যায় না। আর সর্বদা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে বলেই কোনোরকম জটিলতা ওকে স্পর্শ করতে পারেনা।

অনিরুদ্ধ আবার বললো, তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়টা বড্ড কাকতলীয় ছিল তাই না বিজু। দেখতে দেখতে হয়েও গেল প্রায় বছর ছয়েক তুমি আমার কাছে আছো, তাই না?

বিজু মাথা নেড়ে এক মুখ হেসে বললো, আপনি বাঁচিয়েছিলেন বলেই তো বেঁচে আছি। নাহলে তো পাবলিকের মারে তখনই দেহ রাখতাম। অনিরুদ্ধ হেসে বললো, পকেটটা সেদিন সত্যিই তুমি মারোনি বলছো!

এই একটা কথা বললেই বিজয়চাঁদের কানের লতি গরম হয়ে যায়, অভিমানী মুখ করে বলে, আমি খেটে খাওয়া মানুষ, আমি কেন পকেট মারতে যাবো? ওসব ছোটকাজ আমি করিনি দাদাবাবু। অনিরুদ্ধ জানে বিজু পকেট মারেনি সেদিন। নিজে চোখে অন্য একজনকে পকেট কাটতে দেখেছিলো অনিরুদ্ধ। যে পকেট কেটেছিল সে গলে পালিয়েছিল নিজস্ব কায়দায়। ভদ্রলোকের ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়েছিল বিজু, তাই লোকজন ওকেই সন্দেহ

Sahitya Chayan

করে মারতে শুরু করেছিল। অনিরুদ্ধই সেদিন বিজুকে বাঁচিয়েছিল। শুধু মারের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল এমন নয়, ওকে এনে তুলেছিল ওর বাগানবাড়িতে। সূর্যপুরের এই বাগানবাড়ির দেখাশোনার দায়িত্বও দিয়েছিল বিজুকে। তখনই শুনেছিল, সংসারে ওর কেউ নেই। একা থাকে একা খায়।

কি হলো, বললে না তো, বিয়েটা কেন করলে না?

বিজু করুণ হেসে বললো, আমার বাপ দিলো না যে। মেয়েটা দেখতে সুন্দর ছিল, লেখাপড়া জানতো, গান গাইতো, ঘরের কাজ পারতো, কিন্তু মেয়ের বাপটা ছিল গরিব। বিয়ের রাতে পণের টাকার জন্য আমার বাপ আমায় বিয়ের আসর থেকে টেনে নিয়ে চলে এসেছিল। সেই থেকে এতগুলো বছর ওই মেয়েটার ভেজা চোখ দুটো আমায় তাড়িয়ে বেরিয়েছে। পালাতে পালাতে এসে পৌঁছেছিলাম কলকাতায়। বাপ আমার আবার বিয়ে দেবে মনস্থ করেছিল, সেদিনই ঘর ছেড়েছিলাম। পাপ করেছিলাম গো দাদাবাবু। তখন অল্প বয়েস, বাপের মুখের ওপর কিছু বলতে পারিনি, কিন্তু ওই লক্ষ্মীপ্রতিমার মত মেয়েটাকে লগ্নভ্রষ্টা করে পাপ করেছিলাম।

অনিরুদ্ধ বললো, সেকি! তবে থেকে তুমি নিজের থেকেই নিজে পালিয়ে বেড়াচ্ছ! সবটা খুলে বলো তো একদিন, একটা বেশ বড় করে স্টোরি করাবো তোমার জীবনকাহিনী নিয়ে। বিজু হেসে বললো, পালিয়ে বেড়াচ্ছে যে তার আবার জীবনকাহিনী বেরোবে কাগজে? তাহলে আর পালিয়ে পালিয়ে কি লাভ হলো?

Sahitya Chayan

।।৩।।

পালিয়েছে মানে, কে পালিয়েছে নীলাদ্রি? আরে চুপ করে কেন আছো? কিছু তো বলো? ফোনের অন্য প্রান্তে উদ্বেগে ছটফট করে উঠলো কাবেরীর গলাটা। কি বলছো, ক্লিয়ার করো। নৈঋত পালিয়েছে মানে? না মানে বিয়ের আসর থেকে টুটাই পালালো আর তোমরা চুপচাপ দেখলে? আর হঠাৎ টুটাই পালাবেই বা কেন? টুটাই তো এ বিয়েতে অমত করেনি, অহনাকে তো ওর অপছন্দও হয়নি। তাহলে হঠাৎ পালাবে কেন? নীলাদ্রি, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? নীলাদ্রির গলাটা বেশ গম্ভীর। একটু থেমে থেমে বললো, কাবেরী জীবনে কখনো এত অপমানিত হইনি বিশ্বাস করো। এদের বাড়ির সকলে আমার দিকে আঙুল তুলছে। আমি নাকি টুটাইকে সঠিকভাবে মানুষ করতেই পারিনি। কাবেরীর কাছে এখনও সবটাই বেশ ধোঁয়াশায় ঢাকা। নীলাদ্রি আক্ষেপের সুরে যেগুলো বলছে তার থেকে বেশি প্রয়োজন বিয়ের আসরে ঠিক কি হয়েছিল জানাটা। নীলাদ্রি কতটুকুই বা সময় দিয়েছে টুটাইকে, নিজের সমস্ত কাজ সামলে ওকে একটু একটু করে বড় তো করেছে কাবেরী। তাই সব দিক থেকে বাধ্য একটা ছেলে হঠাৎ বিয়ের আসর থেকে কেন পালালো সেটা জানার জন্যই মনটা উতলা হয়ে উঠলো ওর। টুটাইয়ের কোনো দোষ আছে এটাই যেন ভাবতে পারছে না কাবেরী। প্রতিটা মা-ই বোধহয় নিজের সন্তানের দোষ খুঁজে পায় না, সেই তথ্যে অবশ্য কোনোদিনই বিশ্বাসী ছিলনা ও। ছোটবেলায় টুটাই কখনো কারোর সঙ্গে মারপিট

Sahitya Chayan

করলেও কাবেরী খুঁজে বের করতো দোষটা আসলে কার। ছেলে মিথ্যে বলছে কিনা জানাটা ছিল ওর কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবারই কাবেরী দেখেছে টুটাই দোষ করলে নিজে বাড়িতে এসে সত্যিটা বলেছে। সেই নার্সারী থেকে কাবেরীর একটা অদ্ভুত ধারণা মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল, টুটাই দুষ্টুমি করতে পারে, অবাধ্য হতেও পারে কিন্তু মিথ্যে বলবে না। কাবেরী এই সম্বন্ধ ঠিক করার সময়েই ওকে বারবার জিজ্ঞেস করেছিল, ও কোথাও এনগেজড কিনা, যদি কাউকে পছন্দ থাকে তাহলে কাবেরীর কোনো প্রবলেম নেই তাকে বৌমা হিসাবে মেনে নিতে। তখন টুটাই হাসতে হাসতে বলেছিল, অন্য ধর্মের হলেও অসুবিধা নেই মা?

কাবেরী একটু থমকে ছিল বৈকি, তারপর ঘাড় নেড়ে বলেছিল, না নেই। তোর পছন্দই শেষ কথা তোর জীবনে।

কাবেরীকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরেছিল নৈঋত, ফিসফিস করে বলেছিল, আমি মজা করছিলাম মা, সত্যিই আমি এনগেজড নই, তবে বিয়েটা আর কয়েকদিন পরে করলে কি একান্তই চলছিল না?

কাবেরী হাসি মুখে বলেছিল, ধুর বোকা ছেলে, বিয়ে বললেই কি বিয়ে! মেয়ে খুঁজতে খুঁজতেই বছর দুয়েক লেগে যায় কারোর কারোর। আমি শুধু তোর মতামতটুকু জানলাম, এবারে কলিগ, পরিচিত এদের বলবো, আর ম্যাট্রিমনি সাইটে একটা অ্যাকাউন্ট খুলবো তোর ছবি দিয়ে। নৈঋত হেসে বলেছিল, বুঝতে পারছি রিটায়ারমেন্টের বছর পাঁচেক আগে সিনিয়রদের কাজ

Sahitya Chayan
কমিয়ে দেয় রেল, তাই আমার মা নতুন একটা কাজ খুঁজছে। কাবেরী চোখ পাকিয়ে বলেছিল, চুপ কর পাকা ছেলে, বাবা-মায়ের কত দায়িত্ব তুই এখন কি বুঝবি! অবশ্য তোর বাবাও তো আমার কাঁধে দায়িত্ব ফেলে দিয়ে গোটা জীবনটা নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিলো। এবারে আমার টুটাইয়ের যোগ্য মেয়ে খুঁজতে হবে।

কাবেরী তো সেদিন টুটাইয়ের কথায় কোনো অমত দেখেনি! তবে কি অন্য ধর্মের কাউকে ভালোবাসতো ও, সেটাই মায়ের সামনে বলতে পারেনি? কিন্তু এতদিনে মাকে এই চিনলো টুটাই? কাবেরী কাছে একটা ভালো মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, টুটাইয়ের পছন্দ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ধর্ম তো নয়!

সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে ওর। অহনাকে অবশ্য কাবেরীই পছন্দ করেছিল। কিন্তু টুটাইয়েরও যথেষ্ট পছন্দ ছিল বললেই জানিয়েছিল ও। সেইজন্যই সম্বন্ধটা এগিয়েছিলো কাবেরী। আরেকটু পরেই বাকি আত্মীয় স্বজনরা আসতে শুরু করবে। কাবেরীর বেশ কিছু কলিগও আসবে আজকে। বৌভাতের দিনেও তাদের নিমন্ত্রণ করেছিল ও। শুধু ফুলশয্যা নয়, বিয়ের তিনটে দিন দুর্দান্ত করে সাজিয়েছিলো কাবেরী। ওর আর নীলাদ্রির যখন বিয়ে হয়েছিল তখন ওরা দুজনেই কম মাইনে পেত, তারপর ছিল সংসার গড়ার খরচ। নিজেদের সব শখ পূরণ করতে পারেনি বিয়েতে। তাই ভেবেছিল, একমাত্র সন্তানের বিয়েতে সে শখ মেটাবে। কতদিন ধরে অফিসের পরে ঘুরে ঘুরে অহনার জন্য শাড়ি পছন্দ করেছে কাবেরী,

Sahitya Chayan

মনের মত গহনার জন্য ঘুরেছে দোকানের পর দোকান। এত পরিশ্রম, এত স্বপ্ন সব কিছু এভাবে ধূলিস্যাৎ করে দেবে টুটাই, এ যেন অবিশ্বাস্য লাগছে ওর। টুটাই পর্যন্ত বকতো কাবেরীকে, মা প্লিজ আমার বিয়ে নিয়ে তুমি এমন পাগলামি করো না, এবার অতি পরিশ্রমে তোমার শরীরটা ভেঙে যাবে। অহনার মিষ্টি মুখটা ভাসছে চোখের সামনে, কি উত্তর দেবে মেয়েটাকে? নিজের ছেলেটাকে কি তবে মানুষই করতে পারেনি কাবেরী! এভাবে ব্যর্থ হলো ওর সব প্রচেষ্টা। বাড়ি ভর্তি লোকজনের সামনে কিভাবে মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াবে? এলোমেলো ভাবনার মাঝেই ফিসফিস করে বলে উঠলো, নীলাদ্রি, ছেলেটা কখন পালালো? ও তো রাইগঞ্জে প্রথমবার গেলো গো, ওখানের তো কিছুই চেনে না! কেন যে আমি অহনার মায়ের কথায় রাজি হতে গেলাম! কলকাতা থেকে বিয়েটা হলে এমন বিপদ বোধহয় হতো না! অহনার মা যে কেন বললো, ওদের দেশের বাড়ি থেকে বিয়েটা দিতে চায়, আমিও রাজি হলাম। ফোনটা কানে চেপে নিজের মনেই এলোমেলো বলে যাচ্ছিল কাবেরী। নীলাদ্রির দীর্ঘশ্বাস ছাড়াও আরও কিছু শব্দ শোনা যাচ্ছিল, সেগুলো বোধহয় বিয়ে ভেঙে যাবার পরে মেয়ের আত্মীয়স্বজনদের কথাবার্তা। ভালো করে শোনার চেষ্টা করলো কাবেরী, একটাই কথা কানে এলো, বরের গাড়ি তো বাইরে দাঁড়িয়ে, তাহলে বর গেল কোথায়! বুকের ভিতরটা অজানা ভয়ে কেঁপে উঠলো কাবেরীর। টুটাই ঠিক আছে তো! ওর কোনো বিপদ হয়নি তো? আজকাল সব সম্ভব,

Sahitya Chayan

কেউ কিছু খাইয়ে টুটাইকে কোথাও নিয়ে গিয়ে ফেললো না তো!

আশঙ্কাটা মনের মধ্যে উঁকি দিতেই কাবেরী প্রায় আর্ত চিৎকার করে উঠে বললো, নীলাদ্রি টুটাইয়ের কোনো বিপদ হয়নি তো? তোমরা ওর খোঁজ করেছো? কল করেছ ওকে?

নীলাদ্রি হালছাড়া গলায় বলল, টুটাই ফোন সুইচঅফ করে রেখেছে, আর তোমার ছেলে কোনো কচি বাচ্চা নয়, যে তাকে কেউ কিডন্যাপ করবে বাড়ি ভর্তি লোকের মধ্যে থেকে! প্লিজ কাবেরী, এই মুহূর্তে টুটাইয়ের ভাবনা বাদ দিয়ে একটু বলবে, এখান থেকে সম্মানটুকু বাঁচিয়ে নিয়ে কিভাবে বেরোবো? কাবেরী থমথমে গলায় বলল, অহনার মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে বেরিয়ে এসো, এছাড়া আর করারই বা কি আছে! ফোনটা কেটে দিলো নীলাদ্রি।

আকাশ পাতাল ভাবছে কাবেরী, এতক্ষণে নিশ্চয়ই বরযাত্রীর দল বাড়ির সবাইকে ফোন করে জানিয়েও দিয়েছে যে নৈঋত বিয়ের আসর থেকে পালিয়েছে!

ভাবনা শেষ হবার আগেই কাবেরীর দরজায় কেউ একজন ঠকঠক আওয়াজ করে আস্তে আস্তে বললো, মামীমা, দাদাভাই নাকি বিয়ের আসর থেকে পালিয়েছে, তুমি একবার বাইরে আসবে?

পা দুটোতে একটুও জোর পাচ্ছে না কাবেরী। এই দুটো পা দিয়েই গত তিনমাস গড়িয়াহাট চষে বেরিয়েছিল কাবেরী, ছেলের বিয়ের শপিং করার জন্য। সেই পা

Sahitya Chayan

দুটোই অসার লাগছে এখন। দরজায় আবার দুটো ঠকঠক আওয়াজ হলো।

।।৪।।

নৈঋতের বাবা হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে চলে গেছেন, লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে আছে ফুলে ফুলে সাজানো বিবাহবাসর। একটু আগেই ওখানে লাল বেনারসি পরে বসেছিলো অহনা। সেই ছোট থেকে সুচেতা ওকে অনেক কষ্টে মানুষ করেছিল, ভেবেছিল ওর মত কপাল যেন মেয়েটা না পায়, কিন্তু ভগবান বোধহয় মুচকি হেসেছিল সেদিন। লগ্নভ্রষ্টা কথাটা বোধহয় এই সমাজে আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, বিশেষ করে অহনার মত স্বাধীনচেতা মেয়েদের জন্য তো নয়ই। সুচেতার খুব ইচ্ছে ছিল অহনা ওর মতই স্কুল টিচার হোক, কিন্তু অহনার দশটা-পাঁচটার একঘেয়ে জীবনটাতে বড্ড আপত্তি। তাই কোন কিছু না ভেবেই, সুচেতার কথাতে গুরুত্ব না দিয়েই সাংবাদিকতার জীবনটাকে বেছে নিলো। সুচেতার অবশ্য বেশ মনে হয় এর জন্য কিছুটা হলেও অনিরুদ্ধ দায়ী। অহনার ওপরে অনিরুদ্ধর যে একটা মারাত্মক প্রভাব আছে সেটা ও বেশ বুঝতে পারে। বাবাই বলতে মেয়ে অজ্ঞান। অনিরুদ্ধর প্রশ্রয়েই মেয়ে এমন একটা প্রফেশন বেছে নিলো যেখানে প্রতিদিন চ্যালেঞ্জ। সিনিয়র নিউজ রিপোর্টার অনিরুদ্ধ পালকে যেদিন সুচেতা প্রথম দেখেছিলো সেদিন অবশ্য বুঝতেও পারেনি মানুষটা এতটা সাহসী। অনিরুদ্ধকে এককথায় সুপুরুষ বলা চলে, রিপোর্টার বলেই হয়তো

Sahitya Chayan

স্মার্টনেসটাও চোখে পড়ার মত। কিন্তু অনিরুদ্ধর একটা স্বভাব কোনোদিন মেনে নিতে পারলো না - ওর একগুঁয়ে জেদ। অমন একজন শিক্ষিত, শান্ত ভদ্র মানুষের মধ্যে যে এতটা গোঁয়ার মানুষ থাকতে পারে, সেটা সামনে দেখে কেউ বুঝতেই পারবে না। সুচেতা এতগুলো বছর ঘর করেছে বলেই টের পেয়েছে মানুষটা বড্ড অবুঝ। আজ খুব কষ্ট হচ্ছে সুচেতার। কেন যে মনে হচ্ছে অনিরুদ্ধ উপস্থিত থাকলে বোধহয় এমন অলুক্ষণে ব্যাপার ঘটতো না। সুচেতা মেয়েকে সম্প্রদান করবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বলেই বোধহয় অহনার বিয়েটা ভেঙে গেল।

সুচেতা তো বারবার বলেওছিল অনিরুদ্ধকে বিয়েতে উপস্থিত থাকতে, কিন্তু সে তো আড়াল থেকেই ক্যাটারার, ডেকরেটর সব ব্যবস্থা করে দিয়ে বিয়ের দিন থাকলো না। থাকলো না, নাকি সুচেতার অমন কথায় চূড়ান্ত আঘাত পেয়েই সরে গেল ওর জীবন থেকে! অহনা তিনদিন ধরেই জিজ্ঞেস করছে, মা বাবাই কি আমার বিয়েতে থাকবে না? বাবাইকে কল করলেই বলছে ওইদিন নাকি বিশেষ কি কাজ আছে! তুমি কি কিছু জানো? নাকি ওই এক ইস্যু নিয়ে তুমি ক্রমাগত বাবাইকে দোষারোপ করে যাচ্ছ! সুচেতা ইচ্ছে করেই কাজের বাহানায় এড়িয়ে গেছে অহনার কথাগুলো। এড়িয়ে না গিয়ে উপায়ই বা কি ছিল। কারণ সুচেতা জানে অহনা দিনরাত একটা প্রশ্নের পিছনে ছুটে যাচ্ছে, যার উত্তর সুচেতার কাছে থাকলেও ও কোনোদিন দিতে পারবে না অহনাকে। সেই না পাওয়া উত্তরের আশায় মেয়েটা ইদানিং পাগলামি শুরু করেছে

Sahitya Chayan

যেন। দিন নেই রাত নেই এদিক ওদিক উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে বেড়াচ্ছে। মুখে অহনা যতই বলুক, সুচেতা তো মা, তাই ওর মুখ দেখে বুঝতে পারবে না এমন নয়। বেশ বুঝতে পারছে মেয়েটার মনের মধ্যে একটা এলোমেলো বাতাস সর্বদা তার সব শক্তি দিয়ে কালবৈশাখী ঝড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। ভেঙে তছনছ করে দিতে চাইছে অহনার মনের নরম প্রকোষ্ঠগুলোকে। নেহাত শক্ত ধাতের মেয়ে বলেই অহনা সমানে লড়াই করে যাচ্ছে তার সঙ্গে। সেইজন্যই সুচেতা চেয়েছিল মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে একটু থিতু করতে, পারলো কই! ডেস্টিনিকে অস্বীকার করবে বললেই কি হয়? নাহলে অমন সুপাত্র, অমন সুন্দর পরিবার যেচে এসেছিল অহনাকে পছন্দ করে, তারপরেও শেষরক্ষা হলো কি!

মনে মনে আবারও দোষারোপ করলো অনিরুদ্ধকে। এর জন্য অনিরুদ্ধই দায়ী। ও চেষ্টা করলেই অহনার মাথা থেকে ওই প্রশ্নটার বীজকে নির্মূল করতে পারতো তা না করে বীজের গোড়ায় সার সঞ্চার করে চারা গাছটাকে জন্মাতে সাহায্য করেছে। নৈঋত বিয়ের আসর ছেড়ে চলে যাবার পরে সেই যে অহনা ঘরে লক করে দিয়েছে এখনও খোলেনি। সুচেতার বুকটা কেঁপে উঠলো। মেয়েটা ভুল-ঠিক কিছু করে বসবে না তো! যত শক্ত মনের মেয়েই হোক, বিয়ের আসর থেকে বর চলে যাবার মত অপমানজনক ঘটনা মেনে নিতে পারবে কি! এই একটা দিনকে ঘিরে মেয়েদের অনেক স্বপ্ন থাকে, সঙ্গে কিছুটা সংশয়মিশ্রিত ভয়। নতুন পরিবারে যাওয়ার আগে

Sahitya Chayan

এমনিতেই স্নায়ু একটু হলেও দুর্বল থাকে, তার মধ্যে এ ভাবে নৈঋত পালিয়ে যাওয়ায় মেয়েটা বোধহয় সত্যিই ভেঙে পড়েছে। সুচেতার মাথার ঠিক ছিল না এতক্ষণ, এখন মনে হচ্ছে মেয়েটার পাশে গিয়ে দাঁড়ানো উচিত ওর। মা ছাড়া কার কাঁধে মাথাটা রাখবে মেয়েটা!

বাড়ি ভর্তি আত্মীয়স্বজনের চোখে একটাই প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, কেন পালালো বর? তবে কি জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছিলো? সবাই এই মুহূর্তে জল্পনা কল্পনা ছেড়ে বেশ জোরেই আলোচনা শুরু করেছে, একটা বিয়ের খরচ তো কম নয়, ছেলের বাড়ি থেকে আদায় করা উচিত ছিল। দুশ্চরিত্র ছেলেকে নিয়ে বিয়ে দিতে এসেছে সেই বাড়ির এটুকু তো রেস্পনসেবেলিটি থাকবেই। ছেলের বাবা তো দেখলাম, ক্ষমা চেয়ে দায় সারলেন। অসহ্য লাগছে সুচেতার এসব আলোচনা। তাই একটু দৃঢ় স্বরেই বলল, কেন আমরা কি ভিখারি, যে পাত্রপক্ষের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করবো? কেউ এমন কথা বলো না প্লিজ। নিজেকে বড় ছোট মনে হয়।

সুচেতা জানে ও দুপা এগিয়ে গেলেই তথাকথিত আত্মীয়স্বজনরা শুরু করবে সমালোচনার ফিসফিসানি, উঠে আসবে ওর অতীতও। তাই ইদানিং আর ভালো হয়ে থাকার নাটক থেকে নিজেকে দূরে রাখতেই পছন্দ করে সুচেতা। শুভাকাঙ্খীদের ইতিমধ্যেই চিনে ফেলেছে সুচেতা, যারা সারাটা বছর সত্যিই ওর পাশে থাকে। আর কিছু মানুষ তো কাছের মানুষ হবার মুখোশ পরে অভিনয়টা বেশ নিখুঁতভাবেই চালিয়ে যায়। অনিরুদ্ধ অবশ্য বলে,

Sahitya Chayan

সুচেতার নাকি সন্দেহ করাটাই স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। হয়তো তাই, এত উত্থান পতন দেখেছে নিজের জীবনে যে অভিজ্ঞতা নেহাত কম নেই ওর। আর সেই সুখ-দুঃখের সময়ে কোনটা মুখ আর কোনটা মুখোশ সেটা বেশ ভালোই বুঝে নিয়েছে ও। তাই এই বিয়েবাড়ির কৌতূহলী মুখগুলোর দিকে তাকালে এক্সরে মেশিন ছাড়াই সুচেতা নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারবে কজন সত্যিকারের কষ্ট পাচ্ছে আর কজন মজা দেখবে বলে অপেক্ষা করছে! মান সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে ও এখন নৈঋতের বাড়ি থেকে বিয়ের খরচের ক্ষতিপূরণ দাবি করবে, এটা ভাবলো কি করে ওরা, সেটা ভেবেই চমকে উঠলো ও! সুচেতা নিজে একজন শিক্ষিকা, তাছাড়া অহনা যথেষ্ট ভালো রোজগার করে। যদিও অহনার বিয়ের একটা টাকাও সুচেতাকে খরচ করতে দেয়নি অনিরুদ্ধ। তার নাকি বহুদিনের শখ ধুমধাম করে মেয়ের বিয়ে দেবে। সুচেতা নিতে চায়নি অনিরুদ্ধর টাকা, কিন্তু অহনা বেঁকে বসেছিলো, বেশ জেদ ধরে বলেছিল, বাবাইকে বাবাইয়ের ইচ্ছেপূরণ করতে দাও মা, প্লিজ ডোন্ট সিনক্রিয়েট। অহনা বড় হবার পর থেকে মেয়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনোদিনই তেমন যায়নি সুচেতা, তাই অনিরুদ্ধই সমস্ত খরচ করেছিল। অহনার দরজার সামনে দেখলো, ওর দুজন বন্ধু রুমি আর চন্দ্রিমা মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে আছে। সুচেতা ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করলো, ওকে ডেকেছিস রুমি? রুমি ঘাবড়ে গিয়ে বলল, লক করার সময় বলে ঢুকলো, আমরা যেন বিরক্ত না করি। ও আপাতত একা থাকতে চায়! সুচেতার মনটা মোচড় দিয়ে

Sahitya Chayan

উঠলো। মেয়েটার বোধহয় নৈঋতকে ভালোই পছন্দ হয়েছিল, সে যে এভাবে আঘাত দেবে বুঝতে পারেনি বোধহয়। চন্দ্রিমা বললো, আন্টি প্রায় ঘণ্টা খানেক হয়ে গেল, এবারে একবার ডাকা উচিত কিন্তু, আমার কেমন ভয় করছে। ওকে তো সেই স্কুল থেকে চিনি। ওর ভাবনাচিন্তা কোনোদিনই সোজা পথে এগোয় না। আমরা যেখানে গিয়ে ভাবনা শেষ করি ও সেখান থেকে শুরু করে। আর যা জেদ ওর, সুইসাইড করার মেয়ে ও নয়, কিন্তু তবুও কেমন যেন ভয় করছে।

সুইসাইড করার কথাটা শুনেই বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে উঠলো। তবে সুচেতা জানে অহনা হেরে যাবার মেয়ে নয়। হয়তো মায়ের কাছ থেকেই সে এই গুন পেয়েছে। লোকে বলে সুচেতাও নাকি ভীষণ শক্ত মনের মহিলা।

রুমির দিকে ইশারা করতেই রুমি দরজায় টোকা দিলো। চন্দ্রিমা ডাকলো অহনা, দরজাটা খোল প্লিজ। আন্টি এসেছে, একটু কথা আছে রে।

রুমি দরজায় জোরে একটা ধাক্কা দিতেই খুলে গেল দরজাটা। গোটা মেঝে ময় ছড়ানো আছে অহনার পরনের লাল বেনারসিটা। সাদা পাথরের মেজের ওপরে রক্তের স্রোতের মতই এঁকে বেঁকে ছড়িয়ে আছে শাড়িটা। মাঝের সোনালী ফুলগুলো যেন বিদ্রুপ করে বলছে, আমরা প্রাণহীন, সুগন্ধ বেলাতে পারবো না। পাশে পড়ে রয়েছে লালগোলাপের মালাটা।

Sahitya Chayan

বিছানার ওপরে সুচেতার দেওয়া সব সোনার গয়নাগুলো। সবই রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, শুধু নেই অহনা। সুচেতা ধপ করে খাটে বসে পড়লো। স্খলিত গলায় বলল, রুমি, অহনা কোথায় রে?

রুমি হকচকিয়ে তাকালো চন্দ্রিমার দিকে। চন্দ্রিমা ভয়ে ভয়ে বললো, আন্টি আমরা তো ঘরের বাইরে বসেছিলাম সেই তখন থেকেই, ও তো ঘর থেকে বেরোয়নি, তাহলে গেল কোথায়?

রুমি চট করে অ্যাটাচ বাথটা ঘুরে দেখে নিলো। বেসিনে এখনো মেকআপ রিমুভ করার তুলোটা পড়ে রয়েছে।

সুচেতা হালছাড়া গলায় বলল, পিছনের বারান্দার তালাটা খোলা নাকি একবার দেখ তো চন্দ্রিমা?

চন্দ্রিমা বারান্দা থেকে ঘুরে এসে বললো, আন্টি বারান্দার গ্রিল হাট করে খোলা আছে।

সুচেতা আলমারির মাথায় তাকিয়ে দেখল, অহনার ট্যুরে নিয়ে যাওয়ার ট্রলি ব্যাগটাও নেই যথাস্থানে। আলমারি খুলতেই চোখে পড়লো একটা তাক একটু ফাঁকা লাগছে। তারমানে কিছু পোশাক নেওয়া হয়েছে ওখান থেকে।

যেমন মা তার তেমনি মেয়ে, কথাটা তীরের মত এসে বিঁধলো কানে।

আরেকজন তার পাশ থেকেই বললো, বাবাটাকে বিয়েতে থাকতে অবধি দিলো না সুচেতা। ছি ছি অমন

Sahitya Chayan

ভালোমানুষটা মেয়ের বিয়ের সব খরচ দিয়েও উপস্থিত থাকতে পারলো না।

ওই জন্যই তো মেয়ে চিঠি লিখে পালিয়েছে। এখন কার সঙ্গে পালিয়েছে সেটা অবশ্য কেউ জানে না। চিঠিটা দেখেও তো তেমন কিছু বোঝার উপায় নেই। শুধু লিখেছে, যতক্ষণ না সত্যি জানতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত বিয়ের মত ছেলেমানুষি করতে পারবো না।

বোঝো কান্ডঃ আজকাল ছেলেমেয়েদের তো বিয়ে দেওয়াই মুশকিল। প্রথমে পাত্র পালালো, এখন পাত্রী।

সুচেতা উদ্ভ্রান্তের মত বাইরে বেরিয়ে দেখলো, সম্পর্কে সুচেতার পিসিই কথাগুলো বলছিলেন। হাতে একটা টুকরো কাগজও রয়েছে। সুচেতা প্রায় কেড়ে নিল কাগজটা। তারপরেই বললো, এটা কোথায় পেলে রাঙা পিসি?

রাঙা পিসি তার মোটা ঠোঁট উল্টে বললেন, ওই যে তোমাদের পাশের বাড়ির বাচ্চু এসে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে দে ছুট। তা মেয়ের যখন অন্য জায়গায় প্রেম ছিলই তখন জোর করে ভালো পাত্র দেখে বিয়ে দিতেই বা কেন গিয়েছিলে বাপু?

সুচেতার সামনে ভেসে উঠলো অহনার হাতের লেখা।

'মা, প্লিজ রাগ করো না। খবরটা হঠাৎই পেলাম। চললাম আসল সত্য খুঁজতে। যতক্ষণ না খুঁজে পাই ততক্ষণ পর্যন্ত বিয়ের মত সম্পর্কে জড়াতে পারবো না।'

সুচেতার মুখটা নীল হয়ে গেল অপমানে। নিজের সন্তান যে এভাবে সকলের সামনে মুখটা পুড়িয়ে দিতে পারে

Sahitya Chayan
কল্পনাই করতে পারেনি ও। সুচেতা জানে অহনা এখুনি বিয়েটা করতে চায়নি, আরেকটু সময় চেয়েছিল। হয়তো ভালো পাত্র, ঘর পেয়ে সুচেতাই একটু তাড়াহুড়ো করেছিল, তাই বলে অহনার অমত ছিল এটা মেনে নিতে পারবে না ও। অবশ্যই নৈঋতকে পছন্দ ছিল অহনার। সুচেতা মা হয়ে মেয়ের এটুকু মনের কথা টের পেয়েছিলো বৈকি অহনার আচরণে। আচমকা অনিরুদ্ধর ওপরে রাগটা চেপে বসলো। যত নষ্টের গোড়া ওই অনিরুদ্ধই। ফোনটা হাতে নিয়ে অনিরুদ্ধর নম্বরটা ডায়াল করলো।

।।৫।।

আপনার ফোনটা একটু পাওয়া যাবে? মানে একটা বিশেষ কারণে আমি আমার ফোনটা সুইচড অফ করে রেখেছি, তাই প্লিজ হেল্প মি।

নৈঋতের কথা শেষ হবার আগেই চমকে উঠলো অহনা। আরে নৈঋত, আপনি এখনও যাননি? এখনও রাইগঞ্জ স্টেশনে আপনি কি করছেন মশাই? আপনাকে তো বাচ্চুদা মিনিমাম তিনঘণ্টা আগে স্টেশনে ছেড়ে দিয়ে গেছে, তখন থেকে আপনি বুঝি রাইগঞ্জ স্টেশনে বসে ট্রেন কাউন্ট করছিলেন?

নৈঋত মেয়েটাকে প্রথমে চিনতে পারেনি। জিন্স আর জ্যাকেট, মাথায় প্রায় মুখ ঢাকা টুপি, এখন গলা শুনে আর আলোতে কাছ থেকে দেখে বুঝতে পারলো, মেয়েটা অহনা। এর সঙ্গেই মধ্যরাতের লগ্নে ওর বিয়ে হবার কথা ছিল। নৈঋত ঘাবড়ে গিয়ে বলল, কিন্তু আপনি এখনও

Sahitya Chayan

স্টেশনে কি করছেন? আপনার ফিঁয়াসে কোথায়? আপনি যে বললেন, সে বাইরে আপনার জন্য ওয়েট করছে। আমি আপনার মাথায় সিঁদুর পরালেই নাকি সে সুইসাইড করবে, তো সেই মহান প্রেমিকটি কোথায়? আপনি একা কেন?

অহনা একটু সামলে নিয়ে বললো, আছে সে আছে, তার কাছেই তো যাবো এখন। কিন্তু আপনি কেন এখনও বাড়ি পৌঁছাননি বলবেন?

নৈঋত বিরক্তির স্বরে বললো, বিয়েটা যখন করবেন না তখন আগে কেন জানিয়ে দিলেন না? আপনি তো বোবা নন, আর তাছাড়া আপনার ফোনে ব্যালেন্স ছিল না এমনও নয়। এই মুহূর্তে আমি বাড়ি ফিরে যাব কি করে সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

অহনা বললো, আমাদের তো ব্রেকআপ হয়ে গিয়েছিলো। তাই তো বিয়েতে রাজি হয়েছিলাম, কি করে বুঝবো বলুন প্রাক্তন আবার ফিরে আসবে, তাও আবার বিয়ের রাতে।

নৈঋত অসহিষ্ণু গলায় বলল, তার দায় কি আমার? এখন যদি সেখানে গিয়ে দেখেন আপনার প্রাক্তন আবার মত বদলেছে তাহলে কি আপনি আমাকে রিকল করবেন ভেবেছেন নাকি? শুনুন মিস অহনা, আপনি আপনার বাড়িতে সত্যিটা বলে তবেই বিয়ের আসর থেকে বেরোতে পারতেন। অকারণ আমাকে ভাগিয়ে দিয়ে বর পালিয়েছে বর পালিয়েছে রব না তুললেই ভালো করতেন! আমার তো একটা সোশ্যাল স্ট্যাটাস আছে

Sahitya Chayan

নাকি? তাছাড়া আমাদের বসু পরিবারে আমার পরিচয় গুড বয় হিসাবে। গোটা পরিবারের চোখে আমাকে ছোট করে দিয়ে আপনার ঠিক কি লাভ হলো বলুন তো? আপনার মা আমায় রিকোয়েস্ট করেছিলেন, আপনাকে যেন ভালো রাখি। তিনিও ভাবলেন আমি লগ্নভ্রষ্টা করে দিলাম আপনাকে। চলুন, আপনাদের বাড়িতে চলুন, সত্যিটা সবাইকে বলবেন, তারপর আপনার এক্সের কাছে যাবেন। আমিও চাইনা আমার কাঁধে অপরাধের বোঝা চাপিয়ে ঘুরতে। আমার মা-বাবাকে সকলের সামনে ছোট করার কোনো অধিকার আমার নিজেরও নেই। অহনার একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো নৈঋত। এই মেয়েটার জন্য ওকে সবাই ভুল বুঝবে, আর এই মেয়েটা ওর প্রাক্তনের সঙ্গে হানিমুন করবে এটা তো হতে পারে না। নৈঋত ভালো ছেলে ঠিকই, কিন্তু এতটাও উদার নয়। পুরো বিষয়টা আরেকবার ভাবার চেষ্টা করলো ও। ঠিক কিভাবে ঘটে গেল ঘটনাটা।

আগে বিয়ের আসরে নৈঋতকে আনা হয়েছিল, কয়েকটা মন্ত্র পড়ার পরে আরেকটা ড্রেস চেঞ্জের জন্য ডাকা হলো ওকে। সেই ঘরে ঢুকতেই লাল বেনারসি পরা মেয়েটা এসে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলেছিল, প্লিজ আমায় বিয়ে করবেন না। এখুনি জানতে পারলাম আমার এক্স ওয়েট করছে আমার জন্য, আপনি পালান এখান থেকে। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমার এক দাদা আপনাকে স্কুটি করে রাইগঞ্জ স্টেশনে ছেড়ে দেবে। ওখান থেকে ট্রেন ধরলেই হাওড়া চলে যাবেন। প্লিজ হেল্প মি, আমি বিয়েটা

Sahitya Chayan

করতে পারবো না। পিছনের গেট দিয়ে পালান, বাচ্চুদা আপনাকে পৌঁছে দেবে।

সানাইয়ের সুরটা বিষণ্ণ ঠেকেছিলো নৈঋতের কানে। অহনার চোখের আকুতি মুহূর্তের জন্য ভাবিয়েছিলো ওকে। নিজের পরিস্থিতির কথা না ভেবেই অহনার দেখানো পথে পালিয়ে এসেছিল বিবাহ আসর ছেড়ে। ঘন অন্ধকার পথে স্কুটিতে করে আসতে আসতে প্রথম মনে হয়েছিল, বসু বাড়ির সকলে কি ভাবে নেবে ব্যাপারটা। তাছাড়া অহনার মাও তো ভাববে নৈঋত ওনার মেয়েকে এই অবস্থায় রেখে পালিয়ে গেল। প্রায় ঘন্টা দেড়েক স্টেশনের ঠান্ডায় বসে থেকে বেশ শীত ধরে গিয়েছিল ওর। এখন অহনাকে দেখে মাথার মধ্যে একটা অদ্ভুত বিজবিজে রাগ চাড়া দিচ্ছে। এই মেয়েটার এক্সের চক্করে পড়ে আজ ওর এই অবস্থা! নৈঋতের আচমকা টানে ব্যালেন্স না রাখতে পেরে অহনা এসে পড়লো নৈঋতের বুকের কাছে। শিরশির করে উঠলো অহনার গোটা শরীর। নৈঋতের পুরুষালি শক্ত হাতটা তখনও শক্ত করে ধরে রেখেছে অহনাকে।

বেসামাল নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললো, বিয়ে করতে এসেছিলেন বলে কি পুরো ডিওর শিশি গায়ে ঢালতে হয় নাকি! বাই দ্য ওয়ে এটা কোন ব্র্যান্ড?

নৈঋত অবাক হয়ে তাকালো অহনার দিকে। মেয়েটা কি উন্মাদ? এরকম একটা ভয়ানক পরিস্থিতিতে এমন প্রশ্ন করছে কি করে মেয়েটা! এ তো ঠান্ডা মাথায় খুন করতে পারবে মনে হচ্ছে। মুখে এক ফোঁটাও মেকআপ নেই,

Sahitya Chayan

একটু আগের দেখা মেয়েটাই যেন নয়। দুই কপালের মাঝের লাল টিপ, চন্দনের বিন্দুগুলো উধাও, দুই সিঁথির মাঝের ছোট্ট সোনালী টিকলিটাও তো নেই। খোঁপা ঘিরে লালগোলাপ আর জুঁইয়ের মালারাও আর নেই, তার পরিবর্তে একটা ব্যাকক্লিপ ঘাড়ের কাছে এলোমেলো করে ধরে রেখেছে অহনার চুলগুলোকে।

মেকআপবিহীন চোখদুটো যেন আরও বুদ্ধিদীপ্ত। কাজলের রেখা আঁকা সলাজ চাহনি নেই, পরিষ্কার স্বচ্ছ চোখের চাহনিতে আত্মবিশ্বাসী অহংকার।

নৈঋত নিজের পরিস্থিতি ভুলে তাকিয়ে থাকলো অহনার দিকে। মেয়েটা নিখুঁত সুন্দরী নয়, তথাকথিত সেক্সি লুকও নয়, তবুও কি যেন আছে ওর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ চেহারায়। সেটা যে ঠিক কি তা আদৌ আবিষ্কার করতে পারেনি নৈঋত, কিন্তু যেদিন অহনাকে প্রথম দেখেছিলো সেদিনও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ছিল। আজও একইভাবে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

অহনা নিজেকে নৈঋতের বাঁধনমুক্ত করে বললো, বললেন না তো কোন ব্র্যান্ড?

নৈঋত ইতস্তত করে বললো, বন্ধুরা মিলে বিয়ে করতে আসার আগে পুরোটাই গায়ে ঢেলে দিয়েছিল।

অহনা চোখটা নিচু করে বললো, আমি রিয়েলি সরি নৈঋত, আমার জন্য আপনাকে এমন অকোয়ার্ড পজিশনে পড়তে হলো।

নৈঋত থমকে বললো, প্লিজ আমাকে দায়মুক্ত করুন, অন্তত আমায় বাবা, মা, পরিবারের সকলে যেন ভুল না

Sahitya Chayan

বোঝে। অহনা নরম গলায় বলল, এখুনি সম্ভব নয় সেটা। কারণ আমার বাড়িতেও আমায় খুঁজছে সবাই। তাই আমি ফোন করলেই ওরা আবার জোর করে আমায় বাড়ি নিয়ে যাবে। তবে কয়েকটা দিন পরে আমি নিজে কাবেরী আন্টিকে ফোন করে বলে দেব আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

টিকিট কাউন্টারে ঢুকেই অহনা বললো, একটা কালিয়াগঞ্জ দেবেন। পরক্ষণেই নৈঋতের দিকে তাকিয়ে একটা বিস্কিট কালারের জ্যাকেট নিজের ব্যাগ থেকে বের করে দিয়ে বললো, একটু ছোট ছোট হবে হয়তো, তবুও বেশ ঠান্ডা রয়েছে, পরতে পারেন। নৈঋত অনেকক্ষণ ধরেই শীতে কাঁপছিল। কিন্তু বাড়িতে কিভাবে ফেস করবে ভাবতে ভাবতে শীতের অনুভূতিটাকে তেমন পাত্তা দিচ্ছিল না। জ্যাকেটটা দেখে যেন হাতের চেটো দুটো আরও ঠান্ডা হয়ে গেল। অহনার হাত থেকে জ্যাকেটটা নিয়ে পরে ফেললো। বুকের চেনটা অর্ধেক উঠে আটকে গেছে চেস্টে, তবুও একটা উষ্ণতা জড়িয়ে ধরলো ওর শীতল হয়ে আসা শরীরটাকে। কৃতজ্ঞ চোখে অহনার দিকে তাকিয়ে বলল, থ্যাংক ইউ। কিন্তু আপনি যদি আমায় নির্দোষ প্রমাণ না করেন তাহলে তো আমি আমার বাড়িতে পা রাখতেই পারবো না। সকলে ভাববে আমি আপনাকে বিবাহবাসরে ছেড়ে পালিয়ে এসেছি সেই দুঃখে আর অপমানে আপনিও চলে এসেছেন বাড়ি থেকে। আঙুলটা তো আমার দিকেই ওঠানো থাকবে অহনা, তাই প্লিজ...

নৈঋতের কথা শেষ হবার আগেই হো হো করে হেসে উঠলো অহনা। তারপর লালচে নেলপলিশ লাগানো

Sahitya Chayan

আঙুলগুলো সমেত ডান হাতটা নিজের মুখে চেপে ধরে হাসিটা থামাতে চাইলো। নৈঋত বিরক্ত হয়ে বলল, আপনি কি ম্যাড? আচমকা কাঁদেন, কখনো হাসেন, প্রবলেমটা কি আপনার?

অহনা হাসতে হাসতেই গম্ভীর হয়ে বলল, আমি কি করবো, ইউ লুক লাইক এ জোকার। মেরুন ধুতি, ক্রিম পাঞ্জাবি আর বিস্কিট আর পিঙ্ক মিক্স কালারের লেডিস জ্যাকেট, হোয়াট এ কম্বিনেশন ইয়ার!

নৈঋত নিজের দিকে তাকিয়ে হেসেই ফেললো শেষ পর্যন্ত। তারপর বললো, জীবনে প্রথম ধুতি পরলাম অথচ স্যুট করলো না। অহনা ফিসফিস করে বললো, আপনি হাওড়ার টিকিট কাটুন, দিয়ে বাড়ি ফিরুন, আমার বাড়িতে এতক্ষণে সবাই জেনে গেছে পালানোর খবরটা, তাই ওরাও খুঁজতে বেরোবে। নৈঋত একটু ভেবে নিজের ওয়ালেটটা বের করে বললো, আমাকেও একটা কালিয়াগঞ্জ দেবেন। অহনা অবাক চোখে তাকিয়ে বললো, আপনি কি করবেন সেখানে?

নৈঋত একটু গম্ভীরভাবে বললো, আপনার এক্সকে দেখতে যাচ্ছি, আপত্তি নেই নিশ্চয়ই, থাকলেও শুনছি না। চিন্তা নেই, দূর থেকে দেখেই চলে আসব, আসলে এমন ঘটনা তো শুধু রুপালি পর্দায় দেখা যায়। আজ যখন সেটা আমার সঙ্গেই ঘটলো তখন শেষ দৃশ্যের সাক্ষী হতে বড্ড ইচ্ছে করছে।

অহনা থতমত খেয়ে বললো, তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি পরে হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের যুগলের ছবি

Sahitya Chayan
পাঠিয়ে দেব। নৈঋত ক্লান্ত স্বরে বললো, ছবিতে কি আর সব বোঝা যায়? আমার মা যখন আপনার ছবি আমায় দেখিয়ে বলেছিল, দেখ তো টুটাই তোর পছন্দ কিনা? তখন কি আপনার পিঙ্ক টিশার্টে আর ব্ল্যাক জিন্সে লেখা ছিল, আপনি বিয়ের রাতে এক্সের সঙ্গে পালিয়ে যাবেন? তাই ছবিতে সবটুকু বোঝা যায় না, বরং লাইভ দেখাই বেস্ট। অহনা চূড়ান্ত বিরক্ত হয়ে বলল, এবারে কিন্তু আপনি অযথা বিব্রত করছেন আমায়। বুঝলাম আমি আপনার সঙ্গে অন্যায় করেছি, তাই বলে এভাবে অপ্রস্তুত করছেন কেন?

নৈঋত বললো, একটা অ্যানাউন্স হচ্ছে, এই ট্রেনটাই সম্ভবত কালিয়াগঞ্জ নামক অচেনা কোনো এক স্টেশনে থামবে, তাই না? চলুন, বাকি বিতর্ক ট্রেনে সেরে নেবেন।

ট্রেনটা জান্তব শব্দ করে এসে থামলো রাইগঞ্জ স্টেশনে। অহনার সঙ্গে নৈঋতও উঠলো একই কামরায়।

।।৬।।

কি রে মনমরা হয়ে বসে আছিস কেন? তোর না চাকরির ইন্টারভিউ ছিল? এই প্রিয়াঙ্কা, বল না কিছু।

প্রিয়াঙ্কা ওর খসখসে গালে হাত বুলিয়ে বললো, হ্যাঁ রে অনিক তোর বাবা কখনো মদ খেয়ে তোর মাকে এসে পেটায়? কখনো তোর বোনকে খানকি বলে গালাগাল দেয়? কখনো তোর পড়ার সময় লাইট নিভিয়ে দিয়ে বলে, যা ল্যাম্প পোস্টের সামনে গিয়ে দাঁড়া গে যা! সেই ছোট থেকে দেখছি এই বাবা নামক প্রাণীটাকেই মা দুবেলা ভাত বেড়ে দেয়। রাতে বিছানাতেও সঙ্গ দেয়। স্কুল,

Sahitya Chayan

কলেজে গিয়ে শুনলাম বাবাদের কাছে নাকি সব থেকে আপন হয় মেয়েরা। মেয়েদের সব আব্দার নাকি পূরণ করে বাবারা। জানিস অনিক, আমি আমাদের পাড়ার ওই মনসা মন্দিরের সামনে দিয়ে যাবার সময় রোজ প্রার্থনা করি, যেন আমার বাবাটা মরে যায়। কিন্তু ওই শালীও তো বড়লোকের ঠাকুর রে। তাই আমার কথা কিছুতেই শোনে না জানিস! অনিক প্রিয়াঙ্কার হাতটা আলতো করে ধরে বলল, আবার মুড অফ করিস না। বল না, ইন্টারভিউ কেমন ছিল? পোস্টঅফিসের ক্ল্যারিক্যাল জবটা কি হয়ে যাবে? কি মনে হচ্ছে রে? প্রিয়াঙ্কা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, যদি দেখতে সুন্দর হতাম ঠিক একটা জব জুটিয়ে ফেলতাম বুঝলি। কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বুঝেছি, শহরে পাত্তা পাওয়া আমার কম্ম নয়। শালা বড় অফিসের রিসেপসনিস্টগুলোকে দেখবি, যেন মনে হয় গা দিয়ে মাখন গড়িয়ে পড়বে। আমার চামড়া দেখ, ঘর্ষণ বল তৈরি হবে বুঝলি! তাই এসব ক্ল্যারিক্যাল জবের জন্যই লড়তে হবে। অনিক বললো, মুড ঠিক করলে ফুচকা খাওয়াবো। প্রিয়াঙ্কা হেসে বললো, ওসব বড়লোকের রোগ আমার নেই রে। মুড সুইং করার মত বিলাসিতা কি আমাকে মানায়? আমি তো জ্ঞান হয়ে ইস্তক দেখছি, বাবা মাকে ধরে রাতে মারে, আর দিনের বেলায় ভদ্রলোক হয়ে রঙের কাজে যায়। আমার বাবার টাকাপয়সা নেই এটা ভাবিস না। বাবার আন্ডারে গোটা পাঁচেক লোক খাটে। ওই যে নতুন কলোনিতে যে ছয়খানা ফ্ল্যাটবাড়ি হলো দেখলি, পুরো কাজটা বাবাই কন্ট্র্যাক্ট পেয়েছিলো। আসলে

Sahitya Chayan

কি বলতো, বাবার টাকার হিসেবটা আমরাই কোনোদিন পেলাম না। এই আমার টিউশনির টাকায় নিজের লেখাপড়াটা চালিয়ে গেলাম। বাবা যে তার টাকা ঠিক কোথায় কি কাজে লাগায় আমি বা মা কেউ জানি না। তরল পদার্থে ওড়ায় সেটা জানি, আর সংসার খরচ বাবদ মায়ের হাতে যা দেয় সেটাতে টেনে টুনে খাওয়াটুকু জোটে। রোজ মাছ-মাংস না হলেও নিরামিষ জুটে যায়। এসব নিয়ে আমার তেমন আক্ষেপ নেই রে। শুধু একটাই প্রার্থনা করি ভগবানের কাছে, ওই লোকটাকে নরকে পাঠিও। আসলে পীযুষ বিশ্বাসের মেয়ে বলে লোকের কাছে পরিচয় দিতেই লজ্জা করে রে।

অনিক নিজের ব্যাগ থেকে জলের বোতলটা বের করে বললো, খা। এসব কথা তো আমি জানি রে প্রিয়াঙ্কা। রোজ রোজ বলে নিজেকে কেন ক্ষতবিক্ষত করিস তুই?

প্রিয়াঙ্কা জলের ঢোকটা গিলে নিয়ে বললো, জানি তুই জানিস, কিন্তু তুই একটা কথা জানিস না যে আমার সব দুঃখ উগরে দেওয়ার জায়গাটাও তো তুই। অনিক, তোদের মত স্ট্যান্ডার্ড ফ্যামিলিতে আমার মত মেয়েকে মেনে নেবে রে? অনিক একটু চুপ করে থেকে বললো, জানি না রে, তবে আমি এটুকু বুঝি, আমি ছাড়া তোকে কেউ বুঝবে না। তাই তোকে ছেড়ে কোথাও যেতেও পারবো না। প্রিয়াঙ্কা অনিকের হাতটা ধরে বলল, এখানে কি সেক্সি মেয়ের অভাব আছে নাকি বে? তোর কি মরন হয় না, এমন মরা কাঠের পিছনে জীবনটা বরবাদ করছিস কেন?

Sahitya Chayan

অনিক হেসে বললো, কি করবো বল, আমি কাঠে তেল মাখাতেই ভালোবাসি। আর শোন, আমি গতকাল প্রথম মাইনে পেলাম তাই তোর জন্য কয়েকটা গিফট এনেছি, প্লিজ নেব না বলিস না।

প্রিয়াঙ্কার চোখে শেষ বিকেলের কষ্ট মাখামাখি খাচ্ছে। ঠোঁটের কোণে জমে থাকা দুঃখ মেশানো ক্লান্তির ছায়া।

তবুও অনিকের দিকে তাকিয়ে বলল, গিফট, মানে উপহার? তুইই তো আমার সব থেকে কিমতি উপহার রে পাগল। অনিক নিজের ব্যাগ থেকে একটা সিলভার কালারের রিস্টওয়াচ আরেকটা মেকআপ বক্স বের করে বললো, আমার জন্য সাজবি বুঝলি! তুই নিজেই জানিস না তুই কতটা সুন্দর। আমি বাইরে থেকে পরিষ্কার দেখতে পাই তোর ঝকঝকে মনটা। ঠিক শাপলা দীঘির জলের মত। লোকে বলে, মুখ হলো মনের আয়না। যার মন এমন স্বচ্ছ তার মুখে কেন সবসময় দুশ্চিন্তার রেখারা আঁচড় বসাবে বলতে পারিস? শোন না, সেই যে যেদিন তোকে প্রথম দেখেছিলাম সেদিন যেমন ঠোঁটে হালকা গোলাপি লিপস্টিক ছিল, দুই ভ্রুর মাঝে একটা ছোট্ট মেরুন টিপ ছিল, অমন করে সাজবি আমার জন্য! প্লিজ, না বলিস না।

প্রিয়াঙ্কা অবাক চোখে তাকালো সুপুরুষ অনিকের দিকে। ছেলেটা যে ওর মধ্যে ঠিক কি দেখেছে ও নিজেও জানে না। তবে অনিক যে ওকে সবটুকু দিয়ে ভালোবাসে সেটা ও বেশ বোঝে। শুধু প্রিয়াঙ্কা নয়, ওর প্রতিটি শিরার লোহিতকণিকারাও জানে, অনিকের ভালোবাসাটা প্রথম

Sahitya Chayan

বসন্তের নতুন পাতা গজানোর মতই অরিজিনাল। তাই অনিক যখন এভাবে আব্দার করে তখন মুখ ঘুরিয়ে নিতে পারে না প্রিয়াঙ্কা। কি বা এমন চায় ছেলেটা? ও সাজলে নাকি অনিকের আনন্দ, আসলে প্রিয়াঙ্কার খুশিতেই ছেলেটা খুশি হয়ে যায়। প্রিয়াঙ্কার চোখের কোনে আচমকা মেঘের আনাগোনা দেখেই অনিক হেসে বললো, যাক আগ্নেয়গিরিতেও মেঘের দেখা মেলে তাহলে!

একটা কথা মনে রাখিস প্রিয়াঙ্কা, তোর উডবি এখন সরকারি চাকুরি, তাই তুইও মস্ত বড়লোক। যখন যা দরকার ফোনে হুকুম করবি, যদি ততদিনে মাইনে শেষ না হয়ে যায় তাহলে তোর পায়ে হাজির হয়ে যাবে। নাহলে পরের মাসের মাইনে পাওয়া পর্যন্ত একটু ওয়েট করতে হবে, ব্যস। প্রিয়াঙ্কা বললো, ইন্টারভিউ ভালো ছিলো বুঝলি, আমারটাও বোধহয় লেগে যেতে পারে।

অনিক চুপি চুপি বললো, তোর জবটা হয়ে গেলে, দুজনের টাকায় লোন নিয়ে একটা দু কামরার ফ্ল্যাট নেব বুঝলি। বিয়ের পর সোজা ওই ফ্ল্যাটে উঠবো। তাহলে আমার বাড়ির কেউ তোকে অপমান করতে পারবে না কারণে অকারণে।

প্রিয়াঙ্কা কষ্ট করে হেসে বললো, স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে রে আমার চোখদুটো। দেখি তোর এই মেকআপ কিটস থেকে কাজল পরলে হয়তো আবার সব চিন্তা ঘুচিয়ে তোর মত স্বপ্ন দেখবে এই চোখদুটো। কিছুক্ষনের জন্যও যদি ভুলতে পারি নিজের অবস্থানটা তাহলেও শান্তি।

Sahitya Chayan

অনিক বললো, বললি না তো ঘড়িটা কেমন হয়েছে? তোর পছন্দ হয়েছে?

প্রিয়াঙ্কা আনমনে বললো, আমি তো তোকে বলিনি যে গত সপ্তাহে আমার ঘড়িটা হারিয়ে গেছে, তাও তুই কি করে বুঝতে পারিস রে আমার কোনটা প্রয়োজন?

অনিক নরম গলায় বলল, বললাম না, তোর মনটা দেখতে পাই। প্রিয়াঙ্কা আলগোছে বললো, আর কি কি দেখতে পাস? অনিক চোখটা সরু করে বললো, বাকি সব ওই নতুন ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখবো বিয়ের পর। আর যদি তুই ততদিন ধৈর্য্য ধরে না থাকতে পারিস একান্তই এখনই দেখাতে চাস, তাহলে ...

প্রিয়াঙ্কা হেসে বললো, বজ্জাতি করিস না।

অনিক বললো, চল ফুচকা খাই, তোর মুড এখন বেটার হয়েছে। ফুচকাওয়ালাকে নুন ঝাল কম দেবার জন্য বকাঝকা করতেও পারবি, চল। প্রিয়াঙ্কা বললো, এত ভালোবাসিস কেন রে আমায়, বড্ড ভয় করে যে। ভালোবাসা শব্দে আমার বড্ড আতংক, ছোট থেকে পাইনি তো কখনো। অনিক ওর হাতটা চেপে ধরে বলল, বড়বেলায় পাবি, এখন চল তো...

প্রিয়াঙ্কার ঠোঁটে উন্মুক্ত আকাশের মতই একমুঠো হাসি ছড়িয়ে পড়লো। ফিসফিস করে বললো, পাগল একটা।

ফুচকার টক ঝাল স্বাদ জিভের মধ্যে পড়তেই প্রিয়াঙ্কার মনে পড়ে গেলো মায়ের বেশ কিছুদিন হল রাতের দিকে বমি বমি পাচ্ছে। মা বলছিলো, জানিস প্রিয়া জিভটা টক হয়ে থাকছে আর গলার কাছটা ঝাঁঝ মত। প্রিয়াঙ্কা নিজের

Sahitya Chayan

ঘরের বিছানা গোছাতে গোছাতে বলেছিল, বাবাকে বলো, একটা ডক্টরের কাছে নিয়ে যেতে। যার জন্য দু বেলা রেঁধে বেড়ে রাখছো, তার তো এটুকু কর্তব্য, তাই না মা? মায়ের মুখটা মুহূর্তে থমথমে হয়ে গিয়েছিল। মা জানে প্রিয়াঙ্কা বাবা নামক মানুষটাকে মোটেই সহ্য করতে পারে না, তারপরেও মা যে কেন তাকে এত যত্ন করে সেটাই বুঝতে পারে না ও। কিন্তু ওই লোকটার প্রতি একটা আক্রোশ মনের মধ্যে জমিয়ে জমিয়ে আগুনের ফলার মত তীকষ্ন করে রাখছে ও। সুযোগ পেলেই ওই আগুনে পুড়িয়ে মারবে লোকটাকে।

উফ, কি ঝাল রে! বলে চেঁচিয়ে উঠলো অনিক। প্রিয়াঙ্কার চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল মুখের ভিতরে টক ঝালের অনুভূতিতে। নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, হ্যাঁ রে অনিক, আমাদের দেশে আইন ফাঁকি দিতে গেলে কত টাকা লাগে রে? অনিক চোখ বড় বড় করে বললো, তুই থামবি! কি ভাবছিস এসব? প্লিজ প্রিয়াঙ্কা, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা দে যে এমন কিছু করবি না যাতে আমার দেখা স্বপ্নের রংটা ঘন কালো অথবা ধূসর হয়ে যায়। চল তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। প্রিয়াঙ্কা আলগোছে বললো, তুই চলে যা, আমি একবার জীবনদার মেডিকেল স্টোর হয়ে যাবো। মায়ের জন্য অ্যান্টাসিড নিতে হবে।

প্রিয়াঙ্কার দুই ভ্রুর মাঝে বিরক্তি আর দুশ্চিন্তার চিহ্নগুলো ধীরে ধীরে স্পষ্ট হলো, অনিকের চলে যাওয়ার ঠিক পরেই। মনে হলো ওর জীবনীশক্তির অর্ধেক যেন

Sahitya Chayan

নিয়ে চলে গেল অনিক। যেটুকু সময় ওর সঙ্গে ছিল, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে পারছিল অন্তত, আবার গিয়ে ঢুকতে হবে ওই নরকে। ওর এই চব্বিশ বছরের জীবনটার প্রতিটা মুহূর্ত বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছে ওই বাড়িতে। বসন্ত বাতাস ওই বাড়ির জানলা দিয়ে ভুলেও প্রবেশ করে না। তারপরেও যে কি করে অনিক ওর জীবনে এসেছিল কে জানে! অনিকের সঙ্গে প্রথম দেখার মুহূর্তগুলো মনে পড়ছিল ওর রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে। পিছনে এসে একটা গাড়ি খুব জোরে ব্রেক কষে বললো, শালী গুঙ্গি নাকি? এত হর্ন দিচ্ছি শুনতেই পায় না। প্রিয়াঙ্কা পিছন ঘুরে দেখলো, ছোট গাড়ি নয় রীতিমত একটা ছয় চাকার লরি এসে ব্রেক কষেছে ওর এক হাত পিছনে। নির্বিকার প্রিয়াঙ্কা। ও জানে ভগবান ওকে এত সহজে নেবে না। বহুবার চেষ্টা করেছে ও নিজেকে শেষ করে দেবার, প্রতিবারই কোনো না কোনো কারণে বিফল হয়েছে। ও যদি রেললাইন ধরে চলে তাহলে হয়তো দেখা যাবে দূরপাল্লার ট্রেনের ইঞ্জিনই খারাপ হয়ে গিয়ে থমকে যাবে ওর ঠিক পিছনেই। তাই অ্যাক্সিডেন্টে ওর কোনো ভয় নেই, ও জানে ওর দুর্ঘটনা ঘটবেই না। এক জীবনে আর কটা দুর্ঘটনা ঘটবে? ওর জন্মটাই তো একটা মারাত্মক প্রহসন, ও মনে করে দুর্ঘটনা। পীযুষ বিশ্বাসের নামটা যখন স্কুল কলেজের খাতায় অভিভাবক হিসাবে লিখতে হয় তখন মনে হয়, এর থেকে বড় কোনো প্রহসন ওর জীবনে ঘটতেই পারে না। লরি ড্রাইভারের দিকে ইশারায় বললো, চালিয়ে দাও আমার ওপর দিয়েই।

Sahitya Chayan

লরি ড্রাইভার বেশ চেঁচিয়েই বললো, পাগলী শালী।

হ্যাঁ প্রিয়াঙ্কা নিজেও বিশ্বাস করে ও উন্মাদ। নাহলে ওই পরিবেশে থেকেও ও লড়ে যাচ্ছে কি করে? সুস্থ মানুষ যেখানে এক সেকেন্ডও টিকতে পারবে না, সেখানে বছরের পর বছর ধরে আছে ও। প্রিয়াঙ্কা জানে ও আস্তে আস্তে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবে। এখন যেমন মৃত্যুভয় ওকে কাবু করতে পারে না, তেমনি অনিককে হারানোর ভয়ও ওকে আর দুর্বল করতে পারবে না।

ও জীবনদা, মায়ের গলা জ্বলছে, রোজ রাতের দিকে বমি বমি ভাব আছে। কোনো ওষুধ হবে গো?

জীবনদা ওর পান খাওয়া লালচে দাঁতে হেসে বললো, তোর বাপ তো একটু আগে প্রেগনেন্সি টেস্ট কিট কিনে নিয়ে গেল, ভাই-বোনের খবর আছে নাকি আগে দেখ।

সারা শরীরে একটা বিজবিজে ঘৃণার অনুভূতি ওকে চেপে ধরলো। মায়ের পিরিয়ড এখনও হয় ও জানে। বাবার থেকে মা বয়েসে বছর তেরোর ছোট, মায়ের এখনো মেনোপজ হয়নি সেটা প্রিয়াঙ্কা জানে। কিন্তু চব্বিশ বছরের মেয়ের বিয়ে দেবার ভাবনা বাদ দিয়ে তারা এখন বাচ্চা নিচ্ছে? অনিকের ফ্যামিলি আর কি মেনে নেবে প্রিয়াঙ্কাকে? একটু সন্দেহের বশে বললো, জীবনদা মটকা গরম হয়ে আছে, এর মধ্যে ইয়ার্কি ভালো লাগছে না। তাড়াতাড়ি একটা লিকুইড অ্যান্টাসিড দাও দেখি। জীবনদা তার ডাক্তারি বিদ্যে ফলিয়ে বললো, যদি তোর মা প্রেগন্যান্ট হয় তাহলে ডাক্তার না দেখিয়ে আমি কোনো ওষুধ দিতে পারব না রে প্রিয়া। তুই কাল কনফার্ম করে

Sahitya Chayan

তারপর ওষুধ নিয়ে যাস। ঘন্টা খানেক আগেই তোর বাবা ওটা কিনে নিয়ে গেল।

প্রিয়াঙ্কার ইচ্ছে করছিল, সর্বশক্তি দিয়ে জীবনদার গলাটা টিপে ধরে সারাজীবনের মত কথা বলার ক্ষমতাটা বন্ধ করে দিতে। এসব কথা তাহলে আর শুনতে হতো না ওকে। কতজনকে মারবে ও গলা টিপে, এবারে তো সবাই আঙুল তুলবে, পুরো মহল্লা আঙুল তুলে বলবে, কি রে প্রিয়া, ভাই না বোন? এটা কি সত্যি? চোখের সামনে নিজের মেয়ের এমন হেনস্থা দেখেও মা ওদের পরিবারে আরেকটা প্রাণকে আনার সাহস পাচ্ছে? জোরে জোরে বাড়ির দিকে পা চালালো প্রিয়াঙ্কা। সত্যিটা ওকে জানতেই হবে।

।।৭।।

আমাকে সত্যিটা বলো অনিরুদ্ধ, প্লিজ। এসময় ভণিতা ভালো লাগছে না। গোটা বাড়ি ভর্তি আত্মীয়, ছেলের বাড়ির লোকজন অবশ্য চলে গেছে কিছুক্ষণ আগেই। আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে অহনা তোমার কাছেই গেছে। সুচেতার গলা দিয়ে হিসহিস করে আগুন ঝরছে যেন। অনিরুদ্ধ কাল প্রায় মধ্যরাতের পরে ঘুমিয়েছে। তাই ভোর রাতে এমন একটা ফোন পেয়ে ঠিক মেলাতে পারছে না ঘটনাগুলো। ঘুমের ঘোরে আছে বলেই হয়তো মাথার মধ্যে সুচেতার কথাগুলো কিলবিল করলেও সামঞ্জস্য খুঁজে পাচ্ছে না। অনিরুদ্ধ একটাই কথা বলতে চাইছিলো সুচেতার কথার মাঝে, কি হয়েছে? তিতিরের বিয়ের ব্যবস্থাপনায় কোনো খামতি হয়ে গেছে কি?

Sahitya Chayan

পাত্রপক্ষ কি খাবার পায়নি? কিন্তু অনিরুদ্ধ তো মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কোনো কার্পণ্য করেনি। নামি ক্যাটারার, সুস্বাদু মেনু, দামি প্লেট সবই করেছিল প্রাণ ভরে। তাহলে খামতিটা কোথায় ঘটলো সেটাই বুঝতে পারছিল না সুচেতার অসংলগ্ন কথাতে। অনিরুদ্ধ ঘুম ঘুম লাল চোখে তাকিয়ে দেখল ঘড়িতে তখন পাঁচটা বাজছে। তার মানে আমন্ত্রিতদের খাবারের টাইম পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। তাছাড়া লাস্ট সাড়ে এগারোটাতে যখন অনিরুদ্ধ ক্যাটারিং-এর মালিককে কল করেছিল, তখনও সে বলেছিল, কোনো প্রবলেম নেই। নৈঋত বা ওর পরিবার সম্পর্কে যেটুকু শুনেছিল অনিরুদ্ধ সুচেতার কাছ থেকে তাতে পণের প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া নৈঋতের বাবাও অনিরুদ্ধর সঙ্গে ওর অফিসে এসে পরিচয় করে গিয়েছিলেন, ভদ্রলোককে বেশ ভালোই লেগেছিল অনিরুদ্ধর। তাহলে এতক্ষণে তো বিয়ে সুন্দরভাবে মিটে যাওয়ার কথা। সুচেতার নিশ্চিন্তে কাটানোর সময় যখন প্রায় উপস্থিত তখন কেন ও এতটা উত্তেজিত হয়ে রয়েছে, সেটাই বোঝার চেষ্টা করছিল অনিরুদ্ধ ওর অর্ধেক কাজ করা ঘুমন্ত ব্রেনের সাহায্যে। সুচেতা আবার আক্রমণাত্মক স্বরে বললো, মেয়েকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছো বলবে? তোমার সাপোর্ট না থাকলে বিয়ের রাতে অহনা কোনোভাবেই পালাতে সাহস পেতো না। ছি অনিরুদ্ধ, তুমি এভাবে প্রতিশোধ নিলে আমার অপমানের! অতগুলো বছর একসঙ্গে থেকেও তো তোমায় চিনতে পারলাম না গো। ভাবতেই পারছি না, তোমার মত একটা

Sahitya Chayan
নীচ মানসিকতার মানুষকে আমি ভালোবেসেছিলাম এত কাল? মুখ আর মুখোশ দুটোই যার নিখুঁত তাকে আবিষ্কার করা বোধহয় আমার মত মানুষের কর্ম নয়, তাই না?

অনিরুদ্ধ বিরক্ত হয়ে বলল, পাগলের মত না বকে একটু ক্লিয়ার করবে তিতির ঠিক কি করেছে?

সুচেতা হিসহিসে গলায় বলল, তোমার বড্ড আদরের না তিতির? বড্ড প্রশ্রয় দিয়েছো তুমি ওকে। স্বাধীনতা দিয়ে বন্ধুর মত মিশে মানুষ করতে চেয়েছিলে না তুমি ওকে? আজ তোমার এই মাত্রারিক্ত প্রশ্রয়ের জন্যই বিয়ের আসর ছেড়ে তোমার আদরের মেয়ে জাস্ট পালিয়েছে। কার সঙ্গে পালিয়েছে সেটা অবশ্য আমি জানি না অনিরুদ্ধ। তোমার তিতির পাখি তাই না? তাই তার ডানা কোথায় কোথায় উড়তে পারে সেই খবর তোমার কাছেই তো বেশি থাকবে তাই না অনিরুদ্ধ?

সুচেতার কথায় সম্বিৎ ফিরে পেল অনিরুদ্ধ। তিতির পালিয়েছে? কোথায়? বিয়েটা শেষ পর্যন্ত হয়নি? কিন্তু কেন? মেয়েকে তো আলাদাভাবে জিজ্ঞেস করেছিল অনিরুদ্ধ, যে নৈঋতকে ওর পছন্দ কিনা? তখন তিতির বলেছিল, বাবা নৈঋত বা কাবেরী আন্টিকে আমার অপছন্দ নয়, কিন্তু আমি একটা সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই, তারপরে না হয় তাদের কাছে সত্যিটা বলেই শুরু করবো নতুন জীবন। আসলে মিথ্যের ওপরে কোনো সম্পর্কের ভীত স্থাপন করা ঠিক নয় বাবা, এটা তুমিই শিখিয়েছো আমায়। অনিরুদ্ধ মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, কিছু পুরনোকে ভুলে যেতে হয় তিতির, তাতে

Sahitya Chayan

জীবনটা সুন্দর হয়। তিতির বাবার হাতটা চেপে ধরে বলেছিল, আমি যদি বছর খানেক পরে বিয়ে করি তাহলে কি তুমি আমার ওপরে রাগ করবে বাবা? অনিরুদ্ধকে কখনো বাবাই কখনো বাবা, কখনো ডিয়ার যা ইচ্ছে বলে ডাকে অহনা। অনিরুদ্ধই আদর করে নাম দিয়েছে তিতির। অহনা যখন খুব ছোট তখন যখনই ঘুমাত দুটো হাতকে দুদিকে ডানার মত ছড়িয়ে দিত, সেই দেখে অনিরুদ্ধ একদিন সুচেতাকে বলেছিল, ঠিক যেন ছোট্ট তিতির। সেই থেকেই সুচেতার দেওয়া অহনা নামটাতে আর ডাকে না অনিরুদ্ধ। তিতিরের কথা শুনে ও বুঝেছিলো, মেয়েটা এখুনি বিয়ে করতে হয়তো চাইছে না, কিন্তু পাত্রকে পছন্দ নয় বা অন্য কোথাও অ্যাফেয়ার আছে এমন নয়। মেয়ের ফার্স্টলাভের খবরও আছে ওর কাছে। সুচেতা না জানলেও অনিরুদ্ধ জানে তিতির ফার্স্ট ইয়ারে উঠে একজন ম্যারেড প্রফেসরের প্রেমে পড়েছিলো। যদিও সে প্রেম ছিল একতরফা। তিতির একাই ভালোবাসতো ওর স্যারকে, কিন্তু সে প্রফেসর ওকে ছাত্রীর নজরেই দেখতো। একদিন তিতির সাহস করে স্যারকে প্রোপোজও করেছিল, স্যার নাকি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "বিকেলে ভোরের ফুল" দেখে আর "নীলঘূর্ণি" পড়ে পড়ে সবারই দেখছি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। অহনা, আমি চাই তুমি মন দিয়ে পড়াশোনা করো, এসব পাগলামি তোমায় মানায় না।

অহনা নাকি স্পষ্ট সেই স্যারকে বলেছিল, আমি প্রোপোজ করছি বলেই যে আপনাকে রাজি হতে হবে

Sahitya Chayan

এমন নয়। তবে প্রোপোজ করতে পারলাম না বলে যদি ভবিষ্যতে আফশোস হয়, তাই শুভ কাজটা সেরে রাখলাম। এবারে আমিও মন দিয়ে পড়বো, আপনিও মনযোগ সহকারে সংসার করুন। আপনার ছেলের তো সামনেই মাধ্যমিক, ওকে মন দিয়ে পড়ান। স্যার বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারেনি। অহনা এরকমই, যখন যেটা মনে হয় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে সেটাই করে। যেন মনে হয় সেটা না করা পর্যন্ত ও নিঃশ্বাস ফেলবে না। ওর এই মারাত্মক জেদটাকেই ভয় পায় অনিরুদ্ধ। সুচেতা বোঝে না, জোর করে কিছু মতামত চাপিয়ে দেয় অহনার ওপরে। তারফলে বহুবার মা-মেয়ের মধ্যে বিবাদ হয়েছে। প্রতিবারই মিডলম্যান হয়ে অনিরুদ্ধই সামলেছে বিষয়টা। কেউ কারোর জায়গা থেকে এক ইঞ্চিও সরবে না এমন পণ করেই একই ছাদের নিচে কাটিয়ে দিয়েছে এক সপ্তাহ থেকে এক মাসও। দুজনেই কষ্ট পেয়েছে আলাদা ভাবে, কিন্তু ইগো আর জেদ কোনোভাবেই ওদের মাঝের পাঁচিলটাকে ভাঙতে দেয়নি। শেষে রীতিমত ছেনি হাতুড়ি নিয়ে অনিরুদ্ধকেই নামতে হয়েছে বরফ শীতল প্রাচীর ভাঙতে। তিতিরকে সবটুকু চেনে বলেই অনিরুদ্ধ সুচেতাকে বলেছিল, বিয়েটা আর কিছুদিন পরে দিলে হয় না? ও যখন এই মুহূর্তে চাইছে না, তখন না হয়....

সুচেতা ব্যঙ্গাত্মকভাবে হেসে বলেছিল, কে চাইছে না, তুমি না ও? তুমি বুঝিয়েছো ওকে? নাকি ওর কথাটাকেই শিরোধার্য করে ভেস্তে দিতে চাইছো সম্বন্ধটাকে। অনিরুদ্ধ সুচেতার চোখে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতেই তিতিরকে

Sahitya Chayan
রাজি করিয়েছিল বিয়েটা করতে। বলেছিল, নৈঋত আর ওর পরিবারকে যদি তোর পছন্দ হয়ে থাকে, তাহলে বিয়েটা করেই ফেল তিতির। আসলে কি বলতো, তোর মা মন থেকে চাইছে এখানেই তোর বিয়েটা হোক। সম্বন্ধটা কোনোকারণে ভেঙে গেলে সুচেতা কষ্ট পাবে। তুইও নিশ্চয়ই কষ্ট পাবি মা অভিমান করে থাকলে।

বাবার মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল, ওকে ডান, বিয়েটা সেরে নিয়েই আমি সত্য উদঘাটনে নামবো। জানি, তুমি বা মা কেউই আমায় এ বিষয়ে হেল্প করবে না, কিন্তু তোমরা ভুলে যাচ্ছ কেন আমিও একজন সাংবাদিক। খবর জোগাড় করার কিছু রাস্তা তো আমারও জানা আছে, তাই না?

অহনার প্রফেশন বাছার ব্যাপারেও অনিরুদ্ধকেই সুচেতা বারবার দোষারোপ করেছে। অহনার নাকি ওকে দেখেই রিপোর্টার হবার ইচ্ছে জেগেছিল। কোনো প্রয়োজন ছিল না এইসব চ্যালেঞ্জিং প্রফেশনে ঢোকার। অহনার সব স্বেচ্ছাচারী আচরণের পিছনেই নাকি অনিরুদ্ধর প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় আছে, এমনটাই সুচেতার ধারণা। না ধারণা নয় বরং দৃঢ় বিশ্বাস বলাটাই ঠিক। তবে সুচেতার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তিতির বিবাহ আসর থেকে পালিয়েছে, এটা ভাবতে অনিরুদ্ধর একটু কষ্টই হচ্ছিল। তিতির জেদি, তিতির একগুঁয়ে কিন্তু এতটাও অবুঝ তো নয়। সেই ছোট থেকে অনিরুদ্ধর কানে কানে নিজের সব কথা বলতো ও, সেই মেয়েটা আজ এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নিলো অথচ বাবাকে বললো না। শুধু সুচেতার কাছে নয়,

Sahitya Chayan

সত্যিই বোধহয় তিতিরের কাছেও পর হয়ে গেছে ও। গলার কাছটা কেঁপে উঠলো ওর। চোখের সামনে ভেসে উঠলো পিঙ্ক ফ্রক পরা ছোট্ট তিতিরের ছবিটা। এই তো সেদিন জন্মালো মেয়েটা, ঠিক কবে এতটা বড় হয়ে গেল সে! বাবাকে না বলে এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো! সুচেতা আবার বললো, তুমি না সিনিয়র রিপোর্টার, খবর খোঁজাই তো তোমার কাজ, তাই অহনার পালিয়ে যাবার খবরটা আমি নিজেই তোমায় দিলাম।

অনিরুদ্ধ বললো, বেশ রাগ করবে পরে, এখন পুরো ঘটনাটা আমায় ক্লিয়ার করে বলো, দরকার হলে পুলিশের হেল্প নিতে হতে পারে। সুচেতার গলাটা কেঁপে উঠলো, তারপর ভেঙে পড়া গলায় বললো, প্লিজ অনি থানা পুলিশ করো না। তাতে সম্মান কমবে বৈ বাড়বে না।

কত যুগ পরে সুচেতা আবার ওকে অনি বলে ডাকলো কে জানে! লাস্ট কবে ডেকেছিল মনে করার চেষ্টা করলো অনিরুদ্ধ। বয়েস হচ্ছে, স্মৃতিও এখন বড্ড অবাধ্য হয়ে উঠছে।

সুচেতা বলতে শুরু করলো, বিয়ের পিঁড়িতে নৈঋতের আশীর্বাদের পরে পোশাক বদলানোর জন্য ও ঘরে গিয়েছিল। আধঘন্টা পরে পুরোহিত যখন ডাকছেন তখন দেখা গেল বর নেই। অহনা একাই চুপ করে বসে আছে। নৈঋত ঠিক কোথা দিয়ে আর কেন পালালো সেটাই কেউ বুঝতে পারছিলাম না। ওদের পরিবারের লোক আমাদের থেকেও বেশি অবাক হয়েছিল। ওর বাবা গাড়ি নিয়ে দুজনকে পাঠিয়েওছিল আশপাশটা দেখে আসার জন্য।

Sahitya Chayan

অহনার চন্দন আঁকা মুখের দিকে তাকিয়ে আমার তখন কষ্ট হচ্ছিলো অনি। মেয়েটা শেষপর্যন্ত লগ্নভ্রষ্টা হবে! জানি এসব পুরোনো কথা তুমি মানো না, কিন্তু আমি তো মানি, তাই মেয়েটার লাল বেনারসি পরা, নাকে নথ পরা মুখটার দিকে তাকিয়ে কি করবো বুঝতে পারছিলাম না, ঠিক তখনই অহনা বললো, আমাকে একটু একা থাকতে দাও প্লিজ। নিজের ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলো। দরজার বাইরে ওরই দুটো বন্ধু রুমি আর চন্দ্রিমা বসেছিলো। সামনের দরজা দিয়ে ও বেরোয়নি, বেরিয়েছে পিছনের ব্যালকনি দিয়ে। আরেকটা কথা শোনো, নৈঋতকেও ওই পালাতে সাহায্য করেছে। কারণ নৈঋত এই বাড়িতে প্রথমবার এলো। ওর পক্ষে অহনার ঘরের পিছনের ব্যালকনির দরজা জানা সম্ভব নয়। বিয়ে বাড়িতে এত লোকজনের চোখে ধুলো দিয়ে নৈঋত কখনোই এই অপরিচিত জায়গা থেকে পালাতে পারতো না। যদি না তোমার তিতিরপাখি তাকে সাহায্য করতো। ওহ, তোমার আদরের তিতির একটা চিঠিও লিখে গেছে-সত্যের সন্ধান পেয়েছি, লক্ষ্য খুব কাছে, তাই বিয়েটা আপাতত স্থগিত থাকুক। ভেবে দেখো একবার মেয়ের স্পর্ধা। এর পরেও ওর মনে হয় ও ফিরলে নৈঋতের ফ্যামিলি ওকে মেনে নেবে? শুধু বসু পরিবার কেন, কোনো ভদ্র পরিবারই ওকে বউ হিসেবে মেনে নেবে না অনি! এত জানে অহনা আর এটুকু জানে না?

কেন এই সত্য উদঘাটনের ভূতটা ওর মাথায় চাপলো বলবে? কে চাপালো ওর মাথায় এটা? নিশ্চয়ই তোমার

Sahitya Chayan
কাছে এর কোনো জবাব নেই? না থাকাটাই তো স্বাভাবিক।

অনিরুদ্ধ এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল সুচেতার কথা, এবারে গম্ভীর স্বরে বললো, তখনই বলেছিলাম, কলকাতা থেকে বিয়েটা দাও। কেন আমাদের ফ্ল্যাটে কি সমস্যা হচ্ছিল তোমার? তাছাড়া একটা বড়সড় বিয়ে বাড়ি ভাড়া করলেই তো মিটে যেত। নাকি নৈঋতের ফ্যামিলিকে তোমাদের বনেদিয়ানা না দেখালেই চলছিল না। রাইগঞ্জ থেকে বিয়ে দেবার প্ল্যানটা কার ছিল সুচেতা? আমার না তোমার? কলকাতায় বিয়েটা হলে এসব হতো না!

সুচেতা গলায় সমস্ত বিরক্তি মিশিয়ে বললো, কেন কলকাতায় যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই? নাকি পালানোর সুযোগ নেই? তাছাড়া নৈঋতরাও তো ভাববে মেয়ের মামা, পিসি, মাসি কি কেউ নেই? শুধুই আমার স্কুলের কিছু কলিগ আর অহনার অফিসের বন্ধু, এছাড়া কলকাতায় আছেটা কে?

অনিরুদ্ধ কেটে কেটে বললো, আমি ছিলাম। তোমাদের রাইগঞ্জের বাড়িতে তো আমার প্রবেশের সুযোগ নেই, তাই যেতে পারলাম না।

সুচেতা বললো, অকারণ কাউকে দোষ দিও না। অহনার বিয়েতে তুমি থাকবে না, সিদ্ধান্তটা তোমার ছিল। আরেকটা কথা শোনো, কলকাতা কেন সেন্ট্রাল জেলের ভিতরে বিয়ের ব্যবস্থা করলেও তোমার তিতির পাখি হয়তো উড়েই যেত। কারণ ছোট থেকেই তিনি যখন যা ভাবেন তাই করেন কিনা! তখনই বলেছিলাম,

Sahitya Chayan
সাইক্রিয়াটিস্ট দেখানো দরকার ওই মেয়েকে। এরকম ভুল সিদ্ধান্ত কোনো সুস্থ মানুষ নিতে পারে না।

এতক্ষণ অনেকরকম দোষারোপ করে ফোনেই অঝোরে কেঁদে ফেললো সুচেতা। অনিরুদ্ধ ধীর গলায় বলল, শান্ত হও, তিতির যথেষ্ট ম্যাচিওরড মেয়ে, নিশ্চয়ই ও কিছু বুঝেছে তাই এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি দেখছি, ওকে ফোনে কানেক্ট করতে পারি কিনা দেখি।

সুচেতা বললো, ফোন সুইচ অফ বলছে ওর। এরপরেও বলবে, ও ঠিক করেছে? অনিরুদ্ধ প্লিজ, ওকে এভাবে অন্ধ সাপোর্ট করো না। এত ভালো একটা ফ্যামিলি, এত ভালো ছেলে, সব ভেঙে গেল। আসলে কি জানো অনি, আমি তো জানি আমার কপাল, তাই এতটা আশা করা বোধহয় আমার উচিত হয়নি!

অনিরুদ্ধ শান্তভাবে বললো, রেস্ট নাও, আমি কোনো খবর পেলেই দেব।

মা আর মেয়ের মধ্যে একটা অদ্ভুত ঠান্ডা লড়াই চব্বিশঘণ্টাই চলে। অহনার এমন অনেক গোপন খবর ও জানে সেটা সুচেতার অজানা। মায়ের কাছে চিরকালই লুকিয়ে রাখে অহনা নিজেকে, ওর যত গল্প অনিরুদ্ধর সঙ্গে। মেয়ের বাবা বলেই হয়তো ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠলো। শীতের ভোর বড্ড শুনশান হয়, মেয়েটার কোনো ক্ষতি হবে না তো? যদিও মেয়েকে ছোট থেকেই মার্শাল আর্ট শিখিয়েছে ও। সুচেতার ইচ্ছে ছিল মেয়েকে নাচ শেখাবে, অনিরুদ্ধ কিছুটা বিরোধিতা করেই নাচের স্কুলের বদলে ওকে ভর্তি করে দিয়েছিল মার্শাল আর্টের ক্লাসে।

Sahitya Chayan

তাই দীর্ঘদিন ক্যারাটে, মার্শাল আর্ট শেখার ফলে তিতির যে অন্য মেয়েদের মত নরম সরম সেটা নয়। তবুও দিনকাল যা খারাপ, ভয় তো করে! এখন কোথায় খুঁজবে ওকে! সুচেতা যদিও বলেছিল, পুলিশে খবর না দিতে, তবুও পুলিশ সুপারের সঙ্গে অনিরুদ্ধর বন্ধুর মত রিলেশন, পেশার কারণেই পরিচয় হয়েছিল, তারপর কি করে যেন বন্ধুত্বও হয়েছিল। অভিরূপ সান্যাল বলেন, সাংবাদিক আর মিডিয়া থেকে আমি বরাবরই দূরে থাকি, এদের আমি শত্রু ভাবি বুঝলে অনিরুদ্ধ! একমাত্র তোমাকেই কখনো শত্রু ভাবতে পারলাম না। তুমি আমাদের ডিপার্টমেন্টের গাফিলতি নিয়ে এত নিউজ করার পরেও নয়। অভিরূপকেই একবার ফোন করতে হবে। ও যদি গোপনে ওর কোনো সোর্স কাজে লাগাতে পারে তিতিরকে খুঁজতে, তাহলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হবে। মেয়েটার খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত অস্থির লাগছে।

ঘর থেকে বেরিয়েই দেখলো ভোরের আলো আর শীতল হাওয়া প্রতিযোগিতা করে ওকে ছুঁতে চাইছে। বিজু গোলাপ বাগানে চায়ের পাতা ছড়াচ্ছে, আর ঘাস পরিষ্কার করছে নিজের মনে।

অনিরুদ্ধর পায়ের আওয়াজ পেয়েই বললো, দাদাবাবু, এই তো মাঝরাতে শুতে গেলেন, আবার এত ভোরে উঠে পড়লেন?

অনিরুদ্ধ আনমনে বললো, বুঝলে বিজু, সবার কপালে সুখ থাকে না, কারোর কারোর কপালে মঙ্গল, শনি

Sahitya Chayan

সবকিছুর অবস্থান থাকে, তাই সে হয়ে যায় সব কিছুর কালপ্রিট। সেই হয়ে যায় ভিলেন বুঝলে!

বিজু হাঁ করে তাকিয়ে বলল, কি হয়েছে? বৌদিমনি ফোন করেছে নাকি? তার রাগ কমেছে?

অনিরুদ্ধ অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, তুমি কি করে বুঝলে? আমি তো তোমায় কিছুই বলিনি!

বিজু এক মুঠো ঘাস ছিঁড়ে ফেলতে ফেলতে বললো, এই প্রথম আপনি এই বাড়িতে এসে এতদিন থাকলেন। নাহলে তো বৌদিমিনি আর তিতিরদিদিকে নিয়ে এক থেকে দু দিন এসেছেন হাওয়া বদল করতে। এবারে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে, ওদের কাউকে না নিয়ে এসে থাকলেন দেখেই বুঝলাম, কিছু একটা হয়েছে।

বৌদিমনি আমাদের ভারী ভালো মানুষ। গত বছর ফেরার দিনে আমায় বলেছিলেন, বিজুদা দেখো, তোমার দাদাবাবুর সাধের হলদে গোলাপের গাছগুলো যেন নষ্ট না হয়। হলদে গোলাপ ওনার বড় পছন্দের।

অনিরুদ্ধ হালকা হেসে বললো, তা আমি দিন সাতেক আছি বলে কি বিজয়চাঁদের অসুবিধা হচ্ছে নাকি, সে কথা বলে দিলেই আমি বোঁচকা বাঁধি।

বিজু মাটি হাতেই নিজের কান দুটো ধরে বলল, কি যে বলেন দাদাবাবু, আপনি আছেন বলেই তো বাড়িটাতে আবার কতদিন পরে গান বাজছে সকাল সন্ধে, প্রাণ পেয়েছে যেন। হাঁটতে যাবেন তো? দাঁড়ান, সোয়েটার আর টুপি নিয়ে আসি।

Sahitya Chayan

বিজু বাগান থেকে ওঠার তাগিদ করতেই অনিরুদ্ধ বললো, তুমি কাজ করো, আমি নিয়ে নিচ্ছি।

ঘরে ঢুকতেই ফোনটা আবার বেজে উঠলো, স্ক্রিনের ওপরে যার নাম উঠছে সেটা দেখে একটু চমকেই গেল অনিরুদ্ধ।

।।৮।।

চমকাবেন না মিস অহনা, আমিও আপনার সঙ্গেই যাচ্ছি। রাইগঞ্জ থেকে কালিয়াগঞ্জ। দুটো স্টেশনের শেষেই গঞ্জ আছে, এটা যদি আপনার দেশের বাড়ি হয় তাহলে ওটা নিশ্চয়ই আপনার মামার বাড়ি, তাই না?

আপনার এক্সকে দেখে, দুজনের ছবি তুলে তবেই বাড়ি ফিরবো। নৈঋত বেশ দৃঢ় গলায় বলল কথাগুলো।

অহনা বেশ বুঝতে পারছিল, ওর প্রাক্তনের গল্পটা নৈঋত ঠিকমত হজম করেনি। তাই হয়তো ওকে মিথ্যেবাদী প্রমাণ করবে বলেই, অচেনা জায়গার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে ওর সঙ্গেই। নৈঋত আনমনে বললো, আপনার প্রিয় রং কি অহনা?

অহনা তখনও নিজের ভাবনার মধ্যেই ঘোরাফেরা করছিল। তাই নৈঋতের করা প্রশ্নটা ঠিক শুনতে পায়নি।

ওর দিকে তাকিয়ে বলল, আমায় কিছু বললেন?

নৈঋত এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, এই কামরায় আর কাউকে বলার মত তো খুঁজে পেলাম না, অগত্যা আপনাকেই...

অহনা নৈঋতের বাইরের রূপটা দেখে মনে করেছিল ছেলেটা নেহাতই শান্ত প্রকৃতির, মুখচোরা, একে হ্যান্ডেল

Sahitya Chayan

করতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না। এখন দেখছে ওর ধারণা ভুল। নৈঋত শান্ত ভদ্র, কিন্তু বোকা টাইপ নয়। সবকিছু যুক্তি দিয়ে বুঝে নিতে চায়। তাই অহনার এক্সের গল্পটা শুনলেও বিশ্বাস করেনি।

এতক্ষণ মায়ের চিন্তা হচ্ছিল অহনার, বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে আসাটা বোধহয় অত্যন্ত অন্যায় হলো। মাকে সকলের চোখে ছোট করে দেওয়া হলো। এমনিতেই বড় মামা আর মামীমা মাকে নানাভাবে অপমান করে সুযোগ পেলেই। কিন্তু এই মুহূর্তে বিয়েটা করে ফেললে, হয়তো আর কোনোদিনই সত্যের মুখোমুখি হবার সুযোগ পেত না ও। অন্য একটা পরিবার, তাদের সম্মান এসব ভাবতে ভাবতেই পিছিয়ে যেত লক্ষ্য থেকে। বিয়ে মানেই তো একটা বন্ধন, সেই বন্ধনে একবার আবদ্ধ হলে আর কি এভাবে অজানা অচেনার লক্ষ্যে বেরিয়ে পড়তে পারতো? অহনা এটুকু অন্তত ভালোই বোঝে, যতই মেয়েরা স্বাধীন হয়ে যাক, বিয়ের আগের আর পরের জীবনে আকাশ পাতাল পার্থক্য হয়ে যায়। তাই রবিদার জেনুইন খবরটা পাওয়ার পরে বিয়ের পিঁড়িতে বসে নিশ্চিন্তে বিয়ে করাটা ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

অহনা অন্যমনস্কভাবে বললো, ঘন কালো। এটাই আমার প্রিয় রং। এতটাই নিশ্ছিদ্র কালো যেখানে নিজের হাত, পা, মুখ নিজেই দেখতে পাবো না।

নৈঋত একটু অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, কালো আমারও খুব প্রিয় রং তবে সেটা অন্য কারণে। নিজেকে লুকিয়ে রাখবো বলে নয়।

Sahitya Chayan

অহনা ভাবলো, কথা বলে স্বাভাবিক হয়ে যদি একে পরের স্টপেজে নামিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে মন্দ হবে না।

নরম গলায় অহনা বললো, বললেন না তো, কালো কেন আপনার প্রিয় রং?

নৈঋত হেসে বললো, ভয়ংকর রকমের সুন্দর বলে। কালোকে আমার কেন জানি না পৌরুষের প্রতীক মনে হয়। ভীষণ স্ট্রং একটা ব্যক্তিত্ব আছে। মিষ্টতা নেই গোলাপি, আকাশির মত তবুও অহংকার আছে ষোলো আনার জায়গায় আঠেরো আনা।

অহনা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল নৈঋতের দিকে। বেশ কথা বলে তো ছেলেটা!

নৈঋত বললো, অনেকটা আমার এখনকার পজিশনের মত। আপনি সর্বান্তকরণে চাইছেন আমি এই ট্রেন থেকে নেমে যাই, মানে ষোলো আনা চাইছেন আপনার কাঁধ ফাঁকা করি, কিন্তু আমি নির্লজ্জের মত আঠেরো আনা চেপে বসে আছি।

অহনা মুচকি হেসে বললো, তারমানে কালো রঙের মত আপনারও বেশ অহংকার আছে বলুন? মানে কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না আপনার মত একজন সুপুরুষ, সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্রকে ছেড়ে শেষ মুহূর্তে কোনো মেয়ে অন্য কারোর হাত ধরতে যেতে পারে! অস্বস্তির থেকেও অহংকারে আঘাতটা বোধহয় আমি বেশি দিয়ে ফেলেছি তাই না নৈঋত?

নৈঋত একটু থমকে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বললো, হঠাৎ মিডিয়ায় কাজ করার ঝোঁক কেন চাপলো? আপনার

Sahitya Chayan

বাবাকে দেখে? নাকি অন্য কোনো কারণ আছে? না মানে আপনার বায়োতে যা দেখলাম তাতে তো....

অহনা ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বললো, প্রফেসর হতে পারতাম তাই তো? নোবেল জব, লোকজনের দৃষ্টিতে সম্ভ্রম। সেফটি লাইফস্টাইল। আমার মাও তাই বলে জানেন। মিডিয়া শুনলেই লোকজন কেমন একটা চোখে তাকায়, যেন মনে হয় বাকি সবাই যুধিষ্ঠিরের সেকেন্ড এডিশন, শুধু মিডিয়ার লোকগুলোই একচেটিয়া মিথ্যে বলার দায়িত্ব নিয়েছে। মিডিয়ার লোকজনের কি প্রয়োজন বলুন তো অকারণে মিথ্যে বলবে। আমাদের কাছে যতটুকু খবর এসে পৌঁছায় আমরা ততটুকুই দেখাই। অনেকসময় সঠিক খবরই আমরা পাই না। তাছাড়া রাজনৈতিক চাপে আমরাও বাধ্য হই কিছু খবর প্রকাশ্যে না আনতে। মিডিয়ায় কাজ করবো আর রুলিং পার্টির বিরোধিতা করে দুঃসাহসী হবো এমন ভাবলে অন্যত্র চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে, সঙ্গে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে ঘুরতে হবে বুঝলেন! কে কখন ঠুকে দেবে জানতেও পারবেন না। তবে বাবার জবটা অনেক বেশি প্রেস্টিজিয়াস। বাবা এতবড় দৈনিকের সিনিয়র রিপোর্টার! আমি টিভি চ্যানেলের বলে আমার মুখটা হয়তো পাবলিক বেশি চেনে কিন্তু দুর্নাম কুড়াই আমরাই বেশি।

নৈঋত বললো, আমি শুনেছিলাম আমার মায়ের সঙ্গে নাকি আপনার রাস্তায় আচমকা পরিচয় হয়েছিল? মা যদিও বিষয়টা ক্লিয়ার করে বলেনি, তবে আমার মায়ের যেরকম

Sahitya Chayan

পার্সোনালিটি তাতে রাস্তায় কারোর সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেলো আর মা তাকে নিজের পুত্রবধূ নির্বাচন করে ফেলবে এমনটা কিছুতেই নয়। অন্তত আমি এটা বিশ্বাস করি না।

অহনা বেশ ভালোই বুঝতে পারছে নৈঋত এই বিয়ে ভাঙার কারণটা কি সেটাই বোঝার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। তাই প্রথমে পরিচয়সূত্র ধরে প্রশ্ন করতে শুরু করেছে!

বিয়ের আসর থেকে এভাবে পালাতে অহনাও চায়নি। এটা ওর শিক্ষা বা রুচি বিরুদ্ধ। আচমকা ফোনে ওই মেসেজটা দেখে ওর যে কি হয়ে গেল ও নিজেও জানে না। তবে এখন বুঝতে পারছে একটা খুব বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। বিয়েটা শুধু নৈঋত আর অহনার হচ্ছিল না, হচ্ছিল দুটো পরিবারের। এর সঙ্গে দুটো পরিবারের রেপুটেশন জড়িয়ে ছিল। ওর মত শান্ত বুদ্ধির মেয়ে কিভাবে এমন একটা কাজ করে ফেললো সেটাই বুঝতে পারছে না। এখন আর পিছিয়ে যাবার উপায় নেই।

নৈঋত নরম অথচ ব্যঙ্গাত্মক গলায় বলল, প্রাক্তনকে লুকিয়ে রেখে বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন, বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে এলেন এগুলোর কোনো সদুত্তর এখনো পর্যন্ত আমি পাইনি, এখন যে প্রশ্নটা করছি সেটার উত্তর আশা করছি।

অহনা এতক্ষণে খেয়াল করলো ওর বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটা খুব জ্বলছে। এতক্ষণ উত্তেজনার বশে অনুভূতিগুলোও যেন কেমন বিকল হয়ে গিয়েছিল। এখন ট্রেনের হওয়াটা গায়ে লাগতে একটু শিরশির করে উঠলো

Sahitya Chayan
শরীরটা। শেষ শীতের হিমেল হাওয়ায় আবার উপলব্ধি নামক বস্তুটি সচল হলো ওর মস্তিকের অভ্যন্তরে।

স্যান্ডেল থেকে পাটা বের করতে যেতেই দেখলো চ্যাটচ্যাট করছে। কি করে যেন পায়ের বুড়ো আঙুলটা কেটেছে খানিকটা। রক্ত বেরিয়েছে, আবার বন্ধ হয়ে শুকিয়েও গেছে। উত্তেজনায় কোনোটাই খেয়াল করেনি অহনা। পায়ের দিকে তাকাতেই নৈঋত বললো, এ বাবা কেটেছে তো! এতক্ষণ এত কথা বলছেন, প্রাক্তন কত হ্যান্ডসাম সেসব বলে চলেছেন আর আঙুল কেটেছেন সেটাই বলতে ভুলে গেছেন। সত্যি প্রেমের কি মহিমা। মানুষ দুঃখ, কষ্টও ভুলে যায়। জল আছে সঙ্গে? আমায় তো অর্ধ উলঙ্গ করে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন, নিম্নাঙ্গে এই যখন তখন খুলে যেতে পারে বস্তুটি নিয়ে আমি রাস্তায় বেরোলাম। জীবনে প্রথম ধুতি পরার অভিজ্ঞতা যে এমন বিভীষিকার হবে কে জানতো! তাই জল, ব্যাগ, ব্যান্ডেড এসব কিছুই নেই আমার সঙ্গে। যদি আপনার কাছে থাকে তো দিন, আমি আঙুলটা পরিষ্কার করে দিচ্ছি।

আঙুলটা টনটন করছে অহনার, শরীরটাও বড্ড ক্লান্ত লাগছে। প্রায় সারাদিনের উপোসের পর এত ধকল আর নিতে পারছে না ও।

হ্যান্ড ব্যাগে একটা ছোট জলের বোতল আছে বোধহয়, আর পার্সে ব্যান্ডেড থাকারই কথা। ব্যাগ থেকে জলের বোতলটা বের করতেই নৈঋত হাত বাড়িয়ে বললো দিন আমায়। অহনার চোখের দ্বিধার চাউনি লক্ষ্য

Sahitya Chayan

করে বললো, পায়ের আঙুল ছুঁলেও কি এক্স রাগ করবে নাকি?

মারাত্মক পজেসিভ এক্স দেখছি আপনার। কিন্তু আমিও তো মানুষ, অন্তত দেখতে মানুষের মত তাই এটাকে কর্তব্য মনে করি। জলের বোতলটা অহনার হাত থেকে নিয়ে ওর পায়ের আঙুলের ওপরে সাবধানে জলটা ঢাললো নৈঋত। চিড়চিড় করে জ্বলে উঠলো জায়গাটা।

নৈঋত বললো, কোথায় কাটলো? গাড়ির কোনো পার্টসে নয় তো? তাহলে কিন্তু প্রাক্তনের বুকে ঝাঁপাবার আগে টেটভ্যাক নিতেই হবে।

অহনা মৃদু স্বরে বললো, একটু কাটলেই ইনজেকশন নিতে হয় না, এরকম কত কাটে সকলের।

নৈঋত ভ্রু কুঁচকে বললো, আপনি শিওর স্বয়ং ভীষ্ম শরশয্যায় যাওয়ার আগে টেটভ্যাক নেননি? আমার কিন্তু মনে হয় আগে থেকেই প্রিকোশন নিয়েছিলেন ভদ্রলোক। তাই গোঁয়ার্তুমি না করে এক্সের হাত ধরার আগে একটা ইনজেকশন মাস্ট।

দিন ব্যান্ডেডটা দিন। নিজের পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমালটা বের করতে করতে বললো, ভাগ্যিস শীতকালেও রুমালটা সঙ্গে নিয়েছিলাম। অহনাকে চমকে দিয়ে নরম রুমাল দিয়ে ওর পায়ের আঙুলটা মুছিয়ে দিলো খুব আদুরে ভঙ্গিমায়। মারাত্মক অস্বস্তিতে ভুগছে অহনা, এই মুহূর্তে ও নৈঋতকে ওর জীবন থেকে ছেঁটে বাদ দিতে চাইছে আর নৈঋত যেন ততো জড়িয়ে ফেলছে ওকে।

Sahitya Chayan

ব্যান্ডেডটা লাগাতে লাগাতে বললো, আমার না নিজেকে হাম দিল দে চুকে সনম মুভির অজয় দেবগণ মনে হচ্ছে।

না, একটু পার্থক্য অবশ্য আছে, অজয়ের সঙ্গে আল্টিমেটলি ঐশ্বর্য্যার বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল, তারপর অজয় ওর প্রাক্তন সলমনের সঙ্গে মেলাতে নিয়ে চলেছিল। আমার ক্ষেত্রে বিয়েটা হতে হতে হয়নি, বাকি সিকুওয়েন্স প্রায় একই, কি বলুন?

অহনা নিজের পাটা টেনে নিয়ে বললো, আরেকটা পার্থক্য আছে বুঝলেন, ঐশ্বর্য্যা অজয়কে বাধ্য করেছিল প্রাক্তনের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আর আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি আপনি প্লিজ বাড়ি ফিরে যান।

নৈঋত আনমনে বললো, কি জানি কেন অজয় হতে ইচ্ছে হচ্ছে যে। নৈঋতের গলার হালকা কাঁপনটা কানে লাগলো অহনার। সত্যিই তো সমাজের লোকজনের কাছে নৈঋতকে তো কম অপমানিত হতে হবে না! বেচারা বোধহয় বাড়ি ফিরতেই ভয় পাচ্ছে। খারাপ লাগছে অহনার, ওর হঠকারিতার জন্যই এমন পরিস্থিতির তৈরি হলো। এখন তো মনে হচ্ছে বিয়ের পরে নৈঋতকে আসল বিষয় বুঝিয়ে বললে ও নিশ্চয়ই শুনত অহনার কথা। কিন্তু ও কতটাই বা চেনে নৈঋতকে, সত্যিটা সামনে আসার পরে আদৌ কিভাবে রিয়্যাক্ট করতো সেটাই ভাবনার বিষয়।

অন্যমনস্ক অহনা ভাবছিলো, মা-বাবার মুখোমুখি কি ভাবে হবে? তাছাড়া নৈঋতকেও তো এখনো নামানো

Sahitya Chayan

যায়নি ঘাড় থেকে, এত প্রবলেম কি করে যে সলভ করবে কে জানে!

অহনা চিন্তান্বিত স্বরে বললো, ভাবছি আজকের দিনটা দেশের বাড়িতে রেস্ট নিয়ে কাল যাবো ওখানে।

নৈঋত চমকে গিয়ে বলল, মানে? আপনার এক্স থাকবে না স্টেশনে আপনার অপেক্ষায়! কোথায় দেশের বাড়ি যাবেন? সেখানে কে থাকে? আপনি করতে কি চাইছেন একটু ক্লিয়ার করবেন? আপনার কথায় এত পরিমাণে মিনারেল ওয়াটার মিশে আছে যে আমি খনিজ পদার্থের মধ্যে জাস্ট হাবুডুবু খাচ্ছি।

অহনা বিরক্ত হয়ে বলল, বারবার এক্স এক্স করবেন না তো! বিরক্ত লাগছে।

নৈঋত হেসে বললো, বেশ বেশ, তো আপনার প্রেজেন্ট ওয়েট করবে না ওই কালিয়াগঞ্জ না কালনাগ নামক স্টেশনে?

অহনা রেগে গিয়ে বলল, না কেউ থাকবে না। আমি আপাতত বাবার কাছে যাবো। রেস্ট নেব আজ, কাল ভোরে ওখান থেকে কালিয়াগঞ্জ। মাত্র একঘণ্টার পথ।

নৈঋত বললো, আপনার প্রেজেন্ট কি কালিয়াগঞ্জে থাকে?

অহনা জোরে জোরে ঘাড় নেড়ে বললো, হ্যাঁ, তাই থাকে, তাতে আপনার কি বলুন তো? আপনি এবারে নেমে যান, তারপর কলকাতা ব্যাক করুন। নৈঋত বললো, কষ্ট করে যখন এতদূর এলাম তখন একবার তো তেনার দর্শন করেই ফিরবো। এটা তো আমার মত কমন

Sahitya Chayan

ম্যানের নৈতিক অধিকার, এটা আপনি আটকাতে পারবেন না।

অহনা ভাবছিলো নৈঋতের মা ভালোমত মিথ্যে বলেছেন ছেলের সম্পর্কে। উনি বলেছিলেন, ওনার ছেলে নাকি অত্যন্ত শান্ত, ভদ্র, কম কথা বলা মানুষ। তিনটের একটাও যদি সত্যি হতো তাহলে অহনাকে এতটা এফর্ট দিতে হতো না নৈঋতকে ভাগানোর জন্য। মায়ের সামনে নিশ্চয়ই ভদ্র ছেলে সেজে থাকে, তাই কাবেরী আন্টি জানতেও পারেনি তার ছেলেটি একটি মারাত্মক...

অহনার ভাবনাটুকুও শেষ করতে না দিয়ে নৈঋত বললো, কি ভাবছেন, আমি অত্যন্ত নাছোড়বান্দা, অসভ্য টাইপ ছেলে? আসলে কি বলুন তো, খুব বেশি ভদ্র হলে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রফেসর হওয়া যায় না। যদিও বা যায় টিকে থাকা যায় না। আপনি জানেন, কোনোভাবে কলিগদের মাধ্যমে আমার বিয়ের খবরটা ডিপার্টমেন্টে ছড়িয়ে যাবার পরে কি হয়েছিল?

অহনার মাথায় এত চিন্তার ভিড় যে নৈঋতকে ওর স্টুডেন্টরা কি বলেছিল সেটা শোনার কোনোরকম আগ্রহ নেই ওর মধ্যে। কিন্তু নৈঋতের গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছে ও ঘটনাটা অহনাকে শোনাতে বদ্ধপরিকর। ওর কান দুটো যেহেতু হেডফোন বা তুলো দিয়ে ঢাকা নেই আর ও যেহেতু শুনতে পায় তাই অগত্যা শুনতেই হবে। অসহায় ভাবেই তাকালো নৈঋতের দিকে। নৈঋত বেশ উৎসাহের সঙ্গে বলতে শুরু করেছে, যখনই ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরা জানতে পারলো আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে তখনই শুরু

Sahitya Chayan

হলো ফিসফাস। কিছুদিনের মধ্যে সেই ফিসফাস আর গোপন থাকল না। রীতিমত সরব আকারে ফিরে আসতে শুরু করলো আমার কাছে। যেমন, ক্লাসে ঢুকেছি একটি মেয়ে খুব নিরীহ গলায় জিজ্ঞেস করলো, স্যার হানিমুনে কোথায় যাবেন? পাহাড়, জঙ্গল না সমুদ্র? পাশ থেকে আরেকটি ছেলে বলে উঠলো, তুই এমন খাপছাড়া কোয়েশ্চেন করিস কেন রে মনীষা? আগে স্যারকে জিজ্ঞেস করে দেখ, স্যার বিদেশে যাবে না এদেশের মাটিতেই ঘুরবেন?

পাশ থেকে আরেকজন বললো, স্যার শুনলাম নাকি ম্যাম রিপোর্টার? আপনার সঙ্গে কিভাবে পরিচয় হয়েছিল? লাভ না অ্যারেঞ্জড স্যার? আরেকজন মাতব্বর গোছের ছেলে সবাইকে থামিয়ে বললো, আঃ কি হচ্ছে এসব! কেন স্যারকে অ্যাম্বারাসিং কোশ্চেন করছিস তোরা? প্রায় দুবছর স্যারকে দেখেছিস তারপরেও চিনলি না স্যারকে! আমি ভাবলাম, যাক এই ছেলেটা অন্তত ভদ্র সভ্য আছে, শেষ পর্যন্ত বাঁচাল বোধহয় আমায়। আমার ভাবনা শেষ হবার আগেই সে বলল, আমি তো নিশ্চিত জানি স্যারের আরেঞ্জড ম্যারেজ, স্যার কোনোদিন মেয়েদের ঝাড়ি দিতেই পারে না। মানে আমি বিশ্বাস করি না, স্যার যেচে গিয়ে কোনো মেয়েকে প্রোপোজ করছে। স্যারের লুকটা দেখ, লাভ ম্যারেজ করার কোনোরকম চিহ্ন খুঁজে পেয়েছিস তোরা স্যারের চেহারায়? তাহলে অকারণ এসব প্রশ্ন কেন করছিস? স্যার আপনি ওদের কথায় কিছু মনে

Sahitya Chayan

করবেন না, তারপর বলুন, বৌদিকে আপনি পছন্দ করলেন নাকি আপনার মা?

আপনি ভাবতে পারছেন অহনা, এরা কি মারাত্মক লেভেলের লেগপুলিং করতে পারে। এসবের পরেও যখন ওই কলেজে টিকে আছি তখন আমিও নেহাত শান্ত ছেলে নয়। তবে এবার কলেজে ফিরে বিয়ে ভেস্তে যাবার খবরটা নিয়ে ঠিক কিভাবে ট্রলড হবো আমিও কল্পনা করতে পারছি না।

অহনা হেসে ফেলল ওর বলার ভঙ্গিমায়। জিজ্ঞেস করলো তা আপনি কি বললেন? কে পছন্দ করলো আমায়?

।।৯।।

বৌদিভাই, অহনাকে তো তুমিই পছন্দ করেছিলে, তাই না?

নীলাদ্রির বোন অনু কাবেরীর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে প্রশ্নটা করলো। না মানে, টুটাই কি কিছু জানিয়েছিল তোমায় যে অহনাকে ওর পছন্দ নয়, বা অন্য কাউকে ভালোবাসে? কাবেরী বিধ্বস্ত চোখে তাকালো ননদের দিকে। না অনুর চোখে কোনো বিদ্রুপ নেই, বরং দুশ্চিন্তা ঘুরছে এলোমেলো। একমাত্র ভাইপোর বিয়েতে বেশ সুন্দর করে সেজেছিল অনু। বোধহয় পার্লার থেকে সেজে এসেছিল। অফ হোয়াইট আর রেড কম্বিনেশনে বিষ্ণুপুরী বালুচরি পরেছিলো। কানে গলায় মুক্তোর সেট। অনুর একটু ভারী ফরসা আভিজাত্যপূর্ণ চেহারায় মানিয়েছে ভারী। ঘাড়ের কাছে দুটো রেড জারবেরা দিয়েছে। যদিও

Sahitya Chayan

এমন নিখুঁত সাজ এখন প্রায় বিপর্যস্ত, চোখের নিচের কালিটা বোধহয় কাজলের নয়, সারারাত জাগরণের চিহ্ন। ক্লিপ থেকে ফুলদুটো খুলতে খুলতেই আবার বললো, বৌদিভাই, বলো না, টুটাই কি কিছু বলেছিল তোমায়? আমার নিজের ভাইপো বলে বলছি না, আমি এমনিই সবার কাছে বলি, আমাদের টুটাইয়ের মত ছেলে লাখে মেলে না। এমনকি আমাদের তুতান অবধি বলে, মা, দাদার মত হতে পারিস না বলে বলে তুমি আমার কানটার বারোটা পাঁচ বাজালে। আজ যদি এটা আমার নিজের সন্তান তুতান করতো আমি আশ্চর্য হতাম না বিশ্বাস করো। তুতানের মধ্যে একটা কথা না শোনা অবাধ্যতা রয়েছে। কিন্তু আমাদের টুটাই এরকম করতে পারে এ যে কল্পনার অতীত। শুভময় বলছে, কিছু একটা গন্ডগোল আছে ওই মেয়ের মধ্যে, সেটা টের পেয়ে টুটাই পালিয়েছে। কাবেরী এতক্ষণে ঠোঁট খুলে বললো, কি বলছে শুভ? শুভময় এ বাড়ির জামাই হলেও কাবেরীর ভাইয়ের মত। বৌদির সব কিছুতেই তার পূর্ণ সমর্থন থাকে। অনু মজা করে বলে, বুঝলে বৌদিভাই তোমার ভাই বলে, বৌদির কাছ থেকে শিখে নাও সংসার চাকরি আর সন্তানকে কিভাবে ব্যালেন্স করতে হয়। একজনও আঙুল তুলে বলতে পারবে না সে অবহেলিত হচ্ছে। এটা শুধু বৌদিই পারে বুঝলে।

অনু আর নীলাদ্রি দুই ভাইবোন সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের। অনু বড্ড সরল, সাদাসিধে, মনে আর মুখে একই কথার পুনরাবৃত্তি ঘটে ওর। অনেক অপ্রিয় সত্যি ও মুখের সামনে বলে দেয়, কিন্তু আড়ালে তাকে নিয়ে

Sahitya Chayan

আলোচনা করার মেয়ে অনু নয়। শুভময় কর্মসূত্রে ভূপালে থাকে, তাই বাপেরবাড়ি আসেই কম। তবে কাবেরীর সঙ্গে দারুণ একটা বন্ধুর মত সম্পর্ক। অনু গল্প করতে ভালোবাসে, বেশ খোলামেলা। নীলাদ্রি আবার অনামিকার বিপরীত স্বভাবের। কথা কম বলা সিরিয়াস টাইপ মানুষ। মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই ওর মনে কি চলছে! একমাত্র কাবেরীই নীলাদ্রির মুখের শিরা-উপশিরায় ওঠানামা দেখে কিছুটা বুঝতে পারে। আজ অবশ্য নীলাদ্রির মুখের ভাঁজে কোনো অভিব্যক্তিই নেই, অন্তত কাবেরী খুঁজে পায়নি। শুধু চোখে একটা অদ্ভুত অসহায়তা ঝিমিয়ে রয়েছে। নীলাদ্রিকে আজ এত বছর চেনে কাবেরী, কোনোদিন ওর চোখে এমন করুণ দৃষ্টি দেখেনি ও, তাই মানসম্মান বাদ দিয়েও ইন্ট্রোভার্ট মানুষটা ওদের বাড়িতে কতটা অপমানিত হয়েছে ভেবেই কষ্ট হলো কাবেরী। নিজেকেই দোষারোপ করতে ইচ্ছে করছে ওর। নীলাদ্রি বলেছিল, মেয়েটার সব ভালো, কিন্তু বাবা-মায়ের মধ্যে কোনো একটা প্রবলেম চলছে মনে হলো। না, কেউ কারোর নামে কোনোরকম দোষারোপ করেনি ঠিকই, কিন্তু আমার যেন ওনাদের সম্পর্কটা একটু গোলমেলে লেগেছে। বিয়েতে নাকি অনিরুদ্ধবাবু কোনো একটা বিশেষ কারণে উপস্থিত থাকতেও পারবেন না বললেন। কাবেরী, টুটাই আমাদের একমাত্র ছেলে, আরেকবার ভাবলে হতো না? জানি অহনা সুন্দরী, শিক্ষিতা, সাকসেসফুল রিপোর্টার তবুও মন ঠিক সায় দিচ্ছে না। মেয়েটা যেন বড্ড ম্যাচিওর্ড, আমাদের টুটাই সে তুলনায় ইমোশনাল বেশি।

Sahitya Chayan

কাবেরী এক ঝটকায় নীলাদ্রির কথাকে কাটা ঘুড়ির মত উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, অহনার মত মেয়েকে যদি টুটাইয়ের পছন্দ না হয় তাহলে কাকে হবে? অহনা প্রতিবাদী, স্মার্ট, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর একটা মেয়ে, ও পাশে থাকলে একটা অদ্ভুত পজেটিভ এনার্জি কাজ করে জানো। আমার তো প্রথম দেখাতেই পছন্দ হয়েছিল অহনাকে। নীলাদ্রি কম কথার মানুষ, তাছাড়া সাংসারিক ব্যাপারে খুব বেশি ইন্টারফেয়ারে করার মত মানুষও নয়। কাবেরী ওপরে সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে অতগুলো বছর নিশ্চিন্তেই আছে। তাই জোরদার কোনো প্রতিবাদ করেনি, বরং নিমরাজি হয়ে মেনেই নিয়েছিল অহনার সঙ্গে বিয়েটা। যদিও আজকের ঘটনাটা কাবেরী কেন বাড়ির কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

অনুর দিকে তাকিয়ে কাবেরী বিধস্ত গলায় বলল, কি বলছে শুভ? অনু হাত নেড়ে শুভকে ডাকলো, তারপর বলল, ও বলছিলো, টুটাই নিশ্চয়ই কিছু বুঝতে পেরেছে, ওই মেয়ের অবশ্যই কোনো প্রবলেম আছে, সেটা বুঝতে পেরেই টুটাই শেষ মুহূর্তে এমন একটা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে।

শুভময় এসে বসলো কাবেরীর পাশে, একটু গম্ভীর গলায় বলল, বৌদি কাল যেটা হলো সেটা আকাঙ্খিত ছিল না। কিন্তু আমার খটকা লাগছে অন্য জায়গায়, তোমরা আমায় বড়কর্তা করেছিলে। দাদা টুটাইয়ের গাড়িতে যায়নি, আমিই ছিলাম ওর সঙ্গে। টুটাইয়ের দুটো বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে যাচ্ছিলাম। তখন কিন্তু আমি

Sahitya Chayan

বারবার খেয়াল করেছি, টুটাইয়ের মুখে কোনো অস্বস্তি আছে কিনা। যেহেতু আমার অফিসের ঝামেলার জন্য মেয়ে দেখতে আসতে পারিনি তাই মজা করে টুটাইকে জিজ্ঞেসাও করলাম, আজকাল কিন্তু অ্যাপের যুগ টুটাই। ছবিতে তোর বউকে যতটুকু দেখেছি তাতে তো বেশ সুন্দরীই লাগলো, কিন্তু ওই যে বললাম অ্যাপ, ওতে তো হিড়িম্বাকেও শ্রীদেবী লাগে, ভালো করে দেখেছিলিস তো?

টুটাই দেখলাম লাজুক মুখে বললো, না পিসেমন, অহনাকে ছবিতে বরং একটু খারাপ লাগে, সামনে থেকে ও আরও সুন্দরী। বরং আমিই ওর পাশে অনুজ্জ্বল।

ওর বন্ধুরা টিপ্পনি কেটে বললো, বুঝলেন পিসেমন, নৈঋত আমাদের সুতো কাটা ঘুড়ির মত পুরো লাট খাচ্ছে বৌদির জন্য, এখন আপনি ওসব হিড়িম্বা, সূর্পণখা যাই বলুন না কেন, ডেস্টিনেশন রাইগঞ্জ। টুটাই একটু ধমকের সুরে বললো কি হচ্ছেটা কি! তোরা থামবি?

আমি আরও জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁরে টুটাই এই যে অহনা এমন একটা প্রফেশনে আছে যেখানে কাজটা কিন্তু বেশ চ্যালেঞ্জিং, মানে রিপোর্টারদের তো জানিস, জঙ্গলমহলেও ছুটতে হয় আবার বিস্ফোরক কোনো ভোট কেন্দ্রেও ছুটতে হয়, তো তোর এতে আপত্তি হয়নি?

টুটাই একটু হেসে বলেছিল, আসলে কি জানো পিসেমন, আমি তো কলেজে পড়াই, আমার জীবনটা বড্ড একঘেয়ে। ওই একই মুখস্ত কোর্স, একই রকম ছাত্রছাত্রী, রোজ একই লেকচার দিয়ে যাই। সত্যি বলতে কি মাঝে মাঝে মনে হয়, এর থেকে আইটি কোম্পানি জয়েন

Sahitya Chayan

করলে ভালো হতো, তাও তো একটা টার্গেট ফিল করার ব্যাপার থাকতো! সেটাও কিন্তু একরকম চ্যালেঞ্জ। আমার জীবনটা ডালের পরে পোস্ত অথবা পোস্তর পরে ডাল মাখার মতই ভীষণ রকম গোছানো, একঘেয়ে। তাই যখন দেখলাম একটা মেয়ে যার কিনা একাডেমিক কেরিয়ার সরকারি চাকরি পাওয়ার মত হওয়ার পরেও এমন একটা জব বেছে নিয়েছে স্বেচ্ছায় তখন মেয়েটা সম্পর্কে একটা অদ্ভুত রেসপেক্ট কাজ করলো জানো! মনে হলো, সবাই নৈঋত বসুর মত সাদামাটা জীবন চায় না, কেউ কেউ ফ্লাইটে ট্রাভেল না করে সাইকেলে করেও দেশ ঘোরা পছন্দ করে। আমার মত আয়েশি মানুষ তো আর ওসব পারবে না, তাই কোনো চ্যালেঞ্জিং মানসিকতার মানুষের সংস্পর্শে আসতে পারলে মন্দ হয় না ভেবেই বিয়েটাতে মত দিয়ে দিলাম। দুটো আলাদা মেরুর বাসিন্দা হয়েও কিভাবে মানিয়ে নেব একে অপরকে এটা করতে করতেই হয়তো আমার জীবনের মনোটোনাস ব্যাপারটা কেটে যাবে।

বুঝলে বৌদি, টুটাইয়ের কথা শুনে আমি চমকে গিয়েছিলাম, ভাবছিলাম আমাদের সেই টুটাই? মাধ্যমিকের রেজাল্টের পর আমার সামনে কাচুমাচু করে বলেছিল, পিসেমন, বাবা বলছে এখনই কম্পিউটার কিনে দেবে না, তুমি একটু বাবাকে বোঝাবে?

আমি পরেরদিন ওকে কম্পিউটার গিফ করাতে ও কি করবে বুঝতে না পেরে আমার জন্য এককাপ লিকার চা নিজের হাতে করে এনে বলেছিল, আমি করলাম তোমার

Sahitya Chayan

জন্য! সেই টুটাই জীবন সম্পর্কে কত ভেবেছে। বিশ্বাস করো বৌদি, টুটাই কখনো এই বিয়ে ছেড়ে পালাতে চায়নি, ওই মেয়েই হয়তো বাধ্য করেছে, বা ওখানে গিয়ে ও কিছু শুনেছে। তবে শোনা কথা বিশ্বাস করে এত বড় সিদ্ধান্ত নেবার ছেলে ও নয়। আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে, ওই মেয়েটাই টুটাইকে কিছু বলেছে। আচ্ছা বৌদি তুমি ঠিক জানো অহনার এ বিয়েতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মত ছিল?

কাবেরী মনে করার চেষ্টা করলো অহনার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দৃশ্য থেকে বিয়ের সম্বন্ধ করা পর্যন্ত পুরো ঘটনাটা।

সেদিন কাবেরীর অফিস থেকে ফিরতে একটু রাত হয়েছিল। অফিসের কিছু পেন্ডিং কাজ সারতে সারতে দেরিই হয়েছিল। অফিস থেকে বেরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বাস স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করার পর গোটা তিনেক ভিড় বাসকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল, এতটাই ভিড় ছিল যে ওঠার চেষ্টাই করেনি। ট্যাক্সি নেবে কিনা ভাবতে ভাবতেই একটা মোটামুটি ফাঁকা বাস এসে দাঁড়িয়েছিল ওর সামনে। বাসে উঠে বুঝেছিলো, বাইরে থেকে অল্প ফাঁকা লাগলেও ভিতরে বেশ ভিড় রয়েছে। নীলাদ্রি বরাবরই বললে, সাটেল কার ঠিক করে রাখো, অথবা বাড়ির গাড়িতে যাতায়াত করো, হলো তো অনেকদিন এইভাবে বাসে, ট্যাক্সিতে। নৈঋত সর্বদা প্রাইভেট কারে যাতায়াত করে, নীলাদ্রিও অফিস যায় সাটেল কারে, শুধু ব্যতিক্রমী কাবেরী। ওর যে কেন মনে হয়, বাসে, ট্রেনে ঘেমো গন্ধ

Sahitya Chayan

মেশা জনজীবনের সঙ্গে মিশে থাকলে বেঁচে থাকার স্বাদ পাওয়া যায়। রোজ কত মানুষ যুদ্ধ করছে দেখলে নিজেরও জীবনী শক্তি পাওয়া যায়। তাই খুব সমস্যায় না পড়লে কাবেরী বাসেই যাতায়াত করে। নীলাদ্রির সঙ্গে যখন প্রথম আলাপ হয়েছিল কাবেরীর তখন ও গাড়িতে যাতায়াত করার কথা ভাবতই না। বরং বাসভাড়াটাই ছিল ওর কাছে বিলাসিতা। সেই নীলাদ্রির আসমান-জমিন পার্থক্যটা যেন বড্ড চোখে লাগে। এখন তো এসি, গাড়ি, দামি মোবাইল, ফ্লাইটে ট্র্যাভেল করা এগুলো নীলাদ্রির নৈমিত্তিক প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে গেছে। কাবেরীকে প্রায়ই বলে, তুমি আর পাল্টালে না। কাবেরীর ঠোঁটের কোণে একটুকরো হাসি এসে লুকোচুরি খেলে মনে মনে বলে, কেউ তো ধরে রাখুক অতীতের দিনগুলোকে। তাই বসু বাড়ির ইদানিং কালের চাকচিক্য ভরা জীবনে সেভাবে গা ভাসিয়ে দেয়নি কাবেরী। সেদিনও অফিসফেরত বাসে উঠেই একটা জায়গা খুঁজছিল। এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল, তখনই চোখ আটকেছিলো অহনার দিকে। মেয়েটা হাত নেড়ে ডেকে বলেছিল, এদিকে আসুন। গেট থেকে ভিড় ঠেলে একটু একটু করে এগোচ্ছিল কাবেরী, মেয়েটা বোধহয় সামনের স্টপেজে নামবে, তাই সিটটা দেবে বলেই ডাকছে। মেয়েটার দিকে চোখ পড়তেই দেখলো ইশারায় কিছু বলছে। বুঝতে পারছিল না ও। বাইরে থেকে প্রায় ফাঁকা মনে হওয়া বাসটার পেটের খোলের মধ্যে এত লোক ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে। অফিস থেকে ওর বাড়ি প্রায় মিনিট চল্লিশের রাস্তা। বসে গেলে কষ্ট হয় না,

Sahitya Chayan

কিন্তু দাঁড়িয়ে গেলে বুঝতে পারে নৈঋত অনেকটাই বড় হয়ে গেছে, তাই তার মাকে লোকে আর মধ্যবয়স্কা বলবে না। সামনের মধ্য শব্দটা খুব তাড়াতাড়ি বিতাড়িত হবে কাবেরী কাছ থেকে। মেয়েটার কাছে আসতেই মেয়েটা প্রায় লাফিয়ে উঠে বললো, আপনার ব্যাগটা চেক করুন প্লিজ। একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল কাবেরী। যা বাবা, সিট দেবে না? হঠাৎ ব্যাগ নিয়ে পড়লো কেন! ব্যাগটা ডিপ ব্লু, গতবছর নীলাদ্রি কিনে এনেছিল বাইরে ট্যুরে গিয়ে। বেশ এক্সপেন্সিভ বলে এতদিন আলমারির তাকেই শোভা বাড়াচ্ছিলো। একদিন নীলাদ্রি আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, ব্যাগটা ব্যবহার করলেও কি নিজেকে উগ্র বিলাসী বলে মনে হবে তোমার? তাই রেখে দিয়েছো এটাকে?

নীলাদ্রির চোখের অভিমান দেখে সেদিন থেকে ব্যবহার করতে শুরু করেছিল ব্যাগটা। অফিসে নিয়ে যাওয়ার পরই রিতাদি জিজ্ঞেস করেছিল, অরিজিনাল ইটালিয়ান লেদার মনে হচ্ছে কাবেরী? এর দাম তো প্রায় হাজার দশেক। রিতাদির আবার মারাত্মক ব্যাগের শখ। শাড়ির সাথে ম্যাচ করে ব্যাগ ইউজ করে রিতাদি। তাই দামদর ভালো জানে। দশহাজার দিয়ে ব্যাগ কিনেছে নীলাদ্রি! বাপরে, বাবা-ছেলে দুজনেই বড্ড ধনী হয়ে গেছে যেন। নৈঋতও সেদিন ওর নিজের ঘরে একটা টিভি থাকা সত্ত্বেও আরেকখানা প্রায় সত্তর হাজার টাকা দিয়ে টিভি কিনলো। কাবেরী কিছু বলতে গেলেই বাবা-ছেলে একটাই

Sahitya Chayan

কথা বলে দাগিয়ে দেয় ওকে, মিডিল ক্লাস মেন্টালিটি থেকে বেরোও প্লিজ।

এই মেয়েটা বোধহয় ওর এই এক্সপেন্সিভ ব্যাগের দাম জিজ্ঞেস করবে বলেই ডাকছিল। বাপরে কিছু মেয়ের দৃষ্টিও বলিহারি। কে কি শাড়ি পরেছে, কে কি জুয়েলারি পরেছে সব নজরে আসে। অপরিচিত হলেও এরা দিব্যি জিজ্ঞেস করে বসে, কোথা থেকে কিনেছেন? কাবেরী বলতেই যাচ্ছিল, গিফট পেয়েছি, কত দাম, কোন দোকান থেকে কেনা কিছু জানি না। তার আগেই মেয়েটি প্রায় ধমকের সুরে বললো, আন্টি আপনার ব্যাগ চেক করুন কুইক। মনে হচ্ছে পিক পকেট হয়েছে। কথাটা শুনেই কাবেরী ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে হাতে নিয়েছিল, পিছনের চেনের নীচে কেউ ব্লেড চালিয়েছে। ওয়ালেট মিসিং, কারণ কাবেরী জানে এই থার্ড খাপে রাখে ও ওর ওয়ালেট। মেয়েটা স্থির গলায় বলল, বসুন এখানে। তারপর বাসের কন্ডাক্টরকে কিছু একটা বললো ফিসফিস করে। গেটম্যান বাসটা থামাতেই একটা রোগা মত ছেলে প্রায় লাফিয়ে নামলো, মেয়েটা ছেলেটার সঙ্গে লাফ দিলো বাস থেকে। কাবেরী অবাক হয়ে দেখলো, কি অদ্ভুত কায়দায় পালিয়ে যেতে চাওয়া ছেলেটাকে মেয়েটা ধরলো। ছেলেটা কঁকিয়ে উঠলো, সম্ভবত মেয়েটা মেরেছে ঘাড়ে, ছেলেটার একটা হাত মচকে ধরে টেনে তুললো বাসে। গেটম্যান ছেলেটার প্যান্টের ঝোলা পকেট থেকে আবিষ্কার করলো কাবেরী পিঙ্ক কালারের ওয়ালেটটা। যেটার মধ্যে ওর টাকা ছাড়াও তিনটে কার্ড রয়েছে, এছাড়াও বাড়ির

Sahitya Chayan

একসেট চাবি। পার্সটা হাতে পেয়েও কেমন অদ্ভুত একটা ঘোরের মধ্যে ছিল কাবেরী। তখনও অপলক তাকিয়েছিল মেয়েটির দিকে। বিক্ষুব্ধ পাবলিক এতক্ষণে উঠে পড়েছে, ছেলেটিকে মেরে হাতের সুখ নেবে বলে। মেয়েটি খুব সাবধানী অথচ ফিসফিসিয়ে গলায় বলল, এনে আমার কার্ড, কাল কল করিস, এখন পালা। ছেলেটা কার্ডটা হাতে নিয়েই লাফ দিলো চলন্ত বাস থেকে। কাবেরী তখনও তাকিয়েছিল মেয়েটির দিকে। ধন্যবাদ জানাতে ভুলে গিয়েছিল, মেয়েটিও যেন ওর ধন্যবাদ প্রত্যাশী নয়, এমন ভাবেই কাউকে একটা ফোন করে বললো, তোমার কার্ড বিতরণ করলাম একজনকে, নতুন নেমেছে এ লাইনে, এখনো পোক্ত হয়নি হাত। পারলে একটা ব্যবস্থা করো। না না, বিজুকাকার মত কেসটা নয়, ব্যাগ সত্যিই কেটেছিল, কিন্তু অভ্যস্ত নয় বুঝলে? এখনই যদি ব্যবস্থা করা যায় তাহলে এ লাইনে একজন কমানো যাবে, এই আরকি। আমি ফিরবো, কিন্তু আরেকটা কাজ আছে, বাবা, তুমি কাল ফিরবে ফ্ল্যাটে, নাকি দেরি আছে?

কাবেরী বুঝেছিলো মেয়েটি তার বাবার সঙ্গে কথা বলে পকেটমার ছেলেটির একটি কাজের ব্যবস্থা করতে চাইছে। অদ্ভুত লেগেছিল কাবেরীর। মেয়েটার বয়েস কম, তবুও কত ম্যাচিওরিটি! তাছাড়া কি দুর্দান্ত শার্প ব্রেন, প্রথম দেখাতেই মেয়েটাকে খুব ভাল লেগে গিয়েছিলো কাবেরী। হালকা গলায় বলেছিল, বাবার নয়, তোমার একটা কার্ড পাওয়া যাবে?

Sahitya Chayan

মেয়েটি ফিক করে হেসে বলেছিল, আমি আমার ফোন নম্বর দিতে পারি, কার্ড তো এখনো নেই।

ফোননম্বরটা লোড করে নিয়ে কাবেরী বলেছিল, ফোন করলে বিরক্ত হবে না তো?

মেয়েটা হেসে বলেছিল, আপনি অহনা নামে সেভ করুন। আমার মা দিনে বার কুড়ি কল করে, তাতেও বেঁচে আছি যখন তখন আপনার একটা কলে আর কিভাবে বিরক্ত হবো! কাবেরীর বেশ মজা লেগেছিল নৈঋতের বয়সি একটা মেয়ের মুখে এমন কথা শুনে। টুটাইও ঠিক একই কথা বলে কাবেরীকে। মা এই কলকাতা শহরে কয়েক হাজার গাড়ি চলছে, তোমার ছেলে একাই ড্রাইভ করে ফিরছে না বুঝলে, তাই এই হাইপারটেনশনটা একটু কম করলে আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে ড্রাইভ করতে পারি! কাবেরী শুধু একটা কথাই বলে, আগে ছেলে-মেয়ের বাবা হও তখন বুঝবে টেনশন না হাইপারটেনশন! টুটাই মুখে বিরক্তির আওয়াজ করে বলে, মায়েরা এত ছেলেমানুষি করে কেন সেটা তো আগে জানবো তখন!

অহনার বোধহয় নামার সময় হয়েছে, পিঠের ব্যাগটা সামলে নিয়ে নিজের টিশার্টটা একটু ঠিক করে নিয়ে বললো, আসছি আন্টি, বি কেয়ারফুল। এই লাইনে কিন্তু এমন প্রায় হচ্ছে এখন।

অহনা নেমে গিয়েছিল, কাবেরীর মনে চিরস্থায়ী দাগ কেটে দিয়ে। ও তখন নিজের মেয়েবেলাটার কথা ভাবতে শুরু করেছিল। প্রচণ্ড স্টুডিয়াস, গুড গার্ল লুক থেকে যেন

Sahitya Chayan

বেরোতে পারেনি কোনোদিনই ও। এমন মারপিট করার কথা তো স্বপ্নের বাইরে ছিল। মনে পড়ে গেল কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে একটা দিনের কথা। কলেজে সোশ্যাল ছিল, বেশ সেজেগুজে বান্ধবীরা মিলে কলেজে এসেছিল। কাবেরীর শাড়ির কুঁচিটা খুলে যাচ্ছিল বলে ও বন্ধুদের বলেছিল, তোরা এগিয়ে যা, আমি আসছি। ওয়াশরুমের দিকে হাঁটছিল কুঁচি সামলে, একটা ছেলে এসে ওর পথ আগলে বলেছিল, শাড়িটা পরিয়ে দেব ঠিক করে? কাবেরীর শাড়ির আঁচলটা প্রায় ধরে বলেছিল, এস ঠিক করে পরিয়ে দিই। ভয়ে কুঁকড়ে উঠেছিলো ও। কোনোমতে ওয়াশরুম ঢুকে গিয়েছিল। বেশ কয়েকবার উকি মেরে দেখেছিলো ছেলেটা তখনও ওখানে আছে কিনা! প্রায় আধঘণ্টা পরে ভয়ে ভয়ে ও বেরিয়েছিল ওখান থেকে। নিজের ওপরেই রাগ হয়েছিল কাবেরীর, এমন অপমানের উত্তরে ও যোগ্য জবাব দিতে পারলো না বলে। ওয়াশরুমে দাঁড়িয়ে টপটপ করে পড়েছিলো নিরীহ চোখের জল। সেদিনের কাবেরী আর আজকের অহনার মধ্যে কত অমিল, অহনারা কত সাহসী, সাবলীল, এমন মেয়েই তো চাই আজকের সমাজের জন্য।

কাবেরী যখন প্রেগনেন্ট তখন একদিন নীলাদ্রিকে বলেছিল, যদি আমার মেয়ে হয় তাকে আমি তৈরি করব আমার দেখা স্বপ্নের মত। যে মেয়ে তলোয়ারের মত ঝকঝক করবে, মরচে ধরবে না যার বুদ্ধিতে। নীলাদ্রি হেসে বলেছিল, মানে একটু গম্ভীর, লাজুক, অত্যন্ত ভদ্র কাবেরী টাইপ নয় তাইতো?

Sahitya Chayan

কাবেরী নিজের পেটের ওপরে হাত বুলিয়ে বলেছিল, একেবারেই নয়। সে আমার কল্পনায় আছে, যাকে আমি মেয়েবেলা থেকে লালন করে এসেছি, নিজেকে কোনোদিন সেই রূপে দেখতে গিয়ে দেখেছি মুখটা কেমন ধূসর হয়ে যায়। তখনই বুঝেছি, সে আমার সুচিন্তিত কল্পনা, আমায় স্বপ্ন, আমার ভাবনা, আমি নই। কাবেরীর মেয়ে হয়নি, হয়েছিল ছেলে। আর সেই ছেলেও অত্যন্ত শান্ত ভদ্র, নৈঋত নামটাও কাবেরীরই রাখা। নীলাদ্রির সঙ্গে মিল করেই বোধহয় নামটা রেখেছিলো তখন। কিন্তু কাবেরী একেবারেই চায়নি নৈঋত নীলাদ্রির মত ঝুট ঝামেলা এড়িয়ে যাওয়া, অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা মানুষ হোক। কাবেরীর চাওয়াতেই তো আর সবকিছু হবে না। তাই নৈঋতকে যেমন নীলাদ্রির মত দেখতে সুপুরুষ হয়েছে তেমনিই বাবার মতই স্বভাবখানাও পেয়েছে, ঝুট-ঝামেলায় নিজেকে জড়াতে পছন্দ করে না নৈঋত। খুব ছোট থেকেই টুটাই একটু নির্বিবাদী স্বভাবের, এই জন্যই ওকে স্কুলে পাঠিয়ে কখনো ভয় করতো না কাবেরীর। তবে ওই যে প্রতিবাদী, অকাট্য যুক্তিবাদী মেয়ের স্বপ্নটা দেখেছিলো ওটা অধরাই রয়ে গিয়েছিল। অধরা স্বপ্ন চিরকালই ভীষণ রকমের দামি হয়। হয়তো মানুষ এর নাগাল পায় না বলেই মহামূল্যবান হয়ে ওঠে প্রত্যেকের কাছে। অহনাকে সেদিন বাসে দেখার পর থেকেই কাবেরী দেখা সেই সুপ্ত স্বপ্নটা জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। মনে মনে ভেবেছিল, যদি অহনা নৈঋতের বউ হয় তাহলে মন্দ হবে

Sahitya Chayan

না। এমন একটা ডাকাত ডাকাত মেয়ের স্বপ্নই তো লালন করছিল কাবেরী মনের মধ্যে।

অহনাকে দ্বিতীয়দিন দেখার পরে এ বাড়িতে ওকে নিয়ে আসার কাবেরীর ইচ্ছাটা আরও বেড়ে গিয়েছিল।

সেদিনও অফিস যাওয়ার পথেই সুছন্দাদের বাড়িতে একবার ঢুঁ দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। সুছন্দা কাবেরীর ইউনিভার্সিটির বন্ধু। মাঝখানে বেশ কিছু বছরের অদর্শনে যখন ওকে প্রায় ভুলতে বসেছিলো তখনই একটা নামি শাড়ির দোকানে এক মহিলাকে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে দেখেছিলো। কেন দামি শাড়ি একবার পরার পরেই আঁচলে ছেঁড়া বেরোয়। দোকানদার যত বলছে, এটা কোনো খোঁচায় ছিঁড়েছে মহিলা তত জোরে বলছে, পুরোনো স্টকের শাড়ি, কাস্টমারকে গছিয়ে দিয়েছেন, লজ্জা করে না। পুরোনো, পচা সিল্ক, তাই নরম্যালি ফেঁসে গেছে।

মহিলার একরোখা কথা বলার টেকনিকটা খুব চেনা লাগছিলো কাবেরীর। একটু মোটা হলেও মুখের গঠন দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ডেকে উঠেছিলো, সুছন্দা...

সুছন্দা কাবেরীকে বহুদিন পরে প্রথম দর্শনের চমক কাটিয়েই বলেছিল, এই চোরের দোকানে শাড়ি কিনতে এসেছিস? কিছুতেই কিনবি না। চল সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা পোস্ট দেব, দেখি এদের জোচ্চুরি কমাতে পারি কিনা। কাবেরীর হাত ধরে টান দিতেই দোকানের রিসেপশনে বসা ভদ্রলোক হে হে করে বলেছিল, আরে

Sahitya Chayan

ম্যাডাম রাগছেন কেন? মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং তো হতেই পারে। আপনি তো এর আগেও বহু শাড়ি নিয়ে গেছেন আমার প্রতিষ্ঠান থেকে! কোনোবার কি এমনটা হয়েছে? যাকগে ভুল যারই হোক, আমি মনে করি কাস্টমার লক্ষ্মী। তাই ওটা বদলে আপনার পছন্দ মত ওই রেঞ্জের নতুন শাড়ি নিন আপনি। সুছন্দা কাবেরীকে সেই ইউনিভার্সিটির মতই পট করে একটা চোখ মেরে বলেছিল, দেখলি, সব শক্তের ভক্ত। কাবেরীর রুটিনমাফিক জীবনে সুছন্দা এনেছিল একঝলক পুরোনো ঠান্ডা হাওয়া। সেই থেকেই কাবেরীর কাছে নিজেকে ভুলতে দেয়নি সুছন্দা। সপ্তাহে ফোন করে বকবক, মাঝে মাঝেই ওর বাড়িতে কিটি পার্টির আয়োজন করে বন্ধুত্বটাকে আরও গাঢ় করে তুলেছিল। উত্তর কলকাতার সাবেকি পাড়ার বাড়ি ছেড়ে সদ্য উঠে এসেছে সাউথের ফ্ল্যাটে। আজ সেই ফ্ল্যাটেরই গৃহপ্রবেশ, তাই কাবেরীর উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য। অফিসের দোহাই দিলে ও বলেছিল, সেকেন্ড হাফে যাবি, পুজোর সময়টুকু থাকিস প্লিজ। সেই উদ্দেশ্যেই কাবেরী ওর যাদবপুরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঢাকুরিয়া যাবার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে। তখনই দেখেছিলো, ওর চোখের সামনে একটা দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন ধরিয়ে দিল কতগুলো উদ্ভ্রান্ত ছেলে। হকচকিয়ে গিয়েছিল কাবেরী। মুহূর্তের মধ্যে দোকানপাট বন্ধ হতে শুরু করেছিল। বেশ কিছু ছেলের একটা দল সরকারি প্রপার্টি নষ্ট করার উদ্দেশ্যেই হসপিটালের দিকে ছুটছিলো লাঠি নিয়ে। বাসের কাঁচ ভাঙছিলো অবলীলায়। ভয়ে হাত-পা

Sahitya Chayan

কাঁপছিল কাবেরীর। কোনদিকে যাবে বুঝতে পারছিল না। ঠিক সেই সময় একটা ছেলে ক্যামেরা গলায় ঝুলিয়ে পটাপট ছবি তুলেছিল, আর অহনা ক্রুদ্ধ ছেলেগুলোর মুখের সামনে মাইক ধরে জিজ্ঞেস করছিল, আচ্ছা ছেলেটার তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রাস্তায় একটা অন্য বাসের সঙ্গে, তাহলে আপনারা কেন বাকি সব বাস জ্বালাতে চলেছেন?

ছেলেটি দুটো অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দিয়ে বললো, বাসটা স্টেট বাস ছিল। ছেলেটির বাইককে পিছন থেকে এসে মেরেছিলো, তারপরে ওই বাসটা স্পিডে বেরিয়ে যায়। সরকারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, নাহলে এভাবেই জ্বলবে সব। কাবেরী অবাক হয়ে দেখছিল অহনাকে। কি অদ্ভুত সাহস মেয়েটার। রিপোর্টার বলেই কি এতটা সাহসী হতে হবে? নিজের প্রাণের মায়া নেই?

ছেলে দুটোর বাইট নিয়েই ও ছুটছিলো একটা দোকানদারের কাছে, প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তার কথা জানতে চেয়েছিল। ক্যামেরাম্যান সঙ্গে থাকলেও অহনাও মোবাইলে কিছু জিনিস রেকর্ডিং করছিল মনে হলো। তখনই উদ্ভ্রান্তের মত এদিক ওদিক করা কাবেরীকে চোখে পড়েছিলো অহনার। এগিয়ে এসে বলেছিল, এখুনি এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে আন্টি। রাস্তা অবরোধ আছে। সরকারি বাসের সঙ্গে একটা বাইকের। বাইক আরোহী বোধহয় কোনো কলেজের ইউনিয়নের নেতা। তাই বিষয়টা বেশ ঘোরালো আকার নিচ্ছে। আপনি এখানে ট্যাক্সি, উবের কিছুই পাবেন না। আপনার বাড়ি কতদূর?

Sahitya Chayan

কাবেরী থমথমে গলায় বলেছিল, রিকশায় মিনিট দশেক হবে। অহনা ক্যামেরা সামলে ছুটে গিয়ে একটা গ্রে কালারের স্কুটি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল ওর সামনে। বলেছিল, তাড়াতাড়ি উঠুন। আপনাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়েই আমায় অফিস ছুটতে হবে। আজকের ঘটনার রিপোর্ট দিতে হবে অফিসে। নেটওয়ার্ক প্রবলেম, মেল সেন্ড হচ্ছে না।

কাবেরী স্কুটিতে উঠেই বলেছিল, তুমি রিপোর্টার?

অহনা ঘাড় নেড়ে বলেছিল, হ্যাঁ, আমার বাবাও নামকরা সাংবাদিক, তবে নিউজ পেপারের। আমি আপাতত অত বড় জায়গায় যাইনি তবে একদিন নিশ্চয়ই যাবো। চ্যালেঞ্জ নিতে আমি ভয় পাইনা, আমার চ্যানেল আমার ওপরে ভরসা করে।

কাবেরীকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিতেই ও বলেছিল, অহনা, বাড়িতে আসবে না একবার?

অহনা মিষ্টি করে হেসে বলেছিল, চিনে গেলাম তো আন্টি, যেকোনো সময় চলে আসব আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

দাঁড়ায়নি অহনা, বেশ স্পিডেই স্কুটি চালিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। সেদিন থেকেই কাবেরীর মনে একটা চিরস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছিল স্বল্পপরিচিতা অহনা। সাজগোজের পরিপাটি নেই, প্রচণ্ড সাহসী অথচ কর্তব্যপরায়ণ এমন মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না কাবেরীর। তাই অহনার বাড়ির অ্যাড্রেস খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল ও। যদি এনগেজড না হয় তাহলে সম্বন্ধ করতে দোষ কোথায়?

Sahitya Chayan

এমন কাকতলীয়ভাবে যোগাযোগের পিছনে নিশ্চয়ই কিছু ইঙ্গিত আছে ভগবানের। অহনাই কাবেরীর সেই কল্পিত মেয়ে যার মুখটা আঁকা ছিল ওর অন্তরের অন্তঃস্থলে। সেদিন রাতেই নিলাদ্রীকে বলেছিল অহনার কথা। নীলাদ্রি শুনে বলেছিল, বেশ তো, উপকার করেছে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে একদিন খাইয়ে দাও, সঙ্গে কিছু গিফ দিয়ে দাও মিটে গেল। এর মধ্যে টুটাইকে ঢোকাচ্ছ কেন! টুটাই কেন এমন দামাল টাইপের মেয়ের সঙ্গে আজীবন কাটাবে বলতো? শুধু তোমার পছন্দ বলে? টুটাই কিন্তু বরাবরই একটু শান্তশিষ্ট, ওর জীবনসঙ্গী এমন মারদাঙ্গা করবে এটা ও মেনে নেবে কাবেরী? তুমি নিজেও তো ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে যেতে পছন্দ করো, তেমন অকোয়ার্ড সিচুয়েশনে পড়লে তুমি নিজেই তো ঘাবড়ে যাও, একটু ভেবে দেখো প্লিজ। তোমার ওপরে আমার ভরসা আছে, কিন্তু টুটাইয়ের সারাজীবনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কিন্তু আমাদের নেই। বাবা-মা বলেই ওর ওপরে কিছু জোর করে চাপিয়ে দেওয়া কি ঠিক হবে? টুটাই তোমায় একটু বেশিই বিশ্বাস করে, তাই কাবেরী যা করবে বিচক্ষণতার সঙ্গে করো। ওসব মেয়েকে সিনেমার পর্দায় মানায়, বাড়ির বউ হিসেবে নয়।

অনু এটুকু শুনেই বললো, বৌদি যাই বলো দাদা একদম ঠিক বলেছিল। না, না, আমি একেবারে ঘরোয়া, গৃহকর্মে নিপুণা এমন মেয়ের কথা বলছি না গো। জব করুক, যে কোনো অফিসিয়াল জব করুক, গান, নাচ

Sahitya Chayan

করুক কিন্তু তাই বলে রিপোর্টার? তাও আবার টিভি চ্যানেলের। এদের তো শুনেছি জঙ্গলমহলে অবধি যেতে হয় খবর সংগ্রহের জন্য। ভাবতে পারছো, রিপোর্টারদের লাইফ কতটা রিস্কি? এসব জেনেও তুমি টুটাইয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করলে কি করে বৌদি? টুটাই, দাদাভাই এরা মেনে নিল?

কাবেরী কোনো উত্তর দেবার আগেই শুভময় বললো, অহনার প্রফেশন নিয়ে আমার তো মনে হয় টুটাইয়ের কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা নয়, টুটাই এখনকার ছেলে, ওদের ভাবনা আমাদের মত সেকেলে নিশ্চয়ই নয়। অনু বললো, টুটাইয়ের যদি এতই পছন্দ হতো, তাহলে ও বিবাহবাসর ছেড়ে পালালো কেন বলবে?

শুভময় নরম স্বরে বললো, আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে, মেয়েটার কোনো অ্যাফেয়ার ছিল। আর সেটা জানার পরেই টুটাই এমন চটজলদি সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কাবেরী বললো, শুধু লোকের কথাতে এত বড় সিদ্ধান্ত নিলো টুটাই? এমনও তো হতে পারে অহনাই কিছু বলেছিল টুটাইকে, তাই ও বাধ্য হয়েছিল ওখান থেকে পালাতে। কাবেরীর মনে পড়ে গেলো অহনার শেষ কথাটা।

অহনাকে যখন কাবেরী জিজ্ঞেস করেছিল, সত্যি করে বলতো, নৈঋতকে তোমার পছন্দ হয়েছে?

অহনা একটু থেমে বলেছিল, এখুনি বিয়ে করতে ইচ্ছে ছিলো না। আর আন্টি এইটুকু সময়ে একজনের বাইরেটুকুই দেখা যায়। মানে, হাইট, ওয়েট, চেহারার

Sahitya Chayan

কথা বলছি আরকি। ভিতরটা বোঝা সম্ভব নয়। আমার পক্ষেও নয়, নৈঋতের পক্ষেও নয়। পরবর্তীকালে সংসার করতে গিয়ে দেখলাম আমরা হয়তো ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা। তাতে হয় আমরা অ্যাডজাস্ট করে নেব নয়তো সেপারেশন, তাই এখন এইটুকু দেখেই পছন্দ বলায় আমি বিশ্বাসী নই। তবে আপনাকে আমার সত্যিই বড্ড পছন্দ। আপনি আমার মায়ের মত টিপিক্যাল মেন্টালিটির নন। যদি হতেন তাহলে আমাকে ঘরের বউ করে নিয়ে যেতেই চাইতেন না। নৈঋতের প্রফেশন নিয়ে আমার কোনো প্রবলেম নেই, আশা করবো বিয়ের পর আমিও আপনাদের কাছে থেকে সব রকম হেল্প পাবো আমার কেরিয়ারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমার এখুনি বিয়ে করার সত্যিই ইচ্ছে ছিলো না। তবে আমার মায়ের আবার নৈঋতকে ভীষণ পছন্দ, এমন শান্তশিষ্ট ছেলেই মা বেশি পছন্দ করে। আসলে চব্বিশঘণ্টা নিজের মেয়ের বেচাল দেখতে দেখতে হয়তো ক্লান্ত হয়ে গেছে। মাকে আমি কোনো কারণ ছাড়াই ভীষণ ভালোবাসি, তাই মায়ের পছন্দকে এক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে চাই। কাবেরী অবাক হয়ে তাকিয়েছিল অহনার দিকে। এতটা স্পষ্ট কথা যে কেউ পাত্রপক্ষকে বলতে পারে, এমন ধারণাই ছিল না ওর। মনে মনে বাহবা দিয়ে বলেছিল, সাবাস অহনা, তোমরাই এগিয়ে নিয়ে যাবে এ যুগের নারীদের। অহনার মাথায় হাত বুলিয়ে কাবেরী বলেছিল, এমনই থেকো আজীবন। নৈঋত কখনো কারোর ব্যক্তিস্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করে না।

Sahitya Chayan

তাই আশা করি তোমাকেও ও সবটুকু স্বাধীনতা দেবে যেমন তুমি এ বাড়িতে পেয়ে এসেছো।

অহনা মুচকি হেসে বলেছিল, এবাড়িতে বাবা আমায় সাপোর্ট করে শুধু, মা তো দিনরাত বলেই যায়, এসব চাকরি ছেড়ে দিয়ে কোনো স্কুলের জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে। এটা আমাদের বাড়ির রোজকার সমস্যা। তাই আপনি যেটাকে মেয়েবেলার স্বাধীনতা পাওয়া বলছেন, সেটা আমাকে রীতিমত লড়াই করে আদায় করতে হয়েছে। তবে আমি নিশ্চিত যে আপনি আমার এই চ্যালেঞ্জিং প্রফেশনটাকে বেশ রেসপেক্ট করছেন, অন্তত আপনার কথা শুনে সেটাই ধারণা হয়েছে। ওই টিপিক্যাল শাশুড়ি টাইপ নন বলেই আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি হলাম। কাবেরী তখন গুছিয়ে নৈঋতের গুনগান করতে শুরু করেছিল অহনার কাছে। অহনা হেসে বলেছিল, মায়ের কাছে সব ছেলেই সুবোধ বালক হয় আন্টি, এটা তো মানবেন?

কাবেরীর বেশ ভাল লেগেছিলো এই অসম বয়সি বন্ধুত্বটা। কই অহনার সঙ্গে কথা বলার সময় একবারের জন্যও তো মনে হয়নি যে ওর বসুবাড়িতে আসতে কোনোরকম আপত্তি আছে! অথবা অন্য কোথাও অ্যাফেয়ার আছে!

তাহলে এই মুহূর্তে কাবেরীদের বাড়ির নহবতখানা থেকে কেন ভেসে আসছে না বিসমিল্লাহ শাহের সুর?

কেন সবাই কাবেরীর পছন্দের দিকে আঙুল তুলে বলছে, নৈঋত আর অহনা মিসম্যাচ ছিল বলেই ভেঙে

Sahitya Chayan
গেল বিয়েটা। ওয়াড্রবের সামনেই রেখেছিলো লালচে কোরিয়াল বেনারসিটা, ওটা পরে বধূ বরণ করবে খুব আশা ছিল কাবেরীর। শাড়িটা যেন বিদ্রুপ করে বলছে, তুমি আজ ভুল প্রতিপন্ন হলে, তুমি সুসন্তান মানুষ করায় ব্যর্থ হয়েছ কাবেরী বসু, অহনার গোপন অ্যাফেয়ারের কথাও তুমি বুঝতে পারনি ওর নিষ্পাপ চোখদুটো দেখে!

।।১০।।

অ্যাফেয়ার বা প্রেম যাকে বলে সেটা বোধহয় নীলাদ্রির সাথে কাবেরীর কোনোদিনই হত না, যদি না মাঝে নীলাদ্রির বন্ধু সুজন মিডিলম্যান হিসাবে না থাকতো। যদিও ওদের বিয়েটাকে বসুবাড়িতে সবাই প্রেমের বিয়েই বলেই জানে। কিন্তু নীলাদ্রি জানে কাবেরীর সঙ্গে ওর যেটা ছিল সেটাকে নির্ভেজাল বন্ধুত্ব বললেই ঠিক বলা হবে। কেউই বোধহয় কাউকে কোনোদিন প্রোপোজ করতো না। নীলাদ্রি এমনিতেই এসব বিষয়ে স্বচ্ছন্দ নয় একেবারেই, কাবেরীও ততটা ডেসপারেট ছিল না কোনোদিনই। ও হয়তো নীলাদ্রির থেকে মিশুকে ছিল বেশি, গল্প করতে ভালোবাসতো সবার সঙ্গে। কিন্তু প্রেম নিবেদন করবে এমন সাহস ওরও ছিল না। আর এখনকার ছেলেমেয়েরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কাকে বিয়ে করবে! তারপর শেষ মুহূর্তে পছন্দ না হলে বিয়ের আসর থেকেও পালিয়ে যাচ্ছে! অদ্ভুত এদের সাহস, ঈর্ষণীয় স্পর্ধা এদের। নীলাদ্রি তো জীবনে কোনোদিন কাবেরীর বাইরে কিছু ভাবতেই পারলো না। ও জানে বসুবাড়িতে আড়ালে ওকে স্ত্রৈণ্য বলে ব্যঙ্গও করা হয়। যদিও বাংলা অভিধানের ওই শব্দটা

Sahitya Chayan

ঠিক কেন তৈরি হয়েছিল ও জানে না। হয়তো পুরুষতন্ত্রকে আরও জোরদার করার জন্যই। স্ত্রৈণ্য শব্দের উচ্চারণে বোধহয় মেল ইগো আচমকা জেগে উঠতো, আর তারা নখ, দাঁত বের করে নিজের স্ত্রীর ওপরে হম্বিতম্বি করে নিজেদেরকে পুরুষসিংহ প্রমাণ করতে সফল হতো। নীলাদ্রির আবার ওই বিশেষ উত্তেজক শব্দটি শুনলে মনে মনে হাসিই পায়। মনে হয় কাবেরী ওর থেকে অনেক বেশি যোগ্য সাংসারিক দিক দিয়ে। তাই তার হাতে সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে ও কোনো ভুল করেনি। বরং প্রতি পদক্ষেপে নিজেকে অপদার্থ প্রমাণের থেকে এই ভালো। সে বাজারে যাওয়ার সময় লিস্ট নিয়ে বেরোনো থেকে শুরু করে টুটাইয়ের এক্সামের প্রিপারেশন, সবেতেই কাবেরী অনেক বেশি পারদর্শী ওর থেকে। এটা মেনে নিতে কখনো মেল ইগো হার্ট হয়নি ওর। বাজারে লিস্ট না গিয়ে প্রমাণ করেছে ওর স্মৃতিশক্তি প্রবল দুর্বল, এক্সামের আগের দিন টুটাইকে পড়তে বসিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে, টুটাইয়ের কোর্সটাই ও ভালো করে জানে না। আউট অফ সিলেবাস পড়াতে গিয়ে কাবেরীর বকুনিও জুটেছে বার দুয়েক। টুটাই হেসে বলেছে, বাবা ওগুলো তো এই টার্মেই নেই। এরকম বহু ব্যাপারে নিজের অক্ষমতা প্রমাণ করার থেকে বুদ্ধিমানের কাজ হলো, দায়িত্ববান স্ত্রীর কাঁধে দায়িত্বটুকু তুলে দিয়ে তার নির্দেশমত চালিত করা নিজেকে। নীলাদ্রিও তাই করে এসেছে এতকাল। কোনোদিন মনে হয়নি কাবেরী এটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই প্রথম টুটাইয়ের বিয়ের ব্যাপারেই কাবেরীর সঙ্গে মতপার্থক্য

Sahitya Chayan
হয়েছিল নীলাদ্রির, যদিও সেভাবে প্রতিবাদ করেনি ও। এখন বারবার মনে হচ্ছে কাবেরীকে আটকানো উচিত ছিল! শুনত কি কাবেরী? ওর তো অহনাকে বড্ড পছন্দ ছিল।

নীলাদ্রিরও যে পছন্দ ছিল না এমন নয়, কিন্তু মেয়েটাকে দেখেই একটু খামখেয়ালি, মুডি মনে হয়েছিল ওর। তাই জানিয়েছিল কাবেরীকে, কিন্তু কাবেরী ওর স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতায় বুঝিয়ে দিয়েছিল, এই মেয়েই বেস্ট টুটাইয়ের জন্য। আজ যখন অনু বললো, দাদাভাই, সব ব্যাপারে চুপচাপ থাকাটাও কিন্তু ক্রাইম জানিস তো? টুটাই তোরও ছেলে, তাই তোর অপছন্দের কথাটা একটু জোরেই বলতে পারতিস। মানলাম বৌদিভাই সবদিক সুন্দরভাবে সামলায়, তুই হয়তো পারতিস না, আমি রেসপেক্ট করি বৌদিভাইকে, তবে তোর অপছন্দে বিয়েটা হচ্ছিল শুনে বিরক্তি আসছে।

অনুর কথা শুনে এই প্রথমবার নীলাদ্রির মনে হলো, কাবেরীকে বোধহয় এতটা অন্ধভাবে বিশ্বাস করাটা ঠিক হয়নি ওর। এই কথাটা মনে হওয়ার পর থেকেই বুকের বাম দিকে একটা নিস্তব্ধ কষ্ট অহেতুক পীড়া দিচ্ছিল ওকে। স্মৃতির পাতা উল্টে চলে গিয়েছিল কাবেরী সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার মুহূর্তটাতে।

নীলাদ্রি তখন বছর তিনেক জয়েন করেছে রেলে। প্রমোশন হয়ে হয়ে আজ যে পজিশনে আছে তখন এই চেয়ারটা ছিল ধরা ছোঁয়ার বাইরে। বাড়ির অবস্থা স্বচ্ছল থাকলেও কোনোদিনই খুব বিলাসিতায় মানুষ হয়নি

Sahitya Chayan

নীলাদ্রি বা অনু কেউই। তাই নীলাদ্রি জানতো স্যালারি হাতে পেয়েই বিলাসিতায় গা ভাসানো সম্ভব নয়। অনুর বিয়ের দায়িত্ব কিছুটা হলেও ওকে নিতেই হবে। বাবার রিটায়ারমেন্টের পর পেনশনের টাকায় আর যাইহোক বিলাসিতা করা সম্ভব হয় না। তাই নীলাদ্রি বেশ গুছিয়ে চলছিল ওর স্বল্প স্যালারি থেকেই। তখনও এত পে কমিশনের রমরমা হয়নি, তাই কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি হলেও মাইনে কিন্তু সেই হাতে গোনা। এমন অবস্থায় দোতলা করা আর অনুর বিয়ে দেওয়াটা ছিল ফার্স্ট প্রায়োরিটি, নিজের বিয়ে বা প্রেম নিয়ে মোটেই কল্পনা করেনি নীলাদ্রি। ওর অমন আনরোম্যান্টিক জীবনে তখন কাবেরীর প্রবেশের কোনো সুযোগই ছিল না। তবুও কি করে যেন বরুণদেবের গোপন চোখ রাঙানিতে অবাধ্য বসন্ত বাতাস এসে রাঙিয়ে দিয়েছিল নীলাদ্রির আপাত গম্ভীর, রুটিন মাফিক, কেজো জীবনের দিনগুলোকে।

লাঞ্চ ব্রেকে সুজন এসে নিলাদ্রীকে বলেছিল, জানিস একটা মেয়েকে সাহেবের চেম্বারটা দেখিয়ে দিলাম, বোধহয় ক্ল্যারিক্যাল পোস্টে জয়েন করেছে গুডস ডিপার্টমেন্টে। নীলাদ্রি অবাক হয়ে বলেছিল, রেলটা যেহেতু তোর শ্বশুরের নয় তাই এখানে কয়েকশো এমপ্লয়ি রেগুলার জয়েন করবে সেটাই তো স্বাভাবিক।

সুজন বলেছিল, সেটা নয়, আসলে মেয়েদের মধ্যে অফিসিয়াল জব করার প্রবণতা বাড়ছে বুঝলি। শুধু টিচিং নয় এরা সব প্রফেশনেই আসছে। নীলাদ্রি হেসে বলেছিল, আমাদের ডিপার্টমেন্টেও তো তিনজন মহিলা আছেন রে।

Sahitya Chayan

ওরা তো আমার সিনিয়র। আসলে কি বলতো, ছেলে-মেয়ে বলে নয় সবটাই মানসিকতার ব্যাপার। নীলাদ্রির কথাটা শেষ হবার আগেই বেশ সুন্দরী এক মহিলা পাশ থেকে বললো, একদম পারফেক্ট বললেন। সবটাই মানসিকতার ব্যাপার। জবের জন্য সব জায়গায় ট্রাই করছিলাম। স্টেট বা সেন্ট্রাল এমন বাছবিচার ছিল না। এটা হয়ে গেল জয়েন করে ফেললাম। নীলাদ্রি একটু চমকে তাকাতেই, সুজন বললো, সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো? কাজ মিটলো আপনার? এনিওয়ে এটাই হলো সেই বিখ্যাত রেল ক্যান্টিন। এখানে বাঁধাকপির তরকারি আর মাংসের ঘুগনির দায়িত্ব নিয়ে একই টেস্ট করে আমাদের সর্বজনবিদিত উদয়দা। আপত্তি না থাকলে বসতে পারেন, টেস্ট করেও দেখতে পারেন। মেয়েটি নীলাদ্রির দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার যদি অসুবিধা না থাকে তাহলে বসতে পারি। নতুন অফিসে আনকম্ফোর্টেবল ফিল করেনি এমন স্মার্ট বাঙালি খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। তাই এখনও অবধি কারোর সঙ্গেই পরিচয় করে উঠতে পারিনি। দিন তিনেকের অফিস আসার ফলাফল জিরো বলতে পারেন। তবে সুজনদা, আপনি বোধহয় মানুষকে হেল্প করতে ভালোবাসেন। আমি লবিতে পুতুল নাচের মত গোলগোল চক্কর কাটছি দেখেই হয়তো বুঝেছিলেন, সমস্যায় পড়েছি। কাবেরী নিজেই নীলাদ্রির দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আমার নাম কাবেরী।

নীলাদ্রি অপ্রস্তুত গলার স্বরকে স্বাভাবিক করার আপ্রাণ চেষ্টা করে বলেছিল, নিশ্চয়ই বসুন। আমি নীলাদ্রি বসু।

Sahitya Chayan

আপনার মত সমস্যায় আমিও পড়েছিলাম বছর তিনেক আগে। তখনও এই আপনার সুজনদাই আগ বাড়িয়ে আমায় সঙ্গ দিয়েছিল। তারপর কি করে যেন, আমরা অলিখিত ভাবেই বন্ধু হয়ে গেলাম। সুজনের পরপকারী স্বভাবটা দেখছি এখনো বুদ্বুদের মত রয়েই গেছে। নতুনদের দেখলেই সেটা জেগে ওঠে। কাবেরী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বলেছিল, নতুন বন্ধুত্বের দিনটা সেলিব্রেট করা হোক, আমার বাড়ির আনা টিফিন আর আপনাদের উদয়দার বিখ্যাত ঘুগনি দিয়ে। না না, আপনাদের বেস্ট কুক উদয়দার সঙ্গে কম্পিটিশনে নামবো না, তবে মেয়ে অফিসে আসছে দেখে আমার মা উদ্বেলিত হয়ে গোটা পরিবারের লাঞ্চটা আমার লাঞ্চ বক্সে লোড করে দিয়েছে, সেটা একা উদ্ধার করা আমার কম্ম নয়। সুজন মুচকি হেসে বললো, একবার যখন দাদা ডেকেছ, তখন তোমায় সব রকম সাহায্য করতে রাজি এই সুজন মল্লিক। দাও দেখি, মাসিমা টিফিনে কি দিয়েছে মেয়েকে দেখি। তিন পার্টের লাঞ্চ বক্সটা টেনে নিয়ে সুজন খুলতে ব্যস্ত হয়ে গেল। নীলাদ্রি এটা বহুবার লক্ষ্য করেছে, অপরিচিত থেকে সদ্য পরিচিত সকলের সঙ্গেই সুজনের ব্যবহার বেশ খোলামেলা, কোনো জড়তা থাকে না ওর মধ্যে। এই জন্যই বোধহয় যে কেউ সুজনকে তাড়াতাড়ি নিজের করে নিতে পারে।

সুজনকে নীলাদ্রিরও বড্ড আপন মনে হয়, যার কাছে সুখ-দুঃখের কথা বলা যায় নির্দ্বিধায়।

Sahitya Chayan

তাই বলে মাত্র দশমিনিট আগে পরিচয় হওয়া একজন মহিলার টিফিন বক্স থেকে টিফিন শেয়ার করার কথা ভাবতেও পারে না নীলাদ্রি। একি লোয়ারের ক্লাসরুম নাকি, যে সবাই টিফিন ভাগ করে খাবে? এটা অফিস, আর নীলাদ্রি যথেষ্ট সিনিয়র পজিশনে আছে কাবেরীর থেকে। তাই এভাবে সুজনের সঙ্গে স্রোতে ভাসতে ও পারবে না। ওর চোখের দৃষ্টিতেও বোধহয় অস্বস্তি ফুটে উঠেছিলো, সেদিকে তাকিয়েই কাবেরী বললো, বুঝলেন সুজনদা আপনার বন্ধু বোধহয় একজন জুনিয়র অপরিচিতার সঙ্গে একসাথে বসে লাঞ্চ করতে কমফোর্ট ফিল করছেন না। তাই সুজনদা, প্লিজ ওনাকে আমার লাঞ্চ বক্সের খাবার খেতে রিকয়েস্ট করে আর বিব্রত করবেন না। নীলাদ্রি অবাক হয়ে দেখছিল কাবেরীর দিকে। এত স্পষ্ট ভাবে কথা বলতে খুব কম মানুষকেই শুনেছে, তাছাড়া মহিলা কি মনের ভাষা পড়তে পারে নাকি? বেশ দ্বন্দ্বে পড়ে গিয়েছিল নীলাদ্রি। সুজনদা উদ্ধারকর্তার সুরে বলেছিল, আরে না না কাবেরী, নীল বরাবরই এমন রামগরুরের ছানা টাইপের মুখ করেই থাকে। ও নিয়ে বেশি ভেবো না। এই দাদা যতদিন এই ডিপার্টমেন্টে আছে ততদিন তোমার মায়ের হাতের এই লুচি আর আলুরদমের স্বাদ আমি মনে রাখব। ওহ, আরেকটা বক্সে কি আছে দেখতেই তো ভুলে গেছি। কাবেরী লাজুক হেসে বলেছিল, ওটাতে সুজির হালুয়া আছে, খেয়ে দেখুন। আর শুনুন, লাঞ্চ বক্সটা আপনার মাসিমা গুছিয়েছে ঠিকই কিন্তু

Sahitya Chayan

রান্নাটা কিন্তু এই অধমের। আজকে এটাই বাড়ির জলখাবার বানিয়েছিলাম।

সুজন বেশ চমকিত গলায় বলল, বলো কি হে, এই কলিযুগেও মেয়েরা রান্নাঘরে ঢোকে বলছো?

তাহলে তো কাবেরী, এই পেটুক দাদাকে একদিন বাড়িতে বসিয়ে নিজের হাতে কচি পাঁঠার ঝোল রেঁধে খাওয়াতেই হবে। নীলাদ্রির অস্বস্তি চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল। সুজন যে কি করে মাঝে মাঝে, এত বাড়াবাড়ির কি আছে!

ঠিক সেই মুহূর্তেই উদয়দার ক্যান্টিনের ছেলেটা এসে মাংসের ঘুগনি আর তিনটে রুটির প্লেটটা নীলাদ্রির সামনে ঠকাস করে নামিয়ে দিয়ে বললো, স্যালাড আজ বাড়ন্ত আছে।

কাবেরী ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, আমার জন্যও একপ্লেট ঘুগনি আর দুটো রুটি নিয়ে এসো তো ভাই।

কাবেরীর চোখ দুটোতে বেলাশেষের বিষণ্ণতা। সুজন নিজের মনে রসনাতৃপ্তি করেই চলেছে। নীলাদ্রির দিকে হয়তো আর ইচ্ছে করেই তাকাচ্ছে না কাবেরী। একটু বোধহয় অপমানিতই হয়েছে ওর ব্যবহারে। নীলাদ্রি নিজের প্লেটটা কাবেরীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, শুরু করতে পারেন। কাবেরী একটু করুণ হেসে বললো, না না আপনি শুরু করুন, আমি খাচ্ছি ক্ষণ। সুজন হাসতে হাসতে বললো, আরে এত লুচি আছে তোমরা খাও প্লিজ।

নীলাদ্রি অবস্থাটা একটু স্বাভাবিক করার জন্যই বললো, তুমি যেভাবে শুরু করেছ, তাতে শেষ দেখে ছাড়বে সেটা

Sahitya Chayan

বোধহয় উনি বুঝেই নিজের জন্য খাবারের অর্ডার করলেন। কাবেরী নীলাদ্রির কথার পিঠে সাবলীলভাবে বললো, ঠিক সে জন্য নয়, আপনার এত প্রিয় মেনু বলেই টেস্ট করতে চাইলাম। নীলাদ্রি এতক্ষণে মেয়েটার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো, কাবেরীকে এক কথায় সুন্দরী বললে কেউ বিরোধিতা করবে না, বরং সকলেই সহমত পোষণ করবে। মেয়েটার গালের ফর্সা রঙে একমুঠো আবিরের গড়াগড়ি মনে করায় লজ্জা পেলে মেয়েদের মন্দ লাগে না।

উদয়দার ক্যান্টিনের রুটি মুখে দিতেই কাবেরীর মুখভঙ্গি পাল্টে গিয়েছিল। নীলাদ্রির দিকে তাকিয়ে দেখেছিলো, ও অম্লানবদনে চিবাচ্ছে ওই রুটি, আর জল জল ঘুগনি। যার মটর, আলু, পেঁয়াজ, টুকরো চারেক মাংস কিছুতেই নিজেদের পৃথক সত্ত্বা ছাড়তে নারাজ। প্রত্যেককে খুঁজে নেওয়া যাবে বাটিতে ডুব দিয়েই। কাবেরী একটু নাড়াচাড়া করে বললো, বেশ ভালোই খেতে। নীলাদ্রি হেসে বললো, মোটেই ভালো নয়। তবে মা অফিস আসার আগে ভাত রেঁধে দেয়, তাতেই মায়ের বেশ ছুটোছুটি হয়। এরপরে লাঞ্চের বোঝাটা চাপাতে চাইনি আরকি। আমার বাড়িতে অবশ্য সবাই জানে আমাদের রেল ক্যান্টিনে এতটাই উপাদেয় খাবার পাওয়া যায় যে বাড়ির টিফিন মুখে রোচে না। সুজনদা তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বললো, কাবেরী, নে নে তোর জন্য গোটা চারেক লুচি বাঁচিয়ে রেখেছি। নিজের পেটকে বকলাম বুঝলি? বললাম, এটা কলিযুগ এখানে ডায়নোসরের

Sahitya Chayan

রান্নাটা কিন্তু এই অধমের। আজকে এটাই বাড়ির জলখাবার বানিয়েছিলাম।

সুজন বেশ চমকিত গলায় বলল, বলো কি হে, এই কলিযুগেও মেয়েরা রান্নাঘরে ঢোকে বলছো?

তাহলে তো কাবেরী, এই পেটুক দাদাকে একদিন বাড়িতে বসিয়ে নিজের হাতে কচি পাঁঠার ঝোল রেঁধে খাওয়াতেই হবে। নীলাদ্রির অস্বস্তি চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল। সুজন যে কি করে মাঝে মাঝে, এত বাড়াবাড়ির কি আছে!

ঠিক সেই মুহূর্তেই উদয়দার ক্যান্টিনের ছেলেটা এসে মাংসের ঘুগনি আর তিনটে রুটির প্লেটটা নীলাদ্রির সামনে ঠকাস করে নামিয়ে দিয়ে বললো, স্যালাড আজ বাড়ন্ত আছে।

কাবেরী ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, আমার জন্যও একপ্লেট ঘুগনি আর দুটো রুটি নিয়ে এসো তো ভাই।

কাবেরীর চোখ দুটোতে বেলাশেষের বিষণ্ণতা। সুজন নিজের মনে রসনাতৃপ্তি করেই চলেছে। নীলাদ্রির দিকে হয়তো আর ইচ্ছে করেই তাকাচ্ছে না কাবেরী। একটু বোধহয় অপমানিতই হয়েছে ওর ব্যবহারে। নীলাদ্রি নিজের প্লেটটা কাবেরীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, শুরু করতে পারেন। কাবেরী একটু করুণ হেসে বললো, না না আপনি শুরু করুন, আমি খাচ্ছি ক্ষণ। সুজন হাসতে হাসতে বললো, আরে এত লুচি আছে তোমরা খাও প্লিজ।

নীলাদ্রি অবস্থাটা একটু স্বাভাবিক করার জন্যই বললো, তুমি যেভাবে শুরু করেছ, তাতে শেষ দেখে ছাড়বে সেটা

Sahitya Chayan

বোধহয় উনি বুঝেই নিজের জন্য খাবারের অর্ডার করলেন। কাবেরী নীলাদ্রির কথার পিঠে সাবলীলভাবে বললো, ঠিক সে জন্য নয়, আপনার এত প্রিয় মেনু বলেই টেস্ট করতে চাইলাম। নীলাদ্রি এতক্ষণে মেয়েটার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো, কাবেরীকে এক কথায় সুন্দরী বললে কেউ বিরোধিতা করবে না, বরং সকলেই সহমত পোষণ করবে। মেয়েটার গালের ফর্সা রঙে একমুঠো আবিরের গড়াগড়ি মনে করায় লজ্জা পেলে মেয়েদের মন্দ লাগে না।

উদয়দার ক্যান্টিনের রুটি মুখে দিতেই কাবেরীর মুখভঙ্গি পাল্টে গিয়েছিল। নীলাদ্রির দিকে তাকিয়ে দেখেছিলো, ও অম্লানবদনে চিবাচ্ছে ওই রুটি, আর জল জল ঘুগনি। যার মটর, আলু, পেঁয়াজ, টুকরো চারেক মাংস কিছুতেই নিজেদের পৃথক সত্ত্বা ছাড়তে নারাজ। প্রত্যেককে খুঁজে নেওয়া যাবে বাটিতে ডুব দিয়েই। কাবেরী একটু নাড়াচাড়া করে বললো, বেশ ভালোই খেতে। নীলাদ্রি হেসে বললো, মোটেই ভালো নয়। তবে মা অফিস আসার আগে ভাত রেঁধে দেয়, তাতেই মায়ের বেশ ছুটোছুটি হয়। এরপরে লাঞ্চের বোঝাটা চাপাতে চাইনি আরকি। আমার বাড়িতে অবশ্য সবাই জানে আমাদের রেল ক্যান্টিনে এতটাই উপাদেয় খাবার পাওয়া যায় যে বাড়ির টিফিন মুখে রোচে না। সুজনদা তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বললো, কাবেরী, নে নে তোর জন্য গোটা চারেক লুচি বাঁচিয়ে রেখেছি। নিজের পেটকে বকলাম বুঝলি? বললাম, এটা কলিযুগ এখানে ডায়নোসরের

Sahitya Chayan

উপস্থিতি বড়ই ভয়ঙ্কর, এবারে থামো। নে নে খেয়ে নে। কাবেরী বোধহয় অবাক হয়ে দেখেছিলো সুজনকে। কত তাড়াতাড়ি কাবেরী ওর বোন আর তুই হয়ে গেল। আর সেখানে ওরই বন্ধু ভদ্রতা করেও এক চামচ সুজির হালুয়া টেস্ট করেও দেখলো না। এরা বন্ধুত্ব বাঁচিয়ে রেখেছে কি করে সেটাই তো আশ্চর্যের বিষয়!

কাবেরীর দুই ভ্রুর মাঝের বিস্ময়কর ভাঁজের দিকে তাকিয়েই নীলাদ্রি বললো, চুম্বকের সম মেরুর আকর্ষণ ক্ষমতা থাকে না বোধহয় জানেন, বিপরীত মেরুই টানে বেশি। তাই এমন উদ্ভট আমিই প্রাণখোলা সুজনের সব থেকে কাছের বন্ধু হলাম।

কাবেরী নরম গলায় বলল, আপনি কি সকলের সঙ্গেই এমন কম কথা বলেন, নাকি জুনিয়র আর মহিলা বলে আমার সঙ্গে আনকম্ফোর্টেবল ফিল করছেন?

কাবেরী তাকিয়ে ছিল সোজাসুজি নীলাদ্রির দিকে। নীলাদ্রি ওর স্বচ্ছ মন পড়ে নেওয়া দৃষ্টির সামনে সংকুচিত হয়ে বলছিলো, বন্ধুত্ব হতে একটু সময় লাগে। বিশ্বাস জন্মাতেও একটু সময় প্রয়োজন বোধহয়। জীবনটাকে একটু বুঝে খরচ করতে ভালোবাসি আমি। সুজন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই কাবেরী ওর বক্সগুলো গুছিয়ে নিয়ে বললো, আমি খেয়ে নেব সুজনদা। ক্যান্টিনের কাউন্টারে গিয়ে রুটি, ঘুগনির দামটা মিটিয়ে বেশ দ্রুত চলে গেল ওদের সামনে থেকে।

কাবেরী চলে যেতেই সুজন নীলাদ্রির দিকে তাকিয়ে বলেছিল, কলকাতায় এখনও চিরকুমার সভা আছে নাকি

Sahitya Chayan

নীল? জানিস কিছু এ সম্পর্কে?

হঠাৎ করে ট্র্যাক চেঞ্জ করে কথা বলাটা সুজনের একটা বদভ্যাস, এটার সঙ্গেও নীলাদ্রি যথেষ্ট পরিচিত।

নীলাদ্রি তখনও কাবেরীর অমন হঠাৎ চলে যাওয়ায় ঘোরের মধ্যেই ছিল। নিজেকে কেমন একটা অপরাধী মনে হচ্ছিল। মেয়েটা সদ্য অফিস জয়েন করেছে, তাই উত্তেজনাও ছিল ওর চোখেমুখে। নীলাদ্রির রূঢ় ব্যবহারের জন্যই দ্রুত পালিয়ে গেল মেয়েটা।

খারাপ লাগছে ওর, কেন যে ও সহজ হতে পারে না সকলের কাছে! এর মধ্যেই সুজনের আলটপকা প্রশ্নে একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, অমন সভা কি আদৌ ছিল নাকি কখনো? আমি যতদূর জানি ওটা কবিগুরুর কল্পিত নাটক। সুজন বেশ জোর গলায় বলল, আরে ছিল ছিল। সাহিত্যিকরা শুনেছি অল্প দেখেন, বেশিটা কল্পনা করেন। আমাদের কবিগুরুও নিশ্চয়ই এমন কোনো সভা দেখেছিলেন।

নীলাদ্রি হেসে বলেছিল, হঠাৎ এমন সভার খোঁজ কেন হে? বাড়িতে পাত্রী দেখছে নাকি?

সুজন মুচকি হেসে বলেছিল, ভাবছি আমার এক বন্ধুকে ওই সভার সেক্রেটারি করে দেব। নীলাদ্রি কৌতূহলী হয়ে বলছিলো, বুঝলাম না, কাকে?

সুজন উঠে দাঁড়িয়ে চলে যেতে যেতে বলেছিল, নীলাদ্রি বসুকে। যে কিনা মহিলাদের দিকে তাকালে নিজেকে অপবিত্র মনে করে, তাকেই ওই সভার সেক্রেটারি করবো ভাবছি। শোন নীল, তোর কিচ্ছু হবে না বুঝলি? তুই

Sahitya Chayan

চিরকুমার সভা বানিয়ে বসে থাকবি। এই সুজনের কথা যদি শুনিস তাহলে তোর একটা হিল্লে করে দিতে পারি। সুজন চলে গিয়েছিল ভবিষ্যদ্ববাণী করে। নীলাদ্রি গা ঝেড়ে উঠে পড়েছিলো। শুধু মনের মধ্যে একটা খুঁতখুঁতে অস্বস্তি কাজ করছিলো, কাবেরী আনন্দ করে নিজের রান্না খাওয়াতে এসেছিল, এক চামচ খেলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত না বোধহয়। মেয়েটার সামনাসামনি হলে একটা ছোট্ট সরি বোধহয় বলতেই হবে নীলকে।

নীলাদ্রি তারপর দিন সাতেক লাঞ্চ টাইমেও খুঁজেছিলো কাবেরীকে কিন্তু দেখতে পায়নি। সরি বলা আর হয়ে ওঠেনি। সময়ই ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিল নতুন জয়েন করা মেয়েটাকে। কিন্তু ডেস্টিনি বলেও একটা শব্দ আছে ডিকশনারিতে, তাই কাবেরী নামটা যখন আবছা হচ্ছিল নীলাদ্রির মনের খাতায় তখনই সুজন এসে বলেছিল, আগামীকাল কাবেরীর বার্থডে। তোর আর আমার দুজনের নিমন্ত্রণ ওদের বাড়িতে। যাবি তো? নাকি জুনিয়রের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেও তোর আপত্তি।

সুজন আর নীল প্রায় একই পোস্টে জব করে। সুজন যদি যেতে পারে তাহলে নীলাদ্রি নয় কেন! এই প্রশ্নটাই ছুঁড়েছিল সুজন নীলাদ্রির দিকে, কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক ঢঙে।

নীলাদ্রি আচমকা ধাক্কা খেয়ে বলেছিল, সে তোমার বোন, তুমি যাবে, আমি তো কোনো নিমন্ত্রণ পাইনি। নীলাদ্রিকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সুজন বলেছিল,

Sahitya Chayan

নিমন্ত্রণ পেলেই যাবি তো? নীলাদ্রি ঘাড় নেড়ে বলেছিল, আগে তো ইনভাইটেশন পাই, তারপর ভেবে দেখবো।

সুজন গলা ঝেড়ে বেশ জোরেই ডেকেছিলো, কাবেরী...আয়, লজ্জা পাসনা, নীল যাবে কথা দিলো, তুই চট করে নিমন্ত্রণটা সেরে ফেল। পিলারের পিছন থেকে নিলাদ্রীকে চমকে দিয়ে বেবি পিঙ্ক কালারের চিকনের শাড়ি পরে সোজা ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল কাবেরী। অপ্রস্তুত গলায় বলেছিল, বিশ্বাস করুন আমি আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি। কিন্তু সুজনদা বললো, আপনাকে না ইনভাইট করলে নাকি সুজনদাও যাবে না। আমি জানি আপনি জুনিয়রদের সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করেন না, তাই সাহস করে ইনভাইট করিনি।

নীলাদ্রি বুঝেছিলো, সুজনই কাবেরীকে ফোর্স করেছে নীলাদ্রিকে নিমন্ত্রণ করতে, তাই ও বাধ্য হয়ে এসেছে নীলাদ্রির সামনে। সুজন মুচকি মুচকি হাসছিল, নীলের কিছুই বলার নেই। একজন দায়ে পড়ে ওকে আমন্ত্রণ করছে, আর ওকেও বাধ্য করা হচ্ছে তার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য।

নীলাদ্রি অপ্রস্তুত গলায় বলেছিল, তার মানে আপনার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই আপনি আজ এসেছেন তাই তো?

কাবেরী লজ্জিত গলায় বলেছিল, একেবারেই না, আপনি আমাদের বাড়ি গেলে আমি সত্যিই খুশি হবো।

কাবেরীর লজ্জিত মিষ্টি মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে নীলাদ্রি বলেছিল, বেশ, তাহলে আপনাকে ওইদিন খুশি করতেই আমি উপস্থিত থাকবো। অনাহুত ভাবলেও

Sahitya Chayan

আসছি। কাবেরী আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছিল, সত্যি আসবেন? আসলে ভীষণ খুশি হবো।

সেই শুরু ওদের আলাপের। তারপর কি করে যেন কাবেরীর কাছে দুজনের ডাকটা একটু আলাদা হয়ে গিয়েছিল। সুজনকে সুজনদা বললেও নীলাদ্রির নামের শেষে বিশেষ কোনো শব্দ বসায়নি কাবেরী। আপনি থেকে তুমিতে না নামলেও ভাববাচ্যে কথার আদানপ্রদান চলতেই থাকছিলো। নীলাদ্রিরও বেশ ভাল লেগেছিলো কাবেরী নামের দায়িত্ববান, কর্তব্যপরায়ণ, স্বাধীনচেতা মেয়েটাকে। সুজনের চিরকুমার তকমাটা যদি ভাঙতেই হয় তাহলে সেটা কাবেরীর মাধ্যমেই ভাঙবে ভেবে রেখেছিল মনে মনে। প্রেম নয় একটা অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করত নীল ওর প্রতি। কাবেরীরও বোধহয় অপছন্দ ছিল না নীলকে। তাই সুজনের অনুপস্থিতিতে একদিন নীলাদ্রি কাবেরীকে বলেছিল, তুমি জব পেয়ে গেছ, প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছ, এবারে নিশ্চয়ই তোমার বাবা-মা তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করবেন?

কাবেরী একটু চুপ করে থেকে, ডান হাতের আঙুল দিয়ে বাঁ হাতের অনামিকার কপার কালারের নেলপলিশটা খুঁটতে খুঁটতে বলেছিল, যদি কেউ কথা দেয় তাহলে অপেক্ষা করতে পারি আজীবন।

নীলাদ্রি সব বুঝেও মজা করে বলেছিল, যে কেউ কথা দিলেই চলবে বলছো?

কাবেরী হতভম্ব হয়ে বলেছিল, বয়েই গেছে, যার তার কথা মানতে।

Sahitya Chayan

নীলাদ্রি লেগপুলিংয়ের সুযোগ হাতছাড়া না করেই বলেছিল, সে তো বটেই, তুমি সুন্দরী, শিক্ষিতা, সেন্ট্রালের জব করছো, তুমি কেন আমার মত আনরোম্যান্টিক গোমড়া মুখো পাবলিকের কথায় অপেক্ষা করবে?

কাবেরী ততোধিক লজ্জা পেয়ে বলেছিল, আমি কি যার তার মধ্যে নীলাদ্রি বসুর নামটা রেখেছি নাকি?

নীলাদ্রি কোনোমতে হাসি সামলে বলেছিল, তাহলে নীলাদ্রি বসুর নামটা বুঝি বাতিলের দলে আছে! যার তার মধ্যেও তার স্থান অকুলান! হায়রে কপাল!

কাবেরী অসহ্য লজ্জায় ছটফট করতে করতেই বলেছিল, না, মোটেই না, আমি নীলাদ্রি বসুর নামটা স্পেশাল জায়গায় রেখেছি।

নীলাদ্রি স্যান্ডউইচে কামড় দিয়ে বলেছিল, তা স্পেশালদের লিস্টটা কি একটু পাওয়া যাবে ম্যাডাম? কম্পিটিশনে নাম দেওয়ার আগে প্রতিযোগীদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। কত জনের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে জানা থাকলে আগে থেকে প্রিপারেশন নেওয়া যায়।

কাবেরী টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, বেশ লিস্টটা কাল পাঠিয়ে দেব তাহলে।

পরের দিন সুজন একটা খাম এনে নীলের হাতে ধরিয়ে বলেছিল, চিরকুমার সভার প্ল্যানটা বাতিল করলাম বুঝলি নীল। সেক্রেটারি যাকে করবো ভেবেছিলাম সেই স্বয়ং ডুবে ডুবে প্রেম করছে। এরপর ওই সভার কৌলিন্য সঙ্কট হয়ে যাবে বুঝলি! এই নে ধর, প্রেরকের নামটা বোধহয়

Sahitya Chayan

তোর জানা। সুজনের মুখের নির্মল হাসিতেই নীলাদ্রি আর কাবেরীর সম্পর্কের সুতোটা বাঁধা হয়েছিল শক্ত করে।

খামটা খুলতেই ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, একটা আকাশি রাইটিং প্যাডের পেপার।

আমার মনের স্পেশাল মানুষদের লিস্টটা পাঠালাম, দেখুন লড়তে পারেন কিনা!

এক থেকে পাঁচ অবধি সংখ্যা লেখা। প্রতিটা সংখ্যার পাশেই একটাই নাম, নীলাদ্রি বসু।

শেষে লেখা, এই যাচ্ছেতাই লোকটা কথা দিলে অপেক্ষা করতে পারি আজীবন।

নীলাদ্রি অনুর বিয়ে দিয়েছিল ধুমধাম করে। অফিসের অন্য কলিগদের সঙ্গে কাবেরীও ইনভাইটেড ছিল।

কিন্তু কাবেরী বলেছিল, না বোনের বিয়েতে যাবো না, ওই বাড়িতে আমি দুধে আলতায় পা চুবিয়েই ঢুকবো।

নীলাদ্রির জন্য প্রায় বছর ছয়েক অপেক্ষা করছিল কাবেরী। অনুর বিয়ের বছর তিনেক পরে কাবেরী এসেছিল বসু পরিবারের বউ হয়ে। সুজনই উদ্যোগ নিয়ে দুই বাড়িতেই জানিয়েছিল। দুই বাড়িতেই আপত্তি ছিল না কারোর। তারপর থেকেই কিভাবে যেন নীলাদ্রি একটু একটু করে কাবেরীর ওপরে নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল। বাবা, মাকে হারানোর পরেও কাবেরী কোনোদিন ওকে একা হতে দেয়নি। নিজের সমস্ত ভাবনার দায়ভার কাবেরীর কাঁধে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্তেই ছিল নীলাদ্রি। মাঝে মাঝে মতানৈক্য ঘটেছে বৈকি, রাগ,অভিমানও ছিল ওদের দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে, কিন্তু কোনদিনও নীলের মনে হয়নি

Sahitya Chayan

কাবেরী কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই প্রথম কাবেরীর জেদটাকে পছন্দ করেনি নীলাদ্রি। অহনার সঙ্গে টুটাইয়ের বিয়েটা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি ও। টুটাই বিয়ের আসর ছেড়ে চলে যাবার পর তো নীলাদ্রির মনেই হচ্ছে কাবেরীকে সব ব্যাপারে এতটা অন্ধ বিশ্বাস করা বোধহয় উচিত হয়নি। এই প্রথম কাবেরীর ওপরে থাকা পুরু বিশ্বাসের পর্দায় আঁচড় লাগলো।

।।১১।।

জীবনদার কথায় বিশ্বাস করতে একেবারেই মন চাইছে না প্রিয়াঙ্কার। মায়ের আবার বাচ্চা হবে? না, না এ যে অসম্ভব। মা অনিকের বিষয়টা বোধহয় টেরও পেয়েছে। সেদিন প্রিয়াঙ্কা ফোনে কথা বলছিল অনিকের সঙ্গে, মা ঘরে ঢুকে একটু সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলেছিল, কোনো বন্ধু? মেলামেশার আগে তোর বাবার সম্পর্কে সব সত্যি বলবি বুঝলি! নাহলে পরে জানতে পারলে সে তোকে ছেড়ে চলে যাবে আর তুই পড়ে থাকবি এই অন্ধকারেই। বাবার কথা জানার পরে যদি কেউ ভালোবাসতে সাহস পায় তাকেই মন দিবি, নাহলে নয়।

তোর বিয়েটা দিলে তবেই আমার শান্তি। এই নরক থেকে যদি তোকে বের করতে পারি তাহলে মরেও সুখ।

নিজের জীবনটা তো এই আস্তাকুঁড়ে শেষ করলাম, তোরটাও যদি না বাঁচাতে পারি, তাহলে মা ডাকের অপমান। মা যখন কথা বলে তখন প্রিয়াঙ্কা অবাক হয়ে শোনে, মাকে বেশ শিক্ষিতই তো মনে হয়। বিশাল কিছু না হোক, উচ্চমাধ্যমিকটা মা পাশ করেছিল সেটা কথা প্রসঙ্গে

Sahitya Chayan
বলেও ফেলেছিল একদিন। এইখানেই দ্বন্দ্বে পড়ে যায় প্রিয়াঙ্কা। মাকে দেখতে বেশ সুন্দর, বাপের বাড়িও শিক্ষিত ছিল, তাহলে কেন পীযুষ বিশ্বাসের মত লোকের সঙ্গে বিয়ে দিলো মায়ের? এই প্রশ্নের উত্তরে মা ক্লান্ত গলায় একটাই কথা বলেছে, ভাগ্য বলেও যে একটা কথা আছে রে প্রিয়া, ভুলে গেলে চলে! প্রিয়াঙ্কা জানে মায়ের বিবাহিত জীবনটা এতটাই কষ্টের যে সেটা নিয়ে বেশি কথা বলা মা একেবারেই পছন্দ করে না। দীপশিখা বিশ্বাস, প্রিয়াঙ্কার খুব ইচ্ছে ছিল কলেজে অভিভাবকের জায়গায় এই নামটাই লেখে, কিন্তু মাধ্যমিকের অ্যাডমিড কার্ডে পীযুষ বিশ্বাস থাকায় ওটাই রয়ে গেছে প্রিয়াঙ্কার নামের সঙ্গে জুড়ে।

কি মিষ্টি একটা নাম ওর মায়ের, দীপশিখা। প্রিয়াঙ্কা ছোটবেলায় বলেছিল, এই নামের মানে কি মা? মা অন্যমনস্ক গলায় বলেছিল, সলতে শেষ হওয়া, তেল ফুরিয়ে যাওয়া প্রদীপের শিখা, নরম বাতাসও যাকে নিভিয়ে দিতে পারে যে কোনো মুহূর্তে। বড় হয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেছিল, মা দীপশিখার মানে কিন্তু আরেকটাও আছে। দাউদাউ করে জ্বলে অন্যকে জ্বালিয়ে দেওয়া। পলকের জন্য মায়ের চোখের দৃষ্টিতে একটা হলকানি দেখেছিলো প্রিয়াঙ্কা। মাকে আরেকটু শক্ত করার জন্যই বলেছিল, রুখে দাঁড়ালে কার সাধ্যি তোমার মত দীপশিখার ধারে কাছেও আসে! মা চোখ নিচু করে বলেছিল, তুই না থাকলে নিজেকেই রাখতাম না। মায়ের চোখের ওই স্ফুলিঙ্গ মুহূর্তে বদলে গিয়েছিল ক্লান্তিতে। তবে প্রিয়াঙ্কা

Sahitya Chayan

জানে মা বড্ড ঘৃণা করে বাবাকে। এই বয়েসে আবার সন্তান নেবার কথা বোধহয় ভাববে না মা। তাছাড়া প্রিয়াঙ্কার বিয়ে নিয়েও মা যথেষ্ট ভাবে, সেখানে নিশ্চয়ই এরকম পরিস্থিতি তৈরি করবে না, যেখানে প্রিয়াঙ্কাকে লোকের কৌতুকের পাত্রী হতে হবে। বাড়িতে ঢোকার আগেও জীবনদার কথাটা মনে পড়ে গেলো প্রিয়াঙ্কার। অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো বুকটা। এতক্ষণের যুক্তি সাজানো মনটা আতঙ্কিত হয়ে উঠলো, বাড়িতে ঢুকে কি শুনবে ভেবেই! অসার ভারী পা দুটোকে টেনে নিয়ে ঢুকলো বাড়ির উঠানে। রান্নাঘর থেকে পেঁয়াজ ভাজার গন্ধ আসছে। বাবার সাইকেলটা নেই উঠানে। সোজা গিয়ে মাকেই প্রশ্নটা করবে ভাবলো প্রিয়াঙ্কা, কিন্তু কি বলবে বুঝতে পারছিল না। প্রশ্নটা কিভাবে মায়ের সামনে আনবে সেটাই তো জানে না ও। তবুও কাঁপা পায়ে মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই মা বললো, ইন্টারভিউ কেমন হলো রে? চাকরিটা হবে? কি মনে হচ্ছে? যাকগে, হাত পা ধুয়ে নে, ডিমের তরকারি আর রুটি করেছি, খেয়ে নে।

আচমকা প্রিয়াঙ্কা বললো, মা, বাবা জীবনদার দোকান থেকে প্রেগনেন্সি টেস্টের কিট কেন কিনেছে?

তোমার তো কদিন অ্যাসিডিটির জন্য বমি পাচ্ছিলো বললে!

মা ধীরে সুস্থে তরকারিটা কড়াই থেকে ঢাললো, গ্যাসের নব বন্ধ করে বললো, তোর বাবা আমার যে-কোনো শরীর খারাপ শুনলেই ওই একটাই ওষুধ নিয়ে আসে আমার জন্য। এই নিয়ে অন্তত পঞ্চাশবার টেস্ট

Sahitya Chayan

করেছি ইউরিন। আগে ল্যাবে গিয়ে করিয়ে আনতো, এখন বাড়িতেই করে। মায়ের নির্লিপ্ত বলার ভঙ্গিমাতে চমকে উঠে প্রিয়াঙ্কা বললো, কিন্তু কেন মা? এই বয়েসে এমন টেস্ট কেন?

মা একটা বাটিতে প্রিয়ার জন্য তরকারি তুলতে তুলতে বললো, গায়ে জ্বর, বমি, ঠান্ডা লাগায় গা ম্যাজম্যাজ করলেই তোর বাবা টেস্ট করায়। কারণ তোর বাবা বিশ্বাস করে, তার অনুপস্থিতিতে আমি ঘরে অন্য লোক ঢোকাই, তাই যে-কোনো অসতর্ক মুহূর্তে আমি প্রেগনেন্ট হতেই পারি। প্রিয়া অবাক হয়ে বলল, মানে? তুমি অপমানিত বোধ করো না এতে?

মা, হেসে বললো, পাগলী মেয়ে, মান-অপমানের বোধটা জলাঞ্জলি দিয়েছি বলেই না ওই মানুষটার জন্য দু-বেলা রাঁধতে পারি! তুই যা, বকবক না করে খেয়ে নে। চিন্তা করিস না, তোর আর ভাইবোন কোনোদিনই হবে না। তোর বাবাকে লুকিয়ে আমি একটা কাজ করেছি, সেটা হলো লাইগেশন। খাবার দিচ্ছি, আগে খেয়ে নে প্রিয়া।

প্রিয়াঙ্কা তখনও ঘোরের মধ্যেই হেঁটে গেল বাথরুমের দিকে। ভাবছিলো, মা কি প্রস্তর মূর্তি, নাকি রক্তমাংসের মানুষ?

যে মানুষটাকে দু-মিনিট দেখলেই প্রিয়াঙ্কার মধ্যে রক্ত দেখার আদিম দুর্বার ইচ্ছে জেগে ওঠে, যে মানুষটার গলা শুনলেই কল্পনায় নিজেকে চোদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে পাঠাতেও ভয় করে না প্রিয়াঙ্কা—সেই মানুষটাকেই এতগুলো বছর ধরে কি করে সহ্য করছে ওই মহিলা!

Sahitya Chayan

এটা বিস্ময়কর ঘটনা, সত্যিই দীপশিখা বিশ্বাস প্রিয়াঙ্কার বিস্ময়ের পাত্রী।

গরম রুটি আর তরকারিটা দেখে ও বুঝতে পারলো ওর মারাত্মক ক্ষিদে পেয়েছে। খেতে বসতেই আকাশে বিদ্যুতের ঝলকানি। এখন তো শীতকালেও যখন তখন আকাশ কাঁপিয়ে বৃষ্টি নামে। আবহাওয়া দপ্তর বারোমাসই জোরে অথবা হালকা বৃষ্টির সম্ভবনা বলতেই থাকে।

একটা রুটি শেষ করেতেই জোরে বৃষ্টি এলো। মা জানালাগুলো বন্ধ করছিল, প্রিয়াঙ্কা মনে মনে বললো, বুঝেছি দীপশিখা কেন তেল নিঃশেষ করে, সলতে শেষ হয়েও পুড়িয়ে দেয় না। মাথার ওপরে ছাদ আর পেটের ভিতরে খাদ্য— এই দুটো যে ওই লোকটাই জোগায়। বাবা নামক জন্তুটা সাইকেলে বেল বাজিয়ে জানান দিলো নিজের উপস্থিতি। এই বাড়ির উঠোনে ঢুকে বেল বাজানোটা অদ্ভুত লাগতো প্রিয়ার। মাকে জিজ্ঞেস করতে মা খুব সাধারণ গলায় বলেছে, এটা যে ওর বাড়ি, আমরা যে ওর আশ্রিত, ওই এ বাড়ির মালিক সেটা বোঝানোর জন্যই বোধহয় বাড়িতে ঢোকার পর আমাদের সচেতন করে। অনেকটা রাজা রাজসভায় প্রবেশের আগে যেমন সান্ত্রীরা জানিয়ে দিতো, মহারাজ দরবারে আসছেন, তেমন আর কি!

মায়ের এই নির্লিপ্ততা আরও অবাক করে প্রিয়াঙ্কাকে। সব জেনে বুঝেও এই মহিলা শুধু মেয়ের জন্যই এই মনুষত্বহীন মানুষটার সঙ্গে জীবন কাটিয়ে চলেছে।

Sahitya Chayan

এত উদাসীন কি করে থাকতে পারে একটা রক্ত মাংসের মানুষ। বাবার আওয়াজ পেয়েই মা ফিসফিস করে বললো, হাত মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দে। আমায় মারলেও বেরোবি না, বুঝলি কি বললাম? আমি সামলে নেব, তুই বেরোবি না। এটা ওদের বাড়ির নিত্যদিনের ঘটনা। মা ওকে জোর করে ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে পড়ে পড়ে মার খায় ওই লোকটার হাতে, কখনো অশ্রাব্য ভাষায় খিস্তি দেয় মাকে।

গালাগালির ভাষা শুনলে মনে হবে বিবাহিত স্ত্রী নয়, মায়ের কাছে বোধহয় কোনো খদ্দের এসেছে। একরাত থাকবে, পেমেন্ট করবে তারপর চলে যাবে। একেই মা খাবার ধরে দেবে একটু পরে। প্রিয়াঙ্কারও আর ক্লান্ত শরীরে নোংরামি দেখতে ইচ্ছে করছিল না, ওকে দেখলেই বাবার পৌরুষত্ব বেশি করে জেগে ওঠে, তাই ওই লোকটার সামনে না থাকাই ভালো। তাতে হয়তো মায়ের ওপরে অত্যাচারের মাত্রাটা একটু হলেও কমবে।

ফোনটা ভাইব্রেট করলো প্রিয়াঙ্কার, অনিক কল করছে। ফোনটা নিয়েই ঘরে ঢুকলো প্রিয়াঙ্কা। বাইরে থেকেই শুনতে পেল, জড়ানো গলায় বাবা বলছে, এই যে বাজারী মেয়েছেলে, তোমার বিদ্যেধরি শরীর নাচিয়ে ফিরলো? পেলো চাকরি ল্যাংটো হয়ে?

দরজায় ছিটকিনি না লাগিয়ে মা শুতে বারণ করেছে। তাই তাড়াতাড়ি ছিটকিনি লাগিয়ে ফোনটা রিসিভ করলো প্রিয়াঙ্কা।

Sahitya Chayan

আপনি নিজের ফোনটা কেন সুইচড অফ করে রেখেছেন বলবেন? কাবেরী আন্টিকে অন্তত একটা কল করে জানিয়ে দিন আপনি ভালো আছেন, আপনাকে কেউ কিডন্যাপ করেনি অন্তত। অহনা বিরক্ত মুখে কথাগুলো বললো নৈঋতকে। বেশ খানিকক্ষণ ধরেই দেখছে নৈঋত নিজের বন্ধ ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে বোকার মত। অহনার ঝাঁঝালো গলায় বলা কথার উত্তরে নৈঋত খুব শান্ত স্বরে বললো, ওটাই ভাবছি, ঠিক কি বলা উচিত আমার মাকে! মা নিশ্চয়ই এতক্ষণে প্যানিক করছে, কারণ আর কেউ বিশ্বাস করুক না করুক মা জানে আমি কখনোই বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে গিয়ে বসুবাড়ির, মেইনলি কাবেরী বসুর সম্মান কিছুতেই মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারি না। তাই একটা কংক্রিট কজ খুঁজছি, যেটা বললে মা বুঝবে আমি নিরুপায় ছিলাম।

অহনা অপ্রস্তুত গলায় বলল, বুঝতে পারছি আপনি প্রেসারে আছেন। আর সবটাই হলো আমার জন্য। বারবার সরি বলে আপনাকে বিব্রত করতে চাইছি না, কিন্তু আন্টিকে একটা খবর দেওয়া কিন্তু জরুরি। আমার এই সিমের নম্বরটা বাবা ছাড়া আর কেউ জানে না। এটা থেকে একটা কল করবেন কি বাড়িতে?

মানে আপনার ফোনটা অন করলে তো শুধু কাবেরী আন্টি নয় অনেকেই প্রশ্নবানে অস্থির করে দেবে আপনাকে। নৈঋত আলতো হেসে বললো, এই সিমের নম্বরটা আপনার এক্স না মানে এই মুহূর্তে আপনার প্রেজেন্টও জানে না? নাকি এই সিমটা তার সঙ্গে কথা

Sahitya Chayan

বলবেন বলেই এক্সক্লুসিভলি নিয়ে ছিলেন? উফ, বেশ জমাটি প্রেম কিন্তু আপনাদের। অহনা তিতিবিরক্ত হয়ে বলল, কি চাইছেন বলুন তো আপনি? কেন আমার পিছনে পড়ে আছেন?

নৈঋত উদাস গলায় বলল, তেমন কিছু তো চাই না, শুধু আপনার উড়ে আসা প্রেমিকের হাতে নিঃশর্তে আপনাকে সমর্পণ করতে চাই। এটুকুই চাহিদা এই অর্বাচীনের। তাহলে আপনার কাবেরী আন্টিকে কলটা করেই ফেলি, কি বলুন? দিয়ে বলেই দিই, অহনাকে ওর প্রেজেন্ট লাভারের হাতে তুলে দিয়ে ফিরছি কলকাতায়। যেন কেউ কোনো টেনশন না করে।

ফোনটা হাতে নিয়ে সুইচ অন করতে চাইল নৈঋত। অহনা ফোনটা ছিনিয়ে নিয়ে বললো, ইয়ার্কি নাকি? আপনি আমার নামে আন্টিকে যা পারবেন বলবেন আর সেটা আমি মেনে নেব? এসব বলা চলবে না।

নৈঋত মুচকি হেসে বললো, বেশ তাহলে বলছি, অহনার পালিয়ে বিয়ে করায় ইচ্ছে ছিল, তাই আমায় নিয়ে কোনো এক কালিয়াগঞ্জ নামক জায়গায় পালাচ্ছে। সেখানের কোনো মন্দিরে আমরা বিয়ে করে ফিরছি।

অহনা দাঁত চেপে বললো, বাংলা সিরিয়াল দেখার অভ্যেস আছে বুঝি? বসে বসে স্বপ্ন দেখছেন নাকি?

নৈঋত শান্ত গলায় বলল, তাহলে আপনিই আপনার কাবেরী আন্টিকে বলুন কেন পালালাম আমি! আমার মায়ের সঙ্গে তো আপনারাই প্রথম পরিচয় হয়েছিল বলে শুনেছি। মা-ই তো আপনাকে পছন্দ করেছিল, তাই না?

Sahitya Chayan

মায়ের সব পছন্দের ওপরেই আমার আর বাবার একটা অন্ধ বিশ্বাস ছিল, মনে হতো মা বোধহয় ভুল কিছু করতে পারে না। অহনা নৈঋতকে থামিয়ে দিয়ে বললো, এখন বুঝলেন তো মানুষ মাত্রই ভুল হয়, কাবেরী আন্টিও ভুল করে ফেলেছেন, আমায় পছন্দ করে, আপনি বরং ভুলটুকু শুধরে নিন প্লিজ। নৈঋত অহনার মুখের অস্বস্তিটুকু উপভোগ করছিল মন দিয়ে। কেন কে জানে, এই মুহূর্তে নৈঋতের আর ভয় করছে না। লোকলজ্জা, সমাজ, কলেজ, কলিগ, বসু পরিবারের ঐতিহ্য সব কিছুকে বাদ দিয়ে একটা অমোঘ আকর্ষণ অনুভব করছিল স্বল্পপরিচিত মেয়েটার প্রতি। কি যেন আছে মেয়েটার দৃষ্টিতে, প্রতিমুহূর্তে ওকে আবিষ্কারের আশায় ডুব দিতে চাইছে নৈঋতের এত কালের সাবধানী মন।

এই নৈঋতকে তো ও নিজেই চেনে না। এতক্ষণ ওই অন্ধকার স্টেশনের কোণে বসে কতরকম ভাবনার জাল বুনছিলো ও। দুশ্চিন্তায় মাথার শিরাগুলো দপদপ করছিল তখন, আর এখন কোনো এক অজানা জায়গায় চলেছে এই মেয়েটার সঙ্গে অথচ দুশ্চিন্তা নামক ভয়ঙ্কর বস্তুটা যেন ওকে ছেড়ে পালিয়েছে অন্যত্র। নৈঋত বেশ বুঝতে পারছিল অহনার পার্সোনালিটি ধীরে ধীরে অকেজো করে দিচ্ছে ওর যুক্তিবাদী মনটাকে। ধীর, স্থির নৈঋতকে করে দিচ্ছে শেষ চৈত্রের দামাল হাওয়ার মত।

মেয়েটাকে রাগিয়ে দিতে বেশ মজা লাগছে ওর। অদ্ভুত একটা রহস্য আছে অহনার মধ্যে, নৈঋত বেশ বুঝতে পারছে বিয়ের আসর থেকে পালানোর পিছনে একটা

Sahitya Chayan

বড়সড় কারণ আছে। এক্স লাভার বোধহয় সেই কারণ নয়। অহনার মত ব্যতিক্রমী মেয়ের কারণটাও যে বেশ ইউনিক হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মনে মনে মায়ের পছন্দের তারিফ করলো নৈঋত। হয়তো অহনা কোনোদিনই ওর হবে না, তবুও কালকের রাতটা আর এই প্রায় প্যাসেঞ্জারবিহীন ট্রেন জার্নিটা ওর মনে থাকবে চিরকাল।

অহনা আলগোছে বললো, আপনি তার মানে আমার সঙ্গেই যাবেন শেষ পর্যন্ত তাইতো?

নৈঋত কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, কোনো সন্দেহ আছে নাকি? বুঝলেন অহনা, একটা কথা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে, তাই করছি...এই মুহূর্তে আমার সোশ্যাল স্ট্যাটাস নষ্ট করার জন্য আমার সব থেকে বেশি রাগ হওয়ার কথা ছিল আপনার ওপরে, কিন্তু অদ্ভুত ভাবে আমার সব রাগের জীবাণুগুলো মৃতপ্রায় হয়ে গেছে কোনো এক অজানা বিক্রিয়ায়। ঠিক কোন কোন পদার্থের বিক্রিয়ায় তীব্র রাগের অনুভূতিগুলো ভালোলাগায় বদলে যায় সেটা অবশ্য আমি জানি না। যদিও উচ্চমাধ্যমিকে কেমিস্ট্রিতে আমার লেটার মার্ক ছিল, তবুও এই নতুন বিক্রিয়া পদ্ধতিটা আমার অজানাই রয়ে গিয়েছিল। অহনা শান্ত গলায় বলল, আপনার মা বোধহয় ঠিকই বলেছিলেন, আমার ছেলে একটু বেশিই শান্ত, ভদ্র। তাই বলে আপনার ভদ্রতাটাকে আমি ব্যবহার করবো এমন কিন্তু নয়।

ওদের কথা শেষ হবার আগেই লম্বা ঝুলপির, জামার বোতাম খোলা অবাধ্য টাইপ দুটো ছেলে এসে বসলো

Sahitya Chayan

অহনার পাশে।

একটা ছেলে অকারণেই মুখে অদ্ভুত অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করছিল। বিরক্ত লাগছিলো নৈঋতের। কিন্তু এদের কাছে ছুরি টুরিও থাকে। প্রতিবাদ করতে গেলে যদি হিতে বিপরীত হয় তাহলে অহনাকে বিপদে পড়তে হবে। ও নাহয় ছেলে, কিন্তু মেয়েদের এখন প্রতি পদে পদে বিপদ, তাই ধৈর্য্য ধরে দাঁত চেপে লক্ষ্য করছিল ছেলেগুলোর উচ্ছৃঙ্খলতা। মাত্রা ছাড়াচ্ছিলো ওদের অসভ্যতা। নৈঋত ফিসফিস করে অহনাকে বললো, আপনি আমার ডানদিকে এসে বসুন। কামরা মোটামুটি ফাঁকা এখনো, আর যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাদের কাছ থেকে হেল্প পাবো বলে মনে হয় না। এরা কিন্তু ডেঞ্জারাস হয়। ভোরের আর রাতের ট্রেনে এদের বেয়াদপি প্রায়ই পড়ি খবরে। আপনি তো মিডিয়ায় আছেন, আমার থেকেও বেশি খবর দেখেন স্বচক্ষে, তাই বলছি, আমার এইপাশে এসে বসুন। আর শুনুন ছোট থেকে আমি জীবনে মারামারি করিনি, বরং ক্লাসের ছেলেরা আমাকেই পেটাতো, তাই সাঁতার না জানা লোকের সঙ্গে আছেন ভেবে আগে থেকেই সচেতন হন। ওই ছেলেটার পাশে বসে থাকার দরকার নেই। নৈঋতের ফিসফিস শুনেই একটি ছেলে চটুল হিন্দি গান ধরলো। অন্যটি অহনার প্রায় গায়ের ওপরে এসে বসেছে। নৈঋতের রাগটা বাড়ছে, থাকতে না পেরেই বললো, গোটা ট্রেন তো ফাঁকা, আপনারা এভাবে ভদ্রমহিলার গায়ের ওপরে বসছেন কেন? মিনিমাম ভদ্রতা কি ভুলে

Sahitya Chayan

গেছেন নাকি? রেপুটেড বাড়ির ছেলে হলে এমন অসভ্যতা করতে পারতেন না।

একটা ছেলে মুচকি হেসে বললো, কেন দাদা, গার্লফ্রেন্ডকে একটু ভাগ করতে কি বুকে যন্ত্রণা হচ্ছে? নাকি আমার করোনা আছে, যে আমি ছুঁলেই উনি আক্রান্ত হয়ে যাবেন? আরেকজন রানিং কমেন্ট্রি করলো, দাদার যা ফেস দেখছি তাতে গান্ধী আমলে জন্ম মনে হচ্ছে। ভদ্রতা শব্দের দায়টা বোধহয় দাদা একাই বহন করে বেড়াচ্ছেন কি বলুন? তা দাদা, এই নরম সরম ফেস নিয়ে এমন একটা সেক্সি মালকে তুললেন কি করে বলুন তো? শুধু ভালো চাকরির জোরে নাকি? তা দাদা আমাদের সিঙ্গেলদের জন্যও একটু আধটু অ্যাডভাইজ দিন প্লিজ।

অসহ্য আক্রোশে নৈঋতের ফর্সা কানের লতি লালচে হয়ে গেছে। শীতের ভোরেও নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। অহনা নির্বিকার মুখে জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। ছেলেটা বললো, দাদাভাই, বৌদির সঙ্গে কি মান অভিমানের পালা চলছে নাকি? দুজনে দুদিকে বসে আছেন যে? নৈঋতের ইচ্ছে করছিল টেনে একটা থাপ্পড় দেয়। কিন্তু তারপর এরা দুজন মিলে যদি অহনার কোনো ক্ষতি করে তখন দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। কদিন আগেই একটা নিউজ পড়লো, চলন্ত ট্রেনে হাজবেন্ডের সামনেই তার স্ত্রীকে রেপ করেছে তিনজন ছেলে। ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠলো নৈঋত। অহনাকে সঠিকভাবে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারলে তবেই

Sahitya Chayan

শান্তি। এখন যদি ওকে রক্ষা করতে না পারে, তাহলে অহনা ভাববে কোন কাপুরুষকে বিয়ে করতে যাচ্ছিল ও!

গ্রীন আর ইয়েলো শার্ট পরা ছেলেটা অহনার কাঁধের কাছে মাথাটা প্রায় ঠেকিয়ে বললো, বৌদি দেবরজি আপনার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমালে কি আপনি রাগ করবেন? দাদা হয়তো রাগ করবে কিন্তু আপনি কি করবেন?

অহনা মুচকি হেসে বললো, দেবর বৌদির সম্পর্ক যখন তখন মজা তো চলতেই পারে। রাখো রাখো, কাঁধে কেন কোলে রাখো মাথা। ছেলেটা লালচে দাঁত বের করে হেসে উঠতেই চোখের নিমেষে অহনা ছেলেটার হাতটা ঘুরিয়ে ধরে বলল, মজা দেবরজি, জাস্ট ফান। ছেলেটা কঁকিয়ে উঠে বললো, উফ, লাগছে তো!

অহনা দাঁত চেপে বললো, কেন লাগছে কেন? তোদের মত শুয়োরের বাচ্চারাই ভোরের ট্রেনে, রাতের প্লাটফর্মে মেয়েদের রেপ করে যৌনাঙ্গের জোর দেখাস না, তো এখন জোর কোথায় গেল বে?

আরেকটা ছেলে এগিয়ে আসতেই জুতো সমেত পা দিয়ে সজোরে লাথি মারলো ছেলেটির গোপন অঙ্গে। সে কাতর হয়ে সিটের নিচে শুয়ে কাতরাতে লাগলো। অন্য ছেলেটার ততক্ষণে চুলের মুঠি ধরেছে অহনা, ছেলেটার মাথা সিটের পিছনে জোরে ঠুকে দিয়ে বললো, রোজ নিয়ম করে সোনাটাতে জাপানি তেল লাগাবি বুঝলি হারামজাদা? নাহলে এই লৎপতে শরীর নিয়ে ক্যালানি খেয়ে মরবি তো!

Sahitya Chayan

ট্রেনটা কোনো একটা অচেনা প্লাটফর্মে থামতেই ছেলেদুটো কোনোমতে অহনার হাত ছাড়িয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে নামলো। অহনা তখনও চেঁচিয়ে যাচ্ছে, শালা, ছবি তোলা হলো না তাই, নাহলে আগামীকাল জেলের ভাত গিলতিস। টিভির ব্রেকিং নিউজে ফেমাস করে দিতাম তোদের।

নৈঋত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে ছিল, যেন চোখের সামনে কোনো একটা হিন্দি মুভির সিন দেখছে। শুধু হিরোর পরিবর্তে হিরোইন, এটাই যে পার্থক্য। একটু আগেই এই মেয়েটা লাল রঙের বেনারসি আর নাকে বড় নথ পরে ওর সামনে এসে বলেছিল, নৈঋতবাবু প্লিজ হেল্প মি। আপনিই পারেন এই মুহূর্তে আমায় বাঁচাতে, যাহোক করে বিয়েটা ক্যানসেল করে দিন। আপনি পালান, তাহলেই ভেঙে যাবে বিয়েটা। হাত জোর করে বলেছিল, আমি নিরুপায় হয়ে বলছি কথাটা আপনাকে। নৈঋত অসহায় গলায় বলেছিল, পালাবো? কিন্তু আমি তো এখানে কিছুই চিনি না, কি ভাবে পালাব? আর হঠাৎ আপনারই বা কি হলো, কিছুই তো বুঝতে পারছি না আমি। বিয়ের তো আর মাত্র দু-মিনিট বাকি, আমায় ড্রেস চেঞ্জ করতে বললো, এখন বলছেন পালাতে? আর ইউ ক্রেজি?

অহনা প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেছিল, এছাড়া আমার উপায় নেই। আমি এই বিয়েটা করতে পারছি না।

প্লিজ, হেল্প মি নৈঋতবাবু। কাঁদো কাঁদো অসহায় অহনার মুখের দিকে তাকিয়ে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না

Sahitya Chayan

করেই নৈঋত বলেছিল, পালাবো কি করে? অহনা কাউকে একটা কল করে বলেছিল, স্কুটি নিয়ে আমার ব্যালকনির পিছনে আয়, এখুনি বেরোবে ধুতি পরে, সোজা স্টেশনে দিয়ে আসবি।

নৈঋত শুধু পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিয়ে নিজের ওয়ালেট আর মোবাইলটার উপস্থিতি বোঝার সময়টুকুই পেয়েছিলো। তারমধ্যেই অহনা আতঙ্কিত মুখে বলেছিল, এই ব্যালকনি দিয়ে আসুন, ওই যে হলদে টিশার্ট পরা ছেলেটা স্কুটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, উঠে পড়ুন। দেরি করবেন না প্লিজ, আমি রিয়েলি গ্রেটফুল আপনার কাছে। তখনও অহনার চোখের অসহায় দৃষ্টি নৈঋতকে চালনা করেছিল। মনে মনে ভেবেছিল, আহা মেয়েটা কতটা অসহায় অবস্থায় পড়ে এমন একটা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছে, এমন এক অবলা নারীকে এই মুহূর্তে সাহায্য করাটা পুরুষ হয়ে নৈঋতের কর্তব্য।

কি কি যেন ভেবেছিল নৈঋত অহনা সম্পর্কে? অসহায়, অবলা, পরিস্থিতির শিকার! এসব কোনো কথাই প্রযোজ্য নয় এই মেয়ের জন্য। কি সব মুখের ভাষা? জাপানি তেল, ক্যালানি...আরও কিসব যেন বলছিলো... ওহ শুয়োরের বাচ্চা! এসব শুনলে বসু পরিবারের সকলে একসঙ্গে হার্টফেল করতো নিশ্চিত। এই মেয়েকে বিয়ে করতে চলছিল নৈঋত? এত ফুলনদেবী টাইপ লেডি।

নৈঋত একটু ভয়ে ভয়েই বললো, বলছিলাম, ছোট থেকেই এমন মারধর করা অভ্যেস ছিল নাকি বড় হয়ে হয়েছে? আর এমন সব মার্জিত ভাষাই বা কবে শিখলে?

Sahitya Chayan

কথাটা উত্তেজনার বশে বলেই নৈঋত বললো, মানে এই অহনাকে আপনি বলা উচিত না তুমি সেটা এই মুহূর্তে বুঝতে পারছি না! তুমি বোধহয় বয়েসে আমায় জেঠুর বয়েসি নও, তাই তোমায় তুমিই বলি। পারমিশন নিয়ে নিলাম আগাম, কারণ এমন মারকুটে মেয়েকে আমি একটু ভয়ই পাচ্ছি।

অহনা লজ্জিত গলায় বলল, দুঃখিত। আসলে রিপোর্টারি করতে করতে এমন কিছু মানুষ দেখেছি যারা ভদ্রভাষার মানেই বোঝে না। তাই বাধ্য হয়ে স্ল্যাং ইউজ করতে হয়। আর মারামারি কিন্তু আমি শুরু করিনি, আমার গুরুর নিষেধ আছে, কখনো কাউকে অযথা আক্রমণ করবে না। শুধু আত্মরক্ষার জন্য বা অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্যই নিজের শিক্ষাকে কাজে লাগবে। আমিও তাই করেছি মাত্র। আর হ্যাঁ, তুমিই বেস্ট, আমিও স্বস্তি পাই তাহলে।

নৈঋত ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া গলায় বলল, গুরু মানে? কোন ডন নাকি? মা এ তুমি কাকে সিলেক্ট করেছিলে আমার জন্য?

অহনা মুচকি হেসে বললো, আমি মার্শাল আর্ট শিখেছি ক্লাস থ্রি থেকে এছাড়াও ক্যারাটের ব্ল্যাকবেল্ট। আমার গুরু শ্রী যোগেন মুখোপাধ্যায়। আমি ওনার খুব প্রিয় ছাত্রী ছিলাম। নৈঋত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, তুমি মার্শাল আর্ট জানো, ক্যারেটে কুং ফু জানো, এসব মা জানতো?

Sahitya Chayan

অহনা হেসে বললো, হ্যাঁ কাবেরী আন্টি সব জানতেন। ওনার সঙ্গে আমার পরিচয়ই তো হয়েছিল একজন পকেটমারকে পেটানো নিয়ে।

নৈঋত নরম গলায় বলল, তোমাকে আমি লাল বেনারসি আর ঘন কাজলে বেশ লাজুক অসহায় মনে করেছিলাম, এখন বুঝতে পারছি, ওটা আমার জীবনের সবথেকে বড় ভুল ছিল। মানে আমি, সেই তথাকথিত চূড়ান্ত শান্ত, ভদ্র নৈঋত বসু.. যে কিনা মুভিতে মারামারি দেখলেও চোখ চাপা দিই, তার বিয়ে হতে যাচ্ছিল ব্ল্যাক বেল্ট একজন মেয়ের সঙ্গে। একে ডেস্টিনি ছাড়া কি বলবো বলতো?

অহনা আনমনে বললো, আবার এটাও ডেস্টিনি, যে শেষ পর্যন্ত বিয়েটা হলো না। দুধে আলতায় পা দিয়ে বসু বাড়ির চৌকাঠ ডিঙানো আর আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। কাবেরী আন্টির মত লিবারেল শাশুড়ি পাওয়াও আমার কপালে নেই। এগুলোও তো ডেস্টিনি, তাই না? সঙ্গে আপনার মত অত্যন্ত ভদ্র একজন মানুষকে আমার মত রকবাজ মেয়ের সঙ্গে ঘর করতেও হলো না। কার কপাল ভালো বলবেন এক্ষেত্রে? আপনার না আমার? আমি হারালাম, আর আপনি বেঁচে গেলেন, তাই না?

নৈঋত আলতো করে বললো, ব্ল্যাকবেল্ট পাওয়া মেয়েরা যে মনটাও পড়তে পারবে এমন বোধহয় কোনো সংবিধানে লেখা নেই তাই না?

অহনা কথা ঘোরাবার জন্যই বললো, আপনার মা তো ছেলের প্রশংসা শুরু করেলে একটা জলজ্যান্ত মহাভারত

Sahitya Chayan

রচনা হয়ে যায়, তো শুনেছিলাম আপনি ভালো কবিতা লেখেন এবং বলেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তো আমরা নেমে যাবো, আপনার গুণের কদর করতেও পারবো না। হয়তো দেখা হবে না আর কোনোদিন, তখন আফসোস রয়ে যাবে। তার থেকে বরং একটা কবিতা শুনিয়ে দিন এই আনরোম্যান্টিক মারদাঙ্গা করা মেয়েটাকে!

নৈঋত দেখছিল অহনার চোখে হারানোর যন্ত্রণা। কিন্তু বিয়েটা তো ও স্বেচ্ছায় ভাঙলো, তাহলে?

প্রশ্নের পর প্রশ্নে নৈঋতের খাতার পাতা ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। অর্ধেকের উত্তরও নেই ওর কাছে। তাই মনের মধ্যে একটা ভারী বাতাস দমবন্ধ করে দিতে চাইছে ওর। এর চেয়ে বরং কবিতা শ্রেয়। অহনার প্রস্তাবটা মেনে নিয়ে বললো, বুঝতেই পারছো, মা বাড়িয়ে বলেছে, ভালো লিখি কিনা জানি না, তবে এলোমেলো লিখি। ওগুলোকে কবিতা না বলে শব্দগুচ্ছ বললে ওরাও নির্দ্বিধায় তোমার সামনে আসতে পারে আরকি! ওদের কবিতা বললে কৌলিন্য রক্ষার দায়ে নিজেদের আড়াল করে নেবে।

অহনা বললো, বেশ কথা বলেন তো আপনি। বেশ, শব্দগুচ্ছই বলুন তবে।

নৈঋত গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললো, স্বরচিত কিন্তু, ভুলত্রুটি মার্জনীয়।

'এমন একজন প্রেমিকা চাই, যে ভালোবাসবে ঘন অন্ধকারের মত, যার গভীরতা মাপা যাবে না।

যে অভিমান করবে স্বচ্ছ জলের মত।

Sahitya Chayan

অন্তর পর্যন্ত দেখতে পাবো খুব সহজেই।

এমন একজন প্রেমিকা চাই, যে হবে কুয়াশার মত।

তার প্রেমের জালে বাধা পড়বো ক্ষণে ক্ষণে।

যার ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ালেই মনে হবে, শরীর নয়, সে আমাকে নিঃস্ব করছে অপরিসীম ভালোবেসে।

এমন একজন প্রেমিকা চাই, যে পাহাড়ি খরস্রোতা ঝর্ণার মত চঞ্চল, যে স্রোতহীন নদীকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে অনায়াসে।

যার গায়ের গন্ধে জংলি বুনো ফুলের আবেশ জড়ানো থাকবে, বাগানের যত্নে লালিত নয়।

যার চোখের চাহনিতে থাকবে পর্বতের উদারতা।

এমন একজন প্রেমিকা চাই, যে ভালোবাসাকে বুঝবে ভালোবাসা দিয়েই।

এমন একজন প্রেমিকা চাই, যে হবে অগোছালো, কিন্তু আমায় গুছিয়ে নেবে নিজের মত করে।'

অহনা বেশ কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো নৈঋতের দিকে, ওর দৃঢ় চিবুকে ভালোবাসার হাতছানি, লোভ হচ্ছে অহনার, বড্ড লোভ। নৈঋতকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পাওয়ার লোভ কি? এসব কি ভাবছে অহনা, ওর সামনে অনেকটা পথ চলা বাকি। সেই পথের শেষে ঠিক কতটা অন্ধকার লুকিয়ে আছে সেটা এখনও জানে না অহনা। উজ্জ্বল সুখী সুখী দিনের টানে তাই ভাসতে পারছে না ও কিছুতেই। অহনা জানে, বাবা-মা ওর কাছ থেকে কিছু একটা লুকাচ্ছে, আর ওই লুকানোর জন্যই

Sahitya Chayan

ওদের দুজনের মধ্যে এখন তৈরি হয়েছে দূরত্ব। বাবার কাছ থেকে যেটুকু জানতে পেরেছে ও সেটুকুকে কেন্দ্র করেই এগোচ্ছে অহনা। জানেনা কি দেখবে শেষে, তাই ওর এই অনিশ্চিত জীবনের সঙ্গে কিছুতেই জড়াতে চায় না নৈঋতের মত সাদাসিধে ছেলেটাকে। নৈঋতের চোখের স্বচ্ছতাই বলে দিচ্ছে, মন আর মুখে ফারাক করতে এখনো শেখেনি ছেলেটা। ঠিক ওর বাবার মত। এমন একজন পুরুষকেই তো জীবনসঙ্গী হিসাবে কল্পনা করেছিল ও। তাকে পেয়েও হারালো নিজের ভাগ্যের দোষে। ওকে যারা চেনে তারা শুনলে হয়তো হাসবে, শেষ পর্যন্ত অহনা পাল ভাগ্য মানছে? টিভি রিপোর্টার অহনা, যে নাকি যুক্তি-তর্ক না করে কোনো সোজা কথাই বিশ্বাস করতে চায় না, সেই মেয়েটাই আজ ভাগ্যের দোহাই দিয়ে নিজের দোষস্খলন করতে চাইছে! কিন্তু মানতে বাধ্য হচ্ছে, নাহলে কেন ঠিক ওই সময়েই বিশেষ ওই খবরটা পেলো অহনা? আর আধঘণ্টা পরে এলেই তো বিয়েটা হয়ে যেত। তাই অহনা ভাগ্য নামক অতি অস্থির অবিবেচক বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে।

নৈঋত লাজুক গলায় বলল, সরি, তোমায় বোর করলাম। জানি ভালো লাগেনি। অন্যমনস্ক অহনার মনে পড়লো কবিতা শেষ হয়ে গেছে মিনিট দুয়েক আগেই। ও প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ না করেই ডুব দিয়েছিল নিজের ভাবনায়। নৈঋতের দিকে তাকিয়ে বলল, কাকে সামনে রেখে এমন একটা কবিতা লিখেছিলেন শুনি? নিজে তো

Sahitya Chayan

শান্ত নদীটি, অথচ প্রেমিকার বেলায় অশান্ত ঝর্ণা চেয়েছেন কেন?

নৈঋত লাজুক হেসে বললো, কাউকে সামনে রেখে নয়, এ আমায় কল্পনায় ছিল। ভাবতেও পারিনি সত্যিই এমন মেয়ে পৃথিবীতে আছে!

অহনা মুচকি হেসে বললো, তো দেখা পেলেন আপনার খরস্রোতা ঝর্ণার?

নৈঋত সাবধানে বললো, পেলাম তো। তাকে নিজের করে না পেলেও তার বুনো জংলি গন্ধটা আমার নাকে জ্বালা ধরিয়েছে এটা ঠিক। কেন এমন বিপরীতমুখী প্রেমিকা চেয়েছিলাম তাই জানতে চাইছো তো? সত্যি বলছি জানি না জানো। হয়তো নৈঋত বড্ড ভাল ছেলে, খুব ভদ্র, কারোর মুখের ওপর কথা বলে না, বসু পরিবারের আইডল ...ইত্যাদি প্রভৃতি শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম, অথবা কিছুতেই না খুলতে পারা ভালমানুষের ট্যাগটায় ভিতরে ভিতরে হাঁপিয়ে গিয়েছিলাম। তাই কল্পনায় নিজেকে বদলাতে অক্ষম হয়ে জীবনসঙ্গিনীকেই দায়িত্ব দিয়েছিলাম আমাকে স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে।

অহনা দুষ্টুমির ভরা গলায় বলল, ভাসতে চান অচেনা-অজানা জীবনে? সেখানে কিন্তু কমফোর্ট জোন নেই, বেরিয়ে আসার পথ নেই, শুধু দামাল স্রোতে ভেসে যাওয়া, জীবন যেদিকে নিয়ে যাবে প্রশ্ন না করে সেদিকেই এগিয়ে যাওয়া।

Sahitya Chayan

নৈঋত ভীতু গলায় বলল, আমি পারব না যে, শুধু শুধু বোঝা হবো না কারোর।

অহনা হেসে বললো, তাহলে সে আপনার কল্পনাতেই থাকুক ঘাপটি মেরে, বাস্তব বড় কঠিন ঠাঁই।

নৈঋত আনমনে বললো, কিন্তু সেই জংলি ফুলের বুনো গন্ধটা যে আমি আচমকাই পেলাম। মিষ্টতা নেই, তীব্র আকর্ষণ আছে সেই গন্ধে। সাহস থাকলে ওই গন্ধে ডুবিয়ে দিতাম নিজেকে।

অহনা বললো, এরপরেই সূর্যপুর, তার তিনটে স্টেশন পরে কালিয়াগঞ্জ। আমি সূর্যপুরে নামবো। বাবার কাছে আগে যাবো, তারপর কালিয়াগঞ্জ।

নৈঋত বললো, তোমার বাবা? মানে অনিরুদ্ধবাবু? উনি কলকাতার বাইরে থাকবেন শুনেছিলাম বিয়ের সময়। কি বিশেষ কাজে যেন বাইরে যেতে হবে ওনাকে, এমনই তো বলেছিলেন তোমার মা। উনি এখানে কি করছেন?

অহনার মুখটা মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল। নৈঋত শান্ত হতে পারে কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট সেটা ওর ভাবা উচিত ছিল। মা, বাবার নিজেদের ইগোর জন্যই বাবা উপস্থিত হতে চায়নি অহনার বিয়ের আসরে। এই গোপন তথ্যটা নতুন হবু আত্মীয়ের কাছে বেমালুম চেপে গিয়েছিল মা।

নৈঋতের চোখে মাকে মিথ্যেবাদী প্রমান করতে মন চাইলো না অহনার। মা আর যাইহোক অহনার যে সর্বান্তকরণে ভালো চায় সেটুকু পাগলেও বুঝবে। অহনা সামলে নিয়ে বললো, বাবা কাল মধ্যরাতে ফিরেছে,

Sahitya Chayan

এখানে আমাদের দেশের বাড়ি। তাই বিয়েতে থাকতে পারেনি, তবে রিসেপশনে বাবা যাবে আমায় কথা দিয়েছে।

নৈঋত করুণ হেসে বললো, অহনা রিসেপশনটা হলো না শেষ পর্যন্ত, তাই যাওয়ার প্রশ্নই নেই।

অহনা চোখ নিচু করে বললো, আপনি কি আমাদের দেশের বাড়িতে যাবেন? যদি না যান, আপনাকে হাওড়া যাওয়ার ট্রেনে তুলে দিয়ে তবেই আমি রওনা দেব।

নৈঋত কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমার বাবা জানেন, তুমি বিয়ের আসর ছেড়ে এখানে আসছ?

ঘাড়টা দুদিকে নেড়ে অহনা বললো, না জানে না, যদি না মা ফোন করে থাকে। বাড়িতে ঢোকার আগে বাবাকে কল করে জেনে নিতে হবে, ওই বাড়ির পজিশন এখন কি? তবেই যেতে পারবো ওখানে।

নৈঋত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত গলায় বলল, তোমায় পৌঁছে দিয়ে আমি ফিরবো। জানি, তুমি একা পারবে। আমার মত ভীরু মানুষকে তোমার দরকার নেই, তবুও নিজের প্রয়োজনেই তোমার সঙ্গে এটুকু পথ আমি যাবো।

অহনা ভয়ে ভয়ে বললো, প্লিজ থাকুন। বাবাকে একা ফেস করতে আমার ভয় করছে।

নৈঋত দেখছিলো, মারাত্মক সাহসী দামাল মেয়েটার চোখে অহেতুক ভয়ের ছায়া। বিশাল পর্বতের গায়ে মেঘেদের লুকোচুরি দেখার মতো এটাও বড়ই মিষ্টি লাগছিলো নৈঋতের। ওর কি ধীরে ধীরে অহনাকে ভালো লেগে যাচ্ছে? অদ্ভুত একটা টান অনুভব করছে কি? নিজের মনকে সাহস করে প্রশ্নটা করতে পারলো না

Sahitya Chayan
নৈঋত। যদি ওর বেইমান মন সায় দিয়ে বসে, সেই ভয়েই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করলো না ও! অহনা বললো, নামতে হবে চলুন।

অহনার হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে নৈঋত বললো, স্টেশনে সত্যিই কেউ দাঁড়িয়ে থাকবে না এই ভরসাতেই নামছি কিন্তু। অহনা একটু হেসে বললো, না থাকবে না। আমার এক্স, প্রেজেন্ট, ফিউচার কেউ থাকবে না, চলুন।

বুকের মধ্যে অচেনা অনুভূতির শিরশিরানি নিয়েই প্লাটফর্মে পা দিলো নৈঋত।

।।১৩।।

বাগানের ঘাস পরিষ্কার করতে করতে বিজু নিজের মনেই ভাবছিল, ভাগ্যের কি পরিহাস, কোথায় ছিল আর কোথায় আছে এখন। অনিরুদ্ধবাবু জানেন ও নেহাতই খেটে খাওয়া শ্রমিক ছিল, পকেটমার নয়। অতগুলো বছর একসঙ্গে থেকেও নিজের আসল পরিচয়টা কিছুতেই দিতে পারেনি বিজু। বিজয়চাঁদ মল্লিক খেটে খাওয়া শ্রমিক ছিলো না। ছিল বেশ অবস্থাপন্ন চাষীর ঘরের ছেলে। লেখাপড়ায় কোনোকালেই তেমন মন ছিল না বিজয়চাঁদের। ছোট থেকেই রাস্তাঘাটে যেখানেই গান হতো ও দাঁড়িয়ে পড়তো। একমনে তাকিয়ে থাকতো গায়কের দিকে। একদিন এক গানের শিক্ষকের সামনে পড়েছিলো বিজু। শিক্ষক এক ছাত্রকে বারবার শেখাচ্ছিলেন একটা সুর, ছাত্রটিও বারংবার ভুল করছিল। বিজু বগলে ফুটবল নিয়েই গানের স্কুলের জানালায় দাঁড়িয়েছিল আনমনে। গানের সুরই ওকে ফুটবলের মাঠ থেকে টেনে নিয়ে

Sahitya Chayan

গিয়েছিল অনিল মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির বারান্দায়। বিকেল পাঁচটায় বেশ কিছু ছেলে-মেয়ে মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে খাতা হাতে যেত গান শিখতে। বিজু একবার গুনগুন করে আব্দার করেছিল ওর গোঁয়ার জেদি বাবার কাছে। বাবা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল ছেলের শখকে। মা বোঝাতে গেলে বলেছিল, পাড়ার যাত্রায় সীতা সাজবে নাকি তোমার ছেলে, যে তাকে গান শিখতে হবে? পড়াশোনাটা একটু করুক তারপর আমাদের চলতি খোল-ভুষির দোকানে বসবে। হিসেবটা ভালো শিখলে ওখানে আমি সারের ব্যবসাও খুলে দেব। বিশাল দোকানের কাজ সামলাবে না গান নাচ করবে বিজুর মা? ওসব লোক হাসানো কথা তুমি বলতে এস না আমায়। মল্লিক বাড়ির ছেলেরা নিজেদের জমিতে চাষ করে, নিজেদের ট্রাক্টর চালায়, নিজেদের দোকানে বসে ব্যবসা বাড়ায়, গান গেয়ে ভিক্ষে করে না।

বাবার চোখে গায়কদের সামান্য ইজ্জত না দেখে হাল ছেড়ে দিয়েছিল বিজু। কারণ এযাবৎকাল দেখে আসছে বাবার মুখের ওপর কথা বলার সাহস ওর দাদু-ঠাকুমারও নেই। মল্লিকবাড়িতে গৌরচন্দ্র মল্লিকের কথাই শেষ কথা। তারপর থেকেই রাস্তায় বাউল থেকে ভিখারি যারই গান শুনেছে বিজু তাকেই পকেট থেকে খুচরো বের করে দিয়ে বলেছে, আরেকবার গানটা গেয়ে শোনাবেন?

গান শোনা যেন তার নেশা। নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারতো না ও এই নেশার থেকে। কেমন একটা ঘোর লেগে থাকতো ওর মনে। ওই ঘোরে ঘোরেই ফুটবলের মাঠ থেকে এসে দাঁড়াতো গানের মাস্টারের

Sahitya Chayan

দুয়ারে। ছেলেটা ভুল সুরে গান গাইতেই রেগে গিয়েছিলেন মাস্টারমশাই। ঠিক তখনই নিজের অবস্থানের কথা ভুলে গিয়ে সঠিক সুরে গানের লাইনগুলো জানলা থেকেই গেয়ে উঠেছিলো বিজয়চাঁদ। মাস্টারমশাই চমকে উঠে বলেছিলেন, কে রে বাইরে? আয় ভিতরে আয় শিগগির। ভয়ে ভয়েই ভিতরে ঢুকেছিলো ও। অনিল মাস্টার স্বস্নেহে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, তুই তো মল্লিকদের ছেলে, এ পাড়ায় কার কাছে গান শিখিস তুই?

বিজয়চাঁদ ঘাড় নেড়ে বলেছিল, গান তো শিখি না আমি। বাবা শিখতে দেয় না। মাস্টারমশাইয়ের চোখে অবিশ্বাসী দৃষ্টি দেখেছিলো বিজু। মাস্টারমশাই হারমোনিয়ামটা এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, এই গানটা গেয়ে দেখা দিকি, কেমন পারিস। বিজু মাথা নিচু করে বলেছিল, আমি তো হারমোনিয়াম বাজাতে জানি না, তবে গানটা গাইতে পারবো। মাস্টারমশাই অবিশ্বাস্য ঘটনা আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠে বলেছিলেন, বেশ ধর তবে....

ওহে তবলিয়া বাজাও দেখি..

হারমোনিয়ামের রিড বেজে উঠতেই বিজু গেয়ে উঠেছিলো, আকাশ প্রদীপ জ্বলে দূরের তারার পানে চেয়ে....বয়ে চলে আঁধি আর রাত্রি...আমি চলি দিশাহীন যাত্রী...

বিজু গান শেষ করেই দেখেছিলো মাস্টারমশাইয়ের চোখে জল। ভয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে বলেছিল, ক্ষমা করবেন স্যার, বড্ড সাহস দেখিয়ে ফেললাম। স্যার তখন পাঞ্জাবীর হাতায় চোখের জল মুছে বলেছিলেন, সাহস কি

Sahitya Chayan

রে, এ যে দুঃসাহস! আর তুই দুঃসাহস দেখাবি না তো দেখাবে কে রে? তোকে যে বীণাপাণি নিজের হাতে গড়েছেন রে বিজয়চাঁদ। সংগীতই তোর সাধনা হোক আজ থেকে। বিজু মুখ নিচু করে বলেছিল, কিন্তু বাবা যে বলেছে মল্লিকবাড়ির কেউ গান শেখে না, সবাই চাষ করে না হয় ব্যবসা করে। অনিল স্যার হো হো করে দরাজ গলায় হেসে বলেছিলেন, বেশ বেশ মল্লিকবাড়ির বিজয়চাঁদ মল্লিক না হয় একটু অন্য পথেই চললো জীবনে, তাতে কারোর তেমন কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। ক্লাস সিক্সের বিজু বাড়ির সকলকে লুকিয়ে সপ্তাহে তিনদিন আসতো অনিল স্যারের বাড়িতে। যেহেতু বাড়িতে হারমোনিয়াম ছিল না, তাই স্যারের বাড়িতে এসে গান শিখত। অনিল স্যারের ক্লাস ফোরের ছোট মেয়ে হাঁ করে বসে থাকতো বিজুর হারমনিয়ামের সামনে। আর মুখের দিকে তাকিয়ে বলতো, খুব ভালো গান। স্যার মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলতেন, তুই শিখবি? তোর দিদি, দাদা কাউকে তো শেখাতেই পারলাম না, তুই শিখবি দীপা?

দীপা আর বিজু একসঙ্গেই বড় হয়ে উঠছিল। বিজয়চাঁদের গলায় সুর ছিল, আঙুলে তাল ছিল কিন্তু মাথায় বুদ্ধি ছিল না। তাই বুঝতে পারেনি ক্লাস টেনের দীপা কেন ওকে দেখলেই লজ্জায় বাগানের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। কেন ও গানের ক্লাসে ঢোকার আগে খুব সুন্দর করে গুছিয়ে রাখে রঙিন শতরঞ্জি খানা। অনিল স্যারের বয়েস কালের মেয়ে দীপা। দীপার এক দাদা চাকরি সূত্রে বাইরে গিয়েছিল, সে আর বাড়ি ফেরেনি,

Sahitya Chayan

সেখানেই বিয়ে করে সংসার পেতেছিলো। দীপার দিদির বেশ বড় ঘরেই বিয়ে দিয়েছিলেন স্যার, কিন্তু বড়লোকের বউ হয়ে ওর দিদিও ভুলেছিলো বাবা-মাকে। স্যারের গানের স্কুলে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই মাইনে দিতো না। যে কজন দিত, তাই নিয়েই স্যার সুখী ছিলেন। বিজয়ের খারাপ লাগতো বিনা মাইনেতে গান শিখতে। বিশেষ করে ওদের অবস্থা যেখানে স্যারের থেকে যথেষ্ট স্বচ্ছল সেখানে এ হেন সুযোগ নিতে ওর বড্ড অস্বস্তি লাগতো। তাই নিজের হাত খরচের টাকা বাঁচিয়ে দীপার হাতে দিয়ে বলতো, স্যারের দক্ষিণা দেবার ক্ষমতা আমার নেই, এটা তুমি রাখো, স্যারকে বিস্কুট, চা কিনে খাইও। দীপা কোনো সংকোচ না করেই বলতো, বিজুদা, মা বলে তুমি তো আমাদের ঘরের ছেলে, তোমার কাছে দরকারে সাহায্য নিতে অসুবিধে কোথায়? শোনো না বিজুদা, আমাদের স্কুলের সব মেয়েরা নীল পাড়ের ওপরে কলকা ডিজাইনের একটা নতুন শাড়ি কিনেছে প্রতিভা ক্লথ থেকে। অমন শাড়ির আমারও একটা বড় শখ। অনেক দাম বলে বাবা কিনে দিলো না। বিজু হেসে বলেছিল, কত দাম?

দীপা সংকোচের সঙ্গে বলেছিল, তা প্রায় দেড়শো টাকা মত। বিজু তারপর ফুটবল কিনবে, খাতা কিনবে, পেন কিনবে বলে বাবা-কাকু সকলের কাছে থেকে টাকা চেয়ে চেয়ে জমিয়েছিল দেড়শো টাকা। তারপর একদিন প্রতিভা ক্লথে গিয়ে কিনে এনেছিল দীপার স্কুলের কলকা ডিজাইনের একটা শাড়ি। দীপা শাড়িটা হাতে পেয়ে কেঁদে

Sahitya Chayan

ফেলেছিল। আর গোলাপি ঠোঁট দুটো নেড়ে বলেছিল, আমায় নিয়ে যাবে তোমাদের বাড়ি?

বিজু খুব স্বাভাবিকভাবেই বলেছিল, তুমি যাবে আমাদের বাড়ি? বেশ কাল বিকেলে এসে নিয়ে যাবো তোমায়। দীপা হেসে বলেছিল, বুদ্ধুরাম। নিজের চুলগুলো এলোমেলো করে বুদ্ধুরাম শব্দের অর্থ খুঁজতে খুঁজতেই বাড়ি ফিরেছিল বিজু। আর ঢুকেই শুনেছিল, বাবা বলছে এই তো বিজু উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে যাবে সামনের মাসেই, তারপর আর কষ্ট করে কলেজে যেতে হবে না। ওর যা লেখাপড়ার বহর, তাতে জজ ম্যাজিস্ট্রেট যে হবে না সে আমরা সবাই জানি। মল্লিকবাড়ির কেউই কলেজের ডিগ্রি পায়নি, তাই ও নিয়ে বেশি ভাবিও না। বরং খোল-ভুষির দোকানটাকেই আমি বাড়িয়ে সারের দোকান করে দিচ্ছি, ওটাই সামলাবে বিজু। দু-হাতে টাকা ইনকাম করবে। বছর দুয়েক পরে বিয়ে দিয়ে দেব, তাহলেই এই বাউন্ডুলে স্বভাবটা যাবে। পড়ায় যে বিশেষ আগ্রহ বিজয়চাঁদের ছিল তেমন নয়, তবে গান যে তার প্রাণ। স্কুলের, টিউশনির নাম করে গান শেখার কি হবে! দোকানে বসে টাকা গুনেই তার মানে কাটবে ওর জীবন। তবে রোজগার করলে সেই টাকায় একটা হারমোনিয়াম তো কেনাই যাবে। অনিল স্যার বলেছেন, তোকে আমার সবটা প্রায় দান করে দিয়েছি রে বিজয়। এখন শুধু প্র্যাকটিসের দরকার। আমার কাছে আর কিছুই নেই তোকে শেখানোর। স্যারের বয়েস বেড়েছে, ইদানিং হাঁপিয়ে যান বড্ড। মাঝে মাঝেই স্যারের গানের স্কুলের

Sahitya Chayan

ছাত্রছাত্রীদের বিজয়ই শিখিয়ে দেয়। স্যার পাশে বসে হাসেন।

দীপা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবার আগে আগেই ওকে একদল পাত্র দেখতে এসেছিল। বাবার বয়েস বাড়ছে, তাই মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে যেতে চান ওপরে। এদিকে বিজয়েরও স্যারের বাড়ি যাওয়া কমেছে। সে এখন পুরোপুরি ব্যবসাদার। বছর দুয়েক হলো ব্যবসায় বসছে। গানের নেশাও কিছুটা হলে কেটেছে, সময় পায় না খুব একটা। সেদিন দুপুরে দোকান বন্ধ করে ফিরছিল সাইকেল নিয়ে। দীপা পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল। ওকে দেখেই সাইকেল থেকে নেমেছিল বিজু। হাসিমুখে বলেছিল, কি হলো? কিছু চাই? শাড়ি পছন্দ হয়েছে বুঝি?

দীপা মাঝে মাঝেই শাড়ি, ব্লাউজ, কাঁচের চুড়ির বায়না ধরতো, তাই স্বাভাবিক গলাতেই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছিল বিজয়। কিন্তু কেন কে জানে দীপা অগ্নিমূর্তি ধরে বলেছিল, আর জীবনেও যেন তোমার মুখ না দেখি, কোনোদিন আসবে না আমাদের বাড়িতে। আমার বিয়ে ঠিক করছে বাবা, জানো নিশ্চয়ই।

বিজয় অবাক হয়ে বলছিলো, তোমার বিয়েতে সব থেকে বেশি কাজ তো আমাকেই করতে হবে দীপা, স্যার তো বললেন সেদিন। স্যারের তো বয়েস হয়েছে।

দীপা রেগে গিয়ে বলেছিল, যে মানুষ মনের খবর নিলো না, বুঝলো না মনের কথা, সে কি করবে আমার বিয়ের কাজ!

Sahitya Chayan

বিজয়ের মোটা মাথায় এতদিনে ঢুকেছিলো দীপার সেই ছোট থেকে সব আচরণের মানে। শুধু ওর কাছেই আব্দার, ওকে দেখে লজ্জা পাওয়া, নতুন পোশাক পরে ওকে দেখানোর অপেক্ষায় ছটফট করা, নতুন গান তুলে ওকেই শোনানো...সবকিছুর অর্থ, সঙ্গে এই আজকের রাগের মানেও বুঝেছিলো। ফিরে যেতে উদ্যত দীপার হাতটা টেনে ধরে বলেছিল, মাস্টারমশাইকে বলি, আমাদের বাড়িতে তার ছোট মেয়ের সম্বন্ধ নিয়ে যেতে। কি বলো? তোমার কি আপত্তি আছে দীপা?

দীপার ঠোঁটের কোণে আচমকা খুশির ঝলক আর চোখের কোণে এক বিন্দু জলই বুঝিয়ে দিয়েছিল সে কি চাইছে।

বাড়িতে ঢুকে মায়ের কাছেই প্রথম বলেছিল বিজু দীপাকে বিয়ে করার কথাটা। মা একটু থমকে বলেছিল, ওই গানের মাস্টারের মেয়েটা? তা মন্দ কি! বেশ দেখতে, মাস্টাররা তো আমাদের থেকে উঁচু জাতের, তো বিয়ে দেবে তোর সঙ্গে? বিজু লাজুক গলায় বলেছিল, মাস্টারমশাই আসবেন সম্বন্ধ নিয়ে। মা হেসে বলেছিল, বেশ তোর বাবাকে বলবো আজকেই।

মাস্টারমশাই এসেছিলেন ওদের বাড়িতে। কিন্তু ওর বাবা অনেকটা বর পন চেয়েছিল। লজ্জায় মাথা নিচু করেছিল বিজু। বাবার মুখের ওপর কথা বলার সাহস জোগাতে পারেনি তখন।

মাস্টারমশাই কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছিলেন, এটাই আমার শেষ কাজ, যতটুকু পারবো আপ্রাণ চেষ্টা করবো।

Sahitya Chayan

চোখের জলই ওকে গ্রামছাড়া করেছিল। শহরের কারখানায় কাজ নিয়েছিল বিজু। ঘর ছেড়ে মেসে থাকতো। শ্রমিকদের সঙ্গে কাজে যেত। যখন ইচ্ছে গান গেয়ে উঠতো। এভাবেই কাটিয়ে দিয়েছিল অনেকগুলো বছর।

তারপরেই ঘটনাচক্রে ভাসতে ভাসতে পৌঁছেছিল এই সূর্যপুরে। অনিরুদ্ধবাবুর মত ভালো মানুষ পেয়ে মন বসে গিয়েছিল এই সবুজঘেরা বাড়িটাতে। বিজুর এই বেরঙিন জীবনে গোলাপের বাগানটাই একমুঠো রং জোগান দিয়ে যায় অনবরত। তাই এদের নিয়েই বেশ মেতে থাকে ও। এসব কথা ও কাউকেই কোনোদিন বলেনি। আজ অনিরুদ্ধবাবু বললেন, তোমার জীবনের ঘটনা বলো বিজু, কাগজে ছাপাবো। তাই বোধহয় বহু পুরানো ধূসর হয়ে যাওয়া স্মৃতিরা সবাই মিলে ভিড় করে এলো দৃষ্টিপথে।

কলে হাত ধুয়ে বাগান থেকে উঠতে যাচ্ছিল বিজু, চোখে পড়লো গেটের গ্রিলের কাছে একটা অতি পরিচিত মুখ। একটু চমকে উঠলো বিজু, এসময় তো ওর আসার কথা নয়!

।।১৪।।

কাবেরীর ফোনটা ভাইব্রেট করছে, সুচেতা কলিং....

কোন মুখে অহনার মায়ের ফোনটা ধরবে কাবেরী, সেটাই তো বুঝতে পারছে না। টুটাইয়ের পালানোর পর ওদের সম্মুখীন হতেই তো লজ্জা করছে ওর। কিন্তু ফোনটা না ধরাটা আরও বেশি অভদ্রতা হবে বোধহয়। কাবেরীরই উচিত ছিল ফোন করে সুচেতার কাছে ক্ষমা চাওয়া। লজ্জায় আর সংকোচে সেটা করে উঠতে পারেনি

Sahitya Chayan

এখনও। তাছাড়া একটু পরেই নিমন্ত্রিতরা চলে আসবে, তখন কিভাবে সম্মুখীন হবে তাদের। বাকি নিমন্ত্রণের লিস্টটা দেখে দেখে ফোনে সকলকে বারণ করতে হবে, ক্যাটারারদের বারণ করতে হবে। নীলাদ্রি অন্ধকার ঘরে ইজি চেয়ারে বসে আছে মুখ লুকিয়ে। কাবেরীকে কেন বিশ্বাস করেছিল এটাই হয়তো ভাবছে এই মুহূর্তে। টুটাইয়ের জন্য ওর উঁচু মাথাটা আজ মাটিতে মিশে যাবে, ভেবেই ছেলের ওপরে রাগটা আরও বেড়ে গেলো। এদিকে শুভ আবার অন্য একটা ভয় ধরিয়ে দিয়েছে, সেই নিয়েও মনটা ভারাক্রান্ত। শুভ বলছে, টুটাইয়ের নিশ্চয়ই কোনো বিপদ হয়েছে, যদিও নীলাদ্রি এটা মানতেই চাইছে না। নীলাদ্রির বক্তব্য হলো, কাবেরীর চাপে পড়ে টুটাই বিয়েটা করতে গিয়েছিল, তাই সুযোগ বুঝে পালিয়েছে। নীলাদ্রির কথা কাবেরীর বিশ্বাস হচ্ছে না। বরং শুভর কথায় যুক্তি আছে অনেকটা। অনু বললো, বৌদিভাই, সকলে তো আসতে শুরু করবে একটু বেলা হলেই, কি করবে? ফোনে বারণ করবে? আমার মনেহয় সেটা অনেক সম্মানের হবে। লোকজন বাড়ি বয়ে ইনসাল্ট করে যাওয়ার থেকে। কাবেরী শুভর দিকে তাকিয়ে বলল, প্লিজ শুভ, তোমার দাদার কাছ থেকে নিমন্ত্রণের লিস্ট আর ফোন নম্বরগুলো কালেক্ট করে যতটা পারো ফোন করার চেষ্টা করো। আমার মাথা কাজ করছে না, কি বলতে কি বলবো বুঝতেও পারছি না। অনু কাবেরীর মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, বৌদিভাই, সবই আমাদের কপাল বুঝলে। একমাত্র ভাইপোর বিয়েতে কত আনন্দ করবো প্ল্যান

Sahitya Chayan

করেছিলাম, এখন তো শ্বশুর বাড়ির লোকজনের কাছে মুখ দেখানো দায় হয়ে উঠবে। ওরা তো শুধু সুযোগ খোঁজে। বাইরে থাকি বলে এমনিতেই অনেক কথা শুনতে হয়, তারপর বাপের বাড়ির এমন কেচ্ছা পেলে ও বাড়ির লোকজন ছেড়ে কথা বলবে ভেবেছো। কি যে হলো, টুটাই যে কেন ফোনটা সুইচ অফ করে রেখেছে কে জানে! ওর একটা খবর পেলেও নিশ্চিন্ত হতাম একটু। অনু নিজের মনেই বিজবিজ করছে। কাবেরী কানে অর্ধেক ঢুকছে অর্ধেক মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ফোনটা আবার বাজছে দেখে বাধ্য হয়ে রিসিভ করলো কাবেরী। সুচেতার ম্রিয়মাণ গলাটা ভেসে এলো, কাবেরীদি নৈঋত কি বাড়ি পৌঁছেছে? তাহলে একটু কথা বলতাম ওর সঙ্গে। পারলে আমাদের ক্ষমা করবেন আপনারা।

কাবেরী চমকে গেছে, ক্ষোভে, দুঃখে কি সুচেতার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল নাকি! ওদের কাছে ক্ষমা চাইছে? অহনাকে আর ওর পরিবারকে রীতিমতো অপমান করে, মেয়েটাকে লগ্নভ্রষ্টা করে টুটাই পালিয়ে গেল, আর সুচেতা নৈঋতের খবর নিচ্ছে? আর কেউ না জানলেও কাবেরী জানে অহনার মত মেয়ের সঙ্গে যাই ঘটে যাক ওর নামের আগে পিছে কিছু শব্দ বসতেই ভয় পাবে। যেমন অপয়া, লগ্নভ্রষ্টা, অলুক্ষণে....ইত্যাদি বিশেষণগুলো অহনা নামক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কোনোদিন কোনোমুহূর্তেই খাপ খায় না। তাই টুটাই পালিয়ে এলেও অহনা যে বিশেষ ভেঙে পড়েনি এটা কাবেরী জানে। নরম সরম মেয়েলি স্বভাবটা অহনার মধ্যে নেই, তাই ঘর বন্ধ করে কাঁদবে না

Sahitya Chayan

আর নিজের ভাগ্যকে দোষারোপও করবে না। সুচেতা হয়তো একটু ভেঙে পড়বে, যতই হোক মা তো! তাছাড়া বিয়েটা হচ্ছিল ওদের গ্রামের বাড়ি থেকে। যাদবপুরের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেই যদি এত ফিসফিস হয় তাহলে রাইগঞ্জে যে তার এফেক্ট ভালো মত পড়বে সেটা বেশ বুঝতে পারছে কাবেরী। অনুও বলছিলো,ওখানের লোকজন নাকি বলছিলো, বিয়ের সব খরচ পাত্রপক্ষের কাছ থেকে উসুল করা উচিত। সুচেতাই নাকি জোর গলায় বলেছে, ক্ষতি নৈঋতদেরও কিছু কম হয়নি, আমরা কি ভিখারি নাকি যে ওদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ নেব! কাবেরী ওটা শুনেই মনে মনে বলেছিল, অহনার মা যে এমন হবে সেটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। যদিও সুচেতা বলেছিল, অহনার মধ্যে নাকি ওর বাবার প্রভাবই বেশি। অনিরুদ্ধ পালের সঙ্গে ওই একবারই দেখা হয়েছিল কাবেরীর। ভদ্রলোক বেশ গম্ভীর টাইপ। তবে অত্যন্ত ভদ্র। অত বড় একজন সাংবাদিক হয়েও মাটির কাছাকাছি। নীলাদ্রিরও বেশ ভাল লেগেছিলো ভদ্রলোককে। কাবেরী কাঁপা গলায় বলল, একি বলছো সুচেতা, তোমরা ক্ষমা চাইছো কেন? টুটাই আজ যা করলো তাতে আমি হয়তো আর কখনো অহনার সম্মুখীন হতেই পারবো না। অমন মিষ্টি মেয়েটাকে নিজের ঘরে আনতে চেয়েছিলাম, এটাই বোধহয় ভগবানের সহ্য হলো না। তবে বিশ্বাস করো সুচেতা, আমি মা হিসাবে বলছি, টুটাইয়ের কোনো গোপন অ্যাফেয়ারের কথা আমি আজ অবধি শুনিনি। এমনকি অহনার ছবি দেখিয়েও বলেছিলাম, তোর যদি কাউকে

Sahitya Chayan
পছন্দ হয় তাহলে বলতে পারিস নির্দ্বিধায়। তখনও বলেছিল, মা তোমার পছন্দ খারাপ কেন হবে। অহনাকে আমার খারাপ তো লাগেনি, বেশ ভালো। তুমিই বলো সুচেতা, এরপর আর অবিশ্বাস করি কি করে? এ তো আমাদের যুগ নয়, যে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেবে। এখনকার যুগের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে জুতোর ফিতের রং থেকে মাথার চুলের রং অবধি অত্যন্ত ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে পছন্দ করে, কেউ ওদের কিছু জোর করে গছিয়ে দিতে পারে না। চব্বিশঘণ্টা পার্সোনাল লাইফে ইন্টারফেয়ার না করার জ্ঞান দিয়ে দিয়ে জেরবার করে দেয়, তারা কিনা জীবনসঙ্গী বাছার সময় মায়ের পছন্দ মুখ বুজে মেনে নেবে? এটা কি মানা সম্ভব? লাইফ পার্টনার বদলাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে, লিভ ইন করছে, ব্রেকআপের হুজুগে ভাসছে সব, তারা নাকি আমার কথায় জোর করে বিয়ে করতে গিয়েছিল, এটা মানতে হবে আমায়? সুচেতা, টুটাই এখনো বাড়িতে ফেরেনি, ফোনের সুইচ অফ। তাই আসলে যে ঠিক কি ঘটেছিলো আমি এখনো বুঝতে পারছি না গো। আমি জাস্ট হেল্পলেস।

সুচেতার গলাটা ধরে এলো মনে হয়। নাক টানার একটা আওয়াজ পাওয়া গেলো। কাবেরী বলল, অহনা কি করছে গো? জানি জিজ্ঞেস করার মুখ নেই আমার, তবুও নির্লজ্জের মতই জানতে চাইছি।

সুচেতা ধীর গলায় বলল, অহনা বাড়িতে নেই। নৈঋত চলে যাবার ঘণ্টা খানেক পর অবধি দেখেছিলাম তাকে, নিজের ঘরে ছিল। তারপর দরজা খুলে দেখি, বেনারসি

Sahitya Chayan

মাটিতে ছড়ানো, গহনাগুলো খুলে রাখা, মেয়ে ঘরে নেই। ঠিক কোথায় গেছে বলে যায়নি। তারও ফোন অফ, তাই কোনো খোঁজ পাইনি। নৈঋত ফিরলে একটু জানিও প্লিজ, অহনা কি তাকে কিছু বলেছিল? নাকি নৈঋত কিছু বলেছিল? এত ধোঁয়াশা লাগছে বিষয়টা যে এখন বিয়ের চিন্তা ছেড়ে ছেলেমেয়েগুলোর জন্য টেনশন হচ্ছে কাবেরীদি। কাবেরীর হাত থেকে আরেকটু হলেই ফোনটা পড়ে যাচ্ছিল, কোনোমতে সামলে নিয়ে বললো, মানে? অহনা বাড়িতে নেই? কোথায় গেছে অত রাতে?

আরেকটা কথা বলতো সুচেতা, টুটাই তো তোমাদের ওই রাইগঞ্জে গেল এই প্রথমবার, ওর তো রাস্তাঘাট চেনারও কথা নয়, ও প্রাইভেট কার ছাড়া ট্রেনে বাসে একেবারেই স্বচ্ছন্দ ফিল করে না, তাহলে ঐ অপরিচিত জায়গা থেকে রাতের অন্ধকারে পালালো কি করে?

সুচেতা প্লিজ, চুপ করে থেকো না, আমার এবারে সত্যিই খুব টেনশন হচ্ছে।

সুচেতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আমি এখনো কিছুই বুঝতে পারছি না। অহনার খবর পেলে তোমায় জানাবো, তুমিও নৈঋতের কোনো খবর পেলে প্লিজ জানিও। সুচেতা ফোনটা রেখে দিল।

কাবেরীর দ্বিতীয় দফায় সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল। এতক্ষণ ও শুধু ভাবছিলো টুটাই পালিয়েছে বিয়ের আসর থেকে, কিন্তু এখন তো শুনলো টুটাইয়ের চলে যাবার পরে অহনাও নাকি চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে।

Sahitya Chayan

যা কোনোদিন করেনি কাবেরী সেটা করবে ভেবে এগোলো টুটাইয়ের ঘরের দিকে। ওর ল্যাপটপ, বইপত্র সব ঘেঁটে দেখতে হবে, কোনো লুকানো ফাইল আছে কিনা সেটাও দেখতে হবে কাবেরীকে। দু-পা এগিয়েই ভাবলো, তাহলে কি শুভর কথাই ঠিক? অহনার সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেই বিয়ের আসর ছেড়েছে টুটাই?

হনহন করে টুটাইয়ের ঘরের দিকে এগোলো কাবেরী।

ওর ল্যাপটপ অন করলো, আজকাল আবার পাসওয়ার্ড দেওয়ার ঘটা হয়েছে সকলের। কি যে এত লুকোনোর প্রবণতা কে জানে! ওর বা নীলাদ্রির ফোনে তো কখনো পাসওয়ার্ডের প্রয়োজন হয়নি। ওরা কেউই কারোর ফোন ঘাঁটার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি কখনো, মিনিমাম শিক্ষাদীক্ষা থাকলে কেউ কারোর পার্সোনাল ফোন বা পার্স ঘাঁটে না। সেটুকু যাদের নেই, তাদের ধর্তব্যের মধ্যে ধরে না কাবেরী। আজ নিজেকে চূড়ান্ত অশিক্ষিত আর ব্যর্থ মনে হচ্ছে, তাই টুটাইয়ের অনুপস্থিতিতে ওর ঘর খুঁজতে এসেছে। ল্যাপটপ অন করতেই একটা মেয়ের নীলচে ওড়না উড়ছের ছবি স্পষ্ট হলো গোটা স্ক্রিন জুড়ে। পাসওয়ার্ড নেই বলেই, এটা ওটা ক্লিক করল কাবেরী। কাবেরী আর নীলের সঙ্গে টুটাইয়ের বেশ কিছু জয়েন্ট ফটো আছে একটা ফোল্ডারে। সঙ্গে ওই মেয়েটার বেশ কিছু ছবি। মেয়েটার পোশাক-আশাক মোটেও ভদ্র নয়। চাউনিটাও যেন কেমন, সাজগোজ বড্ড উগ্র টাইপ, তবে ফিগারটা দুর্দান্ত। তাহলে কি এই মেয়েটার জন্যই নৈঋত পালালো? এই ধরনের আল্ট্রামর্ডান মেয়ের সঙ্গে কাবেরী

Sahitya Chayan

বা নীলাদ্রি কেউই বিয়ে দিতে চাইবে না বুঝেই চুপ করে ছিলো এতদিন?

মেয়েটার ছবির নিচে আবার দু-লাইন লেখাও আছে। তুঝে ইতনা ম্যা পেয়ার করো, রাব ভি সরমা যায়ে।

ছি ছি, টুটাই এভাবে ঠকালো কাবেরীকে। এই কথাগুলো যদি আগে বলতো, তাহলে অহনার ফ্যামিলিকে বিপদে ফেলতো না ও। এখন বুঝতে পারছে টুটাই ওভাবে পালিয়ে গেছে দেখেই অহনা বাধ্য হয়েছে বাড়ি ছাড়তে। বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হবে না বলেই বাধ্য হয়ে বাড়ি থেকে চলে গেছে অহনা। মেয়েটার বড় বড় সরল চোখ দুটো মনে পড়ে গেলো কাবেরীর। ছেলেটার রুচিটা যে এমন তা তো আগে বুঝতে পারেনি। মেয়েটা বোধহয় কলেজের কোনো ছাত্রী। অন্তত বয়েস দেখে তাই মনে হচ্ছে। নীলাদ্রিকে একবার ডেকে দেখানো উচিত টুটাইয়ের কাণ্ডটা। খুব বলছিলো না, অহনার মত ডেসপারেট মেয়ে নাকি টুটাইয়ের জন্য একেবারেই মিসম্যাচ, তাই টুটাই পালিয়েছে। অহনা স্মার্ট, স্বাবলম্বী, প্রতিবাদী কিন্তু এমন উগ্র নয়। এই মেয়ের যা পোশাক দেখছে কাবেরী তাতে একে যে টুটাই পছন্দ করতে পারে সেটাই তো ভাবতে পারছে না। সাদাসিধে ছিল ছেলেটা, কলেজের এই সবজান্তা মেয়েগুলোর পাল্লায় পড়েই এমন বিগড়ে গেল বোধহয়। নীলাদ্রি শুনলেই বলবে, তোমার ছেলে কচি খোকা নয়, অন্যকে দোষ দেওয়ার আগে ছেলের বয়েসটাও ভেবো। একজন কলেজের প্রফেসর যদি এমন বিহেভ করে তাহলে ছাত্র, ছাত্রীরা কি শিখবে শুনি?

Sahitya Chayan

নীলাদ্রির ঘরের দিকে চুপি চুপি পা বাড়ালো কাবেরী। লম্বা বারান্দায় অনেকেই বসে আছে, সকলের মুখেই কৌতূহলী প্রশ্ন। কাবেরীকে দেখে ফিরে আসা বরযাত্রীর দল চুপ করে গেল। ফিসফিস যে চলবে সে ব্যাপারে ও নিশ্চিত। নীলাদ্রির সম্পর্কে দিদি জিজ্ঞেস করলেন, কাবেরী, টুটাইয়ের কোনো খবর পাওয়া গেলো রে? ছেলেটা কোথায় গেল বলতো? কাবেরী বাধ্য হয়ে ঘাড় নেড়ে বললো, এখনো খবর পাইনি।

রিনাদি মুখের ভাঁজে দুশ্চিন্তা ছড়িয়ে বললেন, এবারে বোধহয় পুলিশে খবর দেওয়া উচিত। এখন তো কি সব ফোন ট্র্যাক করে পুলিশ বলে দেয় যে মানুষটা কোথায় আছে! একবার নীলকে বলে দেখ, যদি কিছু করে।

কাবেরী ভালো করে লক্ষ্য করে দেখল রিনাদির দিকে, চোখে একটা ভয় ভয় চাউনি ছাড়া আর কিছু খুঁজে পেল না। তার মানে কাবেরীর দিকে আঙুল এখনও ওঠেনি। সন্তান মানুষ করার ব্যর্থতা নিয়ে বোধহয় এরা তোলপাড় করছিল না। কাবেরী রিনাদিকে বললো, তোমরা চা খেয়ে নিও। নীলাদ্রি বেডরুমে নেই। ঘর ফাঁকা। কোথায় গেল ভাবতে ভাবতেই দেখলো স্টাডিতে আলো জ্বলছে। ধীর পায়ে এগোলো স্টাডির দিকে।

দেওয়ালে লাগানো একটা ফ্রেমের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে নীলাদ্রি। টুটাইয়ের সেই জন্ম থেকে এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন বয়েসের ছবি একটা দুর্দান্ত ফ্রেমের মধ্যে ফ্রেমবন্দি করেছিল নীল। হালকা আকাশি রঙের দেওয়ালে বাদামি রঙের বড় ফ্রেমটা ঝুলছে। কাবেরী ওর পাশে গিয়ে

Sahitya Chayan

দাঁড়াতেই অন্যমনস্ক নীলাদ্রি বললো, দেখো ক্লাস ফাইভে একবার বায়না করেছিল, বাবার মত স্যুট পরবো, এটা কিনে দিতে হয়েছিল। তারপর বাবু গরমকালেও এটা গা থেকে খুলছিলো না। তুমি তো রীতিমত মারধর করে খুলিয়েছিলে। বলেছিলে, পিঠে ঘামাচি বেরোবে এই গরমে এটা পরে থাকলে। বড় হয়ে গেল টুটাইটা। বরাবরই মা হ্যাংলা, বাবার সঙ্গে ওর তেমন ভাব ছিল না কোনোকালেই। শুধু ছুটির দিনে ক্রিকেট খেলা ছাড়া। এক নাগাড়ে ওকে বল করতে হবে, কিছুতেই আউট হবে না ছেলে। আরেকটা বিষয়ে বাবার সঙ্গে ভাব ছিল, বাবা কি বই পড়ছে দেখে তাকেও পড়তে হবে। বাকি সময় তো আমি বলতাম, মায়ের চামচা, হাতা, খুন্তি। খুন্তি শুনে হেসে গড়িয়ে পড়তো ক্লাস সেভেনের টুটাই।

কত বড় হয়ে গেল, সেই বাইরে চুপচাপ আর ঘরে দুষ্টুমি করা ছেলেটা! এত বড় হয়ে গেল যে নিজের মনের কথাটুকুও বাবাকে বলার প্রয়োজন মনে করল না। যেদিন নেট ক্র্যাক করলো সেদিন ফোনে বলেছিল, বাবা পেয়ে গেছি, মাকে এখনই বলো না। সারপ্রাইজ দেব দুজনে মিলে। কালার পেন্সিল থেকে পছন্দের ব্যাট, তোমায় লুকিয়ে এসে আমার কানে কানে বলতো, কিনে দেবে? মা জানলে বকবে কিন্তু, বলবে অতিরিক্ত ফালতু খরচ। অফিস ফেরত নিয়ে আসতাম, চোখে চোখে ইশারা করে জেনে নিতো এনেছি কিনা! তারপর তোমার চোখ বাঁচিয়ে নিয়ে যেত আমার কাছ থেকে। আমি যেন ওর সমবয়সি কোনো

Sahitya Chayan

বন্ধু, যে তোমার চোখে ফাঁকি দিয়ে ওকে হেল্প করবে, এমনই ভাবত বোধহয় আমায়।

কাবেরী দেখছিলো তার চিরপরিচিত মানুষটাকে। এতদিন তো ভাবত সদাগম্ভীর মানুষটা সংসারের কোনোদিকেই তাকিয়ে দেখে না। কাবেরীর ঘাড়ে গোটা সংসার আর টুটাইয়ের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্তে রয়েছে। মাসের শেষে নিজের মাইনে টাকাটা কাবেরীর হাতে দিয়ে বলতো, যাক, এবারে নিশ্চিন্ত হলাম। সেই মানুষটাও ভিতরে ভিতরে এতটা জড়িয়েছিল সংসারের সঙ্গে কখনো বুঝতে পারেনি তো কাবেরী। টুটাইয়ের সঙ্গে এমন মিষ্টি বন্ধুত্বের খবরটা ওর অজানাই ছিল। নীলাদ্রির মত কঠিন মনের মানুষেরও চোখের কোণে চিকচিক করছে জল। কাবেরী নীলাদ্রিকে জড়িয়ে ধরে বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে, এমন ভেঙে পড়লে চলে! একবার এস আমার সঙ্গে। টুটাইয়ের ল্যাপটপ খুলেছি। একটা মেয়ের ছবি দেখলাম। তোমায় কিছু বলেছিল এর ব্যাপারে! নীলাদ্রির চোখে অবিশ্বাসী চাউনি, টুটাইয়ের কোনো গোপন সম্পর্ক ছিল? সেটা লুকিয়ে ও বিয়ে করতে গিয়েছিল? অসম্ভব, এটা যে কিছুতেই মেলাতে পারছে না টুটাইয়ের সঙ্গে। নীলাদ্রি বললো, তুমি চলো, আমি আসছি। বারান্দায় সব রয়েছে, একসঙ্গে বেরোবো না। কাবেরী বেরিয়ে এলো স্টাডি থেকে। নীলাদ্রির কষ্টকাতর মুখটা ভাসছিল চোখের সামনে। টুটাইয়ের ঘরে ঢুকে দেখলো, তুতান মানে অনুর ছেলে টুটাইয়ের একটা বই নিয়ে নাড়াঘাঁটা করছে। এই ছেলেটাকে বড্ড ভালো লাগে কাবেরীর। ছেলেটার মুখ

Sahitya Chayan

আর মনে কোনো পার্থক্য নেই। বাবা-মায়ের মতোই হয়েছে। তবে কোনো কিছুতেই খুব বেশি কৌতূহল নেই। ওকে দেখেই বললো, মামী, টুটাইদার আর কোনো কন্ট্যাক্ট নেই না গো? আসলে ওই ফোনটার চার্জ চলে যেতে পারে, তাই জিজ্ঞেস করলাম। কাবেরী বললো, আছে, আরেকটা নম্বর আছে, কিন্তু দুটো সিমকে একটাই ফোনে ঢুকিয়ে রাখার ঠিক কি অর্থ সেটা এখনো আমি বুঝি না। তুতান বললো, এটা সত্যিই সমস্যার! ওর কথা শেষ হবার আগেই নীলাদ্রি ঢুকলো ঘরে। বললো, কি দেখাবে বলছিলে দেখাও। কাবেরী ল্যাপটপ অন করে বললো, দেখো, স্ক্রিনের মেয়েটাকে তুমি চেনো?

আমার তো মনে হয় এই মেয়েটার জন্যই টুটাই পালিয়েছে। কি রুচি হয়েছে ছেলেটার! তুমি বলছিলে, অহনার মত ডাকাবুকো মেয়ে বলেই নাকি ওর আপত্তি, কিন্তু এর পোশাক দেখো একবার, তাহলেই বুঝবে তোমার ছেলের রুচিটা আরও কতটা মর্ডান হয়েছে। এখন তো মনে হচ্ছে অহনাকে তোমার ছেলের ব্যাকডেটেড লেগেছিল বলেই হাওয়া হয়েছে। নীলাদ্রি খেয়াল করলো, আজকে কাবেরী টুটাইকে ওর ছেলে বলে বারবার স্বীকার করেছে। এতদিন পর্যন্ত টুটাইয়ের ভালো রেজাল্ট, টুটাইয়ের কবিতা কম্পিটিশন বা আঁকার কম্পিটিশনে ফার্স্ট হওয়া থেকে শুরু করে জব পাওয়ার সব ক্রেডিট নিজেই নিয়েছে। দিনরাত শুধু বলতো, আমার ছেলের রেজাল্ট দেখেছো! আমার ছেলে বলে কথা, এটা তো মানবে নীলাদ্রি? এসব শুনতে শুনতে কবে যে টুটাই কাবেরীর

Sahitya Chayan

একার ছেলে হয়ে গিয়েছিলো কে জানে! ভাগ্যিস টুটাই একটা অত্যন্ত অন্যায় কাজ করলো, তাই টুটাইয়ের বাবা হিসাবে পরিচিত হলো নীলাদ্রি। কাবেরীর দিকে তাকিয়ে নীলাদ্রি বললো, আজ আর টুটাই তোমার ছেলে নয় কাবেরী? শুধুই আমার ছেলে তাই তো?

মামার কথা শুনে তুতান ফিক করে হেসে দিলো। বললো তোমরাও দেখছি আমার বাবা-মায়ের মতোই ঝগড়া করো। আমিও যখন অবাধ্য হই মা তখন আমাকে বাবার ছেলে বানিয়ে দেয় নিশ্চিন্তে। কাবেরী একটু থতমত খেয়ে বললো, এমন বেআক্কেলে কাজ তোমার ছেলে বলেই না করতে পারলো। আমার তো বোঝা উচিত ছিল, বাবারই কোনো দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা নেই এই বয়েসে, তো ছেলের কোথা থেকে আসবে। আল্টিমেটলি ব্লাড কথা বলে বুঝলে নীল!

তুতান বললো, মামা, মামী তোমরা প্লিজ ঝগড়া থামাও। দাদাভাই মিসিং, সেটা নিয়ে ভাবো প্লিজ।

তুতানের কথায় সম্বিৎ ফিরে পেল কাবেরী। নীলের দিকে তাকিয়ে বলল, এই যে ফোল্ডারটা দেখো, এই মেয়েটার ছবি আছে, এই মেয়েটাকেই বোধহয় টুটাই....

নীলাদ্রি অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, নাম, ধাম, অ্যাড্রেস কিছু পেলে? তাহলে মনে হয় পালিয়ে এর কাছেই গেছে।

তুতান বললো, মামী, একটু সাইড দাও, আমি একবার ছবিটা দেখি..

কাবেরী সরে দাঁড়িয়ে বললো, তোকে দাদাভাই কিছু বলেছিল এ ব্যাপারে? তুই তো দাদাভাইয়ের সব

Sahitya Chayan

জানতিস!

তুতান হাসতে হাসতে বললো, ধুর মামী তোমরা সত্যি বড় ব্যাকডেটেড গো। এ তো একজন গায়িকা। রিয়া কক্কর। আমরা তো সবাই ফিদা এর জন্য। আমার ফোনের ফোল্ডারেও এনার ছবি আছে। দেখি দেখি, দাদাভাইয়ের কালেকশনে যদি এক্সট্রা ছবি থাকে ওর তাহলে আমি নেব। ল্যাপটপটা টেনে নিল তুতান।

নীলাদ্রি ফিসফিস করে বললো, আমার ঘরেও সুচিত্রা সেন আর অপর্ণা সেন, অড্রে হেপবার্ন এর সাদাকালো পোস্টার ছিল। আমার ছেলে কিনা, তাই যার ফ্যান তার ছবি রেখেছে ভালোবেসে। অনেকে তো আবার অমিতাভের মুভি দেখতে বসলে এমনভাবে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকে যেন অমিতাভ নেক্সট কিসটা রেখাকে নয় ওনাকেই করবেন। অথচ স্বীকার করার সৎসাহস নেই, সে তুলনায় টুটাই অনেক স্বচ্ছ আমি বলবো। আসলে আমার ছেলে কিনা, তাই অড্রে হেপবার্নকে ভালো লাগে বলতে মুখ কাঁপে না। দ্বিচারিতা নেই চরিত্রে।

কাবেরী বিরক্ত হয়ে বলল, টুটাইয়ের বিষয় নিয়ে কথা বললে ভালো হতো এখন। তুতান বলছে পুলিশে যোগাযোগ করতে, কি করবে বলো?

এই মেয়েটা যখন গায়িকা তখন ওর লাভারের কাছে চলে যাওয়ার যুক্তিটা বাদ দিয়ে ভাবলে ভালো হবে।

নীলাদ্রি বললো, দাঁড়াও, অনিরুদ্ধবাবু কল করছেন, দেখি কি বলেন! কাবেরী নীলের দিকে তাকিয়ে বলল, অহনার বাবা? দেখো টুটাইয়ের কোনো খবর দেন কিনা!

Sahitya Chayan

।।১৫।।

প্রিয়াঙ্কা, তুই তো ডিরেক্ট একদিন তোর মাকে জিজ্ঞেস করতেই পারিস, কিভাবে তোর বাবা-মায়ের বিয়েটা হয়েছিল? তোর কথামত, তোর মামারবাড়ি গরিব হলেও এমন রুচির কোনো মানুষের সঙ্গে নাকি তারা মেয়ের বিয়ে দিতেই পারে না। তাহলে সত্যিটা জানার চেষ্টা করিস না কেন এতদিন?

প্রিয়াঙ্কা ফোনটা কানে চেপে ধরে বলল, জিজ্ঞেস করেছিলাম কয়েকবার কিন্তু মা সেভাবে উত্তর দেয়নি। মামার বাড়িই তো গেছি সেই ছোটবেলায়। দাদু মারা যাবার পরে দিদাকে নিয়ে বড়মাসি চলে গিয়েছিল। তারপর থেকে মাও আর বাপের বাড়ি যায়নি। মাসিরা কেউ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি। এমনকি বড় মাসির ছেলের বিয়েতেও মাকে নিমন্ত্রণ করেনি, আসলে বাবার জন্যই কেউ সম্পর্ক রাখতে চায় না। প্রত্যেকেরই একটা সোশ্যাল স্ট্যাটাস তো আছে বুঝলি অনিক।

তাই মায়ের দিকের কোনো আত্মীয়ই আমাদের সঙ্গে রিলেশন রাখে না। বাবার আত্মীয় আদৌ কেউ ছিল কিনা জানি না, তবে এক জেঠু এসেছিলেন একদিন আমাদের বাড়িতে। মাকে বলছিলেন, দীপশিখা তোমার মত ভালো মেয়ে পেয়েও যে পীযুষ বদলাবে না এমনটা আমরা ভাবিনি। একটু সামলে রেখো, মেয়েটা বড় হচ্ছে, কোনো কেসে জড়ালে মেয়েটার বিপদ। মুখার্জীরা এসে বাড়ি বয়ে অপমান করে গেছে, ওদের বাড়িতে রং করতে গিয়ে নাকি কি অসভ্যতামি করে এসেছে পীযুষ। আমি তখন

Sahitya Chayan

ক্লাস এইটে পড়ি, ওই একবারই জেঠুটাকে দেখেছিলাম। মা বলেছিল, তোর বাবার দাদা। দুটো মানুষের মধ্যে কত পার্থক্য। জেঠু নাকি স্কুল টিচার।

দীপশিখা মেয়ের ঘরের পাশ দিয়ে পেরোনোর সময় প্রিয়ার কথাগুলো শুনতে পেল। বোধহয় কোনো বন্ধুকে বলছে। নাকি অনিক নামের ওই ছেলেটাকে। প্রিয়ার মনে ছোট থেকেই মাকে ঘিরে অনেক প্রশ্ন। দীপশিখা বেশিরভাগ প্রশ্নর উত্তরকেই ইগনোর করে গেছে প্রিয়ার কাছে, তাই মেয়েটার কৌতূহল আরও বেড়েছে। দীপশিখা নিরুপায়। প্রিয়াঙ্কাকে কোনোদিনই সব সত্যি বলা সম্ভব নয়। এমনিতেই মেয়েটা পীযুষ বিশ্বাসের মেয়ে বলে নিজেকে ঘৃণা করে, এরপর যদি বাপের গুণের কথা শোনে তাহলে হয়তো আত্মহত্যা করে বসবে। প্রিয়ার জন্যই এতগুলো বছর নিজের সব কষ্টকে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে আছে ও। ও সুইসাইড করলে মেয়েটাকে হয়তো খারাপ জায়গায় বেচে দিত পীযুষ, তাই নিজের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয়েছে দীপশিখাকে। প্রিয়াঙ্কা একটা চাকরি পেলে ওর ভালো একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তবে ওর ছুটি মিলবে এই ত্রিশ বছরের অভিশপ্ত জীবন থেকে। সেই আশাতেই দিন গুনছে ও। প্রতিটা দিন যেখানে সুদীর্ঘ ক্লান্তিকর লাগে, সেখানে এতগুলো অন্ধকার দুর্গন্ধময় দিন ও কাটালো কি করে কে জানে! ভাবতেই বুকের বাঁ দিকটা যন্ত্রণায় কনকন করে ওঠে। মনের মধ্যে দুশ্চিন্তারা ভিড় করে এলো, এই অনিক নামের ছেলেটা

Sahitya Chayan

প্রিয়াকে বিয়ে করবে তো? নাকি ওর বাবার চরিত্রের গল্প শুনে প্রিয়াকে দূরে সরিয়ে দেবে? যদি অনিকের ফ্যামিলি না মানে প্রিয়াকে বউ হিসেবে, তাহলেও কি অনিক থাকবে মেয়েটার সঙ্গে? নাকি সেই অসহায় মুহূর্তে হাত ছেড়ে দিয়ে পালাবে মেয়েটার। দীপশিখার মেয়ে বলেই হয়তো ভগবান প্রিয়ার ভাগ্যটাও অযত্নের লিখেছেন। সেখানেও হয়তো সুখ, শান্তি, গোছানো সংসার, কেয়ারিং স্বামী কিছুই লিখতে ভুলে গেছেন ভগবান। মায়ের মতোই কপালের রেখা নিয়ে জন্মায়নি তো প্রিয়া? তাহলে তো ডেস্টিনির কাছে হেরে যাবে দীপশিখার এতবছরের লড়াই। পাশে শুয়ে নাক ডাকছে পীযুষ। বিয়ের পর পর মদের গন্ধে গা গুলিয়ে উঠতো ওর। বমি পেয়ে যেত। বমি করতে গেলেই মদ্যপ পীযুষ ঘাড় ধরে মেরে বলতো, শালী বমি করবি? মদের গন্ধ লাগছে? নে শুঁকে দেখ কেমন গন্ধ। ইচ্ছে করে দীপশিখার ঠোঁট দুটো নিজের মুখে ভরে দম আটকে দিতে চাইতো ওর। ছটফট করতো দীপশিখা। ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছিল, মদের গন্ধে বমি পাওয়া বারণ, পেলে মার খেতে হবে। তাই এই গা গোলানো গন্ধে অভ্যস্ত করে নিচ্ছিল নিজেকে। এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। দিব্য ঘুমায় এর মধ্যেই। শুধু মাঝে মাঝে বাবা-মায়ের মুখগুলো, আর পুরোনো কিছু স্মৃতি এসে নিঃশব্দে ভিজিয়ে দিয়ে যায় চোখের পাতাগুলোকে। আজ কিছুতেই ঘুম আসছে না দীপশিখার। প্রিয়ার ভবিষ্যতের ভাবনা বারবার মনকে উতলা করে দিচ্ছে। অনিক যদি প্রতারণা করে মেয়েটাকে, যদি মেয়েটার

Sahitya Chayan

স্বপ্নদেখা চোখ দুটোতে অবিশ্বাসের ঘন ছায়া এসে পড়ে, কি করে আগলাবে ও প্রিয়াকে। কতটুকু ক্ষমতা আছে ওর!

প্রিয়াঙ্কা যে অনিককে ভালোবাসে সেটুকু মা হয়ে বেশ বুঝেছে। বাবার আদর জীবনে পায়নি প্রিয়া, মায়ের মুখেও দিনরাত এক অদ্ভুত কাঠিন্য দেখেছে সেই ছোট থেকেই। মা স্নান করিয়ে, খাইয়ে স্কুলে পাঠিয়েছে ঠিকই কিন্তু কখনো বুকে জড়িয়ে ধরে শরীরের সবটুকু উষ্ণতা প্রিয়াকে দিয়ে বলেনি, বাবা না বাসুক আমি তো বাসি তোকে ভালো। তাই দীপশিখা জানে ভালোবাসা নামক মায়াবী অনুভূতির বড্ড কাঙাল তার মেয়েটা। অনিকের মুখ থেকে বারবার হয়তো শুনতে চায় ভালোবাসি শব্দটা।

এখনও যে প্রিয়ার কাজল কালো চোখের দৃষ্টিতে ভালোবাসা নামক অপার্থিব উপলব্ধির প্রবঞ্চনতা, কাপুরুষতার রূপ ধরা পড়েনি, তাই ওর স্বপ্নগুলোর রং এখনও রক্তিম। মা হয়ে দীপশিখা চায়, ওর অনুভূতিগুলো কৃষ্ণচূড়ার আবির রঙে রাঙা হয়ে থাকুক, ধূসর না হয়ে যাক। তবুও মেয়েটাকে সামনে বসিয়ে একদিন বোঝাতে হবে। ভালোবাসার বাকি রূপগুলো সম্পর্কেও বলতে হবে। প্রিয়া হয়তো ভালোবাসার একটা রূপের কথাই জানে, যেখানে দৃঢ় বিশ্বাস, সোহাগী অভিমান আর আদুরে আব্দার মিলে মিশে গড়াগড়ি খায় পোষা বেড়ালের মত, আর ভালোবাসা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে আজীবন পথ চলার অঙ্গীকার করে।

Sahitya Chayan

ভালোবাসা মানে হয়তো প্রিয়ার কাছে এমনই এক পৃথিবী একসঙ্গে চলার দৃঢ় অঙ্গীকার, কিন্তু ওকে বুঝতে হবে, ভালোবাসা মানে আচমকা আসা কালবৈশাখীর ঝড়ের দাপটও হতে পারে। যেখানে কিছু আন্দাজ করার আগেই সাজানো গোছানো ছোট্ট মনকুঠুরিটা ভেঙে তছনছ হয়ে যেতেও পারে। তারপরেও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে পাতাবিহীন, ডাল ভাঙা গাছের মত। ওকে বুঝতে হবে, ও মেয়ে, তাই ওর সহ্য ক্ষমতা হতে হবে বটবৃক্ষের মত। অকারণ আবেগ, ভালোলাগায় ভেসে যাওয়ার মত অনুভূতিগুলো ওর মধ্যে যত কম থাকবে ততই মঙ্গল।

দীপশিখার গায়ের ওপরে এসে পড়ল পীযুষের একটা হাত। এই হাতের কনুয়ের কাছে একটা গভীর আঘাতের চিহ্ন। ছুরি বা ঐজাতীয় কিছু দিয়ে কেউ আঘাত করেছিল হয়তো। দীপশিখা জানতে চেয়েছিল, কি হয়েছিল এখানে?

পীযুষ বলেছিল, রং করতে ভাড়ায় উঠেছিলাম, পিছনের গ্রিলে লেগে মাংস উঠে গিয়েছিল। বহুদিন ডানহাতের কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছিল। তা প্রায় মাস পাঁচেক তো হবেই। দীপশিখার দুর্ভাগ্য পীযুষের বলা কোনো কথাই কখনো বিশ্বাস করতে পারতো না ও। তাই পীযুষ যখন কথা বলে, ওর চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে সত্যতা যাচাই করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে ও, দীর্ঘ বছরের অধ্যবসায়ের ফলে শেষপর্যন্ত সফল হয়েছে দীপশিখা। এখন ও বুঝতে পারে কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে। তাই পীযুষের হাতের এই ক্ষতটা যে

Sahitya Chayan

গ্রিলের নয় সেটা ও বেশ ভালোই জানে। ঘুমন্ত পীযুষের মুখের দিকে তাকালো দীপশিখা। একদলা থুতু জমে উঠলো মুখের মধ্যে, গলার কাছটা তেঁতো হয়ে গেল যেন। মা বলতো, চোর, ডাকাত যেই হোক না কেন ঘুমন্ত মুখ দেখলে তার চরিত্র নাকি বোঝা যায় না! অপরাধীকেও নিষ্পাপ মনে হয় ঘুমালে। ঘুমন্ত মুখের যে-কোনো মানুষকে দেখলে নাকি মায়া জাগে মনে। কই এই মানুষটাকে দেখে তো কখনো মায়া জাগেনি দীপশিখার। তবে কি দীপশিখা হিংস্র কুটিল মনের! নাকি মায়া, দয়া অপাত্রে করা উচিত নয় বলেই জাগেনি। ঘুমন্ত পীযুষকে দেখলেই দীপশিখার একরাশ ঘৃণা দলা পাকিয়ে ওঠে বুকের কাছে। হাত নিশপিশ করে, মনে হয় গলাটা টিপে ধরলে কি ছটফট করতে করতে মরে যাবে মানুষটা? নাকি ঘুম থেকে উঠে ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ওকেই চুলের মুঠি ধরে পেটাবে। তখন দীপশিখার রোগা রোগা অসহায় হাতদুটো অপারগ হবে নিজেকে বাঁচাতে!

দ্বিতীয়টাকেই সত্যি মনে করেই দিনের পর দিন পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ও। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। শুধু মনে মনে ভাবল, শেষ চেষ্টা করে দেখবে একবার, কিন্তু প্রিয়ার বিয়ের পরে, এখন নয়। ও জেলে থাকলে মেয়েটার বিয়ে দেবে কে!

সামনে অনেক কাজ দীপশিখার, এখন এসব খুনে ভাবনা তাড়াতে হবে মাথা থেকে। অনিকের সঙ্গে আলাপ করতে হবে, দীপশিখাকে বুঝতে হবে অনিক ঠিক কতটা চায় প্রিয়াকে।

Sahitya Chayan

সারাদিনের ক্লান্তি এসে ঘুম পারিয়ে দিতে চাইছে ওকে। এটুকুই যা শান্তি, এই রাতের সময়টুকুই ভাবনাহীন অখণ্ড বিশ্রাম। সব ভুলে ঘুমের রাজ্যে পাড়ি দিতে পারলেই কিছুক্ষণের জন্য ভুলে থাকা যায় অতীতের না পাওয়া, বর্তমানের ক্ষোভ আর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে। চোখ দুটো ভারী হয়ে এলো, আহা কি শান্তি, কানের কাছে প্রিয় গানের অনুরণন, শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়বে দীপশিখা।

।।১৬।।

তো এই স্টেশন থেকে কিভাবে যাওয়া হবে? টোটো, অটো নাকি তোমার প্রেজেন্টের রোলস রয়েসে যাবো? অহনা হঠাৎ কোনো কারণ ছাড়াই নৈঋতের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে ফেলল। হাসির দমকে ও ঝুঁকে যাচ্ছিল দেখেই নৈঋত বললো, তুমি শিওর তোমার সাইকোলজিক্যাল কোনো প্রবলেম নেই? আমার কিন্তু এই কয়েকঘণ্টা দেখেই মনে হচ্ছে ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট করানোর দরকার। মা শেষ পর্যন্ত একটা পাগলীর সঙ্গে আমার বিয়ে দিচ্ছিল। এই অদ্ভুত সিচুয়েশনে, অপরিচিত স্টেশনে দাঁড়িয়ে পাগলের মত হাসতে যে কেউ পারে, না দেখলে তো বিশ্বাসই করতাম না!

অহনা নিজের মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি চাপার চেষ্টা করে বললো, এক্সট্রিমলি সরি। আসলে ছোটবেলায় আমি খুব গোপাল ভাঁড়ের কার্টুন দেখতাম। ওই যে টিভিতে হতো না, ঐগুলো। নৈঋত বললো, তো এখন সেই গোপাল ভাঁড়কে তুমি এখানে কোথায় পেলে? তার তো শুনেছি কৃষ্ণনগরে জন্ম। ঘূর্ণি নামক একটা জায়গায় তার

Sahitya Chayan

মূর্তিও আছে। তিনি তো কৃষ্ণনগরের রাজার রাজসভার ভাঁড় ছিলেন। তাকে এই সূর্যপুরে কোথায় পেলে? অহনা নিজের একটা আঙুল নৈঋতের দিকে তাক করিয়ে বললো, এই যে, এইখানে। বিশ্বাস করুন, কালার ধুতি, তার উপরে গরদের ফিনফিনে পাঞ্জাবি, পায়ে নাগড়াই জুতো, লেডিজ জ্যাকেট, এমন অদ্ভুত কম্বিনেশনই আমায় সেই বিখ্যাত ব্যক্তিকে মনে করিয়ে দিল। বাবাই আপনাকে দেখলে প্রথমেই বলবে, বেশ করেছিস পালিয়ে এসেছিস, এমন ড্রেস সেন্সের ছেলেকে কেউ বিয়ে করে?

শীতের সকালের গুঁড়ি গুঁড়ি কুয়াশা ভেজা স্টেশনে নরম আলোয় অহনাকে বড্ড সুন্দরী লাগলো, ঠিক যেন বৃষ্টিভেজা কচুপাতা। ঝকঝকে অথচ জলের দাগ নেই এতটুকু। সবুজ সতেজ চোখমুখ, রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিটুকু শুধু অবাধ্যর মত রয়ে গেছে চোখের কাজলে।

নৈঋত নির্নিমেষ তাকিয়েছিল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা মেয়েটার দিকে। বেশির ভাগ মুভিতে বা উপন্যাসের নায়িকাদের লেখক বা পরিচালকরা ধপধপে ফর্সা অথবা ডালিম রঙা খোঁজেন। তাই নৈঋতের কেমন যেন ধারণা হয়ে গিয়েছিল সুন্দরী হবার প্রথম লক্ষণ বুঝি গম রঙা গায়ের রং। মানে সুন্দরী হবার বুঝি ওটাই ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া। এমনকি ওর পছন্দের গায়িকা থেকে নায়িকা যারা সো কল্ড সুন্দরী বলে পরিচিত তাদের গায়ের রংও বেদানার দানার মত নরম গোলাপি। কিন্তু অহনা এই তথাকথিত ভাবনা চিন্তাকে নিমেষে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে একাই একশো। এতদিনে নৈঋত বুঝলো, গোলাপি ফর্সা রং, লম্বা চুল, মাপা ফিগার

Sahitya Chayan
মানেই সুন্দরী নয়। বরং যার দিকে তাকানোর পরে চোখ সরালে অকারণে সময় নষ্ট হবে বলে মনে হবে, তাকেই সুন্দরী বলা উচিত। এই যেমন এখন শীতের সকালের নরম সূর্যের আলোয় নৈঋত দেখছে অহনার হাসি হাসি মুখটা, আর যেটা দেখে ওর আঠাশ বছরের সংযমী হৃদয় অবধি তোলপাড় হতে শুরু করেছে। আর ওর আপ্রাণ চেষ্টাতেও কিছুতেই থামছে না ওই ওলটপালট করে দেওয়া ঝড়টা, বরং পূর্বাভাষ দিচ্ছে ঝড়ের প্রকোপ বাড়তে পারে বলে!

নৈঋত বাধ্য হয়ে চোখ সরিয়ে নিয়ে বললো, লজ্জা করে না? ড্রেস সেন্স নিয়ে কথা বলতে? এক কাপড়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার সময় মনে ছিল না, একটা নিরীহ মানুষ এই শীতের রাতে কেঁপে মরবে। আচ্ছা এখানে কোনো মার্কেট নেই? যেখান থেকে অ্যাটলিস্ট একটা পায়জামা আর টি শার্ট কিনে পরা সম্ভব?

অহনা হাসতে হাসতেই বললো, মার্কেট আছে, কিন্তু খুলবে সকাল দশটায়। চিন্তা নেই, আমার জ্যাকেটটা যেমন চেয়ে পরেছেন, তেমনি বাবাইয়ের কাছ থেকে একটা ট্রাকসুট আর টিশার্ট চেয়ে পরে ফেলবেন। বাবাই আর আপনার হাইট প্রায় একই। অহনা মুখে একটা ফিচেল ভঙ্গিমা করে বললো, তবে আমার বাবাই কোয়াইট হ্যান্ডসাম।

নৈঋত হাসতে হাসতেই বললো, আমি এখনো বুঝতে পারছি না, আমরা বিয়েটা না করে পালালাম কেন? করেই পালিয়ে আসতে পারতাম, তাহলে তোমার বাবাই আমায়

Sahitya Chayan
বাবাজীবন বলে খাতির করতেন, আর জামাই আদর করে খাওয়াতেন। মানে আমাদের উদ্দেশ্যটা ঠিক কি? বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে এসে দুটো ফ্যামিলিকে বিপদে ফেলে এখানে দাঁড়িয়ে ড্রেস সেন্স বুঝছি? একটা কথা কিন্তু ঠিক অহনা। মানুষ যার সঙ্গে থাকে তার এফেক্ট বেশ ভালোমত পড়ে তার ওপরে। এই যেমন আমার ওপরে এখন ভর করেছে একটা মারকুটে, পাগলী রিপোর্টার, কোথায় যে নিয়ে যেতে চলেছে কে জানে! এতক্ষন মেয়ে জ্বালাচ্ছিলো, এরপর হতে হতে না হওয়া শ্বশুরমশাইয়ের জেরার মুখে পড়তে হবে। অহনা আমার মনে হচ্ছে, এবারে বোধহয় আমার ফিরে যাওয়া উচিত। তোমার প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার যার সঙ্গে ইচ্ছে তুমি মিট করো, কিন্তু এমন আক্কেলজ্ঞানহীনতার কাজ করার পরে অনিরুদ্ধবাবুর সামনে দাঁড়ানোর মত সাহস আমার নেই। এর থেকে বরং আমি আমার বাড়ি ফিরে গিয়ে সকলকে যাহোক একটা কিছু বলবো।

টিকিট কাউন্টারের দিকে এগোতে যাচ্ছিল নৈঋত। অহনা চমকে উঠে বললো, ইয়ার্কি হচ্ছে? যখন বলেছিলাম চলে যান তখন আমার এক্সকে দেখবেন বলে এতদূর চলে এলেন। এখন তার সঙ্গে আলাপ না করিয়ে আমি তো যেতে দেব না।

নৈঋত থমকে দাঁড়িয়ে বললো, তবে যে এতক্ষণ বলেছিলে সেরকম কেউ নেই তোমার, অন্য কোন অজানা কারণে তুমি বিয়েটা করলে না, এখন আবার সেই কেউটা জুটলো কোথা থেকে? এই অহনা, তুমি সত্যিটা আমায়

Sahitya Chayan

বলো তো, এনাফ হয়েছে। এসব ছেলেমানুষির কোনো মানে হয় নাকি?

অহনা ফিসফিস করে বললো, বাবাই ফোন করছে। এই ফোনের নম্বরটা শুধু বাবাইয়ের কাছেই দেওয়া আছে। এতক্ষন ট্রেনে সিগন্যাল পায়নি বোধহয়। প্লিজ নৈঋত, কি বলবো?

নৈঋত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললো, আমি কি জানি? আমায় জিজ্ঞেস করে পালিয়েছিলে? অহনা উত্তেজনার চোটে নৈঋতের বাঁ হাতটা চেপে ধরেছে। সেই সাহসী মারকুটে মেয়েটার চোখে একটা অদ্ভুত মায়াবী অসহায়তা। ফোনটা রিসিভ করতে ভয় পাচ্ছে।

নৈঋত ওর হাত থেকে ফোনটা নিয়ে বললো, হ্যাঁ আঙ্কেল, আমি নৈঋত কথা বলছি। অহনা আমার সঙ্গেই আছে। আমরা আপনার কাছেই যাচ্ছি। এখুনি প্লিজ খবরটা কাউকে দেবেন না। গিয়ে ডিটেলে সব বলছি। আপাতত আমিও আপনার মতোই অন্ধকারে, কেন পালালাম আমি নিজেও জানি না, তাই এই প্রশ্নটা করে বিব্রত করবেন না প্লিজ। আমরা আসছি। অনিরুদ্ধবাবু অবাক গলায় বলল, তুমি তিতিরের সঙ্গে? মানে? তোমরা কি একসঙ্গে পালিয়েছ? আমার তো কিছুই মাথায় ঢুকছে না। কাল রাতে কি তিতির এই নম্বর থেকে আমায় কল করার জন্য ট্রাই করেছিল? একটা মিস কল হয়ে রয়েছে দেখলাম। তারপর বহু ট্রাই করেও পাইনি। তিতিরের মা খুব টেনশন করছে, আমি কি করবো এখন নৈঋত?

Sahitya Chayan

নৈঋত থমকে বললো, যাই করুন পুলিশে ইনফর্ম করবেন না এখুনি। আমরা আসছি।

অহনা মুখটা নিচু করে বললো, বাবাই কি পুলিশে ইনফর্ম করেছে? বাবাইএর সঙ্গে অভিরূপ আঙ্কেলের খুব ভালো রিলেশন।

নৈঋত চোখ বড় বড় করে বললো, একটু খেয়াল করো দেওয়ালে দেওয়ালে বোধহয় তোমার ছবি পোস্টার আকারে লাগানো কমপ্লিট করে ফেলেছে তোমার পুলিশ আঙ্কেল। আর তাতে লেখা আছে, তিতির পাল, মোস্ট চ্যালেঞ্জিং রিপোর্টার, ওয়ান্টেড।

অহনা একটু ঘাবড়ানো গলায় বলল, হোয়াট! আমি কি খুনি নাকি, যে ওয়ান্টেড লেখা থাকবে আমার ছবির নিচে?

নৈঋত বললো, খুনি নয় পলাতক বলে লিখেছে বোধহয়।

অহনা থমকে বললো, বাজে না বকে বলবেন, বাবাই কি বললো আপনাকে?

নৈঋত বললো, তোমার রোলস রয়েস আর এক্স কারোরই যখন দেখা পাওয়া গেল না, তখন এই গোপাল ভাঁড়ের সঙ্গে ওই টোটোতে করেই চলো।

তোমার বাবাই বললো, একটু সাবধানে নিয়ে এসো তিতির পাখিকে, যেকোনো সময় ডানা মেলে উড়ে যেতে পারে। আমি বললাম, উড়েই তো গিয়েছিল, নেহাত আচমকা রাইগঞ্জের স্টেশনে দেখা হয়ে গেল আর আমিও কাঁধে চেপে বসলাম, তাই ডানা ঝাপটিয়েও নামাতে পারলো না।

Sahitya Chayan

বাই দ্য ওয়ে, তিতির নামটা বেশি ভালো যাচ্ছে তোমার স্বভাবের সঙ্গে।

অহনা অন্যমনস্কভাবে বললো, কেন, তিতির নামটা বেশি ভালো কেন?

নৈঋত নরম গলায় বলল, তিতির নামটার মধ্যে শুধু ডানা ঝাপটানোর শব্দ নেই, উড়ে যাওয়ার বাসনা ষোলো আনা আছে। তিতিরকে খাঁচায় ভরার ইচ্ছে আমারও নেই। নীল আকাশেই তাকে মানায় বেশি। আমার মা না বুঝে তাকে বাঁধতে চেয়েছিল। বড়জোর তার ওড়ার সঙ্গী হতে পারি, যদি সে সঙ্গী করতে চায় তবেই।

অহনা দৃঢ় গলায় বললো, এ লড়াই আমার একার, এ সত্য আমি একাই উদঘাটন করতে চাই।

নৈঋত স্মিত হেসে বললো, বেশ, তবে ফিরে আসবো। বলো তো এখনই ফিরে যাই।

অহনা একটু থেমে বললো, সারারাতের ক্লান্তিটুকু কাটিয়ে ফিরবেন। আমাদের বাড়িতে খাওয়ার সুযোগটুকুও দিইনি আপনাকে, সারারাত না খেয়ে আছেন।

নৈঋত মাঝপথেই বললো, তাই এখন খাইয়ে অতিথিসেবা করে বিদেয় দেবে তাইতো?

অহনা সামলে নিয়ে বললো, স্বামী, স্ত্রী নাই হলাম, বন্ধু ভাবতেই পারেন!

নৈঋত হেসে বলল, সে পারি বৈকি। কিন্তু আমার আবার এক বিরক্তিকর স্বভাব আছে সকলকে বন্ধু ভাবতে পারে না আমার মন।

Sahitya Chayan

অহনা বললো, ঠিকই, আমি বোধহয় আপনার বন্ধু হবারও যোগ্য নই তাই না?

নৈঋত কথাটাকে পাশ কাটিয়ে বললো, ওইযে খান দুই টোটো আছে, চলো ওতেই চাপা যাক।

মনে মনে বললো, হায়রে টুটাই, গাড়ি ছাড়া যে এক পা চলে না, তাকে আজকে আর কোন কোন যানবাহনে চড়তে হবে সেটাই দেখার। এরপরে হয়তো তিতির পাখি বলবেন, আমাদের বাড়ি যেতে গেলে একটা ঘন জঙ্গল পড়বে, সেখানে বাঘের পিঠে চেপে আধঘণ্টা, তারপর একটা নদী, সেই নদীতে কুমিরের পিঠে পনেরো মিনিট গেলে তবেই পৌঁছাবে গন্তব্যে।

কাল রাত থেকে ওর সঙ্গে যা যা ঘটছে তাতে সব কিছুই বোধহয় সম্ভব। নৈঋতেরও নেপলিয়নের মত গলা ফাটিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে, "impossible is a word to be found only in the dictionary of fools"।

পৃথিবীতে সব সম্ভব, তাই এমন জোকার মার্কা সেজে, খালি পেটে এই হতে হতে না হওয়া বউয়ের পিছন পিছন ব্যাগ বইছে প্রফেসর নৈঋত বসু।

ওই মেয়েকে দেখো, এতবড় কাণ্ড ঘটানোর পরেও নাকি আরও কিসব লড়াই বাকি আছে ওনার, সেসব একাই লড়তে চান। এনার তো ঝাঁসিতে জন্মানো উচিত ছিল। মনে হয় ঝাঁসির রানী মরেই এনার জন্ম হয়েছে। আত্মার দেহের পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই কিন্তু স্বভাবের নয়, সেটা বেশ বুঝতে পারছে নৈঋত।

Sahitya Chayan

কি হলো, বুদ্ধুর মত দাঁড়িয়ে আছেন কেন উঠুন। অহনা টোটোয় উঠে ডাক দিল নৈঋতকে। উঠেই অল্প বয়সি ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল, পড়াশোনা করেছো? কেন, মাধ্যমিকের পর পড়া ছাড়লে কেন ভাই? বাবা কি করেন? নৈঋত আর থাকতে না পেরে বলেই ফেললো, আর পড়ার ইচ্ছে থাকলে জানাতে পারো ভাই এই দিদিমণিকে। ইনি সকলের সব দুঃখ দূর করার জন্যই মানব দেহে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। ছেলেটি না বুঝেই বললো, না স্যার অনেক পড়ে ফেলেছি, হিসেব পারি, কাগজ পড়তে পারি, দরখাস্ত লিখতে পারি আর কিছুর দরকার নেই। পি এইচ ডি করে যদি ডোমের চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করে মানুষ তাহলে আমরা ভালোই আছি। দিনে তিনশো-পাঁচশো কামিয়ে নিই, চলে যাচ্ছে। অহনা বললো, পড়াশোনা লোকে শুধু চাকরি করবে বলেই করে না, নিজেকে শিক্ষিত করতেও করে ভাই। নৈঋত বললো, এখান থেকে তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া যায় তো অহনা? এত জ্ঞান না নিতে পেরে যদি ও আমাদের নামিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু হেঁটে যেতে হবে। অহনা বললো, আপনার মা বলেছিলেন, আপনি নাকি অত্যন্ত ভদ্র, শান্ত, কথাটা সত্যি নয় বুঝলেন!! নৈঋত বললো, সে তো তোমার মাও বলেছিল, মেয়ে আমাদের সাত চড়ে রা করে না। আমি তো দেখছি সাতটা কথার পরেই সে চড় থাপ্পড় মারতে শুরু করে। মায়েরা এমন বলেই থাকে, নিজেদের বাঁকা ট্যারা প্রোডাকশনগুলোকে মার্কেটে চালাবে বলে। ওটাকে সিরিয়াসলি নিতে নেই,

Sahitya Chayan

বুঝলে? অহনা গজগজ করে বললো, সঙ্গে নেওয়াটাই ভুল হলো দেখছি। নৈঋত মুচকি মুচকি হাসছিল অহনার মুখের ভঙ্গিমা দেখে। যাক দামাল ঘোড়াটাকে এতক্ষণে একটু বাগে আনতে পেরেছে। এতক্ষণ ধরে তো এক তরফা ছুটিয়ে মারছিল নৈঋতকে। লাগাম ধরতে চেষ্টা করেও পারছিল না নৈঋত। বনবন করে ঘোরাচ্ছিলো ওকে লাগাম ছেঁড়া জেদি মেয়েটা। তবে কেন কে জানে কিছু কিছু সময় জেতার থেকেও হারতে বেশি ভালো লাগে। অহনার এই মারাত্মক জেদের কাছে হার স্বীকার করতে মন্দ লাগছিলো না নৈঋতের। অহনার এই ফোনটা থেকে একটা ফোন করে দেবে বাড়িতে? বলে দেবে মাকে, যে ও ঠিক আছে? না থাক, বরং অহনার বাবাকেই রিকোয়েস্ট করবে ওর বাবাকে একটা ফোন করে খবর দিতে। ও ফোন করলেই মায়ের এত এত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে যে সামলাতে পারবে না নৈঋত।

অহনা আনমনে নিজের আঙুলের নখের নেলপালিস তুলছিল খুঁটে খুঁটে। ওর দুই ভ্রুর মাঝের গভীর ভাঁজটাই বলে দিচ্ছে ওর মন আপাতত এখানে নেই, সে বোধহয় দুশ্চিন্তা অথবা দুর্ভাবনায় পাড়ি দিয়েছে নৈঋতের অচেনা কোনো এক রাজ্যে। নৈঋত বললো, একে কোন পাড়ায় থামতে বলবো? মানে তুমি তো অন্য রাজ্যে বিচরণ করছো তাই বলছি আর কি? অহনা যেন সদ্য তপস্যা ভঙ্গ করলো, এমন ভাবেই উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, এই তো রাখালপাড়ার মোড়ে নামবো।

Sahitya Chayan

নৈঋত বেশ বুঝতে পারছিল অহনার মনের মধ্যে একটা দামাল ঝড়ের তাণ্ডব চলছে। সেটা শুধু বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে আসার জন্য নয়, আসার গোপন কারণটার জন্যই হয়তো। যে কারণটা ও কাউকে বলতেও পারছে না অথচ ওকে ক্ষতবিক্ষত করছে ক্রমাগত।

মেয়েটার সঙ্গে কাটানো এই কয়েক ঘণ্টায় নৈঋত অন্তত এটুকু বুঝেছে কাবেরী বসু মানুষ চিনতে ভুল করে না।

মেয়েটা একটু বেশিই সৎ, তাই বিয়েটা না করেই উঠে এসেছিল আসর থেকে। যদিও সেই কারণটা নৈঋতের একেবারেই চিন্তা ভাবনার বাইরে। তবে কিছু কিছু চোখ থাকে, যেখানে ডুব দিলে সৎ শব্দটা মাখামাখি হয়ে যায় শরীরে, তার থেকে অন্যরকম একটা সুগন্ধ বেরোয়। অহনার দৃষ্টিতে সেই সততা খুঁজে পেয়েছে নৈঋত, মাও হয়তো এই কারণেই বাসে দেখা হওয়া একটা মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছিল! অহনার দৃষ্টির সততাতে মাও নিশ্চয়ই নৈঋতের মতোই মুগ্ধ হয়েছিল। এই স্থিতধী গম্ভীর মেয়েটা যেন অন্য কেউ, আজ ভোরের ট্রেনে মারপিট করা, গালিগালাজ করা মেয়েটা নয়। এ যেন নিজের মধ্যে ডুব দিয়েছে নিজেকে আবিষ্কারের আশায়। কিন্তু ঢেউগুলো এসে ওর গতিপথকে এলোমেলো করে দিচ্ছে বারংবার, তাই পাড়ের ঝুরো বালি আঁকড়ে ধরে লড়াই করছে আপ্রাণ। নৈঋত নির্নিমেষ তাকিয়েছিল অহনার এমন এক ডুবন্ত মুখের দিকে। সকালের হাওয়ায় কিছু অবাধ্য চুলের গোছা এসে ওর কপালে পড়ছে, বার

Sahitya Chayan

দুই অন্যমনস্কভাবে তাদের কপাল থেকে তোলার চেষ্টাও করলো, তারপর সবুজ মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকলো আনমনে।

খুব ইচ্ছে করছিল অহনার হাতটা ধরে বলে, তিতির পাখি প্লিজ, তোমার ওড়ার সঙ্গী করো আমায়, হয়তো আমি তোমার মত অত দ্রুত উড়তে পারবো না, হয়তো আমি পন্ড করবো তোমার কাজ, তবুও খড়কুটো এনে দেব তোমায় বাসা বানাবার জন্য, সারারাত শিয়রে বসে পাহারা দেব তোমার ঘুমন্ত মুখের, বন থেকে ফলমূল সংগ্রহ করে রাখবো তোমার জন্য, তাও কি আমায় সঙ্গে নেওয়া যায় না?

নৈঋত ঠোঁট ফাঁক করার আগেই অহনা বললো, ব্যাস, এখানেই রাখো।

নৈঋত পাঞ্জাবির পকেট থেকে ওয়ালেট বের করতেই অহনা বললো আমি দিচ্ছি, আমার কাছে খুচরো আছে।

একটা পঞ্চাশ টাকার নোট ধরিয়ে দিল ছেলেটার হাতে। বললো, দশ টাকা তুমি রাখো, চা খেও।

ছেলেটা উৎসাহের আতিশয্যে বললো, দিদি, জামাইবাবুকে আমাদের এখানের দর্শনীয় জায়গাগুলো যদি দেখাতে চান, আমার নম্বরটা রাখুন, ফোন করলেই চলে আসব। সব ঘুরিয়ে দেব দুশো টাকায়।

নৈঋত হেসে বললো, দর্শনীয় বস্তু সঙ্গে নিয়েই ঘুরছি ভাই, আর নাইবা দেখলাম।

ছেলেটি বেশ জোরে হেসে বললো, জামাইবাবু কিন্তু মাই ডিয়ার লোক। দিদি বরং একটু রাগী।

Sahitya Chayan

অহনা দাঁত চেপে বললো, বাড়িতে ঢুকবেন নাকি ওই টোটোতেই স্টেশনে ফেরত যাবেন সেটা ডিসাইড করুন।

নৈঋত ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে ভাই, ফোন নম্বরটা দিয়ে যাও, হয়তো লাগবে আমার। বুঝতেই তো পারছো, শ্বশুরবাড়িতে তো আর সারাজীবন থাকবো না, ফিরতে হবে বাড়ি, তাই তখন তোমাকেই ডাকবো। ছেলেটি নিজের ফোন নম্বর দিয়ে বললো, আচ্ছা জামাইবাবু চললাম।

জামাইবাবু শব্দটা শুনে নৈঋতের বেশ মজা লাগছিল, তাই হয়তো ওর ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসির উদ্রেক হয়েছিল। সেদিকে তাকিয়ে অহনা বললো, এই তো ড্রেস সেন্স, তারপর আর ওই ক্যাবলা ক্যাবলা হাসিটা না হাসলেই বোধহয় ভালো হয়। বাবাইয়ের সামনে দাঁড়াতে হবে বুঝে একটু সচেতন হয়ে বাড়িতে ঢুকুন।

নৈঋত ফিসফিস করে বললো, এই ড্রেসে কারোর পার্সোনালিটি আসে না সেটা তোমার জানা উচিত অহনা।

নাকে সিঁথি ময়ূর পরিয়ে যদি তোমায় দাঁড় করানো হতো তুমিও এমনই ক্যাবলা হয়ে যেতে। অহনা বললো, নাকে সিঁথি ময়ূর পরে না, কপালে পরে, বেসিক সেন্স নেই, আবার ইনি নাকি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রফেসর! স্টুডেন্টরা চাটন দেয় না এটা সৌভাগ্য আপনার!

নৈঋত থমকে দাঁড়িয়ে বললো, কি? চাটন? এটা আবার কি শব্দ ?

অহনা গম্ভীর ভাবে বললো, ওটা আরবি শব্দ, পালি ভাষার মধ্যে দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করেছে। তাই কিছুটা

Sahitya Chayan

অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

নৈঋত মনে মনে হেসে বললো, মহা বদমাশ মেয়ে একটা!

বাড়ির সামনে বেশ বড় একটা সাজানো বাগান। বাগানকে পেরিয়ে শুরু হয়েছে গোটা বাড়িটা। ছিমছাম দোতলা বাড়িটা খুব স্নিগ্ধ আকাশি রং করা। যেন স্বয়ং আকাশ এসে হাজির হয়েছে বাড়ির দেওয়ালে। বাগানের মাঝে ছাঁটা ঘাসের পায়ে চলা রাস্তাটা গিয়ে থেমেছে বার্নিস করা একটা কাঠের দরজার সামনে। রাস্তাটাকে মাঝখানে রেখে দুদিকে গোলাপ, ডালিয়া, নাম না জানা সিজন ফ্লাওয়ারের রঙিন ভিড়। গেটের গ্রিলের দরজাটা খুলতেই একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ এসে বেশ অবাক গলায় বললেন, ওমা, তিতির দিদিভাই তুমি এখন এই বাড়িতে? নতুন জামাইকে সঙ্গে করে দাদাবাবুকে প্রণাম করতে এলে বুঝি। একবার ফোনে বলতে হয়তো, এখন বিজু তোমার কি দিয়ে যে আপ্যায়ন করবে কে জানে। বাসন্তীকে খবর পাঠাই, আগে এসে রান্না ঘরে ঢুকুক। কি যে করো না তোমরা, একবার জানাতে হয় তো। দাদাবাবু, দেখুন কে এসেছে...

অহনা গম্ভীর গলায় বলল, বিজু জ্যেঠু, ও তোমাদের জামাই নয়, বিয়েটা আমাদের শেষপর্যন্ত হয়নি। ওর নাম নৈঋত, ও যতক্ষণ আমাদের বাড়িতে আছে ততক্ষণ ওকে যত্ন করো আর নৈঋত বলেই ডেকো।

অহনার কাটা কাটা কথাগুলো বড্ড অসহ্য লাগছিলো নৈঋতের। মিথ্যে নয় বলেই বোধহয় দমবন্ধ হয়ে

Sahitya Chayan

আসছিল। সত্যিই তো এই মুহূর্তে ঠিক কি পরিচয়ে ও অহনার বাড়িতে এসে উঠেছে? কাল রাতে বিয়ে ভেঙে গেছে, দ্য এন্ড। অহনা যে ওকে এতক্ষণ সহ্য করেছে সেটাই বোধহয় অনেক। কি করবে নৈঋত, ওই টোটোওয়ালাকে ফোন করে ডেকে নিয়ে ফেরত যাবে কি! এরপর তো অহনার বাবার মুখোমুখি হতে হবে, সেখানেও হয়তো নৈঋতকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেবে ওই মেয়ে। অনভিপ্রেত প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ওকে। এসবের থেকে বোধহয় নিজের বাড়ি গিয়ে মায়ের কাছে সত্যিটা বললে, মা ঠিক বিশ্বাস করত। মা তো চেনে টুটাইকে।

নৈঋতের দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে অহনা বললো, খেয়ে রেস্ট নিন, বিকেলের ট্রেনেই ফিরবেন। তার মধ্যে আমিই না হয় বাবাইকে বলবো আপনাদের বাড়িতে ফোন করে সত্যিটা বলতে, তাহলে আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরতে পারবেন। চলুন, ভিতরে চলুন। অহনারা যে বেশ অবস্থাপন্ন সেটা আগেই টের পেয়েছিলো নৈঋত। ওর বাবা তো রীতিমত সেলিব্রিটি। দীর্ঘদিন ধরে নামি সংবাদপত্রের ক্রীড়া সাংবাদিক। বেশিরভাগ সময় তো উনি দেশের বাইরেই থাকেন। অহনার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হবার অনেক আগে থেকেই নৈঋত অনিরুদ্ধ পালকে চিনতো। ওনার খেলা বিষয়ক কলম পড়তো সেই স্কুল লাইফ থেকেই। তাই যেদিন ওদের বাড়িতে খুব সামান্য সময়ের জন্য আলাপ হয়েছিল সেদিনই নৈঋত বলে উঠেছিলো, আমি কিন্তু আপনাকে চিনতাম। মানে আপনার লেখা পড়ছি

Sahitya Chayan

বহুবছর ধরে। ভদ্রলোক বোধহয় স্বল্পভাষী। স্মিত হেসে বলেছিলেন, আমার মেয়েকে দেখোনি টিভি চ্যানেলে?

নৈঋত হেসে বলেছিল, আগে চিনতাম না, মা দেখিয়েছিল একদিন। ভদ্রলোক বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, ও আমার থেকেও অনেক বেশি নাম করবে একদিন, ওর মধ্যে সেই সম্ভাবনা আছে। নৈঋত বুঝেছিলো, বাবা মেয়ে বলতে অজ্ঞান। সেই বাবার সম্মুখে দাঁড়িয়ে নৈঋত যদি বলে, অহনার জন্যই আমি বিয়ের আসর থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছি তাহলে কি মেয়ে সোহাগী বাবা বিশ্বাস করবে, নাকি সবটা না শুনেই থাপ্পড় মারবে কে জানে! মেয়ের যা মারের হাত, বাবার যে থাকবে না তাই বা কে বলতে পারে। সুচেতাদেবী তো বলছিলেন, বাবাকে দেখেই নাকি মেয়ে ইন্সপায়ার্ড হয়ে এই প্রফেশনে এসেছে। তো বাবার মারপিট দেখেই হয়তো ক্যারাটে, কুংফু সব শিখেছে। বাবাও হয়তো ব্ল্যাকবেল্ট। হে ভগবান, এ কোন কুস্তিগিরদের বাড়িতে মা ওর বিয়ে দিচ্ছিল কে জানে!

অহনা আবার বললো, এটা আকাশ নয় আমাদের বাড়ির দেওয়াল, তাই তারা গোনার কিছু নেই। আসুন প্লিজ।

।।১৭।।

জামাটা গায়ে চাপাতে চাপাতেই খেয়াল করলো পীযুষ, প্রিয়া সেজেগুজে হাতে একটা ফাইল নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটা বেশ ডাগর হয়ে উঠছে আজকাল। মায়ের মতই সুন্দরী। তবে মায়ের মত রংটা পায়নি বরং ওর মত একটু

Sahitya Chayan

শ্যামলা হয়েছে। মায়ের আরেকটা স্বভাবও পায়নি মেয়েটা। শান্ত, ধীর হয়নি মোটেই। পীযুষের এত মারের পরেও গোঙানির আওয়াজ ছাড়া তেমন কিছুই বেরোয়নি শিখার মুখ থেকে। সেখানে মেয়েটা যেন রনচণ্ডী হয়েছে। দুদিন গায়ে হাত দিতে গিয়েছিল পীযুষ, মেয়ে ঘর থেকে কাটারি বের করে বলেছিল, কেটে দু-আধখানা করে সর্বস্ব পুকুরের জলে ভাসিয়ে দেব। কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। ওই পুকুরে স্নান করেই গায়ের রক্ত ধুয়ে নেব আমি। আর তোমার মত যমের অরুচি মরলে পাড়ার লোকও শান্তি পাবে, তাই তারাও খোঁজ করবে না। মনে রেখো আমি দীপশিখা নই, আমি প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস, তোমার মত জানোয়ারেরই বাচ্চা, তাই আমার গায়েও কিছু গঙ্গার জল বইছে না। মেয়েটার সেদিনের রূপ দেখে ভয়ে ঘরে সেঁধিয়েছিলো পীযুষ। এতদিন পর্যন্ত কোনো জজ, ব্যারিস্টার, পুলিশ ,আমলাকে ভয় খায়নি পীযুষ কিন্তু নিজের মেয়েকে ভয় খেয়েছিল। সেদিন থেকেই মেয়েটাকে দেখলে একটাই কথা মনে হয়, ওর গুমোর শেষ করে দিতে হবে। ওই মেয়ে আবার বড়লোক বাড়ির ছেলেটার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে। অনিক দস্তিদার, দেখতে শুনতে ভালো, চাকরিও পেয়েছে, সে কেন পীযুষ বিশ্বাসের মেয়েকে পছন্দ করলো সেটা ভাবতে গেলেই ঠোঁটের কোণে থুতু জমে ওর। সব ছেলেরই একটাই জায়গায় চুলকানি, সেটা ও বেশ বুঝেছে। প্রিয়াকে এক-দুদিন ভোগ করবে তারপর বাড়ির পছন্দ বিয়ে করে কালী মন্দিরে পেন্নাম সারতে আসবে। তখন মা-মেয়ে গলা জড়িয়ে ধরে

Sahitya Chayan
কাঁদবে। বেশ হবে, ওই মেয়ের দেমাক কমবে। পীযুষ মেয়েছেলের দেমাক মোটে সহ্য করতে পারে না। সেই ছোটবেলায় স্কুলে এক দিদিমণিকে ওর খুব ভালো লাগতো। তাকে একদিন একটা গোলাপ ফুল নিয়ে গিয়ে দিয়েছিলো ও। দিদিমণি ফুলটা নিতেই ফুলের কাঁটায় দিদিমনির চাঁপাকলির মত আঙুলে রক্ত ঝরে। দিদিমণি ওই রক্ত মাখা হাতেই বেত নিয়ে পিটিয়েছিলো পীযুষকে। পিঠে লাল লাল দাগ করে দিয়েছিল। বাড়ি ফেরার পর দেখেছিলো, মা ওর বোনকে চুল বেঁধে দিচ্ছে। মাকে বলেছিল, দিদিমণি মেরেছে, পিঠ জ্বলছে। মা বোনের চুলে ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বলেছিল, বেশ করেছে মেরেছে, বদমাইসি করলে মারবেই।

ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে ও নিজের মা থেকে বোন সবাইকে মেয়েছেলে বলতে শুরু করেছিল। মা অনেক মেরেছে ওকে, মারতে মারতে মা ক্লান্ত হয়ে গেছে কিন্তু পীযুষ একইভাবে বলে গেছে, তুই মেয়েছেলে তোর মেয়েও মেয়েছেলে। মেয়েদের দেমাক পীযুষ সহ্য করে না। শিখা সেটা জানে বলেই পীযুষের সামনে কোনোদিন গলা তুলে কথা বলেনি, এতে শিখা মার হয়তো খেয়েছে কিন্তু মারা পড়েনি পীযুষের হাতে। কিন্তু প্রিয়াকে মরতে হবে, মরতে হবে প্রিয়াকে, এত দেমাক নিয়ে পীযুষের সামনে কোন মেয়ে চলতে পারে না। প্রিয়াকে শুনিয়ে বেশ জোরে জোরে বললো পীযুষ, এই যে শিখা, এবাড়ির সব খানকিকে বলে দিও, আমার টাকায় বসে বসে গিলবে

Sahitya Chayan

আর আমার বুকের ওপরে দাঁড়িয়ে কথা বলবে এসব চলবে না।

প্রিয়া থমকে দাঁড়ালো দরজার সামনে, পিছন ঘুরে বললো, মা তোমার পূজনীয় পতিদেবকে বলে দিও, বিছানায় সুখ করে আমাকে যখন পৃথিবীতে এনেছিল তখন খাওয়াতেও হবে বৈকি। আর এমন বেজন্মার মেয়ে খানকিই হয়, সেটা নিয়ে আমি খুব বেশি ভাবছি না। বেশি গলাবাজি করলে সোজা গিয়ে পুলিশে খবর দেব, এসে তুলে নিয়ে যাবে, তারপর তোমার গরম জায়গায় রুলের বাড়ি মেরে ঠান্ডা করে দেবে, তাই আমার সামনে বেশি কপচিও না। ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে, হাতের ফাইল সামলে হনহন করে বেরিয়ে গেল প্রিয়া।

কিছুক্ষণ স্থবিরের মত তাকিয়ে থাকলো পীযুষ। তারপরেই চোখ পড়ল রান্নাঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে শিখা। ঠোঁটে একটুরো হাসি আছে নাকি দেখার আপ্রাণ চেষ্টা করলো ও। এত বছর পীযুষকে জব্দ করতে পারেনি শিখা, তাই প্রিয়ার কাছে ওর পরাজয় দেখে নিশ্চয়ই খুশিই হয়েছে। পীযুষ বললো, হাসছিস নাকি শালী? মনে খুব ফুর্তি জেগেছে নাকি রে? কি মনে করেছিস, তুই আমার পয়সায় দুধ-কলা খাইয়ে জাত সাপ তৈরি করেছিস, ওর বিষে তুই আমায় মারবি মনে করেছিস নাকি রে? তাহলে ভালো করে শুনে রাখ, তোর মেয়েকে তুই সামলে রাখ, নাহলে এমন সর্বনাশ করবো ওর তখন ওর ওই নাগরও ওর মুখ দেখবে না।

Sahitya Chayan

একটু বোধহয় কেঁপে উঠলো দীপশিখা, সেদিকে তাকিয়ে বেশ জোরে হেসে উঠলো পীযুষ। শিখা স্বাভাবিক গলায় বলল, ভাত হয়ে গেছে খেয়ে বেরোবে তো?

পীযুষ কালো কালো দাঁত বের করে হেসে বললো, এই তো, এমন থাকবে বুঝেছো, তাহলে আর আমায় মারতে হয় না, শুধু মুধু নিজের হাতে ব্যথা করতে হয় না আমায়। আর তোমার ঐ গুণের মেয়েকেও একটু শিখিয়ে রেখো, বাবার পয়সায় যখন খাচ্ছে তখন তাকে সম্মান করতে হবে। শিখা ভাত বাড়তে বাড়তেই বললো, মেয়েটা বড় হয়ে গেছে, ওর বয়সী সবার তো বিয়ে হয়ে গেছে, ওর বিয়ের জন্য কিছু ভাবলে?

পীযুষ গরম ভাতে ডাল সেদ্ধ মাখতে মাখতে বললো, বিয়ে? কে বিয়ে করবে ওই বাচাল মেয়েকে?

লোকে তো একদিনের জন্য বিছানাতেও চাইবে না ঐরকম মুখরা মেয়েকে। সেখানেও লোকে নরম সরম মেয়েকেই চাইবে। শিখা দাঁত চেপে বললো, ও তোমার মেয়ে, নিজের মেয়ে সম্পর্কে এমন বলতে লজ্জা করে না তোমার! এঁটো হাতেই শিখার গালে একটা থাপ্পড় মেরে বললো, না করে না। একটা ভিজে ন্যাকড়াকে তোর বাবা আমায় গলায় বেঁধে দিলো, শালা এক ফোঁটা আগুন পেলাম না কোনদিন শরীরে, বিছানায় ভিজে কাঁথার মত পড়ে রইলি গোটা জীবনটা, তার মেয়ের শরীরে এত আগুন কোথা থেকে আসে রে? মেয়ের কাছ থেকে একটু আগুন ধার করে নিজের শরীরে নিস, আজ কাজ থেকে ফিরে পরখ করবো।

Sahitya Chayan

শিখা এঁটো গালেই বসে রইলো ঝিম ধরে। হাত ধুয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো পীযুষ। শালা, এই মা মেয়ের জন্য আজকাল মদের নেশাটাও ঠিক মত জমে না। কেমন যেন ফিকে হয়ে যায়। এত দামি দামি মদ খেয়েও নেশা জমছে না। এদের জন্যই কপালটা ইদানিং একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। গত একমাস ধরে জুয়ায় হেরেই যাচ্ছে। মা-মেয়ের সারাদিনের অভিশাপেই হারছে ও।

তবে অনেক কষ্ট করে একটা খবর জোগাড় করতে পেরেছে ও। আন্দাজে তীরটা ছুঁড়েও দিয়েছে সেদিকে। দেখা যাক তীরের সঙ্গে কিছু টাকার নোট এসে জোটে কিনা ওর ভাঙা কপালে। রঙের মিস্ত্রি হিসাবে ওর নাম ডাক আছে এ অঞ্চলে। এ অঞ্চলে কেন, আশপাশের অনেক শহরেই ও কাজ করছে বহুদিন ধরে। বড়লোকের বাড়ি তো কম দেখলো না! শালাদের টাকা আছে, কিন্তু খরচের মন নেই। দেওয়ালে রঙের বেলায় দামি দামি কালার পছন্দ করে, আর শালারা মিস্ত্রিকে মুড়িতে একটা গজা কি শিঙারা দিয়েই কাজ শেষ। যদিও পীযুষ এখন আর ভাড়ায় উঠে রং করে না। গোটা ছয়েক লোক রেখেছে ও। এখন ও শুধু ইন্সট্রাকশন দেয়, কাজ ওরা করে। তবুও সেই ছোটবেলার অভ্যেস, লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে সেই কবে রঙের কাজে হাত দিয়েছিল, তাই রং, স্পিরিট এসবের গন্ধ মদের মতোই নেশা ধরায় এখনও।

এই যে আশ্রয় কোম্পানির যে ফ্ল্যাটটার কাজে এখন হাত দিয়েছে রাইগঞ্জে, এর মালিক বেশ দিলদরিয়া পাবলিক। কাজ পছন্দ হলে মুড়ি চানাচুর নয়, মদের

Sahitya Chayan

বোতলও দেয় মিস্ত্রীদের। নারায়ণ বোস পীযুষকে বলেছে, গ্রামের দিকে এখনো ফ্ল্যাট কালচার শুরু হয়নি। তাই রাইগঞ্জ থেকে সূর্যপুর, কালিয়াগঞ্জ, নীলপুর এগুলোতে পর পর ফ্ল্যাট বানানো শুরু করবে। বহু জায়গা কেনা আছে নারায়ণ বোসের। একদিন নিজেই বসে পীযুষের কাছে ওর খারাপ দিনের গল্প শুনিয়েছিলো লোকটা। সেদিনই বলেছিল, আগে রাইগঞ্জ, নীলপুর, দোগেছিয়ার স্টেশনের ধারে বসে সবজি বিক্রি করত। তারপর বাপটা অকালে মরে যেতেই তিনভাইয়ের মধ্যে জমি জায়গা ভাগ হয়ে গেল। দুই দাদা ভালো চাষের জমিগুলো নিয়ে ওকে চাষ না হওয়া দুটো ভিটে জমি দিলো বাস রাস্তার ধারে। একদিন নারায়ণ স্টেশনে বসে ফুলকপি বেচছে, তখন উৎপল বলে এক ভদ্রলোক এসে বলেছিল, শুনলাম নাকি রাস্তার ধারে তোমার জমি আছে? নারায়ণ অবজ্ঞাভরে তাকিয়ে বলেছিল, আছে। কিন্তু সেখানে ভালো চাষ হয় না। তাই ভাগচাষ করবো বলে লাভ নেই, আগেই বলে দিলাম। উৎপল বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলেছিল, তোমার ঝুড়ির সব ফুলকপিগুলোর দাম কত? আমি যদি সবগুলো কিনে নিই তাহলে আমার সঙ্গে যাবে? নারায়ণ অবাক হয়ে তাকিয়ে বলেছিল, মানে? কোথায় যাবো? আমি গরিব বাড়ির ছেলে ঠিকই কিন্তু আমাদের পরিবারের সুনাম আছে, তাই যা-তা কাজ করতে পারবো না। উৎপল হেসে বলেছিল, না, চুরি ডাকাতি তোমায় দিয়ে হবে না। আপাতত আমায় তোমার জমিদুটো দেখাতে পারবে?

Sahitya Chayan

নারায়ণ একটু অবাক হয়েছিল লোকটির খামখেয়ালিপনায়। কিন্তু বাবা বলতো, কোনোদিন হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলবি না, তাহলে পরশপাথর পেয়েও হারাবি। ফুলকপিগুলো উৎপলকে বেচে দিয়ে ওকে সঙ্গে করে একটা রিকশায় চেপেছিলো নারায়ণ। তারপর জিটি রোডের ধারের প্রায় ধু ধু মাঠের পাঁচ বিঘে জমি দুটো দেখিয়েছিল। উৎপল উৎসাহিত হয়ে বলেছিল, এ জমির দলিল তোমার নামে? নারায়ণ জানতো উৎপলের আগ্রহ থাকবে না একটা চাষের পরেই। কারণ দিনরাত এক করে এবারে নারায়ণ জমিতে আলু চাষ করেছিল। শেষে ফসল তুলতে গিয়ে দেখেছিলো, বেশিরভাগ আলু দাগী আর কালো হয়েছে। পাড়ার গণ্য মান্য মানুষরা বলেছিল, ও পড়া জমিতে কি ভালো ফসল হয় নাকি? রাস্তা হওয়ার সময়েই ও জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে ও জমি পাথুরে হয়ে গেছে। ওখানে বাড়ি ঘর হলেও চাষ হবে না।

নারায়ণ বুঝেছিলো, দুই বিষয়ী দাদা ওকে ঠকিয়েছে। নিরুপায় হয়েই দাদাদের জমির ফসল বিক্রি করতো নারায়ণ স্টেশনে বসে।

উৎপলের কথায় নারায়ণ বলেছিল, হ্যাঁ দলিল-পরচা সব আমার নামে। উৎপল ওর হাত ধরে বলেছিল, তুমি আমার স্বপ্নের পার্টনার হবে। বিজনেস পার্টনার নয়, আমার দেখা স্বপ্ন সফল করার সঙ্গী হবে? নারায়ণ না বুঝেই বলেছিল, কিন্তু সব ফুলকপি তো বিক্রি করে দিয়েছি আপনাকে, আর তো কোনো সবজি নেই এখন আমার কাছে! উৎপল বুঝিয়ে বলেছিল, ও এই জায়গায়

Sahitya Chayan

ফ্ল্যাট বাড়ি তুলতে চায়। খরচ ওর, জায়গা নারায়ণের। লাভ দুজনের সমান সমান। এই মুহূর্তে এত টাকা দিয়ে জায়গা কিনলে বাড়ি বানানোর টাকা আর থাকবে না উৎপলের কাছে। কেন কে জানে ওই পাগলা মত উৎপলকে সেদিন বিশ্বাস করেছিল নারায়ণ। সেই শুরু ওদের পার্টনারশিপের। বছর দুয়েকের মধ্যেই নারায়ণের জায়গায় তিনটে ফ্ল্যাট বাড়ি, সামনে লন নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। বাসস্ট্যান্ড আর স্টেশনের খুব কাছে, তাছাড়া পাশেই টিস্যু কারখানা থাকায় জমজমাট হতে সময় লাগেনি। কাগজে, টিভিতে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল উৎপল। খুব তাড়াতাড়ি ওদের প্রায় সবগুলো ফ্ল্যাট বুক হয়ে গিয়েছিল। এত টাকা নারায়ণ এক সঙ্গে দেখেনি। উৎপল আর নারায়ণ একের পর এক জায়গা কিনেছিলো আর ফ্ল্যাট বানাচ্ছিলো। সেই থেকে স্টেশনের ধারে ফুলকপি বিক্রি করা নারায়ণ আজকের কন্ট্র্যাক্টর। এত বছরেরও ওর আর উৎপলের মধ্যে দোস্তি কিন্তু কমেনি, বরং বেড়েছে বিশ্বাস। ওদের আশ্রয় কোম্পানিতে এখন কাজ করে বেশ কিছু লোক। পীযুষের সঙ্গে নারায়ণের পরিচয় হয়েছিল এই ফ্ল্যাটবাড়ির রং করতে গিয়েই। নারায়ণ বলেছিল, তোমার কাজ আমার পছন্দ হয়েছে, কাস্টমারকে না ঠকিয়ে সৎ পথে ইনকাম করবে। মন দিয়ে যদি কাজ করো তাহলে কাজের অভাব হবে না। আশ্রয় কোম্পানির সব কাজ তোমায় দেব। যদিও আশ্রয়ের তখন এতটাও বাড়বাড়ন্ত হয়নি। পীযুষ তখন রাইগঞ্জের বাসিন্দা ছিল। বাড়ির কুলাঙ্গার ছেলে। এক দাদা পোস্টমাস্টার আরেক দাদা

Sahitya Chayan

মাস্টার। পীযুষ মাধ্যমিক ফেল, এমনকি বোনটা পর্যন্ত বি.এ পাশ করেছিল। বাড়ির লোকজন লজ্জা পেত ওকে বিশ্বাসবাড়ির ছেলে বলে পরিচয় দিতে। পীযুষ অবশ্যই কোনোদিনই এসবের তোয়াক্কা করতো না। বোনটা পর্যন্ত বলেছিল, তোকে ভাইফোঁটা দিতে আমার ঘেন্না হয়। দুই দাদার সামনে মিষ্টি ধরে ফোঁটা দিত বোন, পীযুষ সেদিন বাড়িতে থাকতো ইচ্ছে করে, যদি কেউ ডাকে। মা বলতো, মদ, বিড়ি এসবের নেশাটা ছেড়ে দে তাহলেই তোকে সবাই আবার আগের মত ভালোবাসবে। বয়ে গেছে পীযুষের লোকের ভালোবাসা পেতে। মেয়েছেলে জাতটাকেই ঘেন্না করতো ও। বোন থেকে মা সবাই যেন ওর দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকাতো। তাই রাস্তায় ডবকা মেয়ে দেখলেই পীযুষ তাকে নোংরা ইশারা করতো। ইভটিজিংয়ের দায়ে একবার জেলও হয়েছিল ওর। তখনও ওই নারায়ণ বোসই ওকে জামিন করিয়ে এনেছিল। রঙের মিস্ত্রি দরকার বলেই ওর খোঁজে এসেছিল বোধহয়।

নারায়ণ বোসের সঙ্গে এর আগেও পীযুষ কাজ করেছিল অনেকগুলো। তারপর বহুদিন বেপাত্তা ছিল ও রাইগঞ্জ বাজার থেকে। আবার এতদিন পরে ওর "আশ্রয়" প্রজেক্টের কাজে ঢুকলো ও। এতদিন শুধু বাড়ি রংই করেছে, ফ্ল্যাটের কাজ করেনি। আবার এত বছর পরে ফ্ল্যাটের কাজে হাত দিয়েছে। এখানে টাকা বেশি। বিশেষ করে নারায়ণবাবুর মত লোক হলে তো কথাই নেই। ওকে দেখে নারায়ণবাবু বলেছিল, বহু বছর পর তোমায় দেখলাম। এদিকের বাজারে শুনলাম তুমি নাকি বিয়ে শাদি

Sahitya Chayan

করে সংসার পেতেছ। তাই আর খুঁজে বের করতে যাইনি। ভাবলাম অন্য কাজ পেয়েছো, হয়তো তাই এ চত্বর ছেড়ে দিয়েছ। পীযুষ হেসে বলেছিল, আজ্ঞে কাজ এখনও রঙেরই করি, তবে ঘরে মেয়ে বউ আছে যে এ কথা ঠিক। বয়েসও তো হলো বলুন।

নারায়ণবাবু রিমলেস চশমার ফাঁক দিয়ে চোখ সরু করে তাকিয়ে বলেছিলেন, বয়েস হলেও স্বভাব বদলেছে বলে তো আমার মনে হচ্ছে না। কাজ দেব ঠিকই, কিন্তু এমন কিছু করবে না যেন বদনাম হয় আমার কোম্পানির। মনে রেখো এই চত্বরে আমরা নাম কামিয়েছি সততার দ্বারা।

পীযুষ হেসে বলেছিল, আমি এখন সংসারী মানুষ, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে সামনেই, এখন আর সেই বয়েস আছে স্যার? নারায়ণবাবু বলেছিলেন, মদের বোতল দেব কিন্তু অন্য ম এর দিকে যেন ঘুরেও তাকাতে না দেখি। দেখলেই বাতিল করবো কাজ থেকে।

জুয়ায় বেশ কিছু ধার হয়ে গেছে পীযুষের, তাই নারায়ণবাবুর এত কথা সহ্য করেও আশ্রয়ের কাজে ঢুকেছিলো ও। তবে এই মানুষটাকে ভিতর থেকে সম্মান করে ও। শূন্য থেকে একশোয় পৌঁছানো লোকদের ও হেব্বি সম্মান করে। আরেকটা সুবিধা আছে এই কোম্পানীতে কাজ করলে, আশ্রয়ের আইকার্ড গলায় ঝুলিয়ে পোস্ট অফিস থেকে ব্যাঙ্ক যেখানেই যাক না কেন কাজ হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। আসলে ব্যাংকের সঙ্গে অনেক টাকার লেনদেন থাকে নারায়ণবাবুদের। তাই ওই কোম্পানির লোকজনকে একটু সম্মান দেয় ব্যাংক। এখান

Sahitya Chayan

থেকে রাইগঞ্জ অনেকগুলো স্টেশন। প্রায় দেড়ঘণ্টার পথ, তাই ইদানিং কাজের পর বাড়িতে ফিরছিল না পীযুষ। ফ্ল্যাটেই সবার সঙ্গে থেকে যাচ্ছিল। মদ-মাংস নিয়ে বেশ কাটছিল। পরশু ফিরেছিল অনেকদিন পরে, ব্যাস মুডটা গেল চটকে। এই মেয়েছেলেগুলোর পাল্লায় পড়লে দামি মদের নেশাও টিকবে না। রাইগঞ্জের পাশেই নীলপুরে পীযুষদের দেশের বাড়ি। এত দিন ধরে রাইগঞ্জে আছে পীযুষ কিন্তু একদিনও দাদাদের কাছে যায়নি। লাস্ট বাড়ি গিয়েছিল মা মারা যেতে। তারপর আর কোনোদিনও যায়নি। শিখার কাছে শুনেছিল বড়দা নাকি একদিন গিয়েছিল ওদের বাড়িতে, তাও আর বাড়িমুখো হয়নি ও। বিয়ের পর অবশ্য মা বলেছিল, শিখাকে নিয়ে বাড়িতেই থাকতে, কিন্তু বৌদিদের মুখভঙ্গি দেখে শিখাকে নিয়ে বাড়ি ভাড়া করে চলে গিয়েছিল ও।

সেই থেকেই নীলপুর, রাইগঞ্জ চত্বর ছেড়েছে পীযুষ।

সে বহু বছর আগেকার কথা। বেশ জোরে সাইকেল চালাচ্ছিল পীযুষ, দশটার ট্রেনটা ধরতেই হবে, নাহলে সবাই বসে ফাঁকি মারবে আর বিড়ি ফুঁকবে। শেষে নারায়ণবাবু ওকে এসে দোষারোপ করবে। আবার সপ্তাহখানেক বাড়ি ফিরবে না পীযুষ, কাজটা আরেকটু এগলে তারপর ফিরবে। তবে ওই মা মেয়েকে একেবারে বিশ্বাস করে না ও। পীযুষ না থাকলে হয়তো ঘরে লোক ঢোকাবে ওরা। তাই আচমকা হানা দিতে হবে বাড়িতে।

॥১৮॥

Sahitya Chayan

আমি কাল কলকাতা ফিরে যাব বৌদি। সুচেতার দিকে তাকিয়ে সৌমী বললো, চলে যাবে? কিন্তু মেয়েটা কোথায় গেল এখনও তো খোঁজ পাওয়া গেল না। সুচেতা জানে দাদা-বৌদি দুজনেই তেমন পছন্দ করে না সুচেতাকে। নেহাত বাবা মারা যাবার আগে এই বাড়িটা দুই ভাইবোনের নামে করে দিয়ে গেছে বলেই "এ বাড়িতে ঢুকিস না" কথাটা এখনও বলে উঠতে পারেনি ওরা। যদিও সুচেতা এ বাড়িতে আসে হাতেগুনে। অহনা বড় হবার পর থেকে তো ওর স্কুল, পড়াশোনা, নিজের স্কুল সামলে আসাই হয় না। অহনা যখন ছোট ছিল তখন অনিরুদ্ধ বিদেশ ট্যুরে গেলে মাঝে মাঝে চলে আসত রাইগঞ্জের বাড়িতে। দাদা বৌদির ছেলে-মেয়ের সঙ্গে অহনার খুব ভালো বন্ধুত্ব ছিলো। টিনা আর তিপাইয়ের সঙ্গে দিনরাত খেলতো অহনা। এখান ছেড়ে কলকাতায় যেতেই চাইতো না। সুচেতার ছোটবেলাতেই মা মারা গিয়েছিল কিডনির রোগে। তখন ডায়ালিসিস ব্যবস্থা এত উন্নত ছিল না। তাছাড়া রাইগঞ্জের হসপিটালে ট্রিটমেন্টও তেমন হতো না। ছয়মাস ধরে ভুগে ভুগে মা মারা গিয়েছিল। সুচেতা তখন ক্লাস এইটে পড়ে। রাইগঞ্জ স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুশোভনবাবু মানুষটা চিরকালই অগোছালো, সংসারী ছিলেন না কোনোদিনই। চিরটা কাল স্কুল স্কুল করেই মেতে থাকতেন। সুচেতার মা বেঁচে থাকতে সংসারের দিকে তাকাতেও হয়নি কোনোদিন। এবারে লক্ষীহীন সংসারে এলোমেলো উদাসীন মানুষটা পড়েছিলো মারাত্মক বিপদে। সুচেতা আর তার থেকে বছর তিনেকের

Sahitya Chayan

বড় দাদা সোহমকে নিয়ে সংসারযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সুশোভনবাবু। অপটু হাতে কাজ করতে করতে মাঝে মাঝেই বলতেন, এ তোমার কেমন বিচার কমলিনী, আমাকে এভাবে একা করে দিয়ে চলে গেলে তুমি? সোহম ছিল মা ন্যাওটা। মা ছাড়া তার এক মুহূর্তও চলতো না। তাই ক্লাস ইলেভেনের সোহম মা চলে যাবার পরে একেবারেই নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল। সুচেতা ছোট থেকেই বাবার পায়ে পায়ে ঘুরত। বড্ড ভালো লাগত বাবা নামক মানুষটার আদর্শ। বিনামূল্যে ছাত্রদের পড়ানো থেকে শুরু করে ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের পড়াশোনার খোঁজ নেওয়াটাও বাবার কাজ ছিল। মা বলতো, সরকার কি শুধু তোমাকেই মাইনে দেয় নাকি? আর কাউকে তো দেখি না ছুটির দিনে ছাত্রদের খোঁজ করতে বেরিয়েছে?

সুশোভনবাবু হেসে বলতেন, ওগো কমলিনী আমায় কেউ মাইনে দেয় বলে আমি এসব করি না। করি যে মাটিতে জন্মেছি তার ঋণ শোধ করার জন্য। এ মাটির কয়েকটা ছেলেমেয়েকেও যদি মানুষ করে গড়তে পারি তবেই হবে ঋণশোধ। ঋণী থাকতে আমার বড় ভয় হয়। পরপাড়ে গিয়ে জবাব দিতে হবে যে। খাওয়া-দাওয়া আয়েশ করা ছাড়া মাতৃভূমির জন্য আমি কি করে এসেছি? তাই তো এ জন্মে ঋণ চুকিয়ে দিয়ে যেতে চাই।

মা গজগজ করতে করতে বলতো, চিরটা কাল মানুষটা একগুঁয়ে থেকে গেল, নিজের ভালো বুঝলো না। সংসারের দিকে তাকালো না, দশের ভালো নিয়ে মেতে থাকলো। বাবা আদর করে বলতো, ওগো কমলিনী

Sahitya Chayan

সংসারের জন্য তো তুমি একাই একশো গো, আমার দশভুজা। সুচেতা জানতো, মা সামনে যতই বাবাকে বকুক ঝকুক মনে মনে অনেকটা সম্মান করতো। তাই তো বাবা ফেরার আগে সুচেতাকে বলতো, বাথরুমে তোর বাবার গামছা, ধুতি এগুলো রেখে আয়, এত ক্লান্ত শরীরে ফেরে মানুষটা, আর কি দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকে!

সুচেতা ছোট থেকেই বাবার আদর্শে বড় হয়েছে, তাই শিক্ষকতা করার গোপন ইচ্ছেটা ও লালন করেছিল সেই মেয়েবেলা থেকেই। যদিও মা বলতো, মেয়েদের বেশি পড়ার দরকার নেই, সোহম পড়ুক, ওকে চাকরি করতে হবে, তোকে উচ্চামাধ্যমিকটা পাশ করিয়ে সম্বন্ধ দেখতে শুরু করবো। মায়ের এই কথাটা শুনলেই বুকটা কেঁপে উঠতো স্কুলের ভালো ছাত্রী সুচেতার। একদিন চুপি চুপি বাবার কানে গিয়ে নালিশও করে এসেছিল। বাবা, মা বলছে আমায় নাকি পড়াবে না বেশি দূর। দাদাকে পড়াবে আমার নাকি বিয়ে দিয়ে দেবে। বাবা একমুখ হেসে বলেছিল, তুই বাবাকে বিশ্বাস করিস তো? তাহলে আজ গীতার সামনে দাঁড়িয়ে তোকে কথা দিলাম, তুই যতদূর পারবি আমি তোকে পড়াবো। যদি ইচ্ছে হয় তবে বিয়ে করবি না হলে করবি না। ক্লাস সেভেন এইটের সুচেতা বুঝেছিলো, এই মানুষটার কথার দাম অনেক।

কিন্তু এই দৃঢ়চেতা মানুষটাই মায়ের মৃত্যুর পর বেশ ভেঙে পড়েছিলো ভিতরে ভিতরে। সামনে যতই শক্ত থাকার চেষ্টা করুক না কেন, ওদের দুই ভাইবোনকে নিয়ে কিভাবে সংসার আর স্কুল সামলাবে সেটাই ছিল চিন্তার

Sahitya Chayan

বিষয়। রাতের অন্ধকারে মায়ের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বাবা বলতো, কমলিনী এভাবে শোধ নিলে তোমাকে অবহেলা করার? এভাবে মাঝ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলে আমার ছোট নৌকাটাকে? তুমি তো জানতে ধ্রুবতারা ছাড়া নাবিক দিকভ্রান্ত হবে, হারিয়ে যাবে মাঝ দরিয়ায়, তারপরেও কেন চলে গেলে কমলিনী? বাবার ডুকরে কান্নাটা বুকে এসে বেজেছিলো সুচেতার। একদিকে মা হারানোর কষ্ট, অন্য দিকে বাবার ভেঙে পড়াতে ক্লাস এইটেই শৈশব ছেড়ে রাতারাতি প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে গিয়েছিলো সুচেতা। বাবার হাত ধরে বলেছিল, চিন্তা করো না, আমি তো আছি। ওইটুকু বয়েসে অত মনের জোর যে কোথা থেকে পেয়েছিলো সেটা বোধহয় ও নিজেও জানতো না। বাবাও অবাক হয়ে তাকিয়ে খড়কুটোর মত আঁকড়ে ধরেছিল সুচেতার হাত, বলেছিল পারবি? তোকে দেখতে পুরো তোর মায়ের মত। তোর গলার স্বরটাও তোর মায়ের মতন, তুই যখন বলছিস নিশ্চয়ই পারবি।

পিসি, মাসিরা পালা করে ছিলো কিছুদিন, কিন্তু সকলেরই সংসার আছে তাই ওদের সংসারের দায়িত্ব নিয়ে কেউ পড়ে থাকতে পারে না। বাধ্য হয়েই সুচেতা শিখে নিয়েছিল সংসারের খুঁটিনাটি। ভোরে উঠে নিজের পড়াশোনা করে রান্নাঘরে ঢুকে সকলের জন্য চা করতো, তারপরে ঢুকত জবাদি। কি রান্না হবে জবাদিকে বুঝিয়ে দিয়ে স্কুলের জন্য বইখাতা গুছিয়ে নিত। সবার টিফিন ভরে, স্নান সেরে স্কুলে ছুটতো। এভাবেই কি করে যেন মা চলে যাবার পরেও ঝড়ের গতিতে কেটে গিয়েছিল

Sahitya Chayan

সুচেতার দিনগুলো। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, হুল্লোড় এসবের বাইরেও দায়িত্ব নামক এক ভারী বোঝা কাঁধে কেটেছিল ওর স্কুলবেলা। বাবা আবার মেতে উঠেছিলো ভালো ছাত্র তৈরির কাজে। সোহম তখন কলেজ স্টুডেন্ট, নিজের মধ্যেই নিজের জগৎ নিয়ে ব্যস্ত। চিরকালের একটু ইন্ট্রোভার্ট সোহম বাড়িতে বাবা বা বোনের সঙ্গে তেমন কথা বলতো না কোনোদিনই। মায়ের সঙ্গেই ছিল তার মনের আদানপ্রদান। তাই মা মারা যাবার পরে সংসারের দায়িত্ব সুচেতা নিলেও সোহমের কাছে কোনোদিনই আদরের বোন হয়ে উঠতে পারেনি। বরং ও বাবার প্রিয় ছিল বলেই হয়তো দূরত্বটা রয়েই গিয়েছিল দাদার সঙ্গে। ভাইবোনের খুনসুটি শেষ হয়েছিল বোধহয় ক্লাস টু-থ্রিতে। তারপর সুচেতার থেকে একটু কম মেধাবী সোহম বোনকে বোধহয় প্রতিযোগীর আসনে বসিয়ে ফেলেছিল নিজের অজান্তেই। সুচেতাও দাদাভাই বলে জড়িয়ে ধরতে পারেনি সোহমকে। স্কুল যাওয়ার আগে দাদার টিফিন গুছিয়ে দিয়েছে, দাদাকে ভাতের থালা সাজিয়ে দিয়েছে যত্ন করে, জন্মদিনে মায়ের পরিবর্তে ও পায়েস রান্না করেও দিয়েছে দাদাকে তবুও কেন কে জানে মনের দূরত্বটা কোনোভাবেই কমিয়ে আনেনি সোহম। সুচেতাও সংকোচে সরেই গিয়েছিল ক্রমশ। সোহম নিজের পছন্দের সাবজেক্ট ইংলিশ নিয়ে পড়তে শুরু করেছিল। সুচেতাও উচ্চমাধ্যমিকের পর পছন্দের সাবজেক্ট নিয়ে শুরু করেছিল কলেজ জীবন। ওর জীবনের বেস্ট টাইম কলেজ জীবনটা। না, অনিরুদ্ধর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বলে নয়। রায়গঞ্জের মফঃস্বল ছেড়ে,

Sahitya Chayan

কাকা, জ্যাঠাদের ধারণা "মেয়েদের এত পড়ার কি দরকারের" গন্ডি ছাড়িয়ে কলকাতার কলেজে ভর্তি আর হোস্টেলের ছোট ঘরে আরও দুজন রুমমেটের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করার লড়াইয়ে জিতে গিয়েছিল সুচেতা। সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়াটাই ছিল সব থেকে বড় লড়াই। জবা ততদিনে ওদের সংসারের দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে। স্বামী পরিত্যক্তা জবাদি সুচেতার বাবাকে কাকু বলে ডাকলেও সম্মান করতো ঈশ্বরের মতই। বলতো, কাকু না থাকলে আমায় ওরা পিষে মারত। জবাদির মত সৎ মেয়ের হাতে রাইগঞ্জের বাড়ি, বাবা, দাদার দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্তে কলকাতায় আসতে পেরেছিল সুচেতা। সোহম প্রথমেই বলেছিল, আমি রাইগঞ্জ ছেড়ে কোথাও যাবো না। তাই ও ভর্তি হয়েছিল নীলপুরে কলেজে। মাঝে দুটো স্টেশন ও ট্রেনেই যেত কলেজ। সুচেতার উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্টের পরে বাবা কানে কানে বলেছিল, আমার একটা স্বপ্ন ছিল, তুই পূরণ করবি সুচেতা?

বাবাকে ওভাবে ছেলেমানুষের মত আব্দার করতে কখনো দেখেনি সুচেতা। তাই ঘাড় নেড়ে বলেছিল, আমি তোমার সব ইচ্ছে পূরণ করার চেষ্টা করবো বাবা। বাবা একটু নীরবে থেকে বলেছিল, তুই প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হবি? আমার খুব শখ ছিল প্রেসিডেন্সি থেকে পড়াশোনা করবো। কিন্তু নীলপুরে কলেজেই পড়তে হয়েছিল আমায়। গায়ে মফস্বলের গন্ধ মাখা সুচেতা বাবার হাতটা জড়িয়ে

Sahitya Chayan

ধরে বলেছিল, কিন্তু আমি চলে গেলে তোমার, দাদার কে যত্ন নেবে বাবা?

বাবা নির্লিপ্ত গলায় বলেছিল, সোহম তো নিজের নিয়েই ব্যস্ত, আমিও তো সারাদিন স্কুল আর স্কুলের কাজ নিয়েই মেতে থাকি, বাড়িতে জবা আছে, ও ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে। তাছাড়া তোর জেঠু বলছিলো, ভালো সম্বন্ধ আছে, সূচীর বিয়ে দিবি শুভ? বিয়ে দিলে তো তুই আর এ বাড়ি আঁকড়ে পড়ে থাকবি না। ধরে নে তোর বিয়েই দিয়ে দিলাম, তুই চলে গেলি কলকাতা। ক্লাস এইট থেকে এ সংসারের অনেক দায়িত্ব তুই পালন করেছিস রে। এবারে তোর স্বপ্নপূরণ করার দায়িত্ব আমার। শুধু তোর নয়, আমার অপূর্ণ ইচ্ছেটাও তুই পূরণ করে দিবি। সুচেতা বাবাকে কখনো এমন আবেগী গলায় কথা বলতেই দেখেনি, এ যেন দু-চোখে স্বপ্ন আঁকছে বাবা সুচেতাকে কেন্দ্র করে। তাই মনের সমস্ত দ্বিধা নিমেষে সরিয়ে ও বলেছিল, যাবো। বাবা উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, তাহলে আমি গিয়ে ফর্ম নিয়ে আসবো তোর রেজাল্ট নিয়ে গিয়ে।

কদিনের মধ্যেই বাবা ওকে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিয়েছিল বিশাল ক্যাম্পাসের কলেজটাতে। সেই শুরু সুচেতার কলকাতা জীবন। গা থেকে মফস্বলের গন্ধ মুছে নিজেকে শহুরে করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টায় ও তখন মশগুল। জীবন মানে রাইগঞ্জের বাজার নয়, এটা ও তখন বুঝতে শুরু করেছে। আশপাশের বন্ধুদের দেখে নিজেকে একটু একটু করে বদলানোর চেষ্টা করছিল সুচেতা। না বদলালে ও টিকে থাকতে পারবে না এখানের পরিবেশে,

Sahitya Chayan

সেটুকু ও বেশ বুঝতে পেরেছিল। মনের ভিতরে সবুজটুকুকে বাঁচিয়ে রেখেই বাইরে ঘষে মেজে তৈরি করেছিল নিজেকে। পোশাক, কথা বলার ভঙ্গিমা, হাঁটাচলার স্টাইল সব রপ্ত করতে হবে ওকে। শুধু পড়াশোনা করলেই চলবে না। আরো অনেক কিছু শেখার আছে। এই একটু একটু করে ওর স্বপ্ন পূরণের দিনে অচমকাই দেখা হয়েছিল অনিরুদ্ধর সঙ্গে।

দেখাটা নেহাতই কাকতালীয়ভাবে হয়েছিল। ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে আনমনে চলে গিয়েছিল কলেজস্ট্রিটের একটা পুরোনো বইয়ের দোকানে, মনে পড়েছিলো ওর নিজের কিছু বই কেনার দরকার আছে। এটা ওটা ঘাঁটাঘাঁটি করার সময়েই একটা ছেলে এসে পিছন থেকে বলেছিল, এই যে মিস আপনার গলার চেনটা। চমকে উঠে পিছনে তাকিয়ে সুচেতা দেখেছিলো বেশ সুদর্শন একটি ছেলের হাতে ওর গলার লকেটওয়ালা সোনার চেনটা। ছেলেটির ডান হাতে ওর চেন আর বাঁ হাতে আরেকটা অল্পবয়সি ছেলের হাত ধরা আছে বেশ শক্ত করে। ছেলেটির মুখে কাতরতা। হাতে বেশ লাগছে সেটা ওর মুখভঙ্গিমা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সুচেতা জিজ্ঞেস করেছিল, আমার গলার চেন আপনার কাছে কি করে গেল?

ছেলেটি হেসে বলেছিল, ভায়া হয়ে। এই যে বীরপুরুষকে দেখছেন, এই মহারাজ আপনার অন্যমনস্কতার সুযোগে গলা থেকে এটা কুটুস করে কেটে নিয়ে দৌড়াচ্ছিলো। কিন্তু রিপোর্টারের শ্যেন নজরে পড়ে বেচারার আজকের বাজারটা নষ্ট হয়ে গেল। নিন চেনটা

Sahitya Chayan

ধরুন, একে আমি থানায় চালান করে দিয়ে আসি। পকেটমার ধরায় আমার এক্সট্রা কোয়ালিটি আছে আমি নিজেও জানতাম না। না জেনেই এই নিয়ে তিনজনকে ধরলাম। সুচেতা চেনটা নিয়ে বলেছিল, কিন্তু আপনার পরিচয়টা তো....

আমার নাম অনিরুদ্ধ পাল, স্পোর্টস রিপোর্টার। সদ্য একটা দৈনিক পেপারে জয়েন করেছি। সুচেতা কিছু বলার আগেই বলেছিল, আরেকটু সচেতন হয়ে চলাফেরা করবেন। অনিরুদ্ধর হাত ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছিল পকেটমারটা। অনিরুদ্ধ ভিড় ঠেলে তাকে আবার ধরে ফেলল অদ্ভুত কায়দায়। ছেলেটা ছুরি বের করেছিল, সেটাও কিভাবে যেন কব্জির জোরে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল অনিরুদ্ধ। তারপর তাকে টানতে টানতে হারিয়ে গিয়েছিল কলেজস্ট্রিটের গলিতে। সুচেতা তখনও কেমন ঘোরের মধ্যে ছিল। কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, কখন ওর হারটা কেটে নিলো ছেলেটা! আর কখনই বা অনিরুদ্ধ নামের ছেলেটা এই চোরটাকে ধরলো?

দোকানদার সুচেতার দিকে তাকিয়ে বলল, ওই স্যার আপনাকে পিছন থেকে ডাকছিল, আপনি শুনতেই পাননি। তারপর ছুটে গিয়ে ওই চোরটাকে ধরলেন।

কি বই দেব দিদিমণি?

সুচেতা বলেছিল নেক্সট ডে এসে নেব বই, আজ চলি।

হোস্টেলে ফিরে বান্ধবীদের বলেছিল আজকের বিকেলের বইপাড়ার গল্পটা। কিন্তু কেউই তখন অনিরুদ্ধ পালের সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারেনি। স্পোর্টস

Sahitya Chayan

নিয়ে কোনোদিনই কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না সুচেতার। বরং খবরের কাগজ পেলেই মুভির পাতাটা একবার চোখ বুলিয়ে নিতো। কেন কে জানে তারপর থেকে একবার করে স্পোর্টসের পাতাটাও চোখ বুলিয়ে নিত। তারপরেই বার তিনেক গেছে বই পাড়ায় কিন্তু ওই রিপোর্টারের দেখা মেলেনি। সেকেন্ড ইয়ারের শেষের দিকে যখন অনিরুদ্ধর নামটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল সুচেতা তখনই একদিন নামি কাগজের স্পোর্টসের পাতায় নিজস্ব প্রতিনিধির জায়গায় দেখেছিলো অনিরুদ্ধ পালের নামটা। আবারও বছর খানেক আগের বিকেলের স্মৃতিটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। কাগজের অফিসে ফোন করে অনিরুদ্ধর ফোন নম্বর চেয়েছিল। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ ফোনটা ধরে থাকার পরে কেউ একজন কেজো গলায় বলেছিল, এভাবে আমাদের সিনিয়র রিপোর্টারের ফোন নম্বর আপনাকে দেওয়া যাবে না। বিরক্ত হয়ে ফোনটা কেটে দেওয়ার আগে সুচেতা বলেছিল, উনি আমার পরিচিত। কেটে গিয়েছিল ফোনটা।

সেদিন ছিল এক বৃষ্টি ভেজা দুপুর। কলেজ থেকেই বন্ধুদের সঙ্গে কফিহাউসে বসেছিলো সুচেতা। হঠাৎই কেউ একজন কানের কাছে বলে উঠেছিলো, যাক, আজ চেনটা যাহোক গলাতেই আছে। বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠেছিলো সুচেতার। কোনোমতে নিজেকে সামলে বলে উঠেছিলো, আমি তো আপনাকে অনেক খুঁজেছি....কিন্তু...

অনিরুদ্ধ স্মার্টলি হেসে বলেছিল, কেন খুঁজছিলেন? আংটি, কানের দুল কিছু হারিয়েছেন বুঝি?

Sahitya Chayan

সুচেতার দিকে অন্য বন্ধুরা তাকিয়েছিল। কেয়া আলটপকা বলেছিল, এই সেই স্পোর্টস রিপোর্টার? যার জন্য তুই আজকাল তিনটে নিউজ পেপার নিচ্ছিস?

ইস, কেয়াটা যে কি করে না! লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিয়ে সুচেতা বলেছিল, না অন্যকিছু হারাইনি, তবে সেদিন একটা ধন্যবাদও দেওয়া হলো না তাই আর কি। এটা আমার মায়ের স্মৃতি, তাই হারিয়ে গেলে সোনা হারানোর থেকেও বেশি কষ্ট পেতাম আমি আর বাবা।

অনিরুদ্ধ পাশের মেয়েগুলোর দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে বলেছিল, তো আজ যখন কফিহাউসের টেবিলে হঠাৎ দেখা হয়েই গেল তখন টুকটুক করে এক রানই নেবেন? নাকি ওভার বাউন্ডারির ইচ্ছে আছে? সুচেতা না বুঝেই ভ্রু কুঁচকে বলেছিল, বুঝলাম না, আরেকবার বলুন....অনিরুদ্ধ স্মার্টলি বলেছিল, এই কথাটা যখন বোঝেননি, তখন এটার রিপিট করে আর লাভ নেই। আমি বরং অন্যভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি। শুকনো ধন্যবাদ দিয়েই বিদেয় করবেন? নাকি কফি, ফিসফ্রাই অবধি টানবেন ধন্যবাদটাকে, সেটাই জিজ্ঞেস করছি। আমি কফি অর্ডার করার আগে ট্রিট পাবার লক্ষণ আছে কিনা সেটা আরেকবার শিওর হয়ে নিচ্ছিলাম, এই আর কি।

কেয়া ফিসফিস করে বললো, সূচী কি হ্যান্ডু রে ছেলেটা। তবে মারাত্মক স্মার্ট কিন্তু বস, একটু ধরে খেলিস। মানে টেস্ট খেলিস, ওয়ানডের রিস্ক নিস না। প্রথমেই আউট হয়ে ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন, বুঝলি?

Sahitya Chayan

সুচেতা অনিরুদ্ধর দিকে বোকার মত তাকিয়ে বলেছিল, না, না, আমি ট্রিট দিচ্ছি। বলুন কি খাবেন?

অনিরুদ্ধ হেসে বলেছিল, তাহলে তো আপনাকে আমার টেবিলে এসে বসতে হয়, ট্রিট দেবেন আপনি, আর খাবেন অন্যদের সঙ্গে, তা কেমন করে হয়? অবশ্য যদি আপনার বন্ধুদের আপত্তি না থাকে তবেই। নাহলে আমি কাবাবের মধ্যমণি না হয়ে একপেশে হাড্ডি হয়ে সরে যাবো।

রূপালী কনুই দিয়ে খোঁচা দিয়ে সুচেতার কানে কানে বলেছিল, তুই আউট হয়ে গেছিস অলরেডি। তাই ব্যাটিংয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে বোলিং করার জন্য রেডি হ।

কেয়া বললো, যা ওঠ, বসে থাকিস না ভ্যাবলার মত। প্রায় দু-বছর আমরা অনেক চেষ্টা করে তোকে গড়ে-পিঠে নিয়েছি, আজ অন্তত মাঠে থাকিস প্লিজ, গ্যালারিতে দর্শকাসন অলংকৃত করিস না দয়া করে।

সুচেতা কাঁপা পায়ে এগিয়ে গিয়েছিল অনিরুদ্ধর টেবিলের দিকে। টেবিলে বসতেই অনিরুদ্ধ বলেছিল, তাহলে ফিসফ্রাই আর কফি অর্ডার করি? ব্ল্যাক কফি না মিল্ক কফি কোনটা বলবো আপনার জন্য?

সুচেতা ভীতু গলায় বলেছিল, মিল্ক কফি। সুচেতা বরাবরই নির্বিবাদী শান্ত মেয়ে নামেই পরিচিত ছিল রাইগঞ্জে। কোনোদিন কারোর মুখের ওপর কিছু বলে উঠতে পারলো না। অন্যায় দেখলেও মুখ বুজে সহ্য করে নিতো। সোহম তাও গোঁজ হয়ে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিত, কিন্তু সুচেতা দুদিন পরে সব ভুলে আবার

Sahitya Chayan

তার উপকার করতো। সেই ছোট থেকেই দায়িত্ব কর্তব্যের ভারে বাঁচতে বাঁচতে কবে যেন অপ্রিয় সত্য বলার ক্ষমতাটাই হারিয়ে ফেলেছিল ও। বন্ধুরা বলে, তোর সমস্যাটা কোথায় জানিস? তুই আনস্মার্ট নোস, তুই বড্ড ভীতু। সবেতেই তোর ভয়, তাই নিজেকে গুটিয়ে রাখিস বেশি, আর মনে করিস তুই মফঃস্বলের মেয়ে তাই শহরে অ্যাডজাস্ট করতে অসুবিধা হচ্ছে!

সুচেতা জানে ও একটু ভীতু। বেশি চেঁচামেচি, ঝগড়া এসব শুনলেই ওর ভয় করতো ছোট থেকে।

ওর গলার জড়তা লক্ষ্য করেই অনিরুদ্ধ বললো, রিল্যাক্স, আমি মিডিয়ায় আপনার ছবি ছাপাতে আসিনি। তাই মুখটা অমন কাঁচুমাচু করে রাখবেন না। আর শুনুন, যদিও কারোর ব্যক্তিগত রুচিতে ইন্টারফেয়ার করা আমি পছন্দ করি না, তবুও বলছি, কখনো ব্ল্যাক কফি খেয়ে দেখবেন। এখানের ব্ল্যাক কফির এতটাই নিজস্বতা আছে যে দুধ মিশিয়ে নিজের রূপ বাড়াতে হয় না। যেমন কারোর কারোর চোখে এমন সৌন্দর্য থাকে যে কাজল লাগে না। সুচেতার চোখের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে কথাগুলো বলছিল অনিরুদ্ধ। সুচেতা আরও লজ্জিত হয়ে টেবিলের বার্নিসের দিকে মনোনিবেশ করেছিল। অনিরুদ্ধ গলার টোন সম্পূর্ণ চেঞ্জ করে বলেছিল, আপনি লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইটে বিশ্বাসী? মানে প্রথম দর্শনে প্রেমে বিশ্বাস করেন?

সুচেতা ঠিক কি বলবে না বুঝে বলেছিল, না, বিশ্বাসী নই।

Sahitya Chayan

অনিরুদ্ধ একটু গম্ভীরভাবে বলেছিল, আমিও বিশ্বাস করতাম না এতদিন।

সুচেতা একটু সাহস করে বলেছিল, এতদিন করতেন না, মানে এখন করেন?

অনিরুদ্ধ হেসে বলেছিল, মাঝে মাঝে নিজের চেনা জানা সব হিসেব নিকেস ওলটপালট হয়ে যায়। তখন মন আর মাথার দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। মন অবাধ্যতা করে আর মস্তিস্ক স্নায়ুকে শক্ত করে ধরে রাখতে চায়। চলে মারাত্মক লড়াই, কে যে জিতবে কে জানে!

সুচেতা ফিসফ্রাই কামড়ে বললো, কে জিতলে আপনি খুশি হবেন?

অনিরুদ্ধ কফির কাপটা নামিয়ে বললো, আমি মাথাকে জেতাতে চাইছি আপ্রাণ, কিন্তু মন জিতলেই বেশি খুশি হই।

সুচেতা নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে বললো, এমন প্রেমে কি আপনি প্রায়শই পড়েন? মানে প্রথম দেখায় প্রেম বলেই জিজ্ঞেস করলাম। অনিরুদ্ধ হেসে বললো, না, যারা যারা আমার নিউজ অফিসে কল করে উদ্বিগ্ন হয়ে আমার খবর জানতে চায় শুধু তাদের প্রেমেই পড়ি।

সুচেতা ছটফট করে বলে ফেললো, আপনাকে কে বলল, আমি কল করেছিলাম?

অনিরুদ্ধ হেসে বললো, ম্যাডাম রিপোর্টারের জব করি, চোখ কান খোলা না থাকলে পেট চলবে কি করে?

কিন্তু আপনিই তো বলেছেন, আমি নাকি আপনার পরিচিত, এখন এমন অপরিচিতর মত ব্যবহার করছেন

Sahitya Chayan

কেন?

সুচেতাকে লজ্জা দিয়ে অপ্রস্তুত করেই যেন অনিরুদ্ধর আনন্দ। সুচেতা ব্যাগ খুলে বিল পেমেন্ট করতে গেলে অনিরুদ্ধ বললো, আমি পেমেন্ট করে দিয়েছি। আর ওই যে পার্সেলটা নিন, ওটা আপনার বন্ধুদের জন্য। যারা আপনাকে টেস্ট ম্যাচ খেলার পরামর্শ দিয়ে এই টেবিলে পাঠালো। সুচেতা কোনোমতে বললো, কিন্তু ট্রিট তো আমার দেবার কথা।

অনিরুদ্ধ বললো, পার্থিব জিনিস খুঁজে পেয়েছেন বলে ট্রিট না দিয়ে যদি কখনো অপার্থিব জিনিস হারিয়ে যায় আর কিছুতেই তাকে খুঁজে না পান, তখন না হয় আপনি ট্রিট দেবেন। সুচেতা লজ্জায় অধোবদন হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিছুতেই চেষ্টা করেও অনিরুদ্ধর দিকে তাকাতে পারছিল না সোজাসুজি।

কলেজ আর ডিপার্টমেন্টটা তো জানলাম, কিন্তু আপনার বাড়িটাই তো জানা হলো না। সুচেতার বাড়ি রাইগঞ্জ শুনে অনিরুদ্ধ বেশ আগ্রহের সঙ্গে বলেছিল, সূর্যপুরে আমার বাবার একটা ছোট কটেজ আছে। বাবা মারা যাবার পরে ওখানে আর কেউ থাকে না। আমি ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম কয়েকবার। ইচ্ছে আছে সুবর্ণ নদীর ধারে ওই ছোট কটেজটাকে বড় করে একটা বাড়ি বানাবো। দিয়ে রিটায়ারমেন্টের পরে ওখানেই আত্মগোপন করবো। মানে অবসর কাটাবো আরকি। ওই রুটে বেশ কয়েকবার গেছি, তখনই যদি রাইগঞ্জে একবার নেমে পড়তাম

Sahitya Chayan

তাহলে হয়তো পরিচয়টা আরও আগেই হয়ে যেত, তাই না?

অনিরুদ্ধ একটা কার্ড ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, এতে আমার অফিসের আর বাড়ির দুটোরই ফোন নম্বর আছে। টেস্ট ম্যাচে কাজে লাগতে পারে।

সুচেতা বললো, আমি আসছি, ওরা ওয়েট করছে।

অনিরুদ্ধ হেসে বললো, আমিও করবো, অপেক্ষা।

সুচেতার গালে সেই মুহূর্তে কৃষ্ণচূড়ারা নিজেদের রং উজাড় করে দিয়েছিল। অনিরুদ্ধর সামনে থেকে পালিয়ে বেঁচেছিলো ও। সারা রাস্তা রূপালী আর কেয়ার হাজার প্রশ্নের উত্তরে ও শুধু একটা কথাই বলেছিল, ভালোলাগা আর ভালোবাসায় বিস্তর ফারাক তাই না রে? কেউ কেউ বোধহয় ভালোলাগাকে ভালোবাসা ভেবে ভুল করে, তাই না? কেয়া বিজ্ঞের মত বলেছিল, জটিল কেস, অবজার্ভেশনে রাখতে হবে। অনিরুদ্ধকে প্রথম দেখাতেই সুচেতারও ভালো লেগেছিল। নিজে ভীতু বলেই বোধহয় সাহসী আর স্মার্ট অনিরুদ্ধ ওর মনে অনেকটা জায়গা করে নিয়েছিল। কলেজে ক্লাসের ফাঁকে অনিরুদ্ধর বলা কিছু কথা বারবার মনে পড়া সত্ত্বেও সংকোচের বশেই ওর দেওয়া কার্ডটা নিজের ব্যাগে নিয়ে ঘুরলেও ফোনটা আর করা হয়ে ওঠেনি। অনিরুদ্ধর সঙ্গে দেখা হওয়ার একমাস অতিক্রান্ত। সেকেন্ড ইয়ারে এক্সামের ঠিক আগে আগেই একদিন কলেজের একজন স্টুডেন্ট এসে বলেছিল, দিদি তুমিই সুচেতা তাই না? কবাডি চ্যাম্পিয়ন? রাইগঞ্জে বাড়ি? একজন স্পোর্টস রিপোর্টার এসেছেন তোমার

Sahitya Chayan
ইন্টারভিউ নিতে। ক্যাম্পাসের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, তোমাকে একবার দেখা করতে বললেন। দিদি তোমাকে দেখে বোঝাই যায় না তুমি কবাডি চ্যাম্পিয়ন।

সুচেতা বলতে যাচ্ছিল, জীবনে লুকোচুরি আর লুডো ছাড়া আর কোনো গেম ও কখনো খেলেইনি। কবাডি তো স্বপ্নেও আসেনি কোনোদিন। কিন্তু ক্যান্টিনের অনেকেই তখন ওর দিকে সুপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তাই নিজেকে সামলে নিয়ে সুচেতা বলেছিল, আপাতত আর খেলি না। সে অনেক দিন আগের কথা।

রূপালী কানের কাছে বলেছিল, অনিরুদ্ধ ওয়েট করছে, তুই যা। আবারও বলছি, আস্তে খেলিস মেরি মা। এ তোকে আজ কবাডি খেলাচ্ছে কাল বাস্কেটবল খেলাবে পরশু অলিম্পিক জেতাবে। একটু সাবধানে থাকিস সূচী।

সুচেতা মুখ টিপে হেসে বলেছিল, আস্তে নয় এবারে ভাবছি আটশো মিটার একসঙ্গে দৌড়াবো। দেখি স্পোর্টস রিপোর্টার পারে কিনা! সুচেতার ভিতরে তখন উত্তাল করা ঝড়, বাইরে স্বাভাবিক থাকার আপ্রাণ চেষ্টা। অনিরুদ্ধকে দূর থেকে দেখার পর শরীরের সমস্ত রক্তবাহী শিরাগুলো একসঙ্গে ছুটতে চাইছিলো বোধহয়। সুচেতার শাসন অমান্য করেই ওর গালে লালচে ছোপ ধরেছিল, ওর নাকের ডগায় ঘামের বিন্দু জমেছিল, হাতের তালু ঘামছিলো অনবরত, হাঁটার গতি শ্লথ হয়েছিল, পায়ের আঙুলগুলোতেও যেন এসে জমেছিল একরাশ লজ্জা।

সুচেতাকে দেখতে পেয়েই কয়েক পা এগিয়ে এসেছিল অনিরুদ্ধ, সেই একই রকম ভঙ্গিমায় হেসে বলেছিল,

Sahitya Chayan

এভাবে বদনাম করবেন না আমার, এইটুকু আসতে আপনার পাক্কা কুড়ি মিনিট লাগলো, কস্মিনকালেও কবাডি চ্যাম্পিয়ন ছিলেন বললেও পাবলিক বিশ্বাস করবে না। সুচেতা বলেছিল, আপনাকে কে এমন ঢপ দিতে বললো? নাকি এই প্রফেশনে এমন মিথ্যেই সবাই বলে। অনিরুদ্ধ মুচকি হেসে বলেছিল, তথ্য গোপন করার অভিযোগে তো বরাবরই মিডিয়া অভিযুক্ত! মিডিয়ার লোক হিসাবে এ দোষ ঘাড়েই বহন করলাম। কিন্তু একটা কথা বলুন তো, আমি যদি বলতাম, সেকেন্ড ইয়ারের কেমিস্ট্রির মিস সুচেতার জন্য আমি ওয়েট করছি, তাহলে সকলের মনে প্রশ্ন জাগত এই ছেলেটা সুচেতার কে হয়? আপনার দিকে যাতে সন্দেহের তীর না যায় তাই তো আপনাকে ডিস্ট্রিক্ট কবাডি চ্যাম্পিয়ন বানালাম। সুচেতা মুচকি হেসে বলেছিল, ভাগ্যিস অলিম্পিকে গোল্ড জিতেছে বলেননি এই রক্ষে।

অনিরুদ্ধ ফিসফিস করে বলেছিল, গুড গার্লের কি কলেজ বাংক করার অভ্যেস আছে? যদি না থাকে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারেন। নাহলে পরে আপনার নাতিপুতি শুনে হাসবে, বলবে ওমা দিদিয়া তুমি একদিনও কলেজ বাংক করোনি? আসলে এটা কলেজের ক্যান্টিনে মিষ্টি বেশি চায়ে তুফানি তর্ক তোলার মতই একটা অবশ্য করণীয় কাজ। সুচেতা লাজুক হেসে বলেছিল, কোথায় যেতে হবে?

অনিরুদ্ধ গলাটা আরও একধাপ খাদে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, আমার ফ্ল্যাট ফাঁকা থাকলেও নিজেকে গুড বয়

Sahitya Chayan

প্রমাণ করার জন্য আমি সেখানে আপনাকে নিয়ে যাবো না। বরং লোকারণ্য কফিহাউসেই যাই চলুন।

সুচেতা হেসে বলেছিল, কথায় আপনার সঙ্গে পারার ক্ষমতা আমার নেই, প্রতি বলে গোল খাবো বেশ বুঝতে পারছি।

অনিরুদ্ধ সাবধানে বলেছিল, আসলে কি হলো, একটা ক্রিকেট ম্যাচ কভার করার জন্য আমায় কালকের ফ্লাইটে হায়দরাবাদ যেতে হবে, তাই ভাবলাম ডিউ কাজগুলো সেরেই যাবো। আমাকে আমার অফিসে সবাই কাজপাগল বলে। আমি নাকি কাজ পড়ে থাকলে রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারি না। তাই সপ্তাহ খানেক থাকবো না বলেই ডিউ কাজ সারায় মন দিলাম। তখনই মনে পড়ল, আপনার সঙ্গে দেখা করাটাও খুব জরুরি।

সুচেতা মজা করে বলেছিল, আমার আংটি, কানের দুল, চেন কিছুই তো হারায়নি আপাতত। তাহলে আমার সঙ্গে ডিউ কাজটা ঠিক কি বলুন তো?

অনিরুদ্ধ চেয়ারটা টেনে বললো, বসুন। আসলে আমার চুরি গেছে। তাই আজ সেই চোর ধরতেই যেতে হয়েছিল প্রেসিডেন্সি ক্যাম্পাসে। মানে বলতে পারেন নিতান্ত বাধ্য হয়েই। কি করবো বলুন, শহরের বাইরে যাচ্ছি, তাই চুরি করা জিনিসটা ফেরত চাইছি, প্লিজ দিয়ে দিন।

সুচেতা বলেছিল, তাহলে আজ একজনের অপার্থিব বস্তু চুরি গেছে তাইতো? ট্রিট আমি দিই আজকে।

অনিরুদ্ধ বলেছিল, ফেরত চাই, নাহলে কাজে মন বসছে না যে। সুচেতা লাজুক হেসে বলেছিল, আপনি

Sahitya Chayan

সিওর ওটা আমার কাছেই আছে?

অনিরুদ্ধ কাতর গলায় বলেছিল, কথার মারপ্যাঁচে জড়িয়ে ফেলা মানুষটা নয়, তুখোড় রিপোর্টার নয়, সাকসেসফুল ম্যান নয় আজ তোমার সামনে বসে আছে নিতান্ত নিঃস্ব একজন প্রেমিক, তুমি কি তাকে খালি হাতে ফেরত দেবে সুচেতা?

সুচেতা জানতো না এমন করে কেউ প্রোপজ করতে পারে! স্বপ্নীল আবেগে ভেসে ভাঙা গলায় বলেছিল, অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হলেও এই মুহূর্তে তোমাকে ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা আমার সত্যিই নেই অনি।

অনিরুদ্ধ আবেগী গলায় বলেছিল, এই নামেই ডেকো আমায়। এবারে নিশ্চিন্তে হায়দরাবাদ যাবো। মন দিয়ে নিউজ লিখবো। কেন জানো? নিজেকে বেঁধে দিয়ে গেলাম তোমার সঙ্গে, একই তরীতে পার হবো বাঁধভাঙা নদীটা।

সুচেতা বিল মিটিয়ে বলেছিল, বইপাড়ার বইয়ের পুরোনো গন্ধকে সাক্ষী রেখে কথা দাও, একসঙ্গে হাঁটবো এক পৃথিবী...অনিরুদ্ধ ভিড়ের মধ্যেই ওর হাতটা আলতো করে ধরে বলেছিল, হাঁটবো পৃথিবীর শেষ কিনারা পর্যন্ত।

হোস্টেলের সুপার প্রায়ই ডিনার শেষে ঘরে এসে বলতেন, সুচেতা তোমার কল আছে। তোমার বাবা কল করেছেন। সুচেতা হোস্টেলের ড্রয়িংরুমে ফোনটা ধরার পরেই ওপ্রান্ত থেকে অনি হেসে বলতো, কেমন আছিস মা? দিনরাত পড়াশোনা না করে গরিব ছেলেটাকে তো একটু মনেও করতে পারিস। আহা ছেলেটা কোথায়

Sahitya Chayan

কোথায় ঘুরছে, তোকে না দেখতে পেয়ে কত কষ্ট পাচ্ছে বলতো।

সুচেতার হাসি থামতে চাইতো না। সুপার কটমট করে তাকিয়ে বলতো, এত হাসির কি আছে? বাবা তোমার বন্ধু নন, তাকে সম্মান করে কথা বলতে হয়। অকারণে হেসে গড়াচ্ছ কেন?

অনি শুনে বলেছিল, আর কি বলবো ম্যাডাম, আপনিই শুধু বুঝলেন আমার কষ্টটা। এ মেয়ে সম্মান দূরে থাক, ফোনে একটু আদর অবধি করে না।

সুচেতা ফিসফিস করে বলতো, তোমার দুষ্টুমি থামাবে? সুপার ভাবছেন, এত হাসছি কেন?

অনি সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, তুমি ওনাকে বলো আমার বাপ বলছেন, তোর সুপারের গলাটা মধু ঢালা, তাই শুনে হাসছি। এসব খুনসুটি করতে করতেই ওর আর অনিরুদ্ধর সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল বন্ধুত্বের বন্ধনে ভালোবাসার আবরণ দিয়ে। অনিরুদ্ধর বাবা মারা গিয়েছিলেন ওর কলেজ লাইফে। মা বড়দা বড়বৌদির সংসারেই থাকেন। কলকাতায় বাড়ি হলেও কেন অনিরুদ্ধ ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকে এই প্রশ্নটার উত্তরে অনি বেশ কিছুক্ষণ নীরব ছিল, তারপর বলেছে, আমার এমন প্রফেশন দাদা-বৌদির পছন্দ নয়। এমনকি দিদিরও যখন বিয়ে হয়নি তখন দিদিও বিরোধিতা করতো এই বেহিসেবি জীবনযাত্রার স্টাইলটাকে। ওর রাত করে ফেরা, ওর যখন তখন শহরের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া, এসব নিয়ে নাকি প্রায়ই অশান্তি হচ্ছিল বাড়িতে। এদিকে অনিরুদ্ধর এটাই স্বপ্ন। ও

Sahitya Chayan

সিনিয়রমোস্ট স্পোর্টস রিপোর্টার হবে। পলিটিক্যাল বিট ওকে কোনোদিনই তেমন টানে না। ছোট থেকে ওই বাইশ গজের প্রতি ওর অমোঘ আকর্ষণ। না, ব্যাটে বলে এক করার আকর্ষণ নয়, মাঠের প্রতিটা কোনার খবর লেখা ওর নেশা। তাই এই বাড়ির অবাধ্য ছেলে হয়েই নিজের স্বপ্ন সার্থকের নেশায় নেমে পড়েছিলো ও। এখন মাঝে মাঝে যায় বাড়িতে, মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। মাকে কিছু টাকাও দিয়ে আসে। অনিরুদ্ধ সুচেতাকে বলেছিল, একটা ফ্ল্যাট বুক করেছিলাম। কিন্তু এতদিন সেই ফ্ল্যাট নিয়ে বিশেষ কিছু ভাবিনি জানো। কিন্তু তুমি আসার পরে মনে হচ্ছে তাড়াতাড়ি পজেশন পেতে হবে ওই ফ্ল্যাটের। আপাতত রেন্টে আছে একটা ফ্ল্যাটে। কিন্তু খুব শিগগির ও কলকাতার বুকে একাধিক ফ্ল্যাট কিনবে এ আশা ওর আছে। সুচেতার খুব ভালো লেগেছিল ওর এই মারাত্মক পজেটিভ এনার্জিটা। কখনো অনির মুখে শোনা যায় না, ও পারবে না, ব্যর্থ হবে। বরং অনি সবসময় বলে, নিশ্চয়ই পারবো, শুধু সময়ের অপেক্ষা।

এত বছর অনির সঙ্গে ঘর করেও ওর মত সব নেগেটিভ দিকের একটা করে পজিটিভ অ্যাঙ্গেল খুঁজে বের করার বিশেষ ক্ষমতাটা রপ্ত করে উঠতে পারেনি সুচেতা। তাই তো ভাঙা বিবাহবাসর দেখে বুকটা কেঁদে উঠছে বারবার।

বৌদি আবার বললো, তোমার দাদা কি তোমায় দিয়ে আসবে কলকাতায়?

Sahitya Chayan

সুচেতা পুরোনো দিন থেকে ফেরত এলো রাইগঞ্জের বাড়িতে। তারপর নির্লিপ্ত গলায় বলল, না বৌদি, আমি একাই যেতে পারবো।

আনমনে আবার ভাবনার সমুদ্রে ডুব দিলো ও। বৌদি নিজের কাজে চলে গেল। এমন ফেলে ছড়িয়ে ভাঙা বিয়ে আগলে রাখলেই তো আর সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে না। তাই গোছাতে হবে ওদের নিজের সংসার। সুচেতারও উচিত এবারে কলকাতার ফ্ল্যাটে ফেরত যাওয়া। অহনা যখন নিজের ইচ্ছেয় গেছে তখন ফিরবেও হয়তো মর্জি মত, তাই অকারণে এখানে বসে থেকে বিশেষ লাভ নেই। স্কুল জয়েন করবে সপ্তাহখানেক পর। মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে এক সপ্তাহ ছুটি নেওয়া ছিল সুচেতার। স্কুলে ঢুকে টিচার্স কমন রুমে প্রথম দিন ঠিক কোন কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হবে ও ভাবতে ভাবতেই কলেজবেলায় স্বপ্নীল দিনগুলো চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল। ফিরে এলো বাস্তবের রূঢ়তা। মা হিসাবে ও যে ভীষণভাবে ব্যর্থ, সেটা অনিরুদ্ধর কথা বলার ভঙ্গিমাতেই লুকিয়ে ছিল। রাইগঞ্জ থেকে বিয়ে দেওয়াতেই আপত্তি ছিল অনিরুদ্ধর, সুচেতাই জেদ করে ওর দেশের বাড়ি থেকে বিয়েটা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সেটা যে এভাবে ওকে বিদ্রুপ করবে ও কল্পনাও করতে পারেনি।

বাবার ছবির দিকে তাকিয়ে দেখল টাটকা রজনীগন্ধার মালাটা দুলছে বাবার আবক্ষ ছবিতে। স্মিতহাস্য মানুষটার ঠোঁটের কোণে যেন লেগে আছে আলগা সংকোচ। সেদিকে তাকিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো সুচেতা। সেই ছোট

Sahitya Chayan
থেকেই ওর সব মান অভিমান উজাড় করে বলতো যে মানুষটার কাছে সে মানুষটাও ওকে ছেড়ে চলে গেছে কতদিন আগে। নিজেকে বড্ড একলা লাগছে ওর। অনিরুদ্ধকে দোষারোপ করলেও সুচেতা জানে, দোষটা ওর। ধীর পায়ে নিজের ঘরে ঢুকলো ও। দোতলার দুটো ঘর আর এক তলার একটা ঘর আর ড্রয়িংয়ের পজিশনটা বাবা লিখে দিয়েছে সুচেতাকে। বাকি সব দাদার। সুচেতা কালে ভদ্রে এসেছে। অহনার আবার বেশ পছন্দের ছিল রাইগঞ্জের একতলার ঘর এবং সংলগ্ন বারান্দাটা। ও নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়েছিল ওই ঘরটা। প্রায়ই বলতো, আমি ভীষণ আনলাকি মা, দাদাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা হলো না। কিন্তু দাদাইয়ের দেওয়া গিফটা আমার খুব পছন্দ। বেশ একটা মফস্বলের গন্ধ মাখা শহরে ছুটি ছাটায় কাটিয়ে আসলে মন্দ হয় না। মামা-মামী খুব পছন্দ করে না জেনেও অহনা আসতো এই বাড়িতে। এলে নিজের ঘরেই থাকতো। সোহম একদিন বলেছিল, হ্যাঁরে সূচী, কলকাতায় অতবড় ফ্ল্যাট থাকতেও তোরা এ বাড়ির পজেশন ছাড়বি না তাই না?

সুচেতা নরম গলায় বলেছিল, দাদা, তোরাই ব্যবহার কর বারোমাস, শুধু এলে আমায় আমার পুরনো ঘরে আর অহনাকে বাবার ঘরটা ছেড়ে দিস। বাবার শেষ ইচ্ছেটুকুকে মূল্য দিতেই আপাতত পজেশনটুকু থাকুক। পরে নাহয় দানপত্র করে দেব তোকে। সোহম চোখ সরু করে বলেছিল, তোর দানপত্রের আশা ছেড়েই দিলাম।

Sahitya Chayan

কেন যে দাদাটা কোনোদিনই ওকে নিজের ভাবতে পারলো না কে জানে!

ফোনের দিকে তাকালো আরেকবার, অনিরুদ্ধ বলেছিল তিতিরের খবর পেলেই জানাবে, মনটা বড্ড অশান্ত হয়ে আছে। একটা খবরও যদি পাওয়া যেত, তাহলে চিনচিনে যন্ত্রণাটা একটু কমতো।

অনি যখন দায়িত্ব নিয়েছে কিছু একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবে, এটুকু বিশ্বাস সুচেতার আছে ওর প্রতি। আরেকটু অপেক্ষা তো করতেই হবে।

।।১৯।।

অনিরুদ্ধর আজ মর্নিংওয়াকে যাওয়া হয়নি। দীর্ঘদিনের অভ্যাসে বিরতি পড়েছে। বেরোবে বলে রেডি হয়েও মনটা অস্থির করার কারণেই পারেনি। সুচেতা কোনো কারণে কষ্ট পাচ্ছে দেখলে আজও একই রকম মনখারাপ করে ওর। কারণে অকারণে সুচেতার নানা অপমানের সম্মুখীন হবার পরেও সুচেতার ওপরে বেশিক্ষণ অভিমান করে থাকতে পারে না অনিরুদ্ধ। সামনে হয়তো কাঠিন্য বজায় রাখার চেষ্টা করে আপ্রাণ, কিন্তু সুচেতার চোখের জলে আজও একইরকমভাবে উদ্বেলিত হয় ওর মন।

নৈঋতের সঙ্গে কথা বলার পরও সুচেতাকে কোনো খবর দিতে পারেনি অনিরুদ্ধ। আগে ওরা আসুক, ওদের মুখে সবটা জেনে তারপর জানানো উচিত। একটা বইয়ের পাতা উল্টিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছে অনিরুদ্ধ। কিন্তু বারংবার একটাই প্রশ্ন মনের মধ্যে এসে উঁকি দিচ্ছে তিতির পালালো কেন? পালালোই যদি তাহলে নৈঋতের

Sahitya Chayan

সঙ্গে কেন? না মেলা অংকের মতই অস্বস্তিদায়ক হয়ে উঠেছে তিতিরের বিষয়টা। করতে কি চাইছে মেয়েটা?

মায়ের আর কোনো স্বভাব পাক না পাক জেদটুকু যাহোক পেয়েছে। মায়েরও তো জেদ কম নয়, নিজে যেটা বুঝবে সেটাই ঠিক। কলেজস্ট্রিটের দেখা সেই ভীতু ভীতু মেয়েটার মধ্যে যে এমন জেদ থাকতে পারে সেটা কি ঘুনাক্ষরেও আন্দাজ করতে পেরেছিল অনি! বরং তখন সুচেতার মুখটা দেখে মনে হতো, ভীতু ভীতু, মিষ্টি লাজুক একটা মেয়ে।

শহরে এসেও শহুরে কংক্রিটের ঘর্ষণে ওর মনটা পাথুরে হয়ে যায়নি বলেই একটু শান্তি আর স্নিগ্ধতার ছোঁয়া পেতে অনি বারবার ছুটে যেত সুচেতার কাছে। সুচেতার ওই কোমর ছাপানো ঘন চুল, একটু অন্যমনস্ক দৃষ্টি, আত্মভোলা আচরণটা অনিরুদ্ধকে আকৃষ্ট করেছিল প্রথম দিনেই। আত্মভোলা বলেই তো, গলার চেনটা কেটে নিয়ে চলে যাচ্ছিল পকেটমার। প্রথম দর্শনে নিজের ভালোলাগার কথা সুচেতাকে জানানোর পরেই ভ্রু কুঁচকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলেছিল, এমন প্রথম দর্শনে বুঝি অনেককে ভালো লাগে আপনার?

অনিরুদ্ধর বলা হয়নি, যা কিছু দেখতে পায় অভ্যস্ত চোখে সেদিকে নজরই পড়ে না ওর। যেগুলো দেখতে নিতান্ত অনভ্যস্ত লাগে সেখানে গিয়েই আটকে যায় ওর দৃষ্টি। তাই সুচেতার একটু মফস্বলের গন্ধ মাখা চোখের বিস্ময়েই থমকে গিয়েছিল অনিরুদ্ধ। যদিও লাজুক মেয়েটা

Sahitya Chayan

কিছুতেই স্বীকার করতে চায়নি অনিকেও ওর ভালো লেগেছে।

সুচেতার ভালোবাসা প্রকাশের ভঙ্গিমাটা আজও মনে আছে অনিরুদ্ধর। হায়দরাবাদ থেকে ফিরেছিল সেদিন রাতের ফ্লাইটেই। মধ্যরাতে ল্যান্ড ফোনের আওয়াজে ঘুম ভেঙেছিল। ফোনটা রিসিভ করতেই সুচেতা ফিসফিস করে বলেছিল, আমি জানি তুমি ঘুমাচ্ছিলে, আজকেই ফিরেছ, সেটাও জানি। কাল সকালে ক্যাম্পাসের বাইরে গিয়েও কল করতে পারতাম, কিন্তু দেরি হয়ে যাবে তাই হোস্টেলের সকলের ঘুমের সুযোগ নিয়ে এখন ড্রয়িংরুম থেকে করছি ফোনটা। একটু থতমত খেয়ে অনি বলেছিল, কি হয়েছে সুচেতা? এনি প্রবলেম?

সুচেতা গলাটা খাদে নামিয়ে বলেছিল, হ্যাঁ, একটা বিশেষ জিনিস চুরি গেছে বলেই ফোন করছি তোমায়। ঘুমের ঘোরেই উঠে বসেছিলো বিছানায়।

সুচেতা বলেছিল, এই কদিন খুব মিস করেছি তোমায়, বন্ধুরা বলছে আমি নাকি ভালোবেসে ফেলেছি তোমায়। যে ম্যাচটা তুমি কভার করতে গিয়েছিলে সেটাও টিভিতে দেখেছি। আমি ক্রিকেট ভালোবাসি না তাও দেখেছি। শোনো, তোমার ডিপার্টমেন্টকে বলবে, যে রিপোর্টার স্টোরি কভার করতে যাবে তার ছবিও যেন টিভিতে দেখায়।

হো হো করে হেসে উঠেছিলো অনিরুদ্ধ।

তারপর হাসতে হাসতেই বলেছিল, এটা সিরিয়াসলি আমি বলবো। কালকেই অ্যাপ্লিকেশন করবো এই বলে

Sahitya Chayan

যে, আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় লজ্জায় অন্য দিকে তাকিয়ে থাকা প্রেমিকাটিও এই অর্বাচীনের অদর্শনে রীতিমত অস্থির হয়ে যাচ্ছে। মধ্যরাতে ফোন করে আমায় মিস করছি সেটাও জানাচ্ছে। তাই এবার থেকে যেন আমাকে বেশি করে বাইরে ট্যুরে পাঠানো হয়। তবেই আমি আমায় মিস করার এমন মহার্ঘ কথাটি শুনতে পাব তার মুখে।

সুচেতা রেগে গিয়ে বলেছিল, সব সময় ইয়ার্কি ভালো লাগে না, বলে দিলাম।

অনি গভীর গলায় বলেছিল, আগামীকাল বিকেলে দেখা করি?

সুচেতা একটু ভেবে বলেছিল, সকালে আমার তেমন গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস নেই কিন্তু।

অনি রসিকতা করে বলেছিল, কিন্তু ম্যাডাম আপনার এই অর্বাচীন নগণ্য প্রেমিক যে এখন সিনিয়র সাংবাদিক। তাই তার কাজ যে বেড়েছে। সুতরাং বিকেলে দেখা করেই আমি বরং রাধিকার মানভঞ্জন করবো কেমন!

সুচেতা ধ্যাৎ বলে ফোনটা কেটে দিয়েছিল।

সারাদিনের অফিস পলিটিক্স, এগিয়ে যাওয়ার হিংসুটে লড়াই, রাজনৈতিক প্রেশার, অযৌক্তিক সমলোচনা থেকে মুক্তি পেতেই অনিরুদ্ধ ছুটে যেত সুচেতার কাছে। সুচেতার নরম সবুজ মনটার স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে দুদণ্ড বিশ্রাম নিলেই যেন অবসন্ন দেহে শক্তি সঞ্চয় হতো অনির। সেই সুচেতা দিনকে দিন কেমন যেন বদলে গেল। এর পিছনে কি অনিরুদ্ধরই দোষ আছে? হয়তো সুচেতাকে আরেকটু

Sahitya Chayan

সময় দেওয়া উচিত ছিল। নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে থাকতে অনিই বোধহয় ওদের সম্পর্কের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রাচীরটা তুলে দিয়েছিল। আর সুচেতা জেদ করে সেই প্রাচীরটাকে মজবুত সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দিলো। কষ্ট হয় অনির। আরেকবার যদি সেই কলেজের সুচেতাকে ফিরে পেত তাহলে বড্ড ভালো হতো। খ্যাতির শিখরে উঠে দেখেছে চারিদিকটা বড্ড কর্কশ, পাথুরে জমিতে ঠোক্কর খেয়েছে ও। চারপাশে তখন সুচেতার ঘন সবুজ মনটাকে তন্নতন্ন করে খুঁজেও পায়নি। আবিষ্কার করেছে ওর প্রতি কর্তব্যরত সুচেতাও কাঠিন্যের বর্ম পরে নিয়েছে অনির অজান্তেই।

উপলব্ধি করেছে একটা বিশেষ সময়ে সুচেতার প্রতি আরেকটু বেশি যত্নশীল হওয়া উচিত ছিল ওর। তাহলে হয়তো ওদের সম্পর্কের মধ্যে জমে থাকা বরফটা গলতে পারতো। হয়তো কিছুটা লীনতাপ শোষণ করে সুচেতা আবার আগের মত তরল হতো। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো নিজের অজান্তেই। আজকাল প্রায়ই পড়ে এই দীর্ঘশ্বাসটা। বুকের কাছে চাপ হয়ে থাকে একরাশ কষ্ট। তিতিরের বিয়েটা ভেঙে গেল, সেটার দোষও সুচেতা ওকেই দিলো। অনিরুদ্ধ জীবনে একটাই দোষ করেছিল, সুচেতার যখন সব থেকে বেশি প্রয়োজন ছিল ওকে তখনই ও কেরিয়ারের শীর্ষে থাকায় বেশিরভাগ সময় দেশের বাইরে কাটিয়েছে। পরে অনেক চেষ্টা করেও সুচেতার জমে থাকা অভিমানকে আলগা করতে পারেনি। গুটিয়ে নিয়েছে সুচেতা, পাল্টে নিয়েছে নিজেকে। স্কুল, তিতির আর ওর

Sahitya Chayan

প্রতি কর্তব্যটুকু করে গেছে যন্ত্রের মত। অনি একদিন বলেছিল, সুচেতা, প্লিজ এমন কঠিন হয়ে যেও না, যা হয়ে গেছে সেটাকে অ্যাক্সিডেন্ট ভেবে ভুলে যাও, স্বাভাবিক হও। সুচেতা অন্যমনস্কভাবে হেসে বলেছিল, আতঙ্কের দিনগুলোতে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতাম জানো, খুঁজে ফিরতাম সেই অনিকে। পেটের মধ্যে তখন অহনার উপস্থিতি টের পাচ্ছি, বড্ড একা লাগতো তোমার এত বড় সাজানো ফ্ল্যাটে। তুমি ফোনে বলতে চিন্তা কিসের, সব ঠিক হয়ে যাবে। ছুঁতে চাইতাম তোমায়, শুধু নিউজ পেপারে নিজস্ব প্রতিনিধির জায়গায় দেখতাম তোমার নামটুকু। তোমার সাফল্য এসেছে আর আমায় তোমার কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছে অনেকটা দূরে।

সাংবাদিক অনিরুদ্ধ পালের সঙ্গে সেই অনির কত তফাৎ! ওই তফাৎটুকু আমি বোঝার আগেই আমার মন বুঝে গিয়েছিল, তাই তো আর তোমাকে ডিস্টার্ব করেনি সে। তরল অভিমানগুলোকে কঠিন করে ফেলেছে নিজের উদ্যোগে। অনিরুদ্ধ সুচেতার হাত ধরে বলেছিল, আর কি সব ভুলে আমায় আপন করা যায় না সুচেতা?

সুচেতা ক্লান্ত হেসে বলেছিল, যায় বুঝি? তুমি পেরেছ?

অনিরুদ্ধ শান্ত স্বরে বলেছিল, নিশ্চয়ই পেরেছি। সুচেতা চোখ দুটো নামিয়ে বলেছিল, কিন্তু আমার শরীরের উপলব্ধিরা যে অন্য কথা বলেছে আমায়।

অনি থেমে গেছে। বুঝেছে এ মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে সুচেতা নিজেই বেরোতে চায় না। তাই আর জোর করেনি। তিতিরকে নিয়েই অবসরটুকু কাটিয়েছে অনি। কাজের

Sahitya Chayan

প্রেশার বেড়েছে, তিতির বড় হয়েছে, বুড়ো হয়েছে অনিরুদ্ধ কিন্তু সেই কলেজস্ট্রিটে দেখা মেয়েটাকে হাজার খুঁজেও আর পায়নি। এখনো ওর ক্লান্ত মন বারংবার খোঁজে সেই মেয়েটাকে। পাবে না জেনেও ব্যর্থ চেষ্টা করে অনবরত।

দাদাবাবু, দেখুন কারা এসেছে....দিদিমণি আর জামাইবাবু এসেছে।

স্মৃতির ভিড় ঠেলে নিজেকে সামলে নিলো অনিরুদ্ধ। তিতিরের সম্মুখীন হতে হবে ওকে। হয়তো দিতে হবে অনেক প্রশ্নের উত্তর, তাই সচেতন করলো নিজেকে।

বিজু বেশ উত্তেজিত হয়ে ডাকছে বাইরে থেকে। তিতিরের গলা শোনা গেল। অনিরুদ্ধ ওঠার আগেই তিতির ঢুকলো ঘরে। নৈঋতের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল অনিরুদ্ধ। ছেলেটা এমন কিম্ভূত টাইপের পোশাক কেন পরে আছে এখনও সেটাই বোধগম্য হলো না। কালার ধুতি, তসরের পাঞ্জাবি সঙ্গে পিঙ্ক কালারের লেডিস জ্যাকেট। নৈঋত বোধহয় অনিরুদ্ধর দৃষ্টি অনুসরণ করেই বললো, স্যার প্লিজ একটা পায়জামা আর একটা টিশার্ট দিয়ে আমায় উদ্ধার করুন। এভাবে এক বস্ত্রে আমায় রাইগঞ্জ ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল, তাই আমি রণবীর সিংয়ের মত অদ্ভুত পোশাক পরে ঘুরছি, এটা কোনো মুখোপাধ্যায়ের ডিজাইন করা ড্রেস নয়।

ছেলেটার মধ্যে সেন্স অফ হিউমারটা অদ্ভুত। এমন ব্রিলিয়ান্ট ছেলেই অনির বরাবরের পছন্দ। সুচেতা তিতিরের জন্য সঠিক নির্বাচনই করেছিল।

Sahitya Chayan

তিতিরের মুখে বর্ষার ঘন মেঘ জমেছে। তাই নৈঋতের কথাতেও সামান্য হাসলো না মেয়েটা।

বিজু বোধহয় দরজার বাইরে থেকেই নৈঋতের কথাটা শুনেছিল, তাই দুমিনিটের মধ্যেই অনিরুদ্ধর একটা ট্র্যাকসুট আর টিশার্ট এনে বললো, জামাইবাবু, আপনি আমার সঙ্গে আসুন। এদিকে বাথরুম আছে, আমি গিজার অন করে দিয়েছি। আপনি ফ্রেস হয়ে নিন। এই জন্যই বিজুর বিকল্প এখনো কাউকে খুঁজে পায়নি অনিরুদ্ধ। মানুষটার সব দিকে বড্ড নজর।

অনিরুদ্ধর দিকে তাকিয়ে নৈঋত বললো, আমি আসছি। অনিরুদ্ধ নিজেকে স্বাভাবিক করে বললো, তুমি ফ্রেস হয়ে এসে আগে ব্রেকফাস্ট করে নাও, তারপর কথা হবে।

তিতির ঠোঁটটা ফাঁক করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, অনিরুদ্ধ ওকে থামিয়ে দিয়ে বললো ফ্রেস হয়ে নে।

তিতির ঘরে পরার পোশাক নিয়ে অনিরুদ্ধর অ্যাটাচ বাথে ঢুকে গেলো। ঘর থেকে ব্যালকনিতে এসে ফোনটা করলো অনিরুদ্ধ। সুচেতা শোনো, আশপাশে কেউ নেই তো? যেটা বলছি এখুনি ঐবাড়ির কাউকে জানাতে হবে না। সুচেতা উত্তেজিত হয়ে বলল, কোনো খারাপ খবর আছে অনি? আমি সবকিছু শোনার জন্য রেডি, তুমি বলো প্লিজ। সুচেতার গলাটা তিরতির করে কাঁপছে। অনিরুদ্ধ জানে যখন তরল যন্ত্রণাকে ও জমাট বাঁধানোর চেষ্টা করে তখনই এভাবে ওর গলা কাঁপে, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ে। অনিরুদ্ধ একটু জোরেই বললো, আমি বেঁচে থাকতে আমার মেয়ের কিছু হবে না সুচেতা। তোমার সঙ্গে

Sahitya Chayan

অন্যায় আমি হয়তো অনেক করেছি, কিন্তু এতটাও পাপ করিনি জীবনে যে আমি বেঁচে থাকতে আমার তিতিরের কিছু হবে! মন দিয়ে শোনো, শান্ত হও। তিতির আর নৈঋত এখন সূর্যপুরের বাড়িতে ঢুকলো। ওরা ওয়াশরুমে ঢুকেছে। এখনো কথা বলার সুযোগ পাইনি আমি। ঠিক কেন পালাল জেনে জানাচ্ছি তোমায়। তিতির একদম পারফেক্ট আছে।

সুচেতা বিস্মিত গলায় বলল, তুমি কি পাগলের মত বকছো অনি? তিতিরের শোকে কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে তোমার? অহনার সঙ্গে যে ছেলেটার বিয়ে হচ্ছিল তার নাম নৈঋত বসু। তুমি কাকে নৈঋত ভেবে বসে আছো? তিতির কি অন্য কোনো ছেলের সঙ্গে পালিয়েছে নাকি?

অনিরুদ্ধ নরম গলায় বলল, আমার কষ্ট হলেও বাস্তব বুদ্ধি যে লোপ পায় না সেটা তো তুমি জানোই। এর আগেও বহুবার তার প্রমাণ আমি দিয়েছি। তিতির ওভাবে চলে যাওয়ায় দুশ্চিন্তা হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু তাই জন্য উদ্ভ্রান্ত হয়ে ভুলভাল বকবো এমন নয়। নৈঋতকে সঙ্গে নিয়েই তিতির এসেছে এখানে। কেন ওর সঙ্গে পালিয়েছে সেটা আমার কাছেও বিস্ময়, সেটা জানার অপেক্ষায় আছি। জানতে পারলে কল করছি। দুজনেই সুস্থ আছে, তবে তিতির একটু গম্ভীর। তুমি টেনশন করো না। খাওয়া দাওয়া করে নিও নাহলে কিন্তু তোমার পেটে যন্ত্রণাটা বাড়বে। সুচেতা অভিমান ভরা গলায় বলল, মেয়ে তো

Sahitya Chayan

তোমাকেই বেশি বিশ্বাস করে, তাই আমায় একটা ফোন করার প্রয়োজন অনুভব করেনি।

অনি সাবধানে বললো, এখন মান অভিমানের সময় নয়। তিতিরের মনে কি চলছে সেটা জানাটা বেশি জরুরি। পারলে কলকাতা ব্যাক করো, নাহলে এখানেও আসতে পারো। মোটকথা রাইগঞ্জের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এস। ওখানে থাকলে প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে।

সুচেতা গম্ভীর গলায় বলল, আমার জন্য কেউ দুশ্চিন্তা করুক এটা আমি চাইছি না, রাখলাম।

ফোনটার দিকে তাকিয়ে অনিরুদ্ধ ফিসফিস করে বললো, কেন এত ভুল বোঝো সু? ভুল বুঝে ঠেলতে ঠেলতে তো তোমার অনিকে তুমি পাহাড়ের শেষ সীমানায় পৌঁছে দিয়েছো। একবার ঠেলে দিলেই খাদে পড়ে যাব, তবুও তোমার হাতটা আমার দিকে একবারের জন্যও বাড়ালে না সু? ফাঁসির অপরাধীকেও তো তার শেষ ইচ্ছে জানাবার সুযোগ দেওয়া হয়, তার থেকেও কি বেশি দোষী আমি?

চোখের কোনটা জ্বালা করে উঠলো খ্যাতির শীর্ষে ওঠা সাংবাদিক অনিরুদ্ধ পালের।

দ্বিতীয় ফোনটা করার জন্য কন্ট্যাক্ট লিস্টে সার্চ বটন প্রেস করলো। নীলাদ্রি বসুকে খবরটা জানানো উচিত। ওরাও তো সন্তানের বাবা-মা, নিশ্চয়ই খুব দুশ্চিন্তায় আছে।

॥২০॥

Sahitya Chayan

হ্যালো, হ্যাঁ অনিরুদ্ধবাবু বলুন। হ্যাঁ, আমি নৈঋতের বাবাই কথা বলছি।

কাবেরী পাশ থেকে বললো, ইনসাল্টিং কথা বললে, ফোনটা আমায় একবার দিও। আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। ইশারায় কাবেরীকে চুপ করতে বলে নীলাদ্রি বললো, হ্যাঁ অনিরুদ্ধবাবু বলুন। আমি প্রথমেই বলি, টুটাই যা অন্যায় করেছে, মানে নৈঋত আজ যেটা করেছে তার জন্য আমি ওর বাবা হয়ে লজ্জিত। আমি এবং ওর মা দুজনেই আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। অহনার মনের অবস্থা আমরা আন্দাজ করতে পারছি, কিন্তু বিশ্বাস করুন এখনও নৈঋতের কোনো খবর আমরা পাইনি। ফোনটাও সুইচ অফ। আরেকটু বেলা হলে পুলিশ স্টেশনে গিয়ে মিসিং ডায়রি করবো মনস্থির করেছি।

একটু থেমে গেলো নীলাদ্রি। কি ? কি বলছেন আপনি? নৈঋত আপনার কাছে! মানে? আমার তো মাথায় কিছুই ঢুকছে না, প্লিজ ক্লিয়ার করুন। কাবেরী পাস থেকে উত্তেজিত গলায় বলল, টুটাই? টুটাই ওনার কাছে? কেমন আছে ও, কিছু বিপদ হয়নি তো?

নীলাদ্রি কিছু বলার আগেই অনিরুদ্ধ বললো, নৈঋতের মাকে আশ্বস্ত করুন আগে। উনিও নিশ্চয়ই আমার মতই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। শুনুন, নীলাদ্রিবাবু, অহনা আর নৈঋত আপাতত আমার সূর্যপুরের বাড়িতে এসেছে। ওরা চেঞ্জ করতে গেছে। ফিরলে আমি সবটা জেনে আপনাকে কল ব্যাক করছি। আমিও এখনো অন্ধকারে আছি। কিছুতেই

Sahitya Chayan

বুঝতে পারছি না, ওরা দুজন কেন বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে এলো!

দুজন মানে? প্রায় আঁতকে উঠেছেন নীলাদ্রিবাবু। অহনা আর টুটাই এক সঙ্গে গেছে আপনার ওখানে? অহনাও পালিয়েছে রাইগঞ্জ থেকে? কখন? টুটাই যখন চলে গিয়েছিল তখন তো অহনা ছিল বাড়িতেই। তাহলে ওরা মিট করলো কোথায়? অনিরুদ্ধ বেশ বুঝতে পারছে ওদের মনেও একরাশ প্রশ্নের ঘনঘটা। এত প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা এই মুহূর্তে ওর নিজেরও নেই। কাল ঠিক কি হয়েছিল এখনো জানে না ও নিজেই। এদিকে নীলাদ্রিবাবু একটার পর একটা প্রশ্ন করেই চলেছেন। বাধ্য হয়ে অনিরুদ্ধ বললো, আমি আগে পুরোটা শুনে নিই তারপর আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দেব। চিন্তা করবেন না ওরা সুস্থ আছে। নীলাদ্রিবাবু তখনও বিস্মিত কণ্ঠে বলে চলেছেন, অহনার সঙ্গে টুটাই কি করে গেল!

ফোনটা বাধ্য হয়ে ডিসকানেক্ট করে দিলো অনিরুদ্ধ। আগে ওদের সঙ্গে কথা বলা উচিত।

বিজু এসে ফিসফিস করে বললো, লুচি, বেগুন ভাজা আর আলুর দম বানানো গেছে কোনোমতে, এতে হবে দাদাবাবু?

অনিরুদ্ধ মজার ঢঙে বললো, খুব হবে, দৌড়াবে। বিজু কাঁচুমাচু মুখ করে বললো, আমি দিদিমণির বরকে জামাইবাবু ডেকেছি বলে দিদিমণি আমায় বেদম ধমক দিয়েছে। ওই জামাইবাবুটার নাম কি?

অনিরুদ্ধ হেসে বললো, নৈঋত।

Sahitya Chayan

বিজু আপন মনে দুবার উচ্চারণ করলো নৈঋত।

অনিরুদ্ধ মনে মনে হেসে নিলো একচোট। সুচেতার মতই একই টেকনিকে ধমক দেয় তিতির। শান্ত অথচ দৃঢ় গলায়। সুচেতা এখানে এখন থাকলে বোধহয় একটা খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যেত মা-মায়ের। ঘরের লাইট নিভিয়ে দিয়ে ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসলো অনিরুদ্ধ।

নৈঋতকে এখন বেশ ফ্রেস লাগছে। অনিরুদ্ধর আর ওর হাইট বা চেহারা একই রকম হওয়ায় ট্রাকসুট বা টিশার্ট দুটোই ফিট করে গেছে। নৈঋত হাসি মুখে বললো, এ দুটো ধার দিতে হবে স্যার। কলকাতা পৌঁছে কুরিয়ার করবো না হয়। অনিরুদ্ধ হেসে বললো, তোমার আর আমার সাইজ দেখছি একেবারেই এক। তাই এ পরে তোমায় কলকাতা যেতে হবে না। প্রপার ড্রেস পরেই যাবে। আপাতত খেয়ে নাও। ওর কথা শেষ হবার আগেই বিজু খাবারের থালা নিয়ে এসে রাখলো টেবিলে। নৈঋত সেদিকে তাকিয়ে বলল, এত অমৃত বিজুকাকা। জামাইবাবু না হয়েও দেখছি আপনি আমায় জামাই আদর করে ছাড়লেন। বিজু বললো, পেট ভরে খান দাদাভাই, লজ্জা করবেন না।

অনিরুদ্ধ জোরেই হাঁক দিলো, তিতির.....আয় খেয়ে নে।

বিজু বললো, দিদিমণি বললো, ওর খাবারটা ঘরে দিতে, তাই দিয়ে এলাম। অনিরুদ্ধ বেশ বুঝলো ওর সম্মুখীন হতে অস্বস্থি হচ্ছে তিতিরের। বেশ, তাহলে বরং

Sahitya Chayan

তিতিরের সঙ্গে পরে কথা বলবে, আপাতত নৈঋতের কাছ থেকেই জানা যাক, ঠিক কি হয়েছিল!

নৈঋতকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেচারার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। কাল সন্ধে থেকেই নিশ্চয়ই কিছু খাওয়া হয়নি। ওর দিকে তাকিয়ে অনিরুদ্ধ বললো, বিজু আরও লুচি দিয়ে যাও নৈঋতকে। এই তো বয়েস খাবার। জানো নৈঋত তোমার বয়েসে একবার আমার বড়মামার ছেলের বিয়েতে গিয়ে আমরা ভাই-দাদারা মিলে লুচি খাওয়ার কম্পিটিশন করেছিলাম। শেষে বাড়ির রাঁধুনি এসে বড়মামাকে বলেছিল, মাইনে পত্তর দিয়ে দিন বাবু, এ রাক্ষসের ফ্যামিলিতে আমি কাজ করবুনি। আমরাই তখন তার হাতে পায়ে ধরে আটকেছিলাম, কথা দিয়েছিলাম অমন রাক্ষুসে খাওয়া আর খাবো না। তাহলে বুঝতেই পারছো ঝুড়ি ঝুড়ি লুচি উড়ে গিয়েছিল। আর তুমি ছয়টা লুচি নিয়ে বলছো আর নয়! এ তো তোমাদের এই প্রজন্মের লজ্জা, তোমার পিৎজা, বার্গার খেয়েই লিভারের বারোটা বাজাচ্ছ। নৈঋত হেসে বললো, আপনার নিউজ পড়তে পড়তে বা টিভিতে আপনার সাক্ষাৎকার দেখতে দেখতে আপনার সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল। আজ এইটুকু কথা বলে মনে হলো ধারণাটা সর্বাংশে সত্যি নয়।

অনিরুদ্ধ বেগুন ভাজা দিয়ে লুচির টুকরোটা মুখে ভরে বলেছিল, যেমন?...এক্ষেত্রে উদাহরণ অপরিহার্য।

নৈঋত বিজ্ঞের মত বলেছিল, আপনাকে বড্ড দাম্ভিক মনে হয়েছিল, এখন দেখছি আপনার দুটো রূপ।

Sahitya Chayan

কার্যক্ষেত্রে আপনি ড্যাম সিরিয়াস আর বাড়িতে আপনি অমায়িক। অনিরুদ্ধ থমকে গিয়ে বলল, বহুদিন পরে এই প্রজন্মের মুখে এমন পরিণত কথা শুনলাম। আমি তো মনে করতাম এই প্রজন্মের সবাই বোধহয় গলায় একটা করে গ্যাস বেলুন বেঁধে উড়ে বেড়ায়। তোমরাও এমন ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারো বুঝতে পারিনি তো। আসলে তোমাদের মুখে হট আর কুলের অর্থ একই হয় এটা শুনে শুনে আমিই বোধহয় ভুল বুঝতে শুরু করেছিলাম এই প্রজন্মকে। সকলে মনে হয় হাওয়াভাসি নয়, কেউ কেউ মাটিতেও পা রেখে, বিচার বিশ্লেষণ করে কথা বলে তার মানে! যাক বড় নিশ্চিন্ত হলাম। নৈঋত বললো, আসলে কি বলুন তো, এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের ওপরে মানুষ বড় অবিচার করেছে। চারিদিকে খেলার মাঠ ভরিয়ে কমপ্লেক্স তৈরি করেছে, স্কুলে ভর্তি হতে না হতে ওদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে ইঁদুর দৌড়ে। যে একটু পিছিয়ে যাচ্ছে সে শেষ হয়ে যাবে এই মানসিকতার থেকেই আসছে অবসাদ। দিনরাত মোবাইল আর কম্পিউটারের মধ্যে নিজেকে বন্দি রাখতে রাখতে এদের নাম হয়ে যাচ্ছে আনসোশ্যাল। কিন্তু একটু ভেবে দেখবেন তো, এদের এছাড়া আর ঠিক কি করার আছে!

অনিরুদ্ধ বললো, বেশ বেশ, সকলে যখন এই প্রজন্মকে দোষারোপ করতে ব্যস্ত তখন তুমি যে এদের হয়ে লড়লে এতেই আমি ইম্প্রেসড। এখন বলতো, তিতির, মানে অহনাকে বিয়ে না করে বিয়ের আসর থেকে উঠে এসেছিলে কেন? ওকে কি তোমার পছন্দ হয়নি,

Sahitya Chayan
নাকি অ্যাফেয়ার থাকা সত্ত্বেও জোর করে বাড়ির চাপে বিয়েতে বসতে বাধ্য হয়েছিলে? আমার কাছে নির্দ্বিধায় বলতে পারো। আমার তিতির পাখি বলে, মাই ডিয়ার বাবাই। কারণ কি জানো, আমি এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের দোষারোপ করলেও মনে মনে এদের সঙ্গটা বেশ উপভোগ করি। তাই তিতির ওর যাবতীয় গোপন ডায়রির পাতা নির্ভয়ে উল্টায় আমায় সামনে।

নৈঋত সন্দেশে শেষ কামড়টা দিয়ে বললো, পর পর উত্তর দিই আপনার প্রশ্নের।

প্রথমত, আমার মা কাবেরী বসুই অহনাকে প্রথম দেখেছিলো। আমার কোনো অ্যাফেয়ার না থাকায়, মা বিয়ের ঠিক করবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আমার জ্ঞাতার্থে। তাই আমার পছন্দ হয়েছিল বলেই অ্যারেঞ্জড ম্যারেজটা হচ্ছিল।

দ্বিতীয়ত, আমি এই প্রথম রাইগঞ্জ নামক কোনো একটা স্থানে পৌঁছেছিলাম, যার কোনো অস্তিত্ব পৃথিবীর ম্যাপে এর আগে আমি দেখিনি। তাই রাতের অন্ধকারে গাড়িতে করে যে অপরিচিত জায়গাতে আমি পৌঁছেছিলাম সেখান থেকে গাড়ি ছাড়া একা পথ চিনে বেরিয়ে আসাটা আমার পক্ষে যে সম্ভব নয়, সেটা একটা উন্মাদেও বুঝবে।

তৃতীয়ত, বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে যাওয়া মানে দুই বাড়ির সম্মান মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া। আমি চায়ের দোকানের বিপ্লবী নই, নামী কলেজের লেকচারার। তাই পারসোনাল রেসপেক্টের কথা ভেবে কোনোভাবেই পালাতে পারি না।

Sahitya Chayan

এবারে আপনি নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবেন, তাহলে কেন পালালাম? পালালাম না বলে বরং বলি বাধ্য হলাম। অহনাই আমায় এসে বলেছিল, আমি যেন ওকে বিয়েটা না করি। আমি যেন বিয়ের আসর থেকে পালাই। ওর এক্স নাকি ফিরে এসেছে, ও তাকেই বিয়ে করবে। ও ভীষণ অসহায়, এ অবস্থায় আমি যদি ওকে হেল্প না করি তাহলে ওকে সুইসাইড অবধি করতে হতে পারে। অহনাই পাড়ার এক দাদার স্কুটিতে চাপিয়ে আমায় রাইগঞ্জের স্টেশনে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিল।

আমি যখন স্টেশনের অন্ধকারে বসে মোবাইল অফ করে অগ্রপশ্চাৎ ভাবছি তখন ম্যাডাম সম্পূর্ণ অন্য মেকআপে অন্য মুডে স্টেশনে এসে হাজির। তিনিও নাকি ট্রেন ধরে যাবেন এক্সের কাছে। আমি তখন সত্যিটা জানার জন্য ওর পিছু নিয়েছিলাম। তারপর দেখলাম এক্সের গল্পটা মিথ্যে, কিন্তু ঠিক কেন ও বিয়েটা ভেঙে দিতে চাইল সেটা কিন্তু এখনও আমার কাছে ক্লিয়ার নয় স্যার। যাইহোক, এবারে আমাকে বাড়িতে ফেস করতেই হবে। ফিরে যাব আজ বিকেলেই। ওকে আপনার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেলাম, আপনি বরং জেনে নিন কেন করলো এমন আমার এবং আমার গোটা পরিবারের সঙ্গে! কদিন আগে জানালেও আমরা ম্যানেজ করে নিতাম, এখন এই পরিস্থিতি ঠিক কিভাবে সামাল দেব জানি না।

অনিরুদ্ধ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল নৈঋতের দিকে। ছেলেটার চোখে সততা আছে। সাংবাদিক জীবনে মানুষ তো কিছু কম দেখলো না অনিরুদ্ধ, খুব কম চোখেই এমন

Sahitya Chayan

স্বচ্ছতা দেখেছে ও। নৈঋতকে অপছন্দ হবার মত কোন কারণ এখনো পর্যন্ত অনিরুদ্ধর চোখে পড়েনি, তাও কেন তিতির এমন করলো সেটাই ভেবে চলছে ও। যথেষ্ট স্মার্ট, সপ্রতিভ, সেন্সেবেল, উইটি, সুদর্শন-সমস্ত গুনওয়ালা ছেলেই তিতিরের জন্য পছন্দ করেছিল সুচেতা। তাই হয়তো বিয়েটা ভেঙে যাওয়ায় মা হিসাবে সুচেতা এতটা ভেঙে পড়েছে।

নৈঋত কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই অনি বললো, বিজু নৈঋতকে আমার স্টাডিতে নিয়ে যাও, ও একটু রেস্ট নিক। আর দুপুরে ভালোমন্দ মেনু করো বিজু, সস্তায় সেরে ফেলো না।

নৈঋত বললো, আপনি অকারণে ব্যস্ত হচ্ছেন। কলেজে মাঝে মাঝে লাঞ্চ টাইমে আমার ক্যান্টিনে খাওয়াও অভ্যেস আছে। সে তুলনায় এমন খাবার তো অমৃত। তাই বিজুকাকাকে আর বিব্রত করবেন না প্লিজ। আরেকটা কথা স্যার, আমি বিকেলে কলকাতা ফিরতে চাই, ডিরেক্ট কোনো ট্রেন আছে এখান থেকে? অনিরুদ্ধ হেসে বললো, বিকেলে আমার গাড়ি তোমায় যাদবপুরে পৌঁছে দিয়ে আসবে। তিতিরের মা যদি শোনেন তোমায় আমি ট্রেনে তুলে দিয়ে দায় সেরেছি, তো আমায় গৃহহীন হতে হবে। এখন নিশ্চিন্তে একটু বিশ্রাম নাও, তোমায় তোমার বাড়িতে সুরক্ষিত অবস্থায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমার। আমার মেয়েকে যখন তুমি এত অপমানিত হবার পরও দায়িত্ব নিয়ে আমার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেলে তখন বাবা হিসাবে আমারও এটুকু কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।

Sahitya Chayan

নৈঋত মুচকি হেসে বললো, একটাই আব্দার স্যার, আপনার তিতির পাখি কেন আমায় রিজেক্ট করলো শেষ মুহূর্তে এটুকু জানতে পারলে শান্তিতে ফিরতে পারি। নাহলে মেল ইগোয় ঠোক্কর খেতে খেতে মেরুদণ্ডে ঘুন ধরার প্রবল সম্ভবনা আছে। তাই আসল কারণটুকু জেনে যেতে চাই। অনিরুদ্ধ নৈঋতের পিঠে হাত দিয়ে বললো, যদি আমি জানতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই তোমায় জানাবো।

অনিরুদ্ধ ধীর পায়ে ঢুকলো তিতিরের ঘরে। তিতির অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়েছিল হলদে গাঁদা গাছগুলোর দিকে। বিজুর যত্নে ফুলের ভারে গাছগুলো ক্লান্ত যেন। ডালপালা জুড়ে ঝাঁপিয়ে এসেছে অজস্র ফুল। যেন হলদে ওড়না জড়িয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে লাজুক মেয়েটা। অনিরুদ্ধ দেখেই বুঝতে পারলো তিতিরের মনের মধ্যে এই মুহূর্তে কালবৈশাখীর ঝড়ো হাওয়ায় ওলটপালট করে দিচ্ছে সব। ও হয়তো আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে সামাল দেবার কিন্তু পারছে কই! কি রে, টেবিলে আমাদের সঙ্গে জয়েন করলি না কেন? বাবাইয়ের ওপরে অভিমান নাকি? তোর বিয়ের সময় উপস্থিত থাকতে পারিনি বলে রাগ করেছিস? তিতির হাতের তালুর উল্টো পিঠ দিয়ে মুছে নিলো চোখের জলটা। তারপর বেশ দৃঢ় গলায় বলল, তুমি সব জানতে, আমায় কেন বলোনি কোনোদিন? আমি তোমার ফাইল থেকে বেশ কিছু পুরোনো চিঠি আবিষ্কার করেছিলাম, যেগুলো তুমি লিখেছিলে মাকে। মা তখন রাইগঞ্জের বাড়িতে থাকতো। তুমি কলকাতার ফ্ল্যাটে।

Sahitya Chayan

কি বলিনি রে তিতির? তোর মায়ের সঙ্গে আমার অ্যাফেয়ার ছিল সেটা তুই জানতিস তো। আর কি বলিনি? মা কেন তোমায় বিয়ে করতে চাইছিলো না সেটার কারণটা বলোনি আমায়। অনিরুদ্ধ বললো, বলেছি, নিশ্চয়ই বলেছি। কয়েকমাস আগেই তো তোকে বললাম, সুচেতার জীবনে একটা অব্যক্ত কষ্ট আছে তিতির, পারলে আমার অবর্তমানে ওকে একটু প্রটেক্ট করিস। বলিনি তোকে?

তিতির গম্ভীর গলায় বলল, বাবাই এখন আমি কিছুটা জানি। পলিটিক্যাল বিট সামলাই আমি, হতে পারি তোমার মত নামি রিপোর্টার নই তবুও সোর্স আমারও কিছুটা তৈরি হয়েছে। সেই সোর্সকে কাজে লাগিয়েই আমিও বেশ কিছু সত্যি উদঘাটন করেছি। আর সেটা করার পর থেকে তুমি আমার চোখে অনেকটা নীচে নেমে গেছ। কেন অমন একটা ঘটনার কোনো প্রতিবাদ তুমি করোনি? একজন নামি দৈনিকের সাংবাদিক হওয়া সত্ত্বেও কোনোরকম প্রতিবাদ তুমি করোনি। ধীর গলায় অনিরুদ্ধ বললো, আমি তোকে সত্যি বলতে চেয়েছিলাম বারবার, কিন্তু তোর মা আমায় ধিক্কার জানিয়েছে। তোর বিয়ের আগেও আমি তোকে একটু হিন্টস দিয়েছিলাম, জানি না তুই বুঝতে পেরেছিলিস কিনা। আর বাকি রইল প্রতিবাদ? না রে, জীবনের সব থেকে কঠিন সময়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি প্রিয় মানুষটাকে বুকে আগলে রাখাটাই অনেক সময় বেশি প্রায়োরিটি পায়, প্রতিবাদ, সমাজ সংসার সবকিছু তখন তুচ্ছ মনে হয়। আর ওই প্রতিবাদ করতে গিয়ে গোড়াতেই

Sahitya Chayan

তোর মামার বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছিলাম আমি। তোর মামা বলেছিল, অনিরুদ্ধ তোমায় যেন দ্বিতীয়বার রাইগঞ্জের বাড়িতে পা দিতে না দেখি। আমার বাড়ি থেকেও ত্যাজ্য হয়েছিলাম একটাই কারণে, এরপরেও তুই বলবি তিতির যে আমি চেষ্টা করিনি? আমি জানি না তুই কতটা কি জেনেছিস, তবে আমি বলবো এই মুহূর্তে আর বোধহয় রিওপেন করা উচিত হবে না কিছুই।

বাবাই, আমি থ্রেট পেয়েছি। একাধিক ফোন কলস, বিয়ে ঠিক হবার পরে বেড়ে গিয়েছিল। শ্বশুরবাড়িতে জানিয়ে দেবার থ্রেটও পেয়েছি। যদিও আমি এগুলো নিয়ে চিন্তিত নই, কিন্তু শেষ দেখে ছাড়বো। তারপরেই আবার ফিরবো নরম্যাল লাইফে। আগে খুঁজে বের করবো তাকে, সম্মুখীন হবো সত্যের। তারপর না হয় বিয়ে, সংসার এসবে জড়াবো। একটা জিনিস তো বুঝতেই পারছো, বিয়ের পরেও এই সত্যি আমার পিছু ছাড়বে না। তখন বসু পরিবারে শুরু হবে সমস্যা। তাই বাধ্য হয়েই আমি লাস্ট চিরকুটটা পেয়ে বিয়ের আসর থেকে উঠে এসেছি।

অনিরুদ্ধ বললো, কি লেখা ছিল চিরকুটে?

তিতির বললো, সে আমি তোমায় বলতে পারবো না। তবে একটা কথা তোমায় বলি বাবাই, আমি শুধু সত্য জেনে চুপচাপ বসে থাকব না। তোমরা কেউ যদি আমার পাশে না থাক তাহলেও লড়াইটা আমি লড়বো। অনিরুদ্ধ মেয়ের জেদ জানে, তাই নরম গলায় বলল, বোধহয় ভুল করছিস। তিতির আরেকটু দৃঢ় গলায় বলল, আমি নিশ্চিত আমি ঠিক করছি। দেখো বাবাই আমি আন্দাজ করেছি মা

Sahitya Chayan
আর তোমার মধ্যে ঠিক কি নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। কেন তুমি আর মা এই মুহূর্তে আলাদা থাকছো সেটাও আমি আন্দাজ করেছি। মা হয়তো তোমায় দোষারোপ করেছে সমস্ত ব্যাপারে, কিন্তু তোমরা একটা জিনিস কেউ বুঝতে পারছো না, এই সত্যিটা কোনো না কোনোদিন আমার সামনে আসতোই। সে তোমার চিঠিগুলোর মাধ্যমেই হোক বা অন্য কোনোভাবে। ভেঙে পড়া গলায় অনিরুদ্ধ বললো, তিতির তোর মা অতগুলো বছর পরে আমায় বলেছে, আমি নাকি ওর দোষগুলো মেয়ের সম্মুখে আনব বলেই ওই চিঠিগুলো রেখে দিয়েছিলাম প্রমাণস্বরূপ। বিশ্বাস কর তিতির, তোর মায়ের সব চিঠিই আমার কাছে আছে। আমি যেগুলো লিখেছিলাম তোর মাকে সেগুলোও তোর মায়ের অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে চলে এসেছিল আমাদের ফ্ল্যাটে। আমি সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম। কোনো প্রমাণপত্র হিসাবে নয়। অতগুলো বছর একসঙ্গে কাটানোর পরেও যে সুচেতা এভাবে বলে দিতে পারবে আমায় সেটা বোধহয় কল্পনাতীত ছিল। তাই আঘাতটা গরম ফলার মতই এসে বুকে বেঁধেছিল। চেষ্টা করেও আর স্বাভাবিক হতে পারিনি। তারপর যে বাড়িতে আমার ঢোকার অধিকার নেই, সে বাড়ি থেকেই তোর বিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তোর মা। এরপরেও কি সরে যাওয়া উচিত ছিল না তিতির? সত্যি বলতে কি আমারও কেন জানি না মনে হচ্ছিল তুই আর তোর মাও আমার কাছ থেকে দূরে যেতে চাইছিলিস। তাই তো তাড়াতাড়ি আমাদের ফ্ল্যাট ছেড়ে তোর মা নিজের কেনা

Sahitya Chayan

ফ্ল্যাটে শিফট করলো রাতারাতি। আমার কাছে থাকলে নাকি মেয়েকে আমি দুর্বুদ্ধি দেব। কিছুতেই বিশ্বাস করলো না সুচেতা, অবশেষে গুটিয়ে নিলাম নিজেকে। দূরত্ব হয়তো ব্যবধান তৈরি করে খুব দ্রুত, কিন্তু একেবারে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে আটকায়। তাই ওই মুহূর্তে তোর ভালোর জন্যই আমাদের মধ্যে দূরত্বটুকু খুব প্রয়োজন ছিল তিতির। তবে আবারও বলছি, তোকে আর সুচেতাকে ছেড়ে আমি ভালো নেই। সুচেতা আমার এমন জায়গায় আঘাত করেছে যে ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তিটুকুও বোধহয় আমি হারিয়ে ফেলেছি। তাই তো লোকালয় ছেড়ে এখানে আড়াল খুঁজছি। তিতির অনিরুদ্ধর হাতটা ধরে বলল, বাবাই, কিন্তু সত্যিটা যে আমার জানার দরকার। নাহলে আমি রাতে ঘুমাতে পারছি না।

অনিরুদ্ধ নরম গলায় বলল, তোকে রিপোর্টার তৈরি করেছি, নাচ, গানের বদলে মার্শাল আর্ট শিখিয়েছি, নিজের মেরুদণ্ডে শক্ত করে দাঁড় করতে শিখিয়েছি, বাবা হিসাবে আমার কর্তব্য শেষ। তুই এখন স্বাবলম্বী একটা মেয়ে। তাই সবকিছু জানার অধিকার তোর আছে। তুই খুঁজে নে। বিপদে পরবি হয়তো, তবুও তোর বাবা হয়ে আমি বলবো, তোকে এমনই দেখতে চেয়েছিলাম আমি।

এ চত্বরের পুলিশ অফিসারের নম্বরটা রেখে দে, বলবি সাংবাদিক অনিরুদ্ধ পালের মেয়ে, তাহলেই ওরা তোকে হেল্প করবে। সত্যিটা খুঁজে পাওয়ার পরও যদি আমার গলা জড়িয়ে ধরে সেই ছোটবেলার মত আদর করতে মন হয়, তাহলে আসিস তিতির। আর কখনো খুব বিপদে

Sahitya Chayan

পড়লে কল করিস। তিতির বললো, তার মানে এই কাজে তুমি আমায় হেল্প করবে না তাই তো?

অনিরুদ্ধ বললো, ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। সুচেতার কাছে কথা দিয়েছি। তোর এই প্রশ্নের মূলে আর জলসিঞ্চন করবো না আমি। তাই তোর বিয়ের সব খরচ করার অধিকার পেয়েছিলাম আমি। ক্ষমা করিস তিতির পাখি। তিতির বাবার দিকে তাকিয়ে দেখল, বাবার চোখের কোণ দুটো লালচে হয়ে গেছে। তিতির হেসে বললো, ভুলে যেও না আমি সাফল্যের শীর্ষে ওঠা অনিরুদ্ধ পালের মেয়ে, তাই শেষ সিঁড়িতে আমিও পা দেবই।

নৈঋত এসেছিল অহনার সঙ্গে একটা কথা বলতে, কিন্তু দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কিছুটা হলেও শুনতে পাচ্ছিলো বাবা-মেয়ের কথোপকথন। কি সত্য উদঘাটনে চলেছেন মহারানী কে জানে! আর বাবাটাও আরেক পাগল, যখন জানেই এটা রিস্কি, তখন তো মেয়েকে আটকানো উচিত ছিল, তা নয় বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আর এই মেয়ে মার্শাল আর্ট শিখে পরমাণু বোমের সামনেও যাওয়া যায় ভেবেছে হয়তো। আজব ফ্যামিলিতে বিয়ে দিচ্ছিল মা ওর। যাকগে হয়নি ভালোই হয়েছে। বাপরে, প্রাণে একটু ভয় ডর অবধি নেই। টুটাই তো এখনো ইঁদুরে ভয় পায়। যদিও কাউকে কোনোদিন সেটা বুঝতে দেয়নি, কিন্তু ও তো জানে। এমন অনেক কিছুতেই ও ভয় পায়, ভয় পাওয়াটা বোধহয় অন্যায় নয়। যদি এই মেয়ের মত কেউ ভয় না পেত তাহলে বাংলা, ইংরেজি অভিধানে এমন কোনো শব্দই থাকতো না। বাপরে,

Sahitya Chayan

সাংবাদিক নয় পুরো ডাকাতের ফ্যামিলিতে বিয়ে হচ্ছিল ওর। গেছো মেয়ে আর সর্দার বাবা, মা-টা বোধহয় একটু নরম সরম। বিয়ের আগেই কি সুন্দর নৈঋতের হাত দুটো ধরে বলেছিল, আমার মেয়েটাকে একটু দেখো বাবা। এই মেয়েকে ও কি দেখবে? বরং এই মেয়েই ওকে দেখে নেবে টাইপ। ট্রেনে ওই লোফার টাইপের ছেলেগুলোকে বলা কথাগুলো মনে পড়ে গেল নৈঋতের। আর হবে নাই বা কেন, এমন যার বাবা তার মেয়ে তো এমনিই হবে। মেয়েকে গানের বা নাচের স্কুলে ভর্তি না করে মার্শাল আর্টে ভর্তি করে দিয়ে আসে। আরে ভবিষ্যতের কথাও তো ভাবতে হয় নাকি। এই মেয়ের যার সঙ্গে বিয়ে হবে তার দিকটাও তো বিবেচনা করা উচিত ছিল ভদ্রলোকের। নাকি ভেবেছিলেন, রাতের বেলা একটা কিকে মেয়ে পাশে শুয়ে থাকা আগাছাকে মেঝেতে ফেলে দিয়ে একাই গোটা বিছানায় রাজ করবে! বাঃ, কি উচ্চ ভাবনাচিন্তা ভদ্রলোকের। নৈঋত আর বাইরে দাঁড়িয়ে না থেকে ঘরে ঢুকে একটা প্রশ্ন করবে মনস্থির করলো! খুব নিরীহ প্রশ্ন, কিন্তু উত্তরটা অনিরুদ্ধবাবুকে দিতেই হবে। ভদ্রলোক তো জানতেন, ও কলেজের প্রফেসর। রীতিমত নোবেল জব। মারামারি, দাঙ্গা এসব নয়। কলম আর বইয়ের সঙ্গেই ওর সদ্ভাব। ওর একাডেমিক কেরিয়ারে কোনোদিন লেবু দৌড়ে জেতার রেকর্ড নেই, এরা কি ওকে অলিম্পিকে বক্সিং-এ গোল্ড জেতা পাবলিক ভেবেছিল নাকি? নিশ্চয়ই ভেবেছিল তাই এমন ফুলনদেবীর সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে চেয়েছিল। না, ভদ্রলোককে উত্তর দিতেই হবে, কোন আক্কেলে উনি

Sahitya Chayan

মেয়েকে এসব শিক্ষা দিলেন! মানে এই মুহূর্তে নৈঋতের সমস্যাটা হলো, ওই মেয়ের প্রেমে পড়েছে ওর বেহায়া, নির্লজ্জ, অপমানের ভাষা না বোঝা মন, এদিকে একে বিয়ে করলে কপালে চূড়ান্ত ভোগান্তি, এটাও টের পাচ্ছে ওর অতি সাবধানী মন। এমন অবস্থায় জন্য দায়ী এর বাবা। কোথায় মেয়েকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিয়েটা দিয়ে দেবে পরের লগ্নে তা নয় কোথায় কোন সত্য উদঘাটনে পাঠিয়ে দিচ্ছে ওর হতে হতে না হওয়া বৌটাকে। এরপর কি আর অহনাকে ফিরে পাবার ক্ষীণ আশাও অবশিষ্ট থাকলো নৈঋতের! বাড়ি ফিরলেই মা হয়তো এই অপমানের বোঝা হালকা করতে জেদ ধরে এ মাসেই নৈঋতের বিয়ে দেবে। আর বাবা এবারে নিতান্ত ঘরোয়া আলতা পরা, নূপুর পরা, ওগো হ্যাঁগো বলা মেয়ে খুঁজবে। উফ, সেই ন্যাকা মেয়েকে নিয়ে নৈঋত ঠিক কি করবে! অহনার প্রেমে যে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে উঠবেই বা কি করে! এমন বিপদে বোধহয় স্বয়ং ভগবানও পড়েননি। তাই যে সিচুয়েশনের সলিউশন ভগবানের কাছে নেই, সেটা ওকে দেবেনই বা কি করে! ভগবান ওকে উদ্ধার করতে পারবেন না এই সংকট থেকে। একমাত্র ভরসা মেয়েকে চূড়ান্ত প্রশ্রয় দেওয়া নৈঋতের পরম শত্রু বাবাটাই। একেই ম্যানেজ করতে হবে। বিজুকাকা কাটা গায়ে নুনের ছিটের মতই অহনার ছোটবেলা থেকে এখনো পর্যন্ত তোলা সব ছবি সমেত একটা অ্যালবাম দিয়ে বলেছিল, দাদাভাই তুমি একা একা বোর হবে তাই এটা দিলাম, দেখো বসে বসে। নৈঋত মনে মনে হেসে

Sahitya Chayan

ভেবেছিল, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ইন দ্য ইয়ার অফ ১৭৬১-র পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ স্বচক্ষে দেখেছেন। নাহলে কেউ বাড়িতে এলেই পুরোনো অ্যালবাম ধরিয়ে দেয় বোরনেস কাটানোর জন্য! অচেনা সব লোকেদের দেখে ওর কি লাভ আছে! অনিরুদ্ধবাবুর স্টাডিতে সবরকম বইই আছে। ভদ্রলোক বইপ্রেমী সেটা বোঝাই যাচ্ছিল কালেকশন দেখে। একটা বই হাতে নিয়ে মোবাইলটা প্লাগ পয়েন্টে চার্জ করতে দিলো। চার্জারটা বোধহয় অনিরুদ্ধবাবুর এক্সট্রা, গায়ে হালকা ধুলোর উপস্থিতি তাই বলছে। তবুও সে এখনও সচল আছে সেটা জানান দিলো নৈঋতের বন্ধ ফোনে ভাইব্রেট করে।

বইপত্র দেখা হলে আলগোছে অন্যমনস্কভাবেই বিজু কাকার দেওয়া পুরোনো অ্যালবামটা উল্টে ফেলেছিল। আর তখনই বুঝেছিলো, এ বাড়ির প্রতিটা মেম্বার ঠান্ডা মাথায় খুনি। এমন কি পরিচারক অবধি। নাহলে অহনার প্রেমে পড়বো কি পড়বো না ভাবা ওর সচেতন মনটাকে এক ধাক্কায় গভীর গর্তে ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা কেউ করে যায়! সেই ছোটবেলার আদুরে তিতির থেকে স্কুলের জেদি মেয়েটা, কলেজের হরিণ চোখের চাউনির অহনা আর এখনকার আত্মঅহংকারী রিপোর্টারের বিভিন্ন পোজের ছবিগুলো কেউ ষড়যন্ত্র করে ওকে দেখায়!

ওগুলো দেখার পর থেকেই ও বুঝতে পেরেছে ওর মন আর ওর বশে নেই। তাই এ বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে প্রোপজটুকু অন্তত সেরেই যেতে হবে, এছাড়া কোনো রাস্তা নেই ওর। প্রপারভাবে প্রোপজ করলে যদি মেয়ের

Sahitya Chayan

মনটা গলে তাহলে নেক্সট লগ্নে বিয়ের একটা চান্স ছিল। কিন্তু এখন বাবা, মেয়ের কথা শুনে স্পষ্ট বুঝতে পারলো, ঝুলপির চুলে পাক না ধরা পর্যন্ত অহনাকে ও পাবে না। হে ভগবান, এই ভদ্রলোক বাবা না কসাই! মেয়ের কথা তো ছেড়েই দিলাম, নিজের জগতে বিরাজমান, আশেপাশের কার কি হলো দেখার অবসর নেই। কে ওনার থুতনির তিলে আটকে গেলো দেখার দরকার নেই, কে ওনার হালকা হাসির মায়ায় গৃহ ত্যাগ করবে পন করলো সেদিকেও দৃষ্টি নেই, কে ওনার অসহ্য ব্যক্তিত্বের মায়াজালে ভূপতিত হলো সেদিকেও খেয়াল নেই, উনি চলেছেন নিজের লক্ষ্যে। নৈঋত নিজের চুলের মুঠিটা ধরে আরেকটু সাহস সঞ্চয় করে নিলো, অহনার সম্মুখীন হতে গেলে যেটা দরকার সেটা হলো অদম্য সাহস।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নৈঋত বললো, অহনা, আসতে পারি ভিতরে?

।।২১।।

এসো, ওকে ভিতরে নিয়ে আয় প্রিয়া। অনিক আমি তোমার ছবি দেখেছি প্রিয়ার মোবাইলে। প্রিয়া যদিও প্রথমে বলেছিল, জাস্ট ফ্রেন্ড। কিন্তু তারপর আমার জেদি মেয়েটার মুখ দেখেই বুঝেছিলাম, বন্ধু শব্দটা বোধহয় সব সম্পর্কেই প্রযোজ্য। প্রিয়া অবাক হয়ে মাকে দেখছিলো। সেই ছোট থেকে দেখেছে ফিসফিস করে কথা বলে ওর মা। বাবার মারের ভয়ে সব সময় যেন তটস্থ। এদিক ওদিক তাকিয়ে কেমন একটা ঘোলা চোখে গলা খাদে নামিয়ে কথা বলা মাকে এই মুহূর্তে মেলাতে পারছে না

Sahitya Chayan

প্রিয়া। এমন পরিষ্কার উচ্চারণে এমন সাবলীলভাবে কথা বলতে তো কখনো মাকে দেখেনি ও। আজ মাকে খুব মিষ্টি লাগছে। একটা হালকা বেগুনি শাড়ি পরেছে, সঙ্গে ম্যাচিং ব্লাউজ। সিঁথিতে সিঁদুর রয়েছে কিন্তু খুব অল্প, বড্ড অবহেলায় পরা যেন। অন্য দিনের মত টকটকে চওড়া নয়। কপালে একটা মেরুন টিপ, কানে দুটো সোনার টপ, ফাঁকা গলা। এই অল্প সাজেই মাকে যেন দুর্গা ঠাকুরের মত লাগছে। অনিক ভিতরে এসে বসতেই প্রিয়া কারণ ছাড়াই মাকে জড়িয়ে ধরলো। ফিসফিস করে বললো, এইটুকু সেজে থাকতে পারো তো মা। মা হেসে বললো, আমি সাজলে তোর বাবার মনে হয় কারোর সঙ্গে আশনাই চলছে, তাই আরও মারে। প্রিয়া বললো, আজ হঠাৎ অনিককে ডেকে কেন পাঠালে মা? বাবা এসে গেলে কিন্তু ওকে অপমান করতে ছাড়বে না। মা একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বললো, ওই অসুরের হাত থেকে যখন তোকে এতকাল রক্ষা করতে পেরেছি, তখন বাকিটুকু ভরসা কর। আজ সে দূরে গেছে। বোধহয় সপ্তাহখানেক ফিরবে না। কাউকে একটা ফোনে বলছিলো। আমার হাতে দু-হাজার টাকা গুঁজে দিয়ে বললো, এক সপ্তাহ চালাবি, একটাও বেশি খরচ করবি না। তাই তো দেরি না করে অনিককে ডাকতে বললাম। আমি বেরোলে ঠিক ওর চ্যালারা খবর দিয়ে দেবে ফোনে। সেই জন্যই অনিককে আসতে হলো।

অনিক হেসে বললো, আন্টি এ কিন্তু ভারী অন্যায়। আমায় বসিয়ে রেখে আপনারা আমার নামে আলোচনা

Sahitya Chayan
করছেন লুকিয়ে লুকিয়ে। প্রিয়া হেসে বললো— মা কানে কানে বললো, বড্ড বাজে ছেলে, একে বিয়ে করিস না।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে চোখে জল চলে এসেছিল দীপশিখার। প্রিয়াকে এত খুশি লাস্ট কবে দেখেছে মনে নেই দীপশিখার। মেয়েকে চোখ পাকিয়ে বললো, চুপ, শান্ত-ভদ্র ছেলেটার সঙ্গে কেন এমন দুষ্টুমি করছিস প্রিয়া? যা, আজ তুই চা করে নিয়ে আয়। আমি একটু অনিকের সঙ্গে গল্প করি। প্রিয়া হাসতে হাসতেই চলে গেল রান্নাঘরে। প্রিয়া চলে যেতেই দীপশিখা বললো, অনিক তোমাকে একটা কথা ফ্র্যাঙ্কলি বলতে চাই, তুমি কি সত্যিই প্রিয়াকে বিয়ে করবে? মানে সম্পর্কটা নিয়ে তুমি সিরিয়াস? অনিক বেশ গম্ভীর গলায় বলল, হ্যাঁ আন্টি, আমি আমাদের সম্পর্কটা নিয়ে ভীষণ সিরিয়াস। তবে প্রিয়া সিরিয়াস নয়। ওকে আমি যতই বোঝাতে যাই, ও বলে ওর মত ফ্যামিলির মেয়েকে নাকি আমার বিয়ে করা উচিত নয়। আন্টি আমি ওর বাবার কথা সবটুকু জানি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি শুধু প্রিয়াকেই চাই, ওর কোনোরকম ব্যাকগ্রাউন্ড আমি দেখতে চাই না। আমি ওকে ভালোবাসি আন্টি। দীপশিখা বললো, কিন্তু তোমার বাড়ি? পরিবারের বাকি সবাই কি পীযুষ বিশ্বাসের মেয়েকে বউ হিসেবে মেনে নেবে? অনিক দৃঢ় গলায় বলল, না নিলে ওই পরিবার আমায় ছাড়তে হবে। তবে আমার মা বলেছে, তোর সুখেই আমার সুখ অনিক। প্রিয়াকে মায়ের অপছন্দ নয়। বাবার একটু অমত আছে, সেটা প্রিয়ার বাবার বদনামের জন্যই হয়তো। ওটুকু আমি মানিয়ে নেব।

Sahitya Chayan

দীপশিখা বললো, অনিক তোমায় যদি আমি বলি রেজিস্ট্রিটা করে রাখো, আনুষ্ঠানিক বিয়ের আগেই লুকিয়ে, তুমি রাজি হবে?

অনিক চেয়ার থেকে উঠে এসে দীপশিখার হাত দুটো ধরে বলল, প্লিজ আন্টি আপনি শুধু প্রিয়াকে রাজি করান। আমি কালকেই ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে বলবো পেপার রেডি করতে। তারপর একমাসের মধ্যেই রেজিস্ট্রিটা সেরে আসবো। প্রিয়া সার্ভিস পেলেই আনুষ্ঠানিক বিয়ে করবো। দীপশিখা বললো, অনিক কিছু মনে কোরো না। আমি ওর বাবাকে বিশ্বাস করি না। যে কোনো দিন যে কারোর সঙ্গে জোর করে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবার চেষ্টা করতে পারে, আমার ক্ষমতা খুব সীমিত। আমি হয়তো প্রিয়াকে বাঁচাতে পারবো না। তাই এমন অনুরোধ করলাম। অনিক হাসি মুখে বললো, আমার মনের কথাটা বলে দিলেন আন্টি। প্রিয়া চা আর ঘরে বানানো শিঙারা, ঘুগনির প্লেট নিয়ে ঢুকতেই অনিক বললো, তুই যে রোজ রোজ বলিস, তোর বাড়ির পরিবেশ খুব খারাপ, কই কোনোদিন তো বলিস না এবাড়িতে একজন মা আছেন, যিনি ছেলেমেয়ের মনের না বলা কথাও বুঝতে পারেন। প্রিয়া টেবিলে খাবারের ট্রেটা রেখে বললো, জানতাম, আমার অনুপস্থিতিতে আমার সব বদগুনগুলো জেনে নিবি মায়ের কাছ থেকে।

দীপশিখা বললো, অনিক, বিশেষ কিছু আয়োজন করতে পারিনি। সবটুকুই ঘরে বানিয়েছি, খেয়ে নাও।

অনিক খেতে খেতেই বললো, আন্টি, এসব রান্না কিন্তু মেয়েটাকে একটু শিখিয়ে পরিয়ে পাঠাবেন। নাহলে মেয়ে

Sahitya Chayan

তো শুধু বকতে ঝকতেই পারে আমায়! প্রিয়া ঠোঁট ফুলিয়ে বললো, তোকে বলেছি না, বিয়ের কথা সিরিয়াসলি বলবি না, আমি ওটা নিয়ে স্বপ্ন দেখি না। একটা চাকরি জোগাড় করে মাকে নিয়ে এ বাড়ি ছাড়বো, ব্যস, এটুকুই স্বপ্ন। ঘর-সংসার, লালচে বেনারসি, সিঁথিতে আদুরে সিঁদুর, একাধিপত্যের রান্নাঘর এসব আমার জন্য নয়। তুই জানিস সবটুকু অনিক। তাই অকারণে এসব বলে মাকে কনফিউশনে ফেলিস না প্লিজ।

অনিক বললো, আন্টি শিঙারা আমার দারুন পছন্দ হয়েছে, সত্যি বলতে কি মৌচাক সুইটসকে হার মানাবে। এখন আপনি বলুন তো, আমাকে আপনার জামাই হিসাবে পছন্দ কিনা? এই বাজারে আমি সরকারি চাকরি জোগাড় করেছি। একজনকেই ভালোবেসেছি জীবনে। মা বলে, আমার ছেলেকে একটুকরো চাঁদ নয়, পুরো চাঁদের মত দেখতে। এত গালাগাল সহ্য করেও আমার ওয়ান ট্রাক মাইন্ড, আমি প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাসেই অগাধ বিশ্বাস রেখে এসেছি দীর্ঘদিন ধরে। এবারে বলুন আন্টি, এরপরেও যদি আমি বঞ্চিত হই তখন কি আপনি আমার পাশে দাঁড়াবেন না ?

অনিকের কথা বলার ধরনটি বড় পছন্দ হলো দীপশিখার। খুব কম সময়ে ছেলেটা মানুষকে আপন করে নিতে পারে। দীপশিখা বললো, আমি এখনো তোমার পাশেই আছি। শোন প্রিয়া, অনিকের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। তোরা খুব তাড়াতাড়ি রেজিস্ট্রি করে রাখবি। পরে সুযোগ মত বিয়েটা দেওয়া যাবে। তোর বাবাকে আমি বিশ্বাস করি না প্রিয়া, হয়তো কারোর কাছে টাকা

Sahitya Chayan
নিয়ে তার সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে দেবে জোর করে। তখন আমাকে চুপচাপ সেটা মেনে নিতে হবে, তাই আমি চাই তোর রেজিস্ট্রিটা হয়ে থাকুক। তাহলে ও আর কিছু করতে পারবে না। প্রিয়া এতক্ষণে বুঝতে পারলো, মা কেন কদিন ধরে অনিকের বিষয়ে জানতে এত আগ্রহী হয়ে উঠেছিল! এই জন্যই আজ সুযোগ পেয়েই অনিককে ডেকে আনতে বলেছিল বাড়িতে। তার মানে বাবা নামক ওই জানোয়ারটা কি প্রিয়ার বিয়ে সম্পর্কে কিছু বলেছে মাকে? সেইজন্যই মা ভয় পেতে শুরু করেছে? যতই মুখের সামনে ঐ লোকটার বিরোধিতা করুক ও, আসলে ভিতরে ভিতরে ওই সাইকো লোকটাকে ভয় করে। মায়ের কাছে গল্প শুনেছে লোকটা নাকি একদিন মদ্যপ অবস্থায় মায়ের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল। মায়ের পরিত্রাহি চিৎকারে পাশের বাড়ির কাকিমা এসে বাঁচিয়েছিলো। সেই থেকেই সামনে প্রতিবাদ করলেও ওই লোকটাকে দেখলে ভিতরে ভিতরে আতঙ্কে থাকে প্রিয়া। এই লোক সব পারে, প্রিয়ার মুখে অ্যাসিড ঢেলে দেবার হুমকিও দিয়ে রেখেছে পীযুষ বিশ্বাস, প্রিয়ার বায়োলজিক্যাল বাবা।

অনিক বলছিলো, তাহলে আন্টি, আমি বরং ঐদিনের জন্য একটা রেড আর ইয়োলো কম্বিনেশনে বেনারসি কিনে রাখি। যতই হোক বিয়ে বলে কথা, বেনারসি, পাঞ্জাবি, মালা না হলে কেমন যেন ফিলিংস আসে না। দীপশিখা হেসে বললো, আমরাও একটা শর্ত আছে, বরের পাঞ্জাবি আর কনের বেনারসির খরচ আমার। প্রিয়া মায়ের

Sahitya Chayan

দিকে তাকিয়ে দেখল, ক্লান্ত অবশ্রান্ত চোখ দুটোতে স্বপ্নীল দৃষ্টি ফুটেছে। মেয়ের বিয়ের স্বপ্নে ঠোঁটের কোণে নিশ্চিন্ত হাসি দেখা দিয়েছে একটু। নির্মম হতে মন চাইলো না প্রিয়ার। তাছাড়া সত্যিই যদি বাবা জোর করে ওর বিয়ে দিয়ে দেয়, অনিককে ছাড়া পারবে অন্য কারোর বাহুলগ্না হতে! ঘৃণা হবে যে নিজের ওপরেই! মনে হবে, অনিক রাজি ছিল, মা সুযোগ করে দিয়েছিল, শুধু ওর জেদেই সব নষ্ট করে দিয়েছিল ও। নিজেকে সামলে নিয়ে প্রিয়া বললো, এখনো দেখছি নারীদের ইচ্ছের মূল্য কেউ দেয় না, তাই আমার অনুপস্থিতিতে এই প্ল্যান সাকসেসফুল হয়েছে। শাশুড়ি জামাই যখন নিজেদের সম্পর্কটা ঠিক করেই নিয়েছে তখন আমি আর কি বলবো। বাধ্য হয়ে জব পাবার আগেই রেজিস্ট্রি করতে হবে। আসলে কি বলতো অনিক, এ বাড়ি থেকে আমি কোনো শুভ কাজ করতে চাইছিলাম না রে। ভেবেছিলাম মাকে নিয়ে অন্য জায়াগায় শিফট যদি করতে পারি তবেই বিয়ে করবো। অনিক নরম গলায় বলল, তুই যতদিন সময় চাস দেব। এখনকার বিয়েটা না হয় কাগজ কলমে সাক্ষী রেখেই হোক। এটুকু বিশ্বাস বোধহয় তুই করতে পারিস। দীপশিখা বললো, তোমরা কথা বলো, আমি দেখি ফোনটা বাজছে রিসিভ করি।

ফোনটা হাতে নিয়ে একটু হন্তদন্ত হয়েই বেরিয়ে গেল দীপশিখা।

অনিক ইশারায় বললো, তোর থেকে আন্টির দরদ বেশি আমার প্রতি। আয়, একবার কাছে আয়। একবার

Sahitya Chayan
ছুঁয়ে দেখ বুকের বাম দিকটা, নিজেকে খুঁজে পাস কিনা দেখ।

প্রিয়া এসে অনিকের বুকে মাথা গুঁজে বললো, ছুঁড়ে ফেলে দিবি না তো কোনোদিন? আমার জীবনে দেখা প্রথম পুরুষ পীযুষ বিশ্বাস, তাই পুরুষ শব্দটাকে শুধু ভয় নয়, মারাত্মক ঘৃণা করি রে। পারলে ওই ঘৃণা মিশ্রিত ভয়টাকে তাড়িয়ে দিবি আমার মন থেকে? অনিক আলতো করে হাত রাখল প্রিয়ার পিঠে, নরম গলায় বলল, কথা দিলাম কয়েক বছরের মধ্যেই পুরুষ শব্দের সমার্থকে তুইই লিখবি— ভালোবাসা, বিশ্বাস, নির্ভরতা।

দীপশিখা ইচ্ছে করেই ফোনটা ঘরে ওদের সামনে ধরেনি। ওদের এই আনন্দঘন মুহূর্তটুকুকে নিমেষে নিঃশেষ করে দিতে চায়নি। তাই স্ক্রিনে পীযুষ নামটা দেখেই বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। ফোনটা ধরতেই জড়ানো গলায় বলল, কি রে শালী, আমি যেমনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি বাড়িতে খদ্দের ঢুকিয়েছিস? কেন রে, খুব গরম ধরেছে বুঝি তোর? দীপশিখা জানতো কেউ না কেউ ঠিক দেখবে অনিককে এই বাড়িতে ঢুকতে। ফ্রিতে মজা নেবার জন্যই খবরটা ফোনে পৌঁছে দেবে পীযুষের কাছে।

গলাটা স্বভাবিক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে বললো, কই কেউ তো আসেনি! তারপরেই কিছু যেন মনে পড়ে গেছে এমন ভাবে বললো, একটা ছেলে বাড়ির সামনে ছানা বিক্রি করছিল, তাই কিনেছি। বাড়িতে তো নয়, বাড়ির গেটের সামনে কিনেছি। পীযুষ একটু থমকে গিয়ে বলল, সত্যি বলছিস তো?

Sahitya Chayan

দীপশিখা গলার ওঠানামা বুঝতে না দিয়েই বললো, হয় নিজে এসে দেখে যাও, নাহলে যে খবরটা দিলো তাকেই বাড়িতে পাঠাও। পীযুষ গালি দিয়ে বললো, বেশি চালাকি করবি না মাগি আমার সঙ্গে। মনে রাখিস, ছানা, দুধ জুটছে আমার পয়সাতেই। দীপশিখা কায়দা করে বললো, তুমি কি রাতে ফিরবে? তাহলে তোমার জন্য রেখে দেব ছানা। পীযুষ একটু চেঁচিয়েই বললো, ন্যাকা মেয়েছেলে, জানিস না, আমি দূরে কাজে এসেছি, এক সপ্তাহ পরে ফিরবো। তাই বলে এই সুযোগে যদি কোনো বেগড়বাই করিস তুই বা তোর মেয়ে, তাহলে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দেব দুটোকেই। চুপচাপ ঘরের মধ্যে থাকবি। বাইরের গেটে দাঁড়িয়ে নাগর খোঁজার দরকার নেই। ফোনটা কেটে দিলো পীযুষ। কিন্তু এই লোকটাকে একটুও বিশ্বাস করে না দীপশিখা। হয়তো এখুনি কোনো বোতলের বন্ধুকে বাড়িতে পাঠিয়ে খোঁজ নেবে, কেউ আছে কি না ভিতরে। তাই আর দেরি না করেই ডাকলো প্রিয়া, অনিককে একটু এগিয়ে দিয়ে আয়। অনিক, আমি পরে প্রিয়ার ফোন থেকে তোমার সঙ্গে কথা বলবো। তুমি রেজিস্ট্রারের সঙ্গে কথা বলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা কমপ্লিট করো বাবা। অনিক দীপশিখাকে প্রণাম করে বললো, চিন্তা করবেন না, খুব তাড়াতাড়ি আমি প্রিয়াকে রেজিস্ট্রি ম্যারেজে করছি। ততদিন ওকে একটু সামলে রাখুন প্লিজ আন্টি। প্রিয়া বেরিয়ে গেল অনিককে নিয়ে। বেশ জোরেই দীর্ঘশ্বাসটা ছাড়লো দীপশিখা।

Sahitya Chayan

পীযুষের মদের ঠেকের বন্ধুরা কেন যে এভাবে নজর রাখে ওদের বাড়ির ওপরে কে জানে! বোধহয় পীযুষ নির্দেশ দিয়ে যায় ওদের। ভয় করে খুব, প্রিয়া বড় হয়েছে, যদি এই সব মাতালগুলো কোনো একটা সর্বনাশ করে দেয় মেয়েটার। যার বাবা এমন তার মেয়েও যে সহজলভ্য হবে এমনই ধারণা জন্মাতে কতক্ষণ! হয়তো কোনোদিন সবাই মিলে প্রিয়াকে ধরে ...আর ভাবতে পারছে না দীপশিখা। অনিক এখনকার প্রিয়াকে ভালোবাসলেও তখনকার প্রিয়াকে কিছুতেই বিয়ে করবে না। সমাজ সংসার এখনো বোধহয় রেপ হওয়া মেয়েকে মেনে নিতে পারে না বউ হিসেবে! নিরপরাধ হলেও নয়। কেমন যেন সাদা পাতায় অনেকটা কালির দাগের মত। কিছুতেই ওঠে না। অথচ বিয়ের পর থেকে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে যে ধর্ষিতা হয়ে যাচ্ছে দীপশিখা সেটার খোঁজ সমাজ কোনোদিন রাখে না। বৈবাহিক সম্পর্কে বোধহয় ধর্ষণের ছাড়পত্র দেওয়া হয় একচেটিয়া। পীযুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ওর শরীরটা। মনের ওপরে আধিপত্য বিস্তার করার কোনো চেষ্টাই কোনোদিন করেনি পীযুষ, ওর শুধু শরীরটুকুই দরকার ছিল। সাড়া না দেওয়া শরীরটুকু নিয়েই কাটাছেঁড়া করেছে ও এত বছর। মেয়ের বিয়ে দেবার বয়েস হয়ে গেছে ওর তবুও ওর ক্লান্ত যোনীকে বিশ্রাম দেয়নি পীযুষ। এখনো মদ্যপ অবস্থায় দীপশিখার বিশ্রাম চাওয়া যোনীদেশে চলে পীযুষের অকথ্য অত্যাচার। কষ্ট সহ্য করতে করতে দীপশিখার মনে হয়, খুন করা কি সত্যিই খুব অপরাধের! না দীপশিখা খুনি হতে পারেনি,

Sahitya Chayan

পীযুষের মদের ঠেকের বন্ধুরা কেন যে এভাবে নজর রাখে ওদের বাড়ির ওপরে কে জানে! বোধহয় পীযুষ নির্দেশ দিয়ে যায় ওদের। ভয় করে খুব, প্রিয়া বড় হয়েছে, যদি এই সব মাতালগুলো কোনো একটা সর্বনাশ করে দেয় মেয়েটার। যার বাবা এমন তার মেয়েও যে সহজলভ্য হবে এমনই ধারণা জন্মাতে কতক্ষণ! হয়তো কোনোদিন সবাই মিলে প্রিয়াকে ধরে ...আর ভাবতে পারছে না দীপশিখা। অনিক এখনকার প্রিয়াকে ভালোবাসলেও তখনকার প্রিয়াকে কিছুতেই বিয়ে করবে না। সমাজ সংসার এখনো বোধহয় রেপ হওয়া মেয়েকে মেনে নিতে পারে না বউ হিসেবে! নিরপরাধ হলেও নয়। কেমন যেন সাদা পাতায় অনেকটা কালির দাগের মত। কিছুতেই ওঠে না। অথচ বিয়ের পর থেকে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে যে ধর্ষিতা হয়ে যাচ্ছে দীপশিখা সেটার খোঁজ সমাজ কোনোদিন রাখে না। বৈবাহিক সম্পর্কে বোধহয় ধর্ষণের ছাড়পত্র দেওয়া হয় একচেটিয়া। পীযুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ওর শরীরটা। মনের ওপরে আধিপত্য বিস্তার করার কোনো চেষ্টাই কোনোদিন করেনি পীযুষ, ওর শুধু শরীরটুকুই দরকার ছিল। সাড়া না দেওয়া শরীরটুকু নিয়েই কাটাছেঁড়া করেছে ও এত বছর। মেয়ের বিয়ে দেবার বয়েস হয়ে গেছে ওর তবুও ওর ক্লান্ত যোনীকে বিশ্রাম দেয়নি পীযুষ। এখনো মদ্যপ অবস্থায় দীপশিখার বিশ্রাম চাওয়া যোনীদেশে চলে পীযুষের অকথ্য অত্যাচার। কষ্ট সহ্য করতে করতে দীপশিখার মনে হয়, খুন করা কি সত্যিই খুব অপরাধের! না দীপশিখা খুনি হতে পারেনি,

Sahitya Chayan
পারেনি বলেই দিনের পরদিন সহ্য করে চলেছে ওই অমানুষটাকে। আগে আগে পীযুষের অনুপস্থিতিতে দরজা বন্ধ করে বাবার শেখানো গানের দুকলি গাওয়ার চেষ্টা করতো কিন্তু সেখানেও বারবার সামনে এসে দাঁড়াতো বিজয়ের মুখটা। বিজয়ের গাওয়া গান কানের কাছে যেন বেজে যেত অনবরত। বিজয়কে ভোলার আপ্রাণ চেষ্টাতেই গানকেও ত্যাগ করেছিল দীপশিখা। তখন একপ্রকার তীব্র অভিমানের বশবর্তী হয়েই পীযুষকে বিয়ে করেছিল ও। নাহলে বাড়ির কেউই পীযুষের সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়নি ওর। বিজয়ের সঙ্গে দীপার বিয়েটা ঠিক হবার পরেই বাবা বলেছিল, বিয়ের আগে বাড়িটা রং করিয়ে নিলে মন্দ হয় না। সেই রং করানোর সূত্রেই ডেকেছিলো পীযুষকে। ও ওর দুটো রঙের মিস্ত্রি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল দীপাদের বাড়িতে। দীপা চা-মুড়ি দিতে গেলেই ওকে দেখে নোংরা ইশারা করতো। একদিন পথ আগলে বলেছিল, আমায় বিয়ে করবি? তোর ওই গায়ক বরের থেকে অনেক বেশি ইনকাম করি আমি। নেহাত বেশ কিছুদিন কাজ ছিল না তাই এখন সব ছোটখাটো কাজই নিচ্ছি। নাহলে আমি বড় বড় ফ্ল্যাটের কাজ করি শহরে। দীপা বিরক্ত হয়ে বলেছিল, যেটা করতে এসেছেন করে মজুরি নিয়ে বাড়ি যান। অসভ্যতামি করবেন না। আর হ্যাঁ, বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেতে আসবেন যেন। দীপার বড়মুখ করে বলা কথাটা শুনে বোধহয় সেদিন ভগবানও অলক্ষ্যে হেসেছিল। তাই বিজয়ের বাবা আচমকা অতগুলো টাকা বর পণ চেয়ে বসেছিলো। অত সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও কেন যে দীপার

Sahitya Chayan

গরিব বাবার কাছ থেকে টাকা চাইতে হয়েছিল সেটাই বুঝতে পারেনি দীপা। ভেবেছিল বিজয় হয়তো প্রতিবাদ করবে, রুখে দাঁড়িয়ে বলবে, ও দীপাকেই বিয়ে করবে। কিন্তু দীপার শেষ আশাটুকুকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়েছিল বিজয়ের ভীতু চেহারাটা। বিজয় আস্তে আস্তে বলেছিল, ক্ষমা করো। বিয়ের আসর থেকে বেনারসি, সোলার মুকুট, গলায় রজনীগন্ধার মালা পরা দীপাকে ফেলে রেখে বাবার সঙ্গে চলে গিয়েছিল বিজয়। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বসেছিলো দীপা। ওর বাবা, দিদিরা কাঁদতে শুরু করেছিল। লগ্নভ্রষ্টা মেয়েকে নিয়ে বাবা ঠিক কি করবে বুঝতে পারছিল না। দীপার চোখে পড়েছিলো পীযুষ একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেঙে যাওয়া বিয়ের মজা দেখছে। দীপা ইশারায় ওকে ডেকে বলছিলো, বিয়ে করবে আমায়? পীযুষ হাতে চাঁদ পাওয়ার মত গলায় বলেছিল করবো। কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে। ওই গায়কের জন্য সাজানো বিয়ের আসরে আমি বিয়ে করবো না। এর পরের যে ডেটটা আছে, তাতে বিয়ে করবো আমি। আমার কিছু চাই না, কিন্তু বর আনতে গাড়ি পাঠাতে হবে তোমার বাবাকে। দীপার কথা শুনে দিদিরা বলেছিল, এটা ঠিক হচ্ছে না দীপা। একটা মদ্যপ রঙের মিস্ত্রি আমাদের বাড়ির জামাই হতে পারে না। দীপা শোনেনি কারোর কথা, ওর তখন একটাই উদ্দেশ্য ছিল বিজয়কে দেখিয়ে দেবে। বিজয়ের চোখের সামনে দিয়ে ও অন্যের হয়ে যাবে। অন্ধ অভিমানের বশবর্তী হয়েই পীযুষের মত মেয়েদের নোংরা ইঙ্গিত দেওয়া পুরুষকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি

Sahitya Chayan

হয়েছিল দীপশিখা। কয়েক দিনের মধ্যেই সকলের অমতে পীযুষকে বিয়ে করে বিজয়ের বাড়ির সামনে দিয়ে ফুলে সাজানো গাড়ি করে চলে এসেছিল দীপা। পরে অবশ্য শুনেছিল, বিজয়ের অন্যত্র বিয়ে দিতে চেয়েছিল ওর বাবা, বিজয় নাকি গ্রাম ত্যাগ করেছিল। বিজয় ঠিক কোথায় আছে, কি কাজ করে, বেঁচে আছে কিনা তাও জানে না গ্রামের কেউ। দীপশিখাও জানে না কেমন আছে বিজয়, শুধু এটুকুই জানে বিজয়ের ওপরে অভিমান করেই এভাবে নিজের জীবনটা শেষ করেছে ও। পীযুষের সব অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করার সময় মনে মনে বলেছে, বিজয়দা আমি তোমায় সত্যিই ভালোবেসেছিলাম। যদি এসব সহ্য করে বেঁচে থাকি, তাহলে এজন্মেই আরেকবার সম্মুখীন হবো তোমার। একটাই প্রশ্ন করবো তোমায়, ভালোবাসা কি অন্যায় বিজয়দা? জানতে চাইবো আজও গান করো তুমি? আমি গান ছেড়েছি তোমায় ভুলতে, গান ভুলে গেলেও তোমায় ভুলিনি আজও। কখন যেন চোখের কোণে জল জমেছিল দীপশিখার অজান্তেই, প্রিয়া এসে বললো, কাঁদছো কেন মা? অনিককে তোমার পছন্দ হয়নি?

দীপা আঁচলের খুঁটে চোখের জলটুকু মুছে নিয়ে বললো, পছন্দ হয়েছে রে। খুব সাহসী ছেলে, ভীরু নয়। তুই আমার মত ভুল করিসনি মানুষ চিনতে, তাই তো তোদের রেজিস্ট্রিটা করে দিতে চাই তাড়াতাড়ি।

প্রিয়া একটু চিন্তিত গলায় বলল, কিন্তু মা এই লোকটা তো সব খবর আগে পেয়ে যায়। যদি জানতে পারে কিছু,

Sahitya Chayan

তখন তো তোমায় মারবে! আমি এই পোস্টঅফিসের জবটা মনে হচ্ছে পেয়ে যাবো। যদি এটা পেয়ে যাই, আমি আর অনিক ঠিক করেছি একটা দু-কামরার ফ্ল্যাট নেব। তখন ওখানে তুমি, আমি আর অনিক থাকবো। এই লোকটা ওখানে এন্ট্রি নিতে গেলে জাস্ট পুলিশে ইনফর্ম করব আমি। দীপশিখা হেসে বললো, সেকি জামাই বাড়িতে থাকবো? প্রিয়া জোর গলায় বলল, না মেয়ের বাড়িতে থাকবে, মেয়ের টাকায় খাবে, হ্যাপি?

দীপা বললো সে হবেখন। এখন শোন, আমার কাছে জমানো কিছু টাকা আছে, তুই আর অনিক একদিন বেরিয়ে বিয়ের পোশাকটা কিনে আনবি বুঝেছিস।

মা, এত তাড়াহুড়োর কি কিছু কারণ আছে?

আছে রে, নিশ্চয়ই আছে, ভালোবাসা হারিয়ে অন্যের সঙ্গে ঘর করার যে কি কষ্ট সেটা যদি জানতিস তাহলে বুঝতে পারতিস, কেন তাড়া দিচ্ছি। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিস, কল্পনায় যার সঙ্গে সংসার করেছিস তাকে হারিয়ে অন্যের ঘরনি হওয়ার থেকে মৃত্যু শ্রেয়। কিন্তু কি বলতো প্রিয়া, মৃত্যু হচ্ছে বড় দুর্মূল্য জিনিস, যে তাকে চায় তার কাছে সে যায় না, কিছুতেই যায় না। যে তাকে সাদরে গ্রহণ করতে চায় তাকে সে উপেক্ষা করে, আর যারা তাকে ভয় পায়, সে তাদের দুয়ারেই ফেলে তার নির্মম ছাপ। সুতরাং জীবন্ত লাশ হয়ে সারাটা জীবন অন্যের সংসার তোকে যাতে না করতে হয় আমি তার চেষ্টাই করছি। তুই অমত করিস না। অনিক খুব ভালো ছেলে, তোকে খুব ভালোবাসে, তুই ভালো থাকবি। প্রিয়া

Sahitya Chayan

ঘাড় নেড়ে বললো, বেশ মেনে নিলাম তোমার কথা। এবারে বলতো, কাকে ভালোবাসতে তুমি?

দীপশিখা বললো, আমি বাসতাম, সে নয়। তাই সেসব আলোচনা থাক। চল, অনেক কাজ আছে, প্ল্যানটা ঠিকঠাক করতে হবে, তোর বাবা যেন টের না পায়।

।।২২।।

না মানে ওরা ঠিক কি ভেবেছিল বৌদি, যে আমরা কিছু টের পাবো না! অনুর চোখে মুখে তীব্র বিরক্তি। কাবেরী বললো, কিন্তু অনু এখনো কিন্তু আমরা পুরো ব্যাপারটা জানি না। মানে টুটাই কেন ওনার দেশের বাড়িতে গেল সেটাই তো ক্লিয়ার নয়। নীলাদ্রি বেশ গম্ভীর গলায় বলল, ভীষণ ইজি অংক কাবেরী, তোমার মত বুদ্ধিমতী মহিলার তো সমাধান না করার কথা নয়। অহনাই কোনো কারণে টুটাইকে প্রভোক করেছিল টুটাই যাতে বিয়ের আসর থেকে পালায়। টুটাই পালালে বর পালিয়েছের রব উঠবে, সেই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে অহনা পালাবে। খুব সহজ হিসেব। শুভ বললো, দাদা, আপনি বোধহয় ঠিকই বলেছেন। অনু ঘাড় নেড়ে বললো, ঠিক বলছিস দাদাভাই। ওই মেয়ের বুদ্ধিতেই টুটাই এমন করেছে। মেয়েটা কি মারাত্মক চালাক তুই শুধু একবার ভেবে দেখ। বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পুরো দোষটা পড়বে টুটাইয়ের কাঁধে। আর মেয়ে লগ্নভ্রষ্টার কষ্ট নিয়ে সকলের কাছে থেকে সিমপ্যাথি আদায় করবে। আমারও মন বলছিলো, টুটাই এটা করতে পারে না। বাড়ির সম্মানের কথা ওর মাথায় একবারও আসবে না এটা হতে পারে না!

Sahitya Chayan

তাছাড়া টুটাই একটা কলেজের প্রফেসর, ওর কলিগ, স্টুডেন্ট সকলের সামনে প্রেস্টিজ যাবে এমন কাজ ও করবে না। এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, হাওয়ার আগে কথা ছড়ায়।

কাবেরী অহনার হয়ে সকলের বিরুদ্ধে গিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করে বললো, কিন্তু একটা হিসেবে একটু গন্ডগোল লাগছে আমার। কেন টুটাই অহনা এমন একটা কান্ড ঘটানোর পরেও ওর পিছন পিছন সূর্যপুর গেল? শুভ সঙ্গে সঙ্গে বললো, এগজ্যাক্টলি বৌদিভাই, আমিও ওই একই জায়গায় গিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছি। কেন টুটাই ওখানে গেল। অনু বেশ বিরক্ত হয়ে বললো, তোমায় আর অংক মেলাতে হবে না। নিশ্চয়ই ওই মেয়ে টুটাইকে রাজি করিয়েছে ওকে ওখানে পৌঁছে দেবার জন্য। আর আমাদের ছেলেটা তো অভদ্রের মত বলতেও পারে না, যাবে না। তাই হয়তো ওকে বাবার বাড়িতে পৌঁছাতে গেছে। দেখ দাদাভাই এই মেয়ের সব গন্ডগোলে, মেয়ের বিয়েতে বাবা অনুপস্থিত। কি যেন কাজ পড়ে গেছে। এত সব গন্ডগোলের মধ্যে কেন টুটাইয়ের মত ভালো ছেলের বিয়ে হবে সেটা বলতে পারিস। যা হয় ভালোই হয়। আমি নিজে টুটাইয়ের যোগ্য কোনো ভদ্র ভালো মেয়ে দেখবো। কাবেরী কিছু বলার আগেই নীলাদ্রি বললো, সব অংকের উত্তর মিলে গেলেও কোনোভাবেই আমি আর ওই মেয়ের সঙ্গে টুটাইয়ের বিয়ে দেব না। এটা সকলে মনে রাখলে খুশি হব। কথাটা নীলাদ্রি কাবেরীর দিকে তাকিয়েই বললো। কাবেরী মাথা নিচু করে নিলো লজ্জায়। আসলে

Sahitya Chayan

বসু বাড়িতে অহনাকে নিয়ে এত প্রশংসা করেছে যে এখন ওর দোষ শুনলে লজ্জাই করছে কাবেরীর। বলতে গেলে সকলের মতের কিছুটা বিরোধিতা করেই ও অহনাকে নিয়ে আসতে চেয়েছিল বউ হিসেবে। অহনার চোখের সততা এতটাই আকৃষ্ট করে রেখেছিল কাবেরীকে যে এখনো বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে মেয়েটার সত্যিই কোনো দোষ থাকতে পারে। এতক্ষণ যখন শুনছিলো টুটাই পালিয়েছে তখনও বোধহয় এতটা কষ্ট হয়নি যতটা হচ্ছে বিশ্বাসটা অহনা ভঙ্গ করলো বলে! কিন্তু এই বয়েসে মানুষ চিনতে এমন গুরুতর ভুল করলো কাবেরী! মেয়েটাকে নিয়ে দুদিন শপিংয়ে গিয়েছিল কাবেরী, দেখেছিলো কিছুতেই দামি শাড়ি গয়না কিনতে চাইছে না ও। কাবেরীকে বলেছিলো, আন্টি অপচয় কোরো না। বিয়ের এই ভারী বেনারসি বা এই ভারী গয়নাগুলো আমি ঐ একদিনই পরবো, তারপর পরে থাকবে আলমারির কোণে, তাই বলছি এগুলোর পিছনে এতটা খরচ কোরো না। খবরের সন্ধানে বিভিন্ন গ্রামের দিকে যেতে হয় প্রায়ই। তখন দেখি, কত বাচ্চার জামার পিছনের হুকটা পর্যন্ত নেই, কত যুবতী ছেঁড়া শাড়ির আঁচল দিয়ে যৌবন ঢেকেছে কোনোমতে, কত পুরুষের জামার কলারে দারিদ্রের ছাপ, সে তুলনায় আমরা এমনিই প্রচুর বিলাসিতা করি। তারপর আর অপচয় কোরো না প্লিজ। আমি মাকেও বারণ করেছি, তাই তোমাকেও করলাম। তোমরা যদি সত্যিই আমায় কিছু দিতে চাও তাহলে টাকা দিয়ে দিও, আমি কয়েকটা আশ্রমের অনাথ শিশুদের দুদিন পেট ভরে

Sahitya Chayan

খাইয়ে দেব। সেটা আমার বিয়ের বেস্ট গিফট হবে। কাবেরীর অবাক লেগেছিল। এইটুকু একটা মেয়ে এত লোভহীন হয় কি করে!

কাবেরীর সব হিসেব ওলোটপালোট হয়ে গেছে, তাই বুকের মধ্যে চিনচিনে যন্ত্রণাটার অস্তিত্ব টের পাচ্ছে। অনেক আশা ছিল, অহনা এ বাড়িতে বউ হয়ে এলে নীলাদ্রি, নৈঋত থেকে এদের আত্মীয়স্বজন সকলে বুঝতে পারবে মেয়ে মানে সংসার সামলে হেঁসেলে ঢোকা নয়। অফিস ফেরত ক্লান্ত শরীরে সকলকে খাবার পরিবেশন করতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা নয়। মেয়ে মানে নিজের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা নয়, বরং যাকে দেখলে মনে হবে স্বাধীনতা শব্দটা এর জন্যই তৈরি। যাকে দেখলে বিশ্বাস হবে মেয়েদেরকে নিজেদের অধিকার চেয়ে চেয়ে আদায় করতে হয় না, পুরুষদের মত সব অধিকারই মেয়েদেরও জন্মগত। শুধু প্রয়োগ করে না বলেই বেশ কিছু জায়গায় আজও পুরুষ এগিয়ে যাচ্ছে। না, পুরুষ বিদ্বেষ কাবেরীর নেই। শুধু অহনার মত মেয়েদেরকেও পুরুষরা হিংসে করে, এটাই দেখাতে চেয়েছিল ও। নৈঋত বারবার জিজ্ঞেস করেছিল, মা তুমি অহনার মধ্যে কি এমন দেখলে যে একবারে বউ করে আনতে চাইছো?

নীলাদ্রি বলেছিল, খুব যে ডানাকাটা পরী তাও তো নয়।

কাবেরী হেসে বলেছিল, এই হলো তোমাদের বড় রোগ। নিজের ছেলেকে পাড়ার অখাদ্য দানাদারের মত দেখতে হলেও বউ হিসেবে চন্দননগরের জলভরাই চাই।

Sahitya Chayan

নৈঋতকে দিয়ে যেমন অহনা বিয়ের পরে মডেলিং করাবে না, তেমনি নৈঋতও নিশ্চয়ই অহনাকে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে রেড কার্পেটে হাঁটানোর চিন্তা ভাবনা করছে না। তাই ডানাকাটা পরী কি হবে নীলাদ্রি? তোমার ছেলেও তো রূপকথার রাজপুত্র নয়, তাই না? টুটাই হেসে বলেছিল, মা তুমি তো দেখছি অহনার জন্য বেশ লড়ে যাচ্ছ। এবারে কিন্তু আমায় বিশ্বাস করতেই হচ্ছে, মেয়েটার মধ্যে সামথিং ইউনিক আছে যেটায় তোমার চোখ আটকেছে।

কাবেরী ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলেছিল, হ্যাঁ, ওর সব থেকে বড় সম্পদ ও ভীষণ সৎ। জানি তোরা হয়তো হাসবি, বলবি ডুমুরের ফুল আর সৎ শব্দটা সমার্থক। তবুও আমি বলবো, যে ডুমুরের ফুল দেখেছে তাকে যেমন তুই বোঝাতে পারবি না এই ফুল হয় না, তেমনি আমাকেও বোঝাতে পারবি না সৎ মানুষ হয় না। এত কথা বলে রীতিমত সওয়াল করেছিল ও অহনার জন্য। সেই মেয়ে কিনা বয়ফ্রেন্ডের জন্য বিয়ের আসর থেকে পালালো? না, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বয়ফ্রেন্ড থাকলে অহনা স্ট্রেইট বলতো, এই বিয়ে করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। এর পিছনে অন্য কিছু আছে। জানতেই হবে কাবেরীকে। অহনা যে আর বসুবাড়ির বউ হতে পারবে না সে বিষয়ে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর হয়েই গেছে কাবেরী, তবুও সত্যিটা জানার জন্য ছটফট করছিল ও। বাড়িটা একটু ফাঁকা হলে সুচেতাকে কল করতে হবে।

Sahitya Chayan

সকাল থেকেই নীলাদ্রি ছোটাছুটি করছিল। ক্যাটারার থেকে ডেকরেটর, আত্মীয় থেকে কলিগ, পরিচিত সকলকে জানাতে হচ্ছে আগামীকাল ফুলশয্যার প্রীতিভোজটা হচ্ছে না বিশেষ কারণে তাই আপনারা আর কষ্ট করে এ বাড়িতে আসবেন না। বাকি যাদের পেমেন্ট করার সেগুলো মেটাচ্ছে নীলাদ্রি। ওকে দেখে কাবেরীর খারাপই লাগছে। দায়িত্ব থেকে বরাবর এড়িয়ে যাওয়া মানুষটাকে আজ বড় সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে। এত লোককে ফোন করা থেকে শুরু করে একঘেয়ে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাওয়া, তবুও যাক টুটাইয়ের খবরটা পেয়ে একটু নিশ্চিন্ত হয়েছে মানুষটা। নাহলে তো বলছিলো, থানায় যাবে মিসিং ডায়রি করতে। টুটাইয়ের ফোনটা যে কেন এখনো সুইচড অফ কে জানে। একবার কথা বলতে পারলে মনটা শান্ত হতো। শুভও সমানে হেল্প করছে নীলকে। শুভ সোফায় পা ছড়িয়ে বসে বললো, এই যদি বিয়েটা হতো দাদা, তাহলে আজকের সব পরিশ্রমকে কষ্ট মনে হতো না। কিন্তু যখনই মনে হচ্ছে বিয়েটা ভেঙে গেছে বলে আমরা ছুটাছুটি করছি তখনই যেন ক্লান্তি নামছে। ঠিক যেন দুর্গাপুজো হবার আগে প্যান্ডেল বাঁধার উৎসাহ আর দশমীর পরে প্যান্ডেল খুলে ফেলার নিরুৎসাহের মত, তাই না? নীলাদ্রি বিকেলের চায়ে চুমুক দিয়ে বললো, অনিরুদ্ধবাবু বলেছিলেন কল করবেন সবটা জেনে। ভদ্রলোক আর কল করলেন না তো! সে যাকগে, বেশি জেনে লাভ নেই। ওই ফ্যামিলির সঙ্গে আমাদের যেহেতু

Sahitya Chayan

আর কোনো যোগাযোগ থাকছে না, তাই নাড়িনক্ষত্র এখন জেনেই বা আমরা কি করবো, তাই না অনু?

অনু বিষণ্ণ মনে বললো, আমার ভাইপোটার সঙ্গেই এমন হতে হয় ভগবান! অনুর চোখটা ছলছল করছিল দেখে নীলাদ্রি বললো, এটা ভাবছিস কেন যে খুব খারাপ হয়েছে? বরং এভাবেও ভাবতে পারিস অনু, যে ওই মেয়ে যদি বিয়ের মাসখানেক পরে পালাত তাহলে এ বাড়ির কেমন বদনাম হতো, তারপর টুটাইয়ের মনের উপরেও প্রেসার তৈরি হতো অনেক বেশি। তার থেকে আমি তো বলবো ভগবান সঙ্গে আছেন বলেই যা ঘটার বিয়ের রাতেই ঘটে গেছে। আর আমাদের অফিসের ব্যানার্জীদাই তো টুটাইয়ের জন্য সম্বন্ধ এনেছিল। আমি তেমন পাত্তা দিইনি। ব্যানার্জীদার শালার মেয়ে, মেয়েটা বোধহয় মিউজিক নিয়ে পড়েছে, এখন কোনো কলেজের গেস্ট লেকচারার। অনু বললো, হ্যাঁ দাদা, এবারে যখন টুটাইয়ের জন্য পাত্রী দেখবি এমন স্কুল টিচার বা লেকচারার এমন দেখবি, এসব গেছো পলিটিক্যাল বিটে কাজ করা রিপোর্টার নয়, বুঝলি! কথাগুলো হয়তো ওরা এমনিই আলোচনা করছিল কিন্তু কেন কে জানে কাবেরীর গায়ে এসে লাগছিলো। বিশেষ করে এর কোনো প্রতিবাদও করার ক্ষমতা নেই ওর এই মুহূর্তে। টুটাই এখনও বাড়ি ফিরলো না এরা সবাই মিলে ওর মেয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে। কালকের অমন বিশৃঙ্খল ঘটনাটা কাটিয়ে ওঠার জন্যই টুটাইয়ের খুব দ্রুত একটা বিয়ে দিতে হবে এমনটাই বোধহয় সকলে ভাবছে। অনু

Sahitya Chayan

বললো, দাদা, তুই ওই ব্যানার্জীদাকে একটা কল করে দেখ না। পারলে আমরা কাল, পরশু যাবো মেয়ে দেখতে। দিন দশেক পরে আরেকটা লগ্ন আছে। ওই তো তুতানের ড্রয়িং টিচারের বিয়ে ওইদিন। ওই ডেটেই তাহলে টুটাইয়ের বিয়েটা দিয়ে দেব আমরা। নীলাদ্রি একটু ভেবে নিয়ে বললো, মন্দ বলিসনি। অন্তত মেয়েটার ছবিটা তো দেখা যেতেই পারে হোয়াটসআপে। তারপর নাহয় সিদ্ধান্ত নেব দেখতে যাবো কিনা। শুভময় এতক্ষণ চুপ করেই ছিল, এবারে বললো, হ্যাঁ আমিও থাকতে পারবো এই টাইমটা। আমার অফিসেও ছুটির অ্যাপ্লিকেশন দেওয়াই আছে বিয়ে পার্পাসে। তবে অনু, টুটাই ফিরুক তারপর না হয়। কাবেরীও বলতে যাচ্ছিল একই কথা, তার আগেই নীলাদ্রি বললো, আমার মনে হয় টুটাইও চাইবে বিয়েটা সেরে ফেলতে, ওকেও তো কলেজ জয়েন করতে হবে। আমি চাই না, টুটাই ক্লাসে ঢুকলেই স্টুডেন্টরা চেঁচিয়ে বলুক, স্যার আপনার বউ কেন পালালো? ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্টুডেন্ট সম্পর্কে নিশ্চয়ই আমার থেকে তোমার ভালো ধারণা আছে শুভ, তাই তুমি নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছো টুটাইকে ঠিক কতটা অস্বস্তিতে পড়তে হবে কলেজে। আজ সন্ধেতেই আমি ব্যানার্জীদাকে কল করবো। দরকার পড়লে পুরোটা বলবো বুঝিয়ে, তাহলে ব্যানার্জীদাও সিচুয়েশনটা বুঝতে পারবে। অনু হাসি মুখে বললো, তাই কর দাদা। তুই ঠিকই বলছিস যা হয় ভালোর জন্য হয়। এসব রিপোর্টার, সাংবাদিক এদের জীবনে প্রবলেমের শেষ নেই, সারাটা জীবন টুটাইকে

Sahitya Chayan

এসব সহ্য করতে হতো। কাবেরী ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। আসার সময় শুনলো, নীলাদ্রি বলছে, এবারে আর আমি কারোর কথা শুনে দ্বিতীয় ভুল করবো না।

এ সংসারে পা দেওয়া থেকে সব মনে পড়ে যাচ্ছিল কাবেরীর। অনুর বিয়ে দিতে হবে বলে নীল তখন নিজের বিয়ে নিয়ে কিছুতেই ভাবতে রাজি নয়। কাবেরী বলেছিল অপেক্ষা করবো। তখন বোঝেনি এ সমাজে পড়াশোনা কমপ্লিট হয়ে যাওয়া, চাকুরিরতা মেয়ের কুমারী হয়ে থাকার পিছনের কারণটা সকলকে বোঝাতে বোঝাতে ও ক্লান্ত হয়ে যাবে। হয়েছিল ঠিক তাই, সকলেই জিজ্ঞেস করতো কাবেরী বিয়ে করছে না কেন? বয়েস তো হলো। চাকরি করছে, দেখতে শুনতে বেশ ভালো, তাহলে সমস্যাটা কোথায়? সম্বন্ধের পর সম্বন্ধ ফিরিয়ে দিয়ে নীলের জন্য অপেক্ষা করছিল কাবেরী। নীলাদ্রির বাড়িতে কেউ কাবেরীর অস্তিত্বের কথাও জানতো না। কাবেরী ওর বাড়িতে নিলাদ্রীকে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল এবং বলেছিল ওদের সম্পর্কের কথা। নীল হেসে বলতো, তুমি বড্ড সাহসী কাবেরী। ও বলেছিল, যদি অনুর বিয়ের পর তোমার বাড়ি থেকে আমাদের সম্পর্কটা মেনে না নেয় তখন কি করবে নীল? না, নীলের কাছে এর সঠিক কোনো উত্তর ছিলো না। বলতো, সে পরের কথা পরে হবে। একটু ভয়েই যেন এড়িয়ে যেত কাবেরীর প্রশ্নটাকে। তবুও নীলের দোদুল্যমান উত্তরের ভরসাতেই অপেক্ষা করছিল কাবেরী। সেই কারণেই বোধহয় ওদের বিয়ের

Sahitya Chayan

পর থেকেই নীলের ধারণা হয়েছিল কাবেরী সব সামলে নিতে পারে। তাই এ সংসারের সমস্ত দায়িত্ব ওর ওপরে দিয়ে নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিয়েছিল এতগুলো বছর। ওর বাবা-মাও কাবেরীকে ভরসা করতেন যতদিন বেঁচে ছিলেন। এই প্রথমবার নীলের মুখে কাবেরীকে বিশ্বাস না করার কথাটা শুনে তাই ভিতরে ভিতরে একটা অব্যক্ত কষ্ট দানা বেঁধেছিল। একেই বলে বোধহয় সংসারের জটিল অঙ্ক। নিরানব্বইটা ঠিকের পর একটা ভুল করলেই তুমি হয়ে যাবে ব্রাত্য। আগের সব গুন চিহ্ন মুহূর্তের ভাগ হয়ে গিয়ে তোমার স্কোর দাঁড়াবে এ বিগ জিরো। এই এখন যেমন সব কটা আঙুল কাবেরীর দিকে তাক করে বলছে, তুমি ভুল। না, টুটাইয়ের বিয়ের ব্যাপারে আর কাবেরী কোনোরকম ইন্টারফেয়ার করবে না, বধূবরণ ছাড়া আর কোনো ভূমিকা থাকবে না টুটাইয়ের বিয়েতে। অনু, নীল, শুভময়, নীলের জ্যেঠতুতো দাদারা সবাই তো আছে, তারাই দায়িত্ব নিক। কাবেরী শুধু চায় টুটাই খুশি হোক।

সুচেতাকে একটা ফোন করে জিজ্ঞেস করবে কেন ওরা মা মেয়ে মিলে এভাবে কাবেরীর উঁচু মাথাটা নিচু করে দিলো লোকজনের সামনে, নিজের পরিবারে! এই উত্তরটা তো অহনা আর সুচেতা দুজনকেই দিতে হবে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শীতের দুপুর নিভে গিয়ে বিকেল নামা দেখছিলো কাবেরী। কত তাড়াতাড়ি মরা রোদের আলোটুকুকে শুষে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে সূর্য।

Sahitya Chayan

পৃথিবীর বুকে এক ফোঁটা রশ্মিও যেন ফেলে যেতে রাজি নয় সে। বড় নিষ্ঠুর মনে হলো শীতের সূর্যকে।

।।২৩।।

সেদিন ঐরকম নিষ্ঠুর ভাবে কথাগুলো বলা বোধহয় ঠিক হয়নি অনিরুদ্ধকে। মানুষটা কাজের জন্য সময় হয়তো কম দিয়েছে সুচেতাকে কিন্তু দায়িত্ব থেকে কোনোদিন পিছপা হয়নি। সেই কলেজস্ট্রিট, প্রেসিডেন্সির দিনগুলো খুব মিস করে সুচেতা। তখনকার অনিরুদ্ধ অনেক বেশি সময় দিত সুচেতাকে। হয়তো তখনও সিনিয়র সাংবাদিক হতে পারেনি বলেই বাইরে ট্যুর করে এসেই পরের দিন ছুটে আসতো কলেজস্ট্রিট। কফিহাউসের ব্ল্যাককফিতে চুমুক দিয়ে অনেক লোকের ভিড়েও যেকোনো বাহানায় একবার ছুঁয়ে দিত সুচেতার আঙুলগুলো। ফিসফিস করে বলতো, মিস করেছিলে? সত্যি বলো। সুচেতা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতো, বয়েই গেছে ভারী। অনি অভিমানী চোখে তাকিয়ে বলতো, বড্ড নিষ্ঠুর তুমি। মিথ্যে করেও তো বলতে পারতে, করেছো আমায় মিস। সুচেতা কফিতে চিনি মেশাতে মেশাতে বলতো, যে সর্বদা জোর গলায় দাবি করে আমায় ভালোবাসে, সে যদি মনের অন্দরেই প্রবেশ করতে না পারলো তাহলে তার ভালোবাসায় কি নিশ্চিতরূপে ভরসা করা উচিত অনি? অনিরুদ্ধ হেসে বলতো, প্রেসিডেন্সি দেখছি বেশ স্মার্ট করে দিচ্ছে তোমায়। সুচেতা হেসে বলতো, সাংবাদিকের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে বলেই একটু ট্রেন্ডী হচ্ছি এই আরকি। নাহলে ফার্স্ট বলেই আউট হবার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়

Sahitya Chayan
যে। অনি বলতো, তবুও সুচেতা তুমি তোমার গায়ের মাটি মাখা সোঁদা গন্ধটাকে একেবারে মুছে ফেলো না শহরের দূষণে। নিষ্ঠুরতা নয় তোমায় কোমলতা মানায়। হয়তো তখনকার সুচেতা কোমলই ছিল। ছিল তো বটেই, নাহলে কলকাতার স্কুলে চাকরি পাওয়ার পরে রাইগঞ্জ ছেড়ে আসতে হবে বলে কেঁদে ভাসিয়েছিলো সুচেতা। বাবা বলেছিল পাগলী, এ যে আমার বড় গর্বের দিন রে। তুই কূপমণ্ডূকতা ছেড়ে, রাইগঞ্জের পরিধি অতিক্রম করে পা রাখতে পেরেছিস শহরের স্কুলে। স্কুলের চাকরিটা পাওয়ার পিছনেও অনির অবদান অস্বীকার করার নয়। অনিই জোর করে অ্যাপ্লিকেশনটা করিয়েছিল। সুচেতা তখন ইংলিশে মাস্টার্স করছে। অনি বলেছিল, শোনো পড়াশোনা যেমন করছো করো, কিন্তু এই কমলা সুন্দরী স্কুলে একজন ইংরাজির শিক্ষিকা নিয়োগ করবেন ম্যানেজিং বডি, আমি খবর পেয়েছি। একটা অ্যাপ্লাই করতে দোষ কোথায়! সুচেতা বলেছিল, ধুর আমি পাবো না। শহরে কত স্মার্ট মেয়েরা আছে। অনিরুদ্ধ বলেছিল, অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারটা লাগে মশাই চাকরি পেতে গেলে। গ্রামে বসেই যেটা তুমি তৈরি করেছ। আর তোমার অনার্সের রেজাল্টও দুর্দান্ত, সুতরাং চান্স আছে। তারপর শোনো, বুঝতেই তো পারছো আমি একটা নামি দৈনিকের পেজে কাজ করি, তাই স্কুল কমিটি মিডিয়াকে চটাবে না। ব্যাকে যেটুকু পুশ লাগবে আমি তো আছি। সুচেতা বলেছিল, এ তো দু-নম্বরি। অনি ওর থুতনি ধরে বলেছিল, আহা রে, ইনোসেন্ট বেবি। সরকারি চাকরিতে এমন একটু আধটু

Sahitya Chayan

হয়। মানে ধরো তুমি তোমার রেজাল্ট নিয়ে তৃতীয় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছো, তোমার কাঁধে একটু নামকরা কারোর হাত পড়লো তুমি ওমনি মন্ত্রবলে উঠে যাবে প্রথম সিঁড়িতে। তুমি দু-নম্বরি না করলে চতুর্থ সিঁড়ি থেকে দু-নম্বরি করেই কেউ প্রথম সিঁড়িতে উঠবে আর তুমি সততার মুখোশ আটকে বুকে ভালো রেজাল্টের ফাইল আঁকড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ওই তৃতীয় সিঁড়ির ধাপেই। বুঝলেন ম্যাডাম। সুচেতার চাকরিটা হয়ে গিয়েছিল অনিরুদ্ধর তৎপরতায়। তখনও তো স্কুল সার্ভিস কমিশন চালু হয়নি, ওই ম্যানেজিং বডিই সিদ্ধান্ত নিতো, কাকে নিয়োগ করা হবে। অনি বোধহয় ওর বসের সাহায্যও নিয়েছিল এ ব্যাপারে। সুচেতা মাস্টার্সের ফাইনাল ইয়ারেই স্কুলের চাকরিটা পেয়ে গিয়েছিল। বাবার মুখে হাসি ফুটেছিল, চোখে গর্ব। সেদিন সুচেতার মনে হয়েছিল, বাবাকে দেওয়া এটাই বোধহয় সুচেতার সব চেয়ে বেস্ট গিফ। সুচেতা চাকরি পাবার পরেই দাদা বলেছিলো, তুই যদি রাজি থাকিস তাহলে দোতলার মেঝেটা মার্বেল বসাব, তুই কিছু কন্ট্রিবিউট করবি? সুচেতা অবাক হয়ে ভেবেছিল, একটা চাকরি ওকে এতটা গুরুত্বপূর্ণ করে দিলো সংসারে। অনিরুদ্ধ বলেছিল, সু, নতুন ফ্ল্যাটটা হ্যান্ডওভার করবে ওরা, তুমি নিজের মত করে সাজিয়ে নাও। সুচেতা তখন ভীষণ ব্যস্ত। একদিকে মাস্টার্সের শেষ কয়েকটা ক্লাস ওদিকে নতুন স্কুল, আবার অনির দেওয়া আরেকটা দায়িত্ব, ওদের ফ্ল্যাট সাজাতে হবে মনের মত করে। নিজেকে বড্ড বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর সুখী মানুষ মনে

Sahitya Chayan

হয়েছিল ওর। দাদাকে সুচেতা বলেছিল, আমি মাসের মাইনে পেয়েই তোকে দেব, তুই কাজে লাগিয়ে দে। বাবা বলেছিল, বাড়িটাও রং করিয়ে নেব, এবারে তোর বিয়ের কথাও তো ভাবতে হবে। সুচেতা বাড়িতে বলতে চেয়েছিল অনিরুদ্ধর কথা কিন্তু কেমন যেন লজ্জা লজ্জা ভয়ে বলে ওঠা হয়নি। স্কুল সামলে অনির ফ্ল্যাট সাজাতে সাজাতেই মাস্টার্সের ফাইনাল এক্সাম দিয়েছিল সুচেতা। রেজাল্ট দেখে অনিরুদ্ধ বলেছিল, ইউ আর রিয়েলি ব্রিলিয়ান্ট সু। এত কিছু সামলেও এমন ভালো রেজাল্ট। বি.এডটা কমপ্লিট করে রাখো। সুচেতা বলেছিল, বছর খানেক পরে করি। যদিও পরের বছর সুচেতার বি.এড ভর্তি হওয়া হয়নি, অহনার বয়েস যখন ছয় তখন সুচেতা বি.এড করেছিল। অনিরুদ্ধ বলেছিল, বেশ সেই বরং ভালো। আমার কাছে থেকেই পরবর্তী পড়াশনা করো। সুচেতা বলেছিল, বাবা সেদিন বিয়ের কথা বলছিল জানো? অনি কাঁধের ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে বলেছিল, এখন ড্রাইভ করতে শুরু করলে রাতের মধ্যে রাইগঞ্জ ঢুকে যাবো। চলো তোমার বাবাকে একটু চমকে দিয়ে আসি। মানে এই আপনার একমাত্র আর পার্মানেন্ট জামাই, ভালো করে দেখে নিন টাইপ সংলাপ দু-একটা বলবো, লুচি, মাংস খাবো ফিরে আসবো। সুচেতা ওর চুলগুলো ঘেঁটে দিয়ে বলেছিল, আহ্লাদ নাকি? বাবা ভাবতেই পারে না আমি কলকাতায় ভর্তি হওয়ার নাম করে প্রেম করছি এখানে। কি করে যে বলবো বাবাকে কে জানে! অনিরুদ্ধ হেসে বলেছিল, সে তোমার লুকের প্রব্লেমে হয়েছে। ভদ্রলোক

Sahitya Chayan

ভাবতেই পারেন না তার এমন নিরীহ দেখতে মেয়ে অন্যের বুকে ঝড় তুলতে পারে। সে ঝড়ের এমন দাপট যে গোটা বিশ্বের যেখানেই যাই না কাজের সূত্রে, যতই সাদা চামড়ার নীল চোখের সুন্দরীদের দেখি না কেন, সে ঠিক উড়িয়ে এনে ফেলবে তার মেয়ের পায়ে। ভদ্রলোকের দোষ নেই, তিনি তো আর জানেন না, তার কাজল কালো চোখের অধিকারিণী মেয়েটির বাঁকা চাউনিতে একজন ধরাশায়ী হয়ে গেছে।

সুচেতা মুখ বেঁকিয়ে বলছিলো, রিপোর্টারদের নিয়ে এই এক সমস্যা, ভিতরে ভিতরে ভালো না বাসলেও কথার মায়াজালে ঠিক জড়িয়ে ফেলবে। নতুন কেনা ব্রাউন গদির সোফায় সুচেতাকে জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটের পিঙ্ক লিপ্সটিকটা নিজের জিভে মেখে নিতে নিতে অনিরুদ্ধ বলেছিল, ভালোবাসি কিনা সে প্রমাণ পেতে গেলে আজীবন এভাবেই থাকতে হবে আমার বুকের মধ্যে। ছটফট করলেও ছাড়া পাবে না। সু আমার গোটা পরিবার থেকে আমি বিচ্ছিন্ন, জানি না কারণটা ঠিক কি! কেউই যেন আমায় ঠিক আপন করতে পারেনি। প্লিজ তুমি দূরে সরিয়ে দিও না। কথা দাও, সব পরিস্থিতিতে পাশে থাকবে আমার। সুচেতা কথা দিয়েছিল। আজ হঠাৎ মনে পড়ে গেলো, সে কথা কি সুচেতা আদৌ রেখেছে? একতরফা বোধহয় সুযোগই নিয়ে গেছে অনির কাছ থেকে। ভালো তো সুচেতাও বেসেছিলো অনিকে। তাই গ্রীষ্মের ছুটিতে এসে রাইগঞ্জে ফোন না থাকায় বেশ কিছু চিঠিও লিখেছিল অনিকে। স্কুলের গ্রীষ্মের ছুটিতে মেস ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল,

Sahitya Chayan

সুচেতাও রাইগঞ্জের বাড়িতে ফিরে এসেছিল, বাবা-দাদার সঙ্গে কাটাবে কয়েকটা দিন। অনিও তো যাবে কলকাতার বাইরে। মাঝে মাঝে খুব রাগ হতো অনির ওপরে, মানুষটা যেন বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এই কয়েকমাস। জিজ্ঞেস করলে বলতো, দেখতে চাও না আমায় সাফল্যের শিখরে? সুচেতা জানে অনিরুদ্ধ কাজপাগল মানুষ, কাজ ছাড়া ও ভালো থাকতে পারে না। তাই ব্যস্ত অনিরুদ্ধর সঙ্গেই নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। রাইগঞ্জের বাড়িতে ঢোকার পর থেকেই আত্মীয়স্বজনরা শুরু করেছিল সুচেতার বিয়ের আলোচনা। বাবারও ইদানিং শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না।

তাই দাদা তড়িঘড়ি বাড়িতে মিস্ত্রি লাগিয়ে দিল। দোতলার ঘরগুলোর মেঝেতে পাথর বসবে। সুচেতার ইচ্ছে ছিল এক তলার দক্ষিণের কোণের যে ঘরটাতে ও থাকে সেটাকেও নতুন করে সাজাতে। ওই ঘরেই কেটেছে ওর শৈশব থেকে যৌবনে উত্তীর্ণের দিনগুলো। অনিরুদ্ধকে এ-বাড়িতে যেদিন ডাকবে সেদিন প্রথমেই এই ঘরে বসতে দেবে। এই ঘরটার বর্ণনা অনিকে ও বলেছে বহুবার। বাবাকে বলতেই বাবা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গিয়েছিলো। দাদা বলেছিল, একতলার ঘরগুলো আবার পরে হবে না হয়। সুচেতা একটু জেদ করেই বলেছিল, আমার ঘরটাতে আমি হালকা নীল দেওয়াল করবো আর মেঝেতে সাদা পাথর। দাদা অমত করেনি। ওর আর দাদার টাকায় কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। পাড়ার লোকজন আলোচনা করেছিল, ওই বাড়ির মেয়ের বোধহয় বিয়ে

Sahitya Chayan

লাগবে তাই বাড়ির কাজ শুরু করেছে। সুচেতা আর সময় নষ্ট না করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবারে অনিরুদ্ধকে ডেকে আনবে এই বাড়িতে। ওই সুচেতাকে চেয়ে নেবে বাবার কাছ থেকে। সেই মত চিঠিও লিখেছিল অনিকে। অনি উত্তরে লিখেছিল দিন দশেক সময় দাও সু, আমি একটা স্পোর্টস মিট করতে লন্ডনে যাবো, ফিরেই আসছি তোমার কাছে। অভিমানে মুখ কালো করেছিল সুচেতা। সবসময় শুধু কাজ। শুধু জানতো, অনি যখন কথা দিয়েছে তখন দশদিন পরে ও নিশ্চয়ই আসবে এ বাড়িতে। এ কদিন অপেক্ষা করতেই হবে। ততদিনে হয়তো বাড়ির কাজটাও কমপ্লিট হয়ে যাবে। বাবার পেনশনের টাকায় সংসার চলে যায়, তবুও দাদা একটু বিরক্ত যেন। বাবা নাকি বিনা পয়সায় স্টুডেন্ট পড়ানো শুরু করেছে, এতেই দাদার রাগ। কম মাইনে নিক তাই বলে বিনামূল্যে। সুচেতা বুঝিয়ে বলেছিল, এখন তো তুই আমি দুজনেই চাকরি করছি এবার বাবাকে নিজের মত বাঁচতে দে না। দাদা বিরক্ত হয়ে বলেছিল, সারাটা জীবন তো নিজের মতই বাঁচলেন রে। মাও তাই বলতো। কবে আর সংসারের কথা ভাবলেন? সুচেতা বলেছিল, ভাবেননি বুঝি? তাহলে কি তুই আমি মানুষ হতাম? বাবাকে সব বিষয়ে সমর্থন করায় দাদা এমনিতেই সুচেতার ওপরে বিরক্ত হয়ে ছিল। তারপরে বাবার আরেকটা কাজে সুচেতাকে আর সহ্যই করতে পারতো না সোহম। বাড়ির কাজ কমপ্লিট হবার আগেই বাড়িটা ওদের দুই ভাইবোনের নামে সমানভাবে লিখে দিয়েছিল বাবা। বলেছিল, আমার দুই সন্তান, তাদের

Sahitya Chayan

সমান অধিকারে আমি বিশ্বাসী। সুচেতা সোহমের মুড দেখেই বলেছিল, বাবা, আমার সম্পত্তি দরকার নেই, তুমি সবটা দাদাকে দিয়ে দাও। বাবা হেসে বলেছিল, আমি তো অন্যায় করতে পারি না মা। সোহম জন্মের সময় আমার যতটা আনন্দ হয়েছিল, তুই জন্মের সময়েও আমার ততটাই আনন্দ হয়েছিল, তাই আমার কাছে তোরা দুজন সমান। কাউকে বঞ্চিত করার অধিকার আমার নেই।

দাদার সঙ্গে ছোট থেকেই খুব বেশি সদ্ভাব ছিল না সুচেতার। তবুও এতটা দূরত্ব তৈরি হবে সেটা অবশ্য কখনো ভাবিনি সুচেতা। বাড়িটা দুজনকে লিখে দিতেই সোহম অন্য মূর্তি ধারণ করেছিল। কথায় কথায় সুচেতাকে বলতো, সারাটা জীবন সবটুকু সুবিধা তুই ভোগ করলি। কলকাতার হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা, বাবার সব দায়িত্ব আমার ওপরে ফেলে দিয়ে কলকাতায় ছিলিস এতদিন, আবার তোর বিয়ের পরেও বাবার দায়িত্ব আমার, কিন্তু সম্পত্তির বেলায় নাকি সমান অধিকার। সোহমের ব্যবহারের জন্যই হয়তো বাবার বাঁচার ইচ্ছেটা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিল। অমন প্রাণবন্ত মানুষও নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। সুচেতা কি করবে বুঝতে না পেরেই অনিকে বলেছিল, প্লিজ তাড়াতাড়ি এসো এখানে। অনির কলকাতার ফ্ল্যাটে পড়ে ছিল সে চিঠি কারণ ও তখন লন্ডনে ক্রিকেটের নিউজ করতে ব্যস্ত। তখনই সুচেতা আবিষ্কার করেছিল অন্ধকার শুধু কালো নয়, গাঢ় ঘন কালো হয়। সেখানে কোনো ছিদ্র দিয়েই আলো প্রবেশ করতে পারে না। এমনকি মৃত্যুও ভয় পায় সেই গহীন ঘন

Sahitya Chayan

কালোকে। আবার শিউরে উঠলো সুচেতা। দু-হাত দিয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে নিলো। তখনই ওর পাশে থাকা ফোনটা ভাইব্রেট করে উঠলো।

অনি কল করছে। নিজেকে ধাতস্থ করে ফোনটা রিসিভ করলো সুচেতা। ওপ্রান্ত থেকে অনিরুদ্ধ বললো, তুমি কি এখনো রাইগঞ্জে বসে বসে দাদা-বৌদির মধুর বচন শুনছো? কি হলো, গলাটা এমন লাগছে কেন সু? কাঁদছিলে? ভয় পেয়েছো? কেউ কল করে হুমকি দিয়েছে তোমায়? চুপ কেন করে আছো? সুচেতা অবাক হয়ে যাচ্ছিল, আজও ওর একটা ছোট্ট হ্যালো শুনে অনি বুঝতে পেরে যায় ওর মনের অবস্থা? সুচেতা কোনোমতে সামলে নিলো নিজেকে। আমার কথা ছেড়ে তোমার আদরের তিতির পাখির খবর বলো, কি করছে সে? নৈঋত কি এখনো ওখানেই আছে?

অনিরুদ্ধ ফিসফিস করে বললো, সুচেতা তিতিরের জন্য তোমার পছন্দ একেবারে পারফেক্ট। নৈঋত ছেলেটা ভীষণ ডিসেন্ট। আরেকটা কথা বলবো?

ওকে শেষ করতে না দিয়েই সুচেতা বললো, গুড চয়েস হয়েই বা কি হলো অনি? শেষপর্যন্ত বিয়েটা তো দিতে পারলাম না বলো? বসু বাড়িতে আর কোনোদিন বউ হয়ে যেতে পারবে না অহনা। মেয়েটা এটুকু বুঝলো না ওর এই প্রফেশনকে রেসপেক্ট করে যারা ওকে সাদরে বউ হিসেবে নিয়ে যেতে চেয়েছিল সেখানে বিয়ে করলে ও সমস্ত রকম স্বাধীনতা পেতো। অনি একটু ফিচেল হেসে বললো, এই সু জানো একটা মজার ঘটনা লক্ষ্য করছি।

Sahitya Chayan

নৈঋত বোধহয় তিতিরের প্রেমে পড়েছে। তোমার বেরসিক মেয়ে তো প্রেম, ভালোবাসা বোঝে বলে আমার মনে হলো না, তোমার মতো জেদি আর একগুঁয়ে হয়েছে। কিন্তু ছেলেটা আমার মত বুঝলে। বডি ফেলে দিয়েছে তিতিরের জন্য। মনে হচ্ছে আমিও যেমন জিতেছিলাম শেষ পর্যন্ত ওয়ার্ল্ডকাপটা ছেলেটাও বোধহয় জিতবে, তবে ধরে খেলতে হবে। কিন্তু ছোঁড়াটার ধৈর্য্য কম বুঝলে। এখনকার ছেলে তো, হুড়োহুড়ি করে ফেলছে। কিছুতেই বুঝছে না এই খেলায় একটার জায়গায় দুটো রান নিতে গেলেই রান আউটের সমূহ সম্ভবনা আছে। আসলে মেয়ের বাপ তো, তাই ছেলেটাকে ট্রেনিং দিতে লজ্জা পাচ্ছি। এই বয়েসে অনুঘটকের কাজ করাটা কি ঠিক হবে সুচেতা? এত দুঃখ, এমন দুশ্চিন্তার মধ্যেই অনির কথা শুনে হেসে ফেললো সুচেতা। ও জানে ওর মুখে হাসি ফোটানোর জন্যই অনি এখন অনেক উল্টোপাল্টা বকবে। তবু আমল না দিয়ে বললো, কি বলছে তোমার মেয়ে? দাবিটা ঠিক কি? অনিরুদ্ধ একটু গম্ভীর স্বরে বললো, ও সত্যিটা জানতে চায়। আমি পারতাম ওকে বলে দিতে কিন্তু বলিনি। আমি চাই ও নিজেই সত্যের মুখোমুখি হোক, তারপর নিজেই গুছিয়ে নিক নিজেকে। একটু সময় চেয়েছে আমার কাছে। আমি দিয়েছি ওকে সময়। আসলে কি জানো সুচেতা অল্প বয়েস তো, তাই উত্তর না পাওয়া প্রশ্নের ভার বইতে পারছে না। নিজেই খুঁজে নিক উত্তর গুলো। আমার তো মনে হয় উত্তরগুলো খুঁজে পাবার পর ও আবার ফিরে আসবে আমাদের কাছে। যদিও অলরেডি

Sahitya Chayan

কিছুটা আন্দাজ করে আমায় দোষারোপ করেছে, কেন আমি প্রতিবাদ করিনি সেই জন্য! আমার মনে হয় তোমারও ওকে আরেকটু সময় দেওয়া উচিত ছিল। তুমি তো ওকে চেনো, মিথ্যের সঙ্গে আপোষ করতে ও শেখেনি। বিয়েটা আর কয়েকদিন পরে হলে ওর কাছে আসা থ্রেট কল আর আমার লেখা চিঠিগুলোর উত্তর ও পেয়ে যেত। তাতে এভাবে চিরকুট পেয়ে বিয়ে ছেড়ে উঠে আসতো না। কারণ তখন ওর কাছে দিনের আলোর মত সত্যিটা পরিষ্কার থাকতো।

সুচেতা হিসহিসে গলায় বলল, আর যদি ফিরে না আসে আমার কাছে? যদি মা বলে আর না ডাকে তখন? কি উত্তর দেবে অনিরুদ্ধ তুমি? ওই চিঠিগুলো জমিয়ে রেখেছিলে কেন? আমায় আমার আসল জায়গাটা ভবিষ্যতে মনে করিয়ে দেবে বলে? একজন রিপোর্টার এসব কলে কখনোই বিশ্বাস করে না, অহনাও করতো না। যদি না তখন তোমার আলমারি ঘেঁটে ওই চিঠিগুলো পেত! এর পিছনে তোমার গাফিলতি আছে বলেই আমি মনে করি, এতদিনের সংসার বলেই ষড়যন্ত্র কথাটা বলতে বাঁধছে অনি।

অনিরুদ্ধ একটা জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, দোষারোপ করেই যদি শান্তি পাও তবে তাই সহ্য করি। কিন্তু এই মুহূর্তে তোমার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। আমি গাড়ি পাঠাচ্ছি কাল ভোরে কলকাতা ব্যাক করো। বিজু গিয়ে তোমায় কলকাতা পৌঁছে দিয়ে আসবে। আর যদি ইচ্ছে হয় সূর্যপুরে থেকে যেতে পারো কয়েকটা দিন।

Sahitya Chayan

তাহলে নাহয় আমি কলকাতা চলে যাব। তিতির এখানে কদিন থাকবে মনে হলো, তুমি আসতে চাইলে আসতে পারো। সুচেতা রাগী গলায় বলল, আমি অহনার সম্মুখীন হতে চাই না। কলকাতা ব্যাক করবো। বিজুকে দরকার নেই, শ্যামলকে দিয়ে গাড়িটা পাঠিয়ে দিও।

অনিরুদ্ধ শান্ত গলায় বলল, কখনো যদি ঝড় থেমে যায় তাহলে একবার ডেকো, কয়েকটা কথা বলার আছে তোমায়, জানিনা আদৌ বলা হবে কিনা কোনোদিন, তবুও চেষ্টা করবো। সুচেতা কিছু বলার আগেই অনিরুদ্ধ বললো, শ্যামলকে পাঠিয়ে দেব সকাল সকাল।

সুচেতা ব্যাগপত্র গোছাচ্ছিলো, সোহম ঘরে ঢুকে বললো, তোরা আর মানসম্মান রাখলি না। দায়িত্ব নিয়ে রাইগঞ্জের বুকে বাবার নামটা ডুবিয়ে দিয়ে গেল তার মেয়ে আর তার নাতনি। ভাগ্যিস বাবা বেঁচে নেই। সুচেতার বুকটা হুহু করে উঠছিলো। বড্ড একা ও। দাদা, বৌদি, মেয়ে, স্বামী কেউ যেন ওর নিজের নয়। বাবার মালা পরা ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর শান্ত স্বরে বললো, হয়তো আর আসবো না রাইগঞ্জ। বাড়িটা গোটাটাই তোর নামে লিখে দিতে চাই। আজ রাতের মধ্যে ব্যবস্থা করতে পারবি? আমি কাল সকালে ফিরে যাব কলকাতা।

সোহমের মুখে হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখলো যেন। বেশ জোরেই বললো, আমি রাতেই ব্যবস্থা করছি। আরে উত্তমের কাছে সবসময়ই স্ট্যাম্প পেপার থাকে। তুই আপাতত দানপত্র করে দে। পরে রেজিস্ট্রির সময় এসে

Sahitya Chayan
একটা সাইন করে দিয়ে যাস। সুচেতা ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়লো। রাইগঞ্জ ওকে কিছু দেয়নি, শুধু কেড়ে নিয়েছে। ভেবেছিল নিজের বিয়েটা তো হয়নি এই বাড়ি থেকে, অন্তত মেয়ের বিয়েটা দেবে নিজের জন্মস্থান থেকে। এই বাড়ি ওর কাছ থেকে শুধু কেড়ে নিল। তাই অভিমানেই এই বাড়িটা ত্যাগ করবে ও। আর কখনো পা দেবে না রাইগঞ্জের মাটিতে। বাবার ঘরে গিয়ে একবার বাবার ইজি চেয়ারটায় হাত বুলিয়ে আসবে। ক্ষমা চেয়ে নেবে বাবার কাছ থেকে। বাবার দেওয়া বাড়ির অংশটুকু দাদাকে লিখে দেওয়ার আগে একবার বাবার ঘরে গিয়ে জানিয়ে আসবে বাবাকে। সুচেতা আত্মায় বিশ্বাস করে না, আবেগে বিশ্বাসী। তাই সাইন করার আগে একবার পারমিশন নিয়ে আসবে বাবার কাছ থেকে। কষ্টগুলো দলা পাকিয়ে আসছে গলার কাছে। দুটো তিনটে বড় বড় ট্রলি ব্যাগ এনেছিল। এখন ক্লান্ত শরীরে সেসব গোছাতে গোছাতে হাঁফিয়ে যাচ্ছিল। বৌদি বোধহয় ইতিমধ্যেই দাদার কাছে খবরটা পেয়ে গেছে। তাই ঘরে ঢুকেই বললো, তুমি একটু বিশ্রাম নাও, আমি সব গুছিয়ে দিচ্ছি সূচী। সুচেতা মনে মনে ভাবলো, স্বার্থ বড় বিষম বস্তু।

।।২৪।।

স্বার্থপর? আপনার কেন হঠাৎ আমাকে স্বার্থপর মনে হচ্ছে বলবেন? আপনার কি মনে হয়, সমস্ত প্রশ্নের তীর আপনার গায়েই লাগবে? আমার গায়ে কি মোঘল আমলের বর্ম পরা আছে নাকি? রিসেপশনের দিন গোটা অফিসের কলিগদের আসার কথা ছিল। তাহলে বুঝতে

Sahitya Chayan

পারছেন, আমিও কতটা সমস্যার সম্মুখীন হবো। অহনা একনাগাড়ে কথাগুলো বলে জোরে নিঃশ্বাস নিলো।

অনিরুদ্ধবাবুই বোধহয় প্রথম খেয়াল করেছিলেন নৈঋত দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরে আসার প্রতীক্ষায় রয়েছে। অনিরুদ্ধই আচমকা ডেকে উঠলেন, নৈঋত এসো এসো ভিতরে এসো। তোমরা কথা বলো, আমি দরকারি কয়েকটা কল সেরে আসছি। অহনা তখনও বাগানের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসেছিলো। অনিরুদ্ধবাবু বেরিয়ে যেতেই নৈঋত আচমকা বলে বসলো, স্বার্থপর, তুমি অত্যন্ত স্বার্থপর অহনা। অহনা অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, স্বার্থপর? আপনার কি মনে হয় আমি এটা করলাম ইচ্ছে করে? আসলে কি বলুন তো ভগবান সকলকে সত্য সহ্য করার ক্ষমতা নিয়ে তৈরি করেন না। তাই আপনাকে আমি সত্যিটা বলতে পারছি না। সেইজন্যই আমাকে স্বার্থপর লাগছে আপনার।

নৈঋত ঘড়ির দিকে তাকালো। এবাড়িতে ওর মেয়াদ আর বড়জোর ঘণ্টা দুয়েক। তারপরেই ও রওনা দেবে কলকাতার উদ্দেশ্যে। এতক্ষণে হয়তো ওর বাড়ির সকলেই জেনে গেছে বিয়ে ভাঙার পিছনে দোষটা ঠিক কার? তাই বসুবাড়িতে যে অহনাকে আর মেনে নেবে না সেটুকু বুদ্ধি নৈঋতেরও আছে। কিন্তু এই কয়েকঘণ্টা একসঙ্গে কাটিয়ে, ওর ছোটবেলার ছবিগুলো দেখে নৈঋত বুঝতে পেরেছে মেয়েটা সত্যিই সৎ। মুখোশের আড়ালে থাকতে পারে না বলেই এতবড় রিস্ক নিয়ে, বদনাম নিয়ে বিয়েটা ভেঙে দিলো। এর পিছনে যে কারণই থাক

Sahitya Chayan

অহনার গুরুত্ব তাতে নৈঋতের কাছে এক বিন্দু কমবে না। নিজেকে বড্ড অসহায় মনে হচ্ছিল নৈঋতের। অহনার পাশে থেকে ওকে হেল্প করার সুযোগটুকু অহনা দিতে নারাজ। অথচ অহনাকে এই অবস্থায় ছেড়ে চলে যেতে মন চাইছিলো না। সত্যি বলতে কি নৈঋত অহনাকে ভালোবেসে ফেলেছে। কিছুতেই লজ্জা সরিয়ে প্রোপোজটা করে উঠতে পারছে না। অহনার চোখের দিকে তাকালে গুছিয়ে নেওয়া কথারা হয়ে যাচ্ছে এলোমেলো। তাই রেগে গিয়েই বলেছিল তুমি বড্ড স্বার্থপর অহনা।

অহনার বলা শেষ হলে নৈঋত বললো, অন্যের মনের অবস্থাটা বোঝাও তোমার দায়িত্ব, এটা এড়িয়ে যেতে পারো না তুমি! অহনা বললো, এড়িয়ে তো যাইনি, আমি জানি আমার বাবা-মা খুব কষ্ট পেয়েছে, কাবেরী আন্টিও খুব দুঃখ পাবেন আমার এমন ব্যবহারে, কিন্তু আমি সত্যি নিরুপায়। নৈঋত মাথা নিচু করে বললো, আমি জানি না কে কি কষ্ট পাচ্ছে, তবে আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি। বিশ্বাস করো, জানতাম না ভালোবাসা শব্দের অনুভূতি কেমন হয়। আক্ষরিক শব্দের সঙ্গে এর অনুভূতির যে এতটা ফারাক কখনো বুঝিনি। এতদিন জানতাম ভালোবাসলে একটা টান অনুভব করে। ভালো থাকার, আনন্দে থাকার মন্ত্র হলো ভালোবাসা। আজ বুঝেছি তরল কষ্টের নাম ভালোবাসা। যে ক্রমাগত হৃৎপিণ্ডটাকে গরম লাভার মত তরল দিয়ে পুড়িয়ে চলেছে, আর আমি নিরুপায় হয়ে অসহায়ের মত তাকিয়ে দেখছি নিজের সর্বনাশ। অহনা কোনো ফিল্মি ডায়লগ নয়, আমি মেকি কিছু বলতে পারি

Sahitya Chayan

না। লোকে বলে, অ্যানরোমান্টিক লোহালক্করের প্রফেসর। তাই এখন যেটা বলছি এর মধ্যে মিথ্যের নিঃশ্বাস অবধি নেই। ভালোবেসে ফেলেছি তোমায়। নিজের গভীর বাস্তববাদী মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে রণক্লান্ত আমি। যুদ্ধের সব সাজ সরঞ্জাম তোমার পায়ে নিবেদন করে অস্ত্রবিহীন আমি দাঁড়িয়ে আছি তোমার সামনে, ইচ্ছে হলে হত্যা করো, এভাবে তিলে তিলে মৃত্যুদণ্ড দিও না। তলোয়ার তোমার হাতে, একবারে বুকের বাম দিক চেপে সজোরে বসিয়ে দাও, যাতে এই অর্বাচীন তোমায় ভালোবাসি বলার স্পর্ধা আর দেখাতে না পারে। শুধু একটাই অনুরোধ, একটু একটু করে নিঃশেষ করে দিও না আমায়। সহ্য করার ক্ষমতা সত্যিই ভগবান আমায় দেয়নি। আমি জানিনা, তোমার গোপন সত্যটা ঠিক কতটা বিপর্যয় নিয়ে আসবে আমার জীবনে, তবে এটুকু বলতে পারি, যে নাবিক পথ হারিয়েছে তার কাছে ধ্রুবতারার থেকে সত্যি আর কিছুই হতে পারে না।

অহনা, পথভ্রষ্ট নাবিককে তুমি প্রথমে ধ্রুবতারার সন্ধান দাও, তারপরে তো বোঝাবে কোন আইল্যান্ডে গেলে সে বিছের দংশন খাবে? তুমি সামুদ্রিক ঝড়ে হাল ভাঙা পাল ছিঁড়ে যাওয়া জাহাজটাকে পথনির্দেশটুকু না দিয়ে সচেতনতার বার্তা দিয়ে যাচ্ছ, এ কেমন অন্যায়?

অহনার চোখে ঘন মনখারাপের ছায়া, ঠোঁট কাঁপছে তিরতির করে। নৈঋত ওর হাতটা ধরে বলল, ফিরিয়ে দিও না। পথভ্রষ্ট হয়ে কোনো এক নাম না-জানা দ্বীপে আটকে থাকবো আজীবন, যে দ্বীপের নাম ডিপ্রেশন। প্লিজ

Sahitya Chayan

অহনা, ফিরিয়ে দিও না। শুধু তোমার সঙ্গে এক পৃথিবী চলতে চাই, আর কিছু নয়। তোমার চোখে ভরাডুবি হয়েই গেছে আমার। সাঁতার জানি না, তাই পাড়ে ওঠার ক্ষমতা নেই, আমায় হাতটা ছেড়ে দিও না। এতটা নিষ্ঠুর হয়ো না আমার প্রতি।

অহনা নরম গলায় বলল, এ কাজে আমি একা যেতে চাই নৈঋত। তবে কথা দিচ্ছি, যে-কোনো প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় আমি তোমায় ডাকবো। যদি সত্যিটা শোনার পরেও আমাকেই ধ্রুবতারার স্থান দাও তাহলে সে অবশ্যই ফিরে আসবে নাবিকের কাছে।

নৈঋত ধীর গলায় বলল, অপেক্ষা যত দীর্ঘই হোক আমি প্রতীক্ষায় থাকবো। তোমার মুখে "তুমি" ডাকটুকু আর "আমায় মনে রাখবে" প্রতিশ্রুতিটুকু নিয়ে ফিরে যাচ্ছি কলকাতায়। সাবধানে থেকো। জানি না তুমি কিসের সন্ধানে কোন বিপদসঙ্কুল পথে যেতে চলেছো, শুধু এটুকুই বলবো সফল হয়ে ফিরে এসো।

অহনা বললো, একটা প্রতিবাদ বাকি আছে, যেটা করা উচিত ছিল আজ থেকে প্রায় বছর চব্বিশ-পঁচিশ আগে। আমার জন্মমুহূর্তেই সরব হওয়া উচিত ছিল, কেন জানিনা কেউ হয়নি। অন্যায়টাকে চুপচাপ মেনে নিয়েছে সকলে, আমি মানবো না। জানি বিপদ আছে, তবুও আমি মেনে নেব না নৈঋত। প্রতিবাদ তো আমি করবোই। নৈঋত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো আগুন ঝরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চিবুকের দিকে। মনে মনে বললো, বিপরীত তুমি, সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা আমার স্বভাবের থেকে, তবুও আমি

Sahitya Chayan

পরাজিত হতে চাই তোমার ব্যক্তিত্বের কাছে, তোমার সততা, সাহসের কাছে। নৈঋত আলগা স্বরে বললো, একটা জিনিস চাই, দেবে? অহনা জোরে শ্বাস নিয়ে বললো, বলো?

নৈঋত অ্যালবাম থেকে বের করে আনা মার্শাল আর্টের ড্রেস পরা কলেজ লাইফের একটা ছবি অহনার সামনে ধরে বলল, এইটা? দেবে আমায়?

অহনা একটু যেন লজ্জা পেল। এমন সাহসী মেয়েকে লজ্জা পেলেও মন্দ লাগে না। এই মেয়েকে লজ্জা পেতে দেখাটাও বোধহয় সৌভাগ্য। অহনা নরম গলায় বলল, দিলাম। আমি তখন ফার্স্ট ইয়ারে, একটা কম্পিটিশন অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছিলাম, তখনই কলকাতার ফ্ল্যাটে বাবা তুলেছিল। নৈঋত ছবিটা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, অহনা বললো, কি এমন দেখলে এই ছবিতে?

নৈঋত ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, অরিজিনাল অহনাকে। সাহসী, প্রতিবাদী, সৎ, আবার মাঝে মাঝে একটু আদুরে, অল্প ভীতু টেনশনে সামান্য কাবু - সবরকম এক্সপ্রেশনই আছে এই ছবিটাতে। বোধহয় কম্পিটিশন যাওয়ার আগের সামান্য ভয় আর টেনশন মিশে ছিল চোখে, সঙ্গে ছিল আমি জিতবই টাইপের মনোভাব, তাই সব মিলিয়ে এই ছবির অহনা একেবারে অরিজিনাল।

অহনা ক্লান্ত হেসে বললো, যদি কখনো চাকরি ছাড়বে ভাবো, বোলো আমায়। আমাদের দৈনিকে কবিতার কলামে তোমার লেখা ছাপাবো।

Sahitya Chayan

নৈঋত হেসে বললো, যদি রিপোর্টারের সঙ্গে কবি সবজায়গায় ঘুরতে পারে, মানে তোমাদের কোম্পানি যদি সেই সুযোগ দেয় তাহলে আমি রাজি।

অহনা হেসে বললো, কাবেরীআন্টি ঠিকই বলেছিল, ছেলেটা আমার এখনও ম্যাচিওরড হলো না। সত্যিই পাগল তুমি।

কিছু কিছু কথা কারোর মুখে অন্য মাত্রা পায়। অহনার বলা পাগল, ইমম্যাচিওরড কথাগুলোকে খুব সংগোপনে মনের গোপন কুঠুরিতে ভরে তালা দিয়ে দিল নৈঋত। অবসর সময় এই কথাগুলোই হবে ওর মনখারাপ ভাগানোর ওষুধ।

অহনার ঘর থেকে বেরোতেই চোখাচোখি হয়ে গেল বিজুকাকার সঙ্গে। বিজু কাকা গভীর গলায় বলল, দাদাভাই, যদি ভালোবাসো তবে অভিমানে সরে যেও না। চলে গেলে আর ফিরে পাওয়া যায় না। আজীবন বুকে পাথর চাপিয়ে থেকে যেতে হয়। গানের সুরও তখন স্তব্ধ হয়ে যায় কণ্ঠনালীতে। একটু অবাক হয়েই তাকালো নৈঋত বিজুকাকার দিকে। ভদ্রলোককে দেখে তো মনে হচ্ছিল এ বাড়ির কেয়ারটেকার। এখন মনে হচ্ছে, ভদ্রলোক গায়ক মানুষ। নৈঋত নরম সুরে বললো, আগে বলো তার নাম কি? যে চলে যাওয়ায় তুমি এমন স্তব্ধতা অনুভব করেছ?

বিজুকাকা বলল, দীপশিখা। আমার গানের শিক্ষকের মেয়ে। একই সঙ্গে গান শিখতাম। বিয়ের রাতে বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল। ওকে একলা ফেলে কাপুরুষের মত চলে

Sahitya Chayan

এসেছিলাম। জীবনে আর ঘর বাঁধা হলো না। হলো না দীপশিখার নিষ্পাপ মুখটা ভুলে যাওয়া। তাই তো সুরও থমকে গেল আমার কণ্ঠনালীতে। এখন গুনগুন করেও গাইতে পারি না এক কলি। অথচ এককালে স্যার বলতেন, চড়ায় গলা তোল বিজয়, আরও চড়ায়, তোর গলা ওপরেও ফেটে যায় না, স্থির থাকে অবিচল। সেই আমি আর কখনো গাইতেই পারলাম না দাদাভাই। এবাড়ির দাদাবাবুও জানেন না এত কথা। কখনো বলিনি কাউকে। কিন্তু দিদিমণির বিয়েটা ভেঙে যাওয়া ইস্তক মনটা ছটফট করছে। তাই ভাবলাম বলেই ফেলি। সাবধান হতে পারবে তোমরা। আর ভুল যেন কেউ না করে এ ভেবেই এত কিছু বলে ফেললাম। কিছু মনে কোরো না দাদাভাই। চলো খেয়ে নেবে চলো। নৈঋত অবাক হয়ে দেখছিল, মধ্যবয়েস ছেড়ে প্রৌঢ়ত্বের দিকে পা বাড়ানো মানুষটার দিকে। যার হাতের যত্নে এত রঙিন ফুল ফোটে, বাগানে প্রজাপতির মেলা বসে, সেই মানুষটার মনের মধ্যেই এমন ধূসর ঝাপসা অন্ধকার! তবে বিজুকাকা বোধহয় ঠিকই বলছে, সময়ের গুরুত্ব অনেক, তাকে একবার অবহেলায় যেতে দিলে হাজার চেষ্টা করলেও সে ফিরে আসে না। তখন স্মৃতির স্মরণী বেয়ে একা একা পথ চলা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

নৈঋত খাবার টেবিলে পৌঁছে দেখলো এইটুকু সময়ের মধ্যে বিজুকাকা অঢেল আয়োজন করেছে। অনিরুদ্ধবাবু অলরেডি চেয়ারে বসে আছেন। বসে বসে বললেন, এসো এসো নৈঋত, তিতির কি এলো না?

Sahitya Chayan

নৈঋত ঘাড় নেড়ে বললো, বোধহয় আমার সামনে অস্বস্তিবোধ করছে। যদিও নৈঋত মনে মনে ভীষণ রকম চাইছিলো এই বাড়িতে যে দু-ঘণ্টা সময় আছে সেটুকু অহনার সঙ্গেই কাটাতে, কিন্তু সে উপায় বোধহয় নেই। কারণ অহনা চায় না নৈঋতকে ফেশ করতে।

অনিরুদ্ধবাবু বললেন, খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও, তারপর শ্যামল তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসবে। নৈঋত বললো, আচ্ছা এখান থেকে কলকাতা ঠিক কতক্ষণ লাগে? অনিরুদ্ধবাবু কিছু বলার আগেই অহনা এসে নিজের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললো, প্রায় সাড়ে তিনঘণ্টা, জ্যাম থাকলে চার। আর কেউ যদি ভয়ে গাড়ির স্পিড বাড়াতে না দেয় তাহলে পাঁচ, ছয় যা খুশি লাগতে পারে।

অনিরুদ্ধবাবু তিতিরের দিকে চোখ পাকিয়ে বললেন, আঃ, তিতির কি হচ্ছে! না নৈঋত, মোটামুটি সাড়ে তিন মত লাগে। বিজুকাকা আর আরেকজন পিসি পরিবেশন করছিল। অহনা হঠাৎ ফোড়ন কাটলো, বিজুকাকা তোমার দাদাভাই কিন্তু বড়ি দেওয়া তরকারি খান না, আর বেগুনভাজা সবচেয়ে ফেভারিট আইটেম। তাই পারলে বেগুনভাজা বেশি করে দাও, আর বড়ি বেছে শুক্তো দিও। অনিরুদ্ধর খুব হাসি পাচ্ছিলো অহনার কথা বলার ধরন দেখে। আর তার থেকেও হাসি পাচ্ছিলো নৈঋতের বিস্মিত চাউনির দিকে তাকিয়ে। নৈঋত আমতা আমতা করে বললো, কিন্তু তুমি কি করে জানলে এগুলো?

Sahitya Chayan

অহনা বেশ কাব্যিক ঢঙে বললো, ডোন্ট আন্ডার এস্টিমেট দ্য পাওয়ার অফ এ রিপোর্টার! নৈঋত হেসে বললো, বুঝেছি, নিশ্চয়ই কাবেরী বসুর কাজ। বিয়ে হবে কি হবেনা না জেনেই তোমায় আমার পছন্দ অপছন্দের লিস্ট ধরিয়ে দিয়েছে। নৈঋতের স্বরতন্ত্রীর কোন একটা স্বর যে বেশ বেদনায় আছে সেটা অনুভব করলো অনিরুদ্ধ। ছেলেটাকে ওর খুব পছন্দ হয়েছে। তাই নৈঋতের বলা আক্ষেপযুক্ত কথাটাতে বেশ কষ্ট হলো অনিরুদ্ধর। পরিবেশটাকে স্বাভাবিক করার জন্যই অনিরুদ্ধ বললো, বুঝলে নৈঋত তিতিরের মায়ের পিছনে আমি পাক্কা পাঁচ থেকে ছয় বছর পড়ে ছিলাম। যাই বলো, অ্যারেঞ্জড ম্যারেজে সে মজা কোথায়, যেটা আছে সাকসেসফুল লাভ ম্যারেজে। নৈঋত সোনামুগের ডাল আর বেগুনভাজা দিয়ে খেতে খেতেই বললো, বিষয়টা ঠিক কি রকম স্যার?

অনিরুদ্ধ বললো, বেশ তোমাকে বরং আমি বিষয়টা একটু ইলাবরেট করেই বলি। দেখো, প্রথমে তো তুমি একটা মেয়েকে প্রথম দর্শনে মন দিয়ে বসে আছো, কিন্তু সে মেয়ে তখনও তোমায় বিন্দুমাত্র চেনে না। এরপর শুরু হলো তোমার মানসম্মান খোয়ানোর কাজ। তুমি অফিস, কাজ ছেড়ে সেই মেয়ের রুটিন মত শিডিউল বানিয়ে ফেললে, রোজই সেই মেয়ের সঙ্গে তুমি দেখা করছো, অবশেষে মহারানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলে। যখন অফিসে অনুপস্থিতির কারণে তোমার চাকরি প্রায় টলমল তখন তিনি তোমায় খেয়াল করলেন, এবং

Sahitya Chayan

ব্যঙ্গাত্মক স্বরে বললেন, আপনাকে রোজই দেখছি আমায় ফলো করেন, কি চান বলুন তো?

কি উত্তর দেবে তুমি নৈঋত? বলা তো উচিত আমি কিডনি পাচারকারী নই, তাই হৃৎপিণ্ডটাই চাই, কিন্তু মনে রাখবে তোমার একটা লুজ বলে তুমি শেষ। তাই এই মুহূর্তে একটু ধরে খেলতে হবে।

অহনা মুখ টিপে হেসে বললো, বাবাই, তোমার এসব জ্ঞান দেওয়া তুমি থামাবে?

অনিরুদ্ধবাবু একটুও না দমে বললেন, মোটেই থামাবো না। কিছু জিনিস নৈঋতকে শেখানো আমার কর্তব্য, কারণ আমি এক্সপিরিয়েন্সড। তারপর শোনো নৈঋত, তখন তুমি ডাহা মিথ্যে বলবে বুঝলে! তোমার অফিস যে সাউথের শেষ প্রান্তে সেটা বেমালুম চেপে গিয়ে তোমায় বলতে হবে, আমারও তো নর্থের এদিকেই অফিস, তাই আমরা যদি যাতায়াতটা একসঙ্গে করি তাহলে মন্দ হয় না। মেয়েটার সন্দেহের দৃষ্টিকে খুব বেশি আমল না দিয়ে, তোমার আদৌ কোনোদিন সম্মানবোধ ছিল সেটা বিস্মৃত হয়ে ফিল্ডে নেমে যাবে। মনে রাখবে এটাই ম্যাচের সব থেকে ক্রাইসিস টাইম। এই সময় যদি টেনে কিছু রান করে ফেলতে পারো ম্যাচ তখন তোমার হাতের মুঠোয়। তাই কোনো বল ভুল খেললে চলবে না। যখন দেখবে সে মেয়েও তোমার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে, তখন সপ্তাহ খানেক রেগুলার অফিসে গিয়ে চাকরিখানা বাঁচিয়ে নাও।

পরের দিনের দেখাতেই বলো, তোমার ওপরে এ কদিন যমে মানুষে টানাটানি চলেছে। জ্বরের ঘোরেও

Sahitya Chayan

একটাই মুখ তুমি দেখেছো, সেটা কার, তা নিশ্চয়ই তোমায় বলে দিতে হবে না। এরপর আর টেনশন নেই বেটা, ম্যাচ তোমার, চালিয়ে খেলো, ছক্কা হাঁকাও। এই এত যুদ্ধের পর যখন রাজকন্যা তোমার হলো, মানে একেবারে আপন করে তাকে পেলে বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে তখন নিজেকে আলেকজান্ডার ড্রফ মনে হবেই। সুচেতাকে জয় করার পর আমারও এমনই অনুভূতি হয়েছিল। দেখো এই সুদীর্ঘ প্রেমপর্বে ঝগড়া-ঝাটি, মান-অভিমান যাই হয়ে যাক না কেন, মনে রেখো উইকেটে টিকে কিন্তু থাকতেই হবে। ম্যাচ টলমল হতে পারে, কয়েকশো আউটের অ্যাপিল উঠতেই পারে, কিন্তু লড়ে যেতে হবে। আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, এভরিথিং ইস ফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার। লড়তে লড়তেই একদিন অপজিট দিকের মানুষটা পরাজয় স্বীকার করে তোমার কাছে হার মানাবে।

বেশ এবারে নতুন ইনিংসের জন্য রেডি হও, কারণ প্রেমের ঝগড়ায় মিষ্টতা থাকবে, সংসারের ঝগড়া কিন্তু সুগার পেশেন্ট, শুধু করলা আর উচ্ছে সেদ্ধ খাওয়া বস্তু। তবুও ভাল লাগবে জানো নৈঋত, পুরোনো স্মৃতি রোমন্থনে শিহরণ জাগবে বৈকি। তাই কনক্লুশন হলো এই যে, নো অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ, অনলি লাভ ম্যারেজ। লাভ ম্যারেজে বোঝা যাবে তুমি কতটা মাথা ঠান্ডা প্লেয়ার। ওয়ার্ল্ডকাপ জিতবে না সেমিফাইনালে আউট হবে!

নৈঋত বললো, স্যার অনেকটা সাহস পেলাম, লড়তে রাজি আছি। আশাকরি কোচ হিসেবে আপনাকে পাশে

Sahitya Chayan

পাবো? বুঝতেই তো পারছেন বড্ড নভিস আমি।

অনিরুদ্ধ হেসে বললো, না হে তুমি যে একেবারে নভিস সেটা মেনে নিতে পারলাম না। তোমার পারফরম্যান্স অন্তত তা বলছে না। তিতির লজ্জা পেয়ে বললো, তোমরা কি থামবে? এটা খাওয়ার টেবিল না বৃন্দাবনের আখড়া?

অনিরুদ্ধ মেয়েকে আরেকটু লেগপুলিং করার জন্যই বললো, আচ্ছা নৈঋত, তোমার কি মনে হয়, খুব সাহসী শক্ত মনের প্রতিবাদী মেয়েরাও অকারণে লজ্জা পায়? নাকি তার পিছনে যথেষ্ট কারণ থাকে?

ভাবো নৈঋত, ভাবো... আর শোনো, আমার বয়েস হয়েছে তাই পাতে দই, মিষ্টি এসব আমার চলে না। তুমি কিন্তু সব খেয়ে উঠবে। বিজু এদিকে এসো, তোমার সঙ্গে আমার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। তিতির দেখিস, নৈঋত যেন সব খেয়ে তবে ওঠে।

নৈঋত মনে মনে বললো, এমন রোমান্টিক বাবার এমন একটা যুদ্ধং দেহি টাইপ মেয়ে হয় কি করে! না, মেয়ের বাবা-মা দুজনেই অত্যন্ত ভদ্র, ভালো মানুষ। গন্ডগোল এই মেয়েটাই।

অহনা নরম গলায় বলল, কলকাতা ফিরে পৌঁছানোর খবর জানাবেন, সরি জানিও। আর ওই বাড়ির কি অবস্থা সেটাও জানিও প্লিজ। আমি একটু পরেই কাবেরী আন্টিকে কল করে বলে দেব, তোমার কোনো দোষ ছিল না, আমিই এই ঘটনার জন্য দায়ী। আশাকরি বাড়িতে ফিরে কারোর প্রশ্নের বা তিরস্কারের সম্মুখীন হতে হবে না

Sahitya Chayan

তোমায়। নৈঋত আলগোছে বললো, প্লিজ অহনা এই মুহূর্তে আমার বাড়িতে তোমায় কল করতে হবে না।

অহনা একটু অবাক হয়ে বলল, সেকি? রাইগঞ্জের স্টেশনে তুমি তো এই দাবি নিয়েই আমার সঙ্গে এতদূর এলে, এখন ফোন করতে বারণ কেন করছো?

নৈঋত আনমনে বললো, জানি না। এই কয়েকঘণ্টায় অনেককিছু ওলটপালট হয়ে গেছে অহনা। সেই রাইগঞ্জের স্টেশনে বসে থাকা ছেলেটার মনটা পাল্টে গেছে। এখন তার মনে হচ্ছে, তাকে অপমান করলেও কেউ যেন তোমায় দোষারোপ না করে! এই পরিবর্তনের আগাম বার্তা তো আমার কাছে ছিলো না, তাই তখন আমি বলেছিলাম তোমায় ফোন করতে। আপাতত নিষেধ করছি, আমার বাড়ির কারোর সঙ্গে তোমায় এখন কথা বলতে হবে না।

অহনা বললো, কিন্তু কাবেরীআন্টিকে একটা জবাবদিহি তো আমায় করতেই হবে নৈঋত, আমি তো সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে পারি না বিষয়টা। নৈঋত বললো, আমি বাড়ি ফিরি, তারপর তোমায় জানাবো। তার আগে কাউকে ফোন করার দরকার নেই।

অহনা, আমি ফোন করলে রিসিভ করবে? নাকি বিজি টোন শুনবো? সত্যি করে বলো তো, আমি সূর্যপুর ছাড়লেই কি ভুলে যাবে আমায়? অব্যবহৃত ডায়রির পাতায় স্থান হবে আমার?

অহনা বললো, তোমার কি মনে হয় নৈঋত?

Sahitya Chayan

নৈঋত বললো, আমার তো মনে হয় তুমি সম্পূর্ণা, পরিপূর্ণ তুমি, তাই ঋণী হতে চাওনা কারোর কাছে। আমি বড়ই অপ্রয়োজনীয় তোমার জীবনে, তাই আমার কথা মনে রাখার বিশেষ প্রয়োজন বোধহয় পড়বে না তোমার।

অহনা অন্যমনস্ক স্বরে বললো, সূর্যও বড় একা নৈঋত। হতে পারে তার প্রখর আলো, হতে পারে তার অসীম ক্ষমতা কিন্তু তবুও একাকীত্বটা একাকেই ভোগ করতে হয়। তাই বোধহয় চন্দ্রের সঙ্গে ভাগ করে নেয় একাকীত্বের যন্ত্রণাটা। নৈঋত বললো, সূর্য তো তবুও নিজের আলোর কয়েকভাগের একভাগও চন্দ্রকে দিয়ে নিজে যন্ত্রনা মুক্ত হয়, কিন্তু তুমি তো তোমার যন্ত্রণার তিল ভাগও শেয়ার করতে নারাজ।

অহনা বললো, নৈঋত যন্ত্রণাটা যাতে আমায় কাবু করতে না পারে সেই জন্যই তো সত্যিটা জানতে চাই। আমি যেটা ভাবছি সেটা হয়তো আমার কল্পনাপ্রসূত, তাই কয়েকটা প্রমাণ দরকার। মুশকিলটা হলো এমন কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলো বাবাই বা মাকে ডিরেক্ট করতেও পারছি না। তাই আমাকে একাই চেষ্টা করতে হবে। আমি যে সূত্র ধরে এগোতে চাইছি তার ভিত্তিটা ঠিক কতটা মজবুত এখনো সেটাই বুঝতে পারছি না। এই লড়াইটা মানসিক লড়াই নৈঋত, যদি মাঝপথে আমি ভেঙে পড়ি, যদি বর্তমানের সাহসী আমিটাকে আর খুঁজে না পাই নিজের মধ্যে তখন নিশ্চয়ই তোমায় ডাকবো, আশাকরি বন্ধু হিসাবেও সাড়া দেবে তখন। নৈঋত বুঝতে পারলো, কারণটা কিছুতেই অহনা ওকে বলবে না এখন, তাই

Sahitya Chayan

বারবার চেষ্টা করেও একটা শব্দও বের করতে পারলো না ওর মুখ থেকে। ব্যর্থতা থেকে একটা শিক্ষা পাওয়া যায়, অতিরিক্ত চেষ্টায় সুতো ছিঁড়ে যেতে পারে, তাই ব্যর্থতাকে একটু একা থাকতে দেওয়া উচিত, জেদের বশে সবসময় জোর জবরদস্তি করা উচিত নয়।

নৈঋত কথা ঘুরিয়ে বললো, আচ্ছা অহনা তুমি কি প্রেমে বিশ্বাসী নাকি....

অহনা ওর কথাটা সম্পূর্ণ না করতে দিয়ে বললো, আসলে প্রেম করতে ঠিক সাহস হয়নি। একবার ক্রাশ খেয়েছিলাম কলেজের বিবাহিত, দুই সন্তানের বাবা একজন প্রফেসরের প্রতি, কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। প্রেম করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। আসলে আমি বোধহয় বাবা-মায়ের মত রোম্যান্টিক নই। বরং একটু কাঠখোট্টা টাইপ, বন্ধুরা বলে। তারপর আমার প্রোফাইলটিও তো প্রেমের উপযুক্ত নয় একেবারেই তাই বোধহয় কোনো ছেলে সাহস করে এগোতে পারেনি। মানে নামি সাংবাদিকের মেয়ে, নিজে পলিটিক্যাল বিটের রিপোর্টার, দিনরাত দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিয়েই ব্যস্ত, সঙ্গে মার্শাল আর্টের মত এমন একটা বিষয় মিশে গিয়ে লোকজনকে পুরো কনফিউশনে ফেলে দিয়েছে আরকি। মানে মেয়েরা সংগীত বা নৃত্য পটিয়সী হবে এটাই গুণের। মার্শাল আর্ট জানা, ব্ল্যাক বেল্ট পাওয়া মেয়েদের লোকে আড়ালে মদ্দাটে বলে, জানো তো? যদিও এই শব্দের সঠিক অর্থ আমার জানা নেই। বোধহয় একটু পুরুষালি বোঝাতেই ব্যবহার করা হয়। মানে মার্শাল আর্টটা পুরুষ শিখতে

Sahitya Chayan

পারে মহিলা নয়। ভেবে দেখো নৈঋত হিপোক্রেসির কোন লেভেলে আমরা বাস করি। আমরা উদয়শঙ্করের সঙ্গে মমতাশঙ্করকে মেনে নিচ্ছি, আমরা সলিল চৌধুরীর সঙ্গে অন্তরা চৌধুরীকেও মেনে নিচ্ছি সাগ্রহে কিন্তু ব্রুসলীকে মেনে নিলেও শর্মিলা চানুকে মেনে নিতে আমাদের যত সমস্যা। তো এই জন্যই বসন্তের আনাগোনা বরাবরই উপেক্ষিত হয়েছে আমার দুয়ারে এসে। প্রেমে বিশ্বাসী হলেও প্রেম আসেনি, তাই অভিজ্ঞতা শূন্য বলতে পারো।

নৈঋত বললো, তার মানে সাদা খাতা তাই তো? আমি আপনমনে হিজিবিজি কাটতেই পারি।

'এমনিতে সে একলা থাকে
জ্যোৎস্না তাকে জড়িয়ে রাখে
তবুও যদি হাত বাড়াই
সাহস করে অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে চাই
প্রেম কি তবে আগলে নেবে?
নাকি আপন মনে পালিয়ে যাবে?'

অহনা বললো, তোমার কবি হওয়া উচিত ছিল কিন্তু।

নৈঋত বললো, কবিতার শেষে কিন্তু জিজ্ঞাসা চিহ্ন আছে, তাই শ্রোতার দায়িত্ব একে শেষ করা।

অহনা একটু ভেবে বললো,

'প্রেম তো ধরা দিতেই চায়,
অন্ধকারে হাতড়ে মরে,

Sahitya Chayan

আলোর ঠিকানা পেলে
ছুটেই নাহয় যাবে মাতাল সমীরণে।'

নৈঋত হেসে বললো, সঙ্গ দোষে স্বভাব নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তাই আমি আপাতত পালাচ্ছি কলকাতা, তোমার ডাকের অপেক্ষায় থাকবো। আর যদি একান্ত ভুলে যাও, তাহলেও কোনো এক পাতা ঝরা শীতের নিস্তব্ধ দুপুরে নিশ্চয়ই দেখা হবে আমাদের। হয়তো তখন তুমি অন্য কারোর ঘর, জেনো আমার ঘর শূন্য সেদিনও রবে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে যাবার সময় অহনা বললো, মিষ্টি না খেয়ে চললে কোথায়? বিজু কাকা বকবে কিন্তু।

নৈঋত ভাঙা গলায় বলল, আগে মিষ্টি সময় আসুক, কেউ যখন নিজের হাতে খাইয়ে দেবে মিষ্টি তখন নিশ্চয়ই খাবো। আজ থাক, কিছু তো বাকি রেখে যাই, তবেই তো লাটাইবিহীন ওড়ার কষ্টটা উপভোগ করবো আমি।

অহনা কিছু না বসে চুপচাপ বসে রইল, গন্তব্যহীন পথের শেষ দেখার চেষ্টায় মনটা আকুল হয়ে উঠলো।

নৈঋত বেরিয়ে গেল, বাবার দেওয়া একটা টিশার্ট আর জিন্স পরেছে, বেশ হ্যান্ডসাম লাগছে। অহনার কানের কাছে এসে বলে গেল, কি ম্যাডাম, চেয়েচিন্তে পরা ড্রেসেও আমায় সবসময় খারাপ লাগে না বুঝলেন। কেউ যদি ইচ্ছে করে একটা লেডিস জ্যাকেট আমায় পরায় তাহলে অবশ্য আমার কিছুই বলার নেই।

অহনার কষ্ট হচ্ছিল, নৈঋতকে চলে যেতে দেখে কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা অনুভূতি গলা টিপে ধরতে চাইছিলো।

Sahitya Chayan

ইচ্ছে করছিল, নৈঋতের সঙ্গে ছুটে চলে যেতে। ওর হাতটা টেনে ধরে বলতে, আমাকেও নিয়ে চলো প্লিজ। আজ তো আমারও তোমাদের বাড়িতেই যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বলা হলো না কিছুই, কয়েকটা ধোঁয়া ধোঁয়া প্রশ্ন এসে আটকে দিলো অহনার পাদুটোকে। বিজু কাকা বাগানের কয়েকটা গোলাপ নৈঋতকে দিয়ে বললো, আবার এসো কিন্তু দাদাভাই। বাবাও গম্ভীর গলায় বলল, পৌঁছে খবর দিও নৈঋত, আর মাঝে মাঝে যোগাযোগ করো, তোমাকে আমার সত্যিই বড্ড ভাল লেগেছে, আমাদের অসম বন্ধুত্বটা কিন্তু চলতেই পারে, যদি তোমার আপত্তি না থাকে। নৈঋত বাবাকে প্রণাম করে বলেছে, আমি আপনার ৭০% ফ্যান ছিলাম এখন আপনার ১০০% ফ্যান হয়ে গেছি, এসিও বলতে পারেন। তাই যোগাযোগ নিশ্চয়ই থাকবে। বেরিয়ে গেল নৈঋত। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ওর চলে যাওয়ার শেষটুকুও দেখলো তাকিয়ে তাকিয়ে। মনটা ক্ষণিকের জন্য বিকল হতে বসেছিলো ঠিক তখনই ওর ফোনটা ভাইব্রেট করে উঠলো, রিসিভ করতেই সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর।

কি হলো, সত্যিটা জেনে কি বিয়েটা ভেঙে গেল নাকি? আমি তাহলে বড্ড দুঃখিত হলাম। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি তোমার শ্বশুরবাড়ির লোককে কোনো ফোন করিনি। চিঠিও পাঠাইনি। তাহলে তারা জানলো কোথা থেকে? আমি তো কেবল তোমার কাছ থেকে কিছু টাকা চেয়েছি, আর তার বিনিময়ে তোমায় একটা জবরদস্ত খবর দিতে

Sahitya Chayan

চেয়েছি, ব্যস এটুকুই। লোক জানাজানি তো আমিও করতে চাইনি।

অহনার সবকটা স্নায়ু সতর্ক হলো। ফোনটা রেকর্ড করতে করতেই বললো, আমি কাল আসছি আপনার কাছ থেকে খবরটা জানতে। লোকটা বললো, কিন্তু ফাঁকা হাতে নয়, মাত্র দশ লাখ দিলেই চলবে। তোমার বাবার একবছরের মাইনে থেকেও কম। এটুকু তো দিতেই পারো। অহনা বললো, আমি কাল গিয়ে দেখা করবো আপনার সঙ্গে, প্লেস বলুন, টাইম বলুন।

ফোনটা কেটে গেছে অনেকক্ষণ। ভাবনার বুদ্বুদগুলো মাথার মধ্যে আওয়াজ করেই চলেছে, সমাধান খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে ওরা।

অবসন্ন লাগছে শরীর ও মন। বালিশে মাথা রেখে গান চালালো অহনা।

Sing me to sleep now
Sing me to sleep
WonÓÓt you sing me to sleep now−
Sing me to sleep

Remember me now, time cannot erase
I can hear your whispers in my mind
I’ve become what you cannot embrace
Our memory will be my lullaby...

Sahitya Chayan

কপিল ওর দিকে চোখ সরু করে তাকালো ভাড়া থেকে নেমে। ফিসফিস করে বললো, কিছু বখরা আমাদেরও দিও গুরু। পীযুষ গালাগাল দিয়ে বললো, গরু এখনো লেজ নাড়ছে শালা শকুন ঠিক রেডি। শোন, আগে কাজগুলো উদ্ধার কর ঠিক করে, তারপর বখরা চাইবি। কাল বিকেলে তুই, সুনীল আর বাপ্পা তিনজন মিলে যাবি। মালটাকে তুলে সোজা ফ্ল্যাটের চারতলায় আনবি।

কপিল ভয়ে ভয়ে বললো, কিন্তু গুরু যদি নারায়ণ স্যার জানতে পারে, তাহলে এখানে পাত্তারি গোটাতে হবে।

কেন বে? বস মদ দিতে পারে আর মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি করলেই দোষ? বস আপাতত কলকাতায় আছে। আর ওই ম্যানেজার রাজেনটাকে আমি ম্যানেজ করে নেব। তোদের যেটুকু বললাম সেটুকু করবি। বেশি কথা বলবি না। কপিল ঘাড় নেড়ে বললো, তাহলে কাল বিকেলে চলে যাবো স্টেশনে।

পীযুষ জানে নারায়ণবাবু সাচ্চা আদমি। ভুলভাল কাজ দেখলে পীযুষকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে আশ্রয় কোম্পানি থেকে। কিন্তু পীযুষ এও জানে ওর হাতের কাজ দেখার পর কাস্টমারদের অন্য কাজ তেমন পছন্দ হবে না। তাই নারায়ণবাবু বাধ্য হয়েই ওকে ডাকবে, ঠিক যে কারণে সেবার জামিন করিয়ে এনেছিল। তবে এবারে সময় মত রাইগঞ্জে এসেছিল বলেই এত বড় একটা খবর জোগাড় করতে পারলো। শালী খবরটা যদি সত্যি হয়, তাহলে তো টাকাই টাকা। ওই রিপোর্টার মাগিই টাকায়

Sahitya Chayan

ভরিয়ে দেবে। তখন নারায়ণবাবুর কাজে লাথ মেরে চলে যাবে পীযুষ। আর যদি নেহাত আশ্রয় ওকে না তাড়ায় তাহলে টিকে যাবে। কিন্তু এমন টাকা ভরা গাছের সন্ধান যখন পেয়েছে তখন সেটাকে কাজে লাগবে না এমন বান্দা ও নয়। তাছাড়া যদি সত্যিই অনিরুদ্ধ পাল এ মাগির বাপ হয় তাহলে তো সোনার খনির সন্ধান পেয়ে গেছে ও। এখন শুধু খবরটা পাক্কা করে নেওয়ার অপেক্ষা। তবে এ খবর সুশোভন মাস্টারের আমলের এক মানুষের দেওয়া। এ মিথ্যে নয় বলেই জানে পীযুষ। ভাবলেই মনটা নেচে উঠছে ওর। অনিরুদ্ধ পালের ওপরে এমনিতেই বহুত রাগ জমে আছে ওর। নেহাত হারামিটা প্রচুর পাওয়ার ওয়ালা লোক তাই পীযুষ রণে ভঙ্গ দিয়েছিল। নাহলে ফয়সালা তখনই করতো ও। হিসেব না মিলিয়ে রেখে দেওয়াটা ওর চরিত্রে নেই।

ফোনটা আবার বাজছে দেখেই রিসিভ করলো ও।

হ্যাঁ, অলোক বল কি খবর?

কি বললি? প্রিয়া আর প্রিয়ার মা দুজনে বেরিয়েছে বাড়ি থেকে? সঙ্গে কোনো ব্যাটাছেলে আছে? নাকি ওরা দুজনেই? কোথায় গেল দেখলি?

জানোয়ারের বাচ্চা, এই জন্য তোকে মাসে মাসে আমি মদের বোতল সাপ্লাই দিই হারামি? রিকশায় চাপলো আর তুই অমনি চাঁদবদন করে ফোন করতে শুরু করলি? কোথায় গেল খোঁজ নিলি না? প্রিয়ার মা কি সেজেগুজে ছিল নাকি? অলোক আমতা আমতা করে বললো, দাদা তোমার মেয়েটা হেব্বি মাঞ্জা দিয়েছিল। বৌদি কি পড়েছিল

Sahitya Chayan

অতটা খেয়াল করিনি। শুয়োরের বাচ্চা, ডবকা মেয়েটার প্রতি তো বেশ নজর আছে, বৌটা কেমন সেজেছে সেটা দেখতে ভুলে গেলি? কতক্ষণ পরে বাড়ি ফেরে খোঁজ নিবি, দোকানের সামনে দিয়েই তো ফিরবে, মনে রাখবি। অলোক বেশ উত্তেজিত হয়ে বলল, নিশ্চয়ই, আমি এবারে চোখ বড় করে দেখবো।

ফোনটা রেখে দিয়েই দীপশিখার উদ্দেশ্যে গালাগাল দিলো পীযুষ। বেইমান মেয়েছেলে একটা। গায়ক তো বিয়ের আসর থেকে পালিয়েছিল, এই শর্মা ছিল বলেই তো সিঁথিতে সিঁদুর উঠলো। এখন কিনা ওর সঙ্গেই গেম খেলছে মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে। পীযুষকে ঠকানো? মেরে পিঠের চামড়া তুলে নেবে ওই মেয়েছেলেটার! বিছানায় তো ভিজে কাঁথার মত শুয়ে থাকে শিখা আর ও বাড়ি থেকে চলে এলেই যত চুলকানি জেগে ওঠে। এবারে বাড়ি ফিরে মা-মেয়েকে উত্তম মধ্যম ক্যালাতে হবে। তবে যদি এদের গুমোর কমে। মেয়েটার আবার তেজ হয়েছে খুব। ওরই পয়সায় খেয়ে পরে ওকেই বলে কিনা কেটে ফেলবে! শিক্ষিত মেয়ে, আইন আদালতের ফাঁকফোকর জানে বলেই একটু সমঝে চলে পীযুষ। তাই বলে অনিক নামের ওই ছেলেটা মেয়েটাকে ফুসলে নিয়ে চলে যাবে তা তো হয় না। প্রিয়ার সঙ্গে রাজারপুরের পূর্ণেন্দুর বিয়ে দেবে মনে মনে ঠিকই করে ফেলেছে পীযুষ। পূর্ণেন্দুর নিজস্ব বিলাতি মদের দোকান, টাকার কুমির। প্রিয়ার দিকে নজর আছে ওর। একদিন পীযুষকে ডেকে বলেছিল, কাকা তোমার মেয়ে বুঝি? বেশ সুন্দর ফিগার তো? পূর্ণেন্দুর

Sahitya Chayan
প্রথম পক্ষের বউটা গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল বিয়ের একবছরের মধ্যেই। নিন্দুকেরা বলে, ওটা নাকি মার্ডার। নিন্দুকের ওসব কথায় কান দেয় না পীযুষ। পূর্ণেন্দুর সঙ্গে প্রায় পাকা কথা ভিতরে ভিতরে সেরেই রেখেছে। শুধু ওর নামে যে কেসটা ঝুলছে সেটার নিষ্পত্তি হলেই প্রিয়ার সঙ্গে বিয়েটা দিয়ে দেবে। পূর্ণেন্দু ওকে ক্যাশ বেশ কিছু টাকাও দেবে প্রিয়ার সঙ্গে বিয়েটা দিলে। মনে মনে হাসে পীযুষ, টাকা তো ও বারেবারে নেবে পূর্ণেন্দুর কাছ থেকে, যতই হোক গরিব শ্বশুরের দুঃখ কি আর সহ্য করতে পারবে একমাত্র জামাই! উড়ে নিক প্রিয়া, যতদিন না পূর্ণেন্দুর কেসটা মেটে। তবে কেসটা বোধহয় খুব তাড়াতাড়ি মিটে যাবে। কারণ ওর শ্বশুরবাড়ির লোক প্রমাণ করতে পারেনি যে তাদের মেয়ের মৃত্যুটা মার্ডার।

ফোনটা বার দুয়েক বেজে গেল দীপশিখার। এত বাড়ন্ত হলো কবে, যে ওর ফোন রিসিভ করছে না? ইচ্ছে করছে এখনই ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরে গিয়ে মা-মেয়েকে হাতে নাতে ধরতে। কিন্তু এই মুহূর্তে নিরুপায় পীযুষ। মেয়েটাকে আটকে রেখে বাবাটার কাছ থেকে আগে টাকা বের করতে হবে, হাতের সব তাস সাজিয়ে দিয়েছে ও। খেলাটা গুটিয়ে এনে এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার কোনো অর্থ নেই। কাজটা মিটে গেলে তবেই বাড়ি যাবে পীযুষ। অনিরুদ্ধ পালকে যদি নাকে দড়ি দিয়ে না ঘুরিয়েছে তাহলে ওর নামও পীযুষ বিশ্বাস নয়।

সুশোভন মাস্টারের নাতনির বিয়েটা নাকি রাইগঞ্জ থেকে হচ্ছে এমনি খবর পেয়েছিলো পীযুষ। প্যান্ডেলওয়ালা

Sahitya Chayan

পিনাকী ওকে বিড়ি টানতে টানতে বলেছিল, বড়লোকের সেন্টিমেন্ট বুঝলে পীযুষদা। সুশোভন মাস্টারের মেয়ে গো, কি যেন নাম, যার কলকাতায় সাংবাদিকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, তার মেয়ের নাকি এই গ্রাম থেকে বিয়ে হবে। দাদুর বাড়ি থেকে বিয়ে দেবে। বোঝো কাণ্ড। কোথায় কলকাতা আর কোথায় রাইগঞ্জ। যতই এখানে ফ্ল্যাট উঠুক, বাজার বাড়ুক কলকাতার সঙ্গে কি কোনো তুলনা হয়? কেন যে মেয়েটার বিয়ে এখান থেকে দিতে চাইছে কে জানে? মেয়ের মামা এসে বললো, মাস খানেক পরে মেয়ের বিয়ে, তাই বাড়িতে নহবত বসবে, বাড়ির বাইরে বড় প্যান্ডেল খাটাতে হবে। আমি তো মনে মনে হাসলাম, জিজ্ঞেসাও করে ফেললাম, কলকাতার মেয়ের এখান থেকে বিয়ে? তা মামা বললো, আমার দিদির ইচ্ছে দাদুর স্মৃতি জড়ানো বাড়ি থেকেই কন্যা বিদায় হোক। বোঝো দিকি পীযুষদা! বড়লোকদের ব্যাপারস্যাপার, এদের যে কখন কার জন্য মন কাঁদে কে জানে! আমার আর কি, বড় কন্ট্র্যাক্ট পেলাম, গুছিয়ে টাকা নেব।

পীযুষের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিলো অনিরুদ্ধ পালের মুখটা। মনের মধ্যে পুষে রাখা রাগ থেকেই খোঁজ খবর নিতে শুরু করেছিল। খুঁজতে খুঁজতে এমন একটা খবর হাতে এসে পৌঁছেছে, যেটা দেখালে ওই রিপোর্টার বাবুর আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে। এই খবরের জন্য অবশ্য ওকে বেশ টাকা খরচ করতে হয়েছে। যাক, শেষ অবধি মেয়েটার বিয়েটা ভেঙে দিতে পেরেছে। পিনাকী তো বললো, বিয়ের আসর থেকে নাকি বর পালিয়েছে, মেয়েও

Sahitya Chayan
নাকি বেপাত্তা। ভাগ্যিস চিরকুটটা ঠিক সময় মত পৌঁছাতে পেরেছিল। তাই তো পুরো কেসটা এখন ওর হাতের মুঠোয় মধ্যে চলে এসেছে। এখন একটু ধরে খেলতে হবে শান্ত মাথায়। নিজে সামনে না গিয়ে কপিল, বাপ্পাকে দিয়ে কাজ তুলতে হবে।

মেয়েও তো রিপোর্টার, যদি ছবি তুলে কাগজে ছাপিয়ে দেয়, তাহলে কিডন্যাপার বলে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে। তাই এমন ভাবে খেলতে হবে যেন বিষয়টা বেশি না ছড়ায়। বিড়িতে দুটো টান দিয়ে প্ল্যানটা মনে মনে আঁকছিলো পীযুষ। তখনই শিখার ফোন ঢুকলো।

ফোনটা ধরেই পীযুষ বললো, কি রে মাগি, সেজেগুজে কোথায় গিয়েছিলিস? আমি বাড়িতে নেই বলে কি পিঠে দুটো ডানা গজিয়েছে নাকি?

শিখা ভাঙা গলায় বলল, পেটে যন্ত্রণা হচ্ছিল, তাই প্রিয়া ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। গলাটা টক হয়ে আছে, আর পেটে লাগছে। ফোনটা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম। গলা শুনেই মনে হচ্ছে অসুস্থ। পীযুষ বললো, ঘরে আছিস, খাচ্ছিস দাচ্ছিস এত রোগ বাঁধে কি করে? দেখিস, টসকে যাস না, আমার এখন অনেক কাজ বাড়ি ফিরতে পারবো না।

ফোনটা রেখে দিয়েছে শিখা। বিরক্ত লাগছে পীযুষের। এখন যদি শিখার বাড়াবাড়ি কিছু হয় তাহলে ওকেই ছুটতে হবে। এদিকে এতবড় একটা রিস্কের কাজ ফেলে বাড়িও ফিরতে পারবে না ও।

Sahitya Chayan

বিড়িটা সিমেন্টের মেঝেতে ঘষে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ও। একবার রিটায়ার্ড পোস্ট মাস্টারের বাড়ি যেতে হবে। কয়েকটা খবর নেওয়ার আছে। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে কপিলকে বললো, কাজ সেরে সিউকিউরিটিকে বলে তবে বেরোবি, নাহলে পরে আমায় কথা শুনতে হয়। রোজ একই কথা বলতে হয় এদের। হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ির দিকে এগোলো পীযুষ। অনেক কাজ, এখন ওর অনেক কাজ।

।।২৬।।

কে ফোন করেছিল নীল? কাবেরীর প্রশ্নে নীলাদ্রি মাথা উঁচু করে তাকিয়ে বলল, অনিরুদ্ধবাবু। টুটাই বাড়ি ফিরছে। উনিই গাড়ি করে পাঠিয়ে দিয়েছেন টুটাইকে। অহনাই নাকি টুটাইকে বলেছে ও এখন বিয়ে করতে পারবে না। কারণটা ঠিক কি সেটা অবশ্য অনিরুদ্ধবাবু আমার কাছে পরিষ্কার করে বললেন না। তবে মেয়ের এ হেন ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইলেন। এবং টুটাইয়ের যে-কোনো দোষ ছিল না কালকের ঘটনার জন্য সেটাই বললেন। অহনার কথাতেই ও বিয়ের আসর থেকে পালিয়েছিল। কাবেরী উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, কিন্তু তাহলে টুটাই কেন গিয়েছিল সূর্যপুর? নীলাদ্রি বললো, বুঝলে কাবেরী, তুমি ছেলেটাকে বড্ড ভালোভাবে মানুষ করেছো গো, অহনা আনলাকি তাই ও টুটাইকে পেল না। অহনাকে নাকি একা রাইগঞ্জ স্টেশনে দেখে ওকে বাবার কাছে পৌঁছে দিতে টুটাই গিয়েছিল ওখানে। অনিরুদ্ধবাবুর মত অমন স্বনামধন্য মানুষ একবাক্যে স্বীকার করলেন, আপনারা বড় যত্ন নিয়ে সন্তান মানুষ করেছেন নীলাদ্রিবাবু।

Sahitya Chayan

ছেলে আপনাদের হিরের টুকরো। বড় ভদ্র, মার্জিত, শান্ত স্বভাবের ছেলে নৈঋত। ওকে এই কয়েকঘণ্টায় নাকি ওনার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। উনি বললেন, আত্মীয়তা হলো না ঠিকই, কিন্তু মাঝে মাঝে নৈঋতের সঙ্গে সময় কাটানোর পারমিশনটুকু আমায় দেবেন। সব দোষ আমাদের মেয়ের, তাই টুটাই বাড়ি ফিরলে যেন আমরা কোনোভাবেই ওকে আক্রমণ না করি। বুঝলে কাবেরী, অনিরুদ্ধ বাবু মানুষ হিসাবে ভীষণ সাচ্চা। নাহলে কেউ এভাবে মেয়ের দোষ স্বীকার করে না।

কাবেরী ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লো। তার মানে শেষ আশাটুকুও নিভে গেল। বসুবাড়ির সবার ধারণাই সত্যি হলো। দোষী তার মানে অহনা! কাবেরীর চোখই ধোঁকা খেয়েছে। কাবেরী মাথা নিচু করে বললো, আমায় তোমরা ক্ষমা করে দিও। আর অফিসের ব্যানার্জীদার সঙ্গেই কথা বলো, আমার আপত্তি নেই। অহনার বাবা-মা ভদ্র ভালো জেনে আমার আর কোনো ইন্টারেস্ট নেই নীল। মেয়েটা আমায় এভাবে ঠকালো, ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে! যাক, টুটাই ফিরে আসুক, আমরা ওর একটা ভালো বিয়ে দেব। নীলাদ্রি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, কাবেরী আজ টুটাই একা আসছে। আজ তো ওর বউ নিয়ে এবাড়িতে ঢোকার কথা ছিল। ছেলেটার ওপর দিয়ে বড্ড ঝড় বয়ে গেল গো। আমাদের শক্ত হয়ে ওকে সামলাতে হবে এখন। কাবেরী নীলের হাতটা ধরে বলল, হয়তো ভালোই হলো। ওই মেয়ের পাল্লায় পড়লে আমার ছেলেটার কপালে কি জুটতো কে জানে! বলা তো যায় না, হয়তো

Sahitya Chayan

বাধ্য হয়ে বিয়েটা করতো তারপর শুরু করত টুটাইয়ের সঙ্গে অশান্তি। এই বেশ ভালো হলো। সাময়িক কষ্ট হলেও জীবনটা তো ছোট নয়। টুটাই কখন ফিরবে বলো তো?

নীলাদ্রি ধীর গলায় বলল, ফিরতে ফিরতে সাতটা তো বাজবেই। অনু পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল বোধহয়, টুটাই ফিরছে শুনেই উত্তেজিত হয়ে বলল, টুটাই ফিরছে? আমি বরং ওর ঘরটা পরিষ্কার করে রাখি বৌদিভাই। ছেলেটা বড্ড ক্লান্ত, ওর রেস্ট দরকার। আমি জানতাম, আমাদের টুটাই এমন কাজ করতেই পারে না। আমি শুভকে বলেও ছিলাম, আমার ভাইপো আমি চিনবো না? যাই তুতানকে বলি, দাদার ঘরটা ভালো করে পরিষ্কার করতে।

অনু চলে যেতেই নীলাদ্রি বললো, জানো কাবেরী যাদেরই ফোনে বলছি বিয়েটা ভেঙে গেছে একটা আকস্মিক ঘটনায়, তারাই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে চলেছে, নৈঋতের মত ছেলে হয় না, ওর সঙ্গে এমন ঘটলো? কাবেরী মাথা নিচু করে বললো, সবটাই আমার দোষ। তোমরা অহনা সম্পর্কে একটু হলেও দ্বিমত পোষণ করেছিলে, আমি একাই লড়ছিলাম। আমার জন্যই আজ সকলকে অপমানিত হতে হলো, সরি নীল। নীলাদ্রি আলগোছে বললো, ডেস্টিনি, না মানলেও উপায় নেই। টুটাইয়ের মুখোমুখি কি ভাবে হব সেটাই ভাবছি। ও তো আমাদের বিশ্বাস করেই অহনাকে পছন্দ করেছিল। টুটাই কলেজে গিয়ে কিভাবে ফেস করবে ছাত্র ছাত্রীদের? নীলাদ্রি জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বললো, উফ, আর ভাবতে পারছি না।

Sahitya Chayan

কাবেরীও আর ভাবতে পারছে না। সব তালগোল পাকিয়ে হাজির হয়েছে ওর সামনে। নীল, একবার ব্যানার্জীদাকে কলটা করবে? কেমন যেন অস্থির লাগছে আমার। নীলাদ্রি কাবেরীর দিকে তাকিয়ে বলল, এত অস্থির হয়ে পোরো না। তুমি এমন করলে আমি জোর পাবো কোথা থেকে! টুটাই সুস্থ ভাবে বাড়ি ফিরছে এটাই আমাদের কাছে সব থেকে বড় পাওনা। সোসাইটি, প্রেস্টিজ, কলিগ এসব শব্দের থেকেও কিন্তু টুটাই আমাদের কাছে অনেক দামি। কাবেরী কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, টুটাই আমায় আর কোনোদিন বিশ্বাস করবে না নীল। ক্ষমাও করবে না হয়তো। সেই টুটাই যার টিফিনবক্স আমি না গুছিয়ে দিলে নাকি তার পেট ভরতো না, সেও আমায় ভুল বুঝবে, আমি কিভাবে সামলাব নীল? নীলাদ্রি ক্লান্ত হেসে বললো, এখনকার ছেলেমেয়েরা আমাদের মত এতটা ইমোশনাল বোধহয় নয়। নয় বলেই টুটাই কাল থেকে ফোনের সুইচ অফ করে রেখে দিতে পেরেছে। একবারও আমাদের একটা কল করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেনি। অহনাকে দেশের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়াটা ওর কাছে প্রায়োরিটি ছিল অথচ তোমাকে একটা কল করে নিজের খবরটা জানানো নয়, তাই না? তাই বলছি কাবেরী এত ভেবো না। আমি বরং ব্যানার্জীদাকে একটা কল করি। সন্ধে তো হয়েই গেল। কাবেরী সাগ্রহে তাকালো নীলের দিকে। হ্যাঁ, সময় নেই নষ্ট করার মত। আমিও চাই এই মাসেই টুটাইয়ের অন্যত্র বিয়ে ঠিক করতে। হঠাৎ তুতান ডাকলো ঘর থেকেই, মামিমা

Sahitya Chayan

দেখো...দাদাভাইয়ের ল্যাপে ওই বউদিভাইটার কয়েকটা ক্লিপিং। তুতান সারাদিন টুটাইয়ের ল্যাপটপটা নিয়ে মুভি দেখে যাচ্ছে। তুতান এ বাড়িতে এলে টুটাইয়ের সব জিনিস ওর দখলেই থাকে। টুটাই বড্ড ভালোবাসে পিসির ছেলেটাকে। হয়তো নিজের ভাইবোন নেই বলেই। তুতানের কাছে টুটাইয়ের পারসোনাল কিছু নেই, সব ওদের কমন। বিয়ে করতে যাওয়ার আগে যেমন টুটাই বললো, এই তুতান তোর জেলটা একটু আমার চুলে দিয়ে দে, নিজেই তো কেত মারছিস, আরে আজ সবাই আমাকে দেখবে বস, তোকে নয়। তুতান হাসতে হাসতেই বললো, জেল লাগিয়ে আর কি করবি? তোকে তো টোপর পরে থাকতে হবে, আজ তোর সব ফ্যাশন গন... তারপরেও কাবেরী দেখলো তুতান বেশ যত্ন করে টুটাইয়ের চুল সেট করছে আর বলছে, তুই এবারে চুলটা হাবিবের কাছ থেকে কাটিসনি? তোকে যে আমি ফোনে বলেছিলাম, তাও শুনলি না? টুটাই কি উত্তর দিয়েছিল শোনা হয়নি কাবেরীর। তবে এটুকু জানে দুই ভাইয়ের বড্ড মিল। ল্যাপটপ থেকে মোবাইল সবকিছুর একসেস টুটাই আর কাউকে না দিক তুতানকে দেবেই।

ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে কাবেরী বললো, কি রে?

তুতান প্লে করতেই দেখতে পেলো টিভির নামি চ্যানেলের কিছু ক্লিপিং। যেখানে অহনা মাউথপিস হাতে বাইট দিচ্ছে। নীলাদ্রি বললো, দেখো, মেয়েটার কি মারাত্মক সাহস। এই তো কদিন আগের মৌলালীর ঘটনাটা নিয়ে বলছে, তাও আবার স্পট থেকে।

Sahitya Chayan

নিউজ চ্যানেলের নিউজ রিডার বলছেন, মৌলালীতে এই মুহূর্তে উপস্থিত আছেন আমাদের চ্যানেলের রিপোর্টার অহনা পাল, অহনার কাছ থেকে জেনে নেব এখন ওখানকার অবস্থা ঠিক কেমন।

অহনা বেশ স্পিডেই বলছে, 'একটু আগেই এখানে একটা মিছিলকে কেন্দ্র করে শুরু হয় গন্ডগোল। তারপর দুই দলের ইট ছোড়াছুড়ি চলেছে বেশ কিছুক্ষণ। অবশেষে পুলিশের কাঁদানে গ্যাসে ছত্রভঙ্গ হয়েছে মিছিল। তবুও আপনারা এখনো আমাদের ক্যামেরায় দেখতে পাচ্ছেন, মিছিলের বেশ কিছু মানুষ এখনও ছত্রভঙ্গ মিছিলকে পুনরায় সংঘবদ্ধ করার প্রয়াস চালাচ্ছে। ঘটনাস্থল এখনো উত্তপ্ত। আমি অহনা পাল, মৌলালী থেকে বলছি।'

এমন আরও বেশ কয়েকটা ভিডিও ক্লিপিং রয়েছে টুটাইয়ের এই ফোল্ডারে।

নীলাদ্রি বললো, কাবেরী তুমি কি করে এমন একটা মেয়েকে চুজ করেছিলে বলতো? রীতিমত উত্তপ্ত পলিটিক্যাল গন্ডগোলের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই মেয়ে রিপোর্টিং করছে, ভাবতে পারছো বিপদটা! এর এটাই প্রফেশন। তোমার ধারণা আছে, রিপোর্টাররা কতরকম বিপদের মধ্যে পড়ে, এসব খবর করতে গিয়ে! কিন্তু আমি ভাবছি টুটাইয়ের তার মানে অহনার প্রতি ইন্টারেস্ট তৈরি হয়েছিলো, তাই এগুলো জোগাড় করেছিল। তুতান বললো, দাদাভাইয়ের কিন্তু অহনাদিকে অপছন্দ ছিল না, এটুকু বলতে পারি। কাবেরী একটু হেসে বললো, অহনাকে অপছন্দ করবে এমন মানুষ হতেই পারে না।

Sahitya Chayan

তবে ও যেটা করলো আমার সঙ্গে, এরপরে আর এ বাড়িতে ওর নামটুকুও উচ্চারণ করবে না কেউ।

কাবেরী দেখলো, অনু টুটাইয়ের ঘরটা খুব সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছে। ফুলদানিতে টাটকা গোলাপ রেখেছে কিছু। বিছানায় টুটাইয়ের পছন্দের রঙের একটা চাদর পাতা। দেওয়ালে টুটাইয়ের ছোটবেলার ছবিগুলোর একটু আধটু জায়গা পরিবর্তন করেছে মনে হচ্ছে, বেশ ভালো লাগছে। তুতান বললো, মামী, মা বলেছে আমি মামার পাশের ঘরটাতে থাকবো, দাদাভাইকে এখন একটু একা ছেড়ে দেওয়া উচিত। একটু প্রাইভেসি দরকার ওর। আমি আমার ব্যাগটা নিয়ে ওই ঘরে শিফট করে যাচ্ছি। নীলাদ্রি বললো, সেই ভালো। তুই আমাদের পাশের ঘরে চলে আয়। তোর মামীর সঙ্গে ঝগড়া হলে মাঝরাতে আমাকে বাঁচাতে তুইই আসতে পারবি। নীলাদ্রি মজা করে মনের চাপ লাঘব করার চেষ্টা করছে। কাবেরী আবার তাড়া দিলো, কি গো ফোনটা করো ব্যানার্জীদাকে।

বার দুয়েক রিং হবার পরেই রিসিভ করলো ব্যানার্জীদা। সাধন ব্যানার্জী, নীলাদ্রির সঙ্গে একই পোস্টে জব করেন। বয়েসে যদিও নীলাদ্রির থেকে একটু বড়ই হবেন। নীলাদ্রি অবশ্য ওদের সমস্ত কলিগ এমনকি কাবেরীর কাছেও বিস্ময়। কারণ এত বছরের রেলের জবে কাবেরী নিজেও বার দুয়েকের বেশি প্রমোশন পায়নি। সেখানে নীলাদ্রি গুনে গুনে ছটা প্রমোশন পেয়ে এখন রীতিমত গ্রুপ-এ র গেজেটেড পোস্ট হোল্ড করে। নীলাদ্রির সব কলিগরাই প্রায় ওর থেকে সিনিয়র বা

Sahitya Chayan

রিটায়ার করবে আর কয়েকদিনের মধ্যে এমন। সেখানে নীলাদ্রি অনেকটা কম বয়েসেই পৌঁছেছিল এই পজিশনে। কাজের ব্যাপারে ও বরাবরই ভীষণ সচেতন, সেটা অবশ্য কাবেরীও জানে।

আরে নীল, বলো বলো...ব্যানার্জীদার দরাজ গলা শোনা গেল। কিছু মনে কোরো না ভায়া, একটা সংবাদ পেলাম আমাদের সৌরভের কাছ থেকে, ও নাকি বললো, তোমার ছেলের বিয়েটা ভেঙে গেছে। তাই আমাদের নিমন্ত্রণ ক্যানসেল। তুমি নাকি সকলকে জানিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছো সৌরভকেই। অনেকবার ইচ্ছে করছিল তোমায় একবার কল করি, আসল বিষয়টা কি সেটা জানার জন্যই। তবুও কৌতূহল দমন করে নিলাম, হয়তো ব্যস্ত আছো এই ভেবে। কি হয়েছে নীলাদ্রি?

ব্যানার্জীদা মানুষটা বরাবরই খোলা মনের। অফিস রাজনীতিতে কোনোদিনই ইন্ধন জোগান না। ব্যানার্জীদার আসল নাম সাধন ব্যানার্জী, কিন্তু উনি এখন সকলের ব্যানার্জীদা নামেই পরিচিত। নীলাদ্রি জানে, এই মানুষটাকে সবটুকু সত্যি বলাই যায়, তবুও অফিস বলে কথা, তারপর নিজের পজিশনটার কথা ভেবেই একটু রেখে ঢেকে বলবার সিদ্ধান্ত নিলো।

নীলাদ্রি একটু থেমে থেমে বললো, হ্যাঁ ব্যানার্জীদা ঠিকই শুনেছ। বিয়েটা ভেঙে গেছে মেয়ের কারণে। পাত্রী রিপোর্টার। বিয়ের আসরে বসার আগে নাকি তার কি কাজ পড়ে গেছে, তাই সে বিয়েটা তখন করতে পারছিল না। আসলে ব্যানার্জীদা আমরা মধ্যবিত্ত মানসিকতায় মানুষ।

Sahitya Chayan
তাই এমন ধরণের উচ্ছৃঙ্খলতা দেখতে অভ্যস্ত নই। সম্পর্ক নিয়ে শুরুতেই টানাহ্যাঁচরা করতে ইচ্ছে করেনি আর। টুটাইও আর রাজি হলো না বিয়েটা করতে, বাধ্য হয়ে ভেঙে দিলাম। এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের আমাদের রাডারে ধরার চেষ্টা না করাই ভালো বুঝলে তো?

এখন আমরা চাই টুটাইয়ের একটা ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে দিতে। তো তোমার পরিচিত কোনো মেয়ে যদি থাকে তাহলে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ব্যানার্জীদা বেশ আগ্রহের সঙ্গে বললো, আরে নৈঋতের মত ছেলের কি পাত্রীর অভাব হবে নাকি! আমার শালার মেয়েই তো আছে। দাঁড়াও, তোমায় আমি মিমির দুটো ছবি পাঠাই। ও তো রবীন্দ্রভারতীর মিউজিক ডিপার্টমেন্টের লেকচারার। তারপর এখন তো মিউজিক নিয়ে পি এইচ ডি করছে। নৈঋতের সঙ্গে বেশ মানাবে। আমার শালা আবার এসব ম্যাট্রিমনি সাইটে একেবারে বিশ্বাসী নয়। সাবেকি ঘটক প্রথায় বিশ্বাসী। আমি এখুনি ওদের নৈঋতের কথা বলছি। মিমিরও ফার্স্ট চয়েস প্রফেসর। আমি ছবি পাঠাচ্ছি দেখো। নীলাদ্রি তোমায় আর কাবেরী দুজনকেই তো আমি চিনি, তাই তোমাদের ফ্যামিলিতে মেয়ে দিতে আমাদের কারোর আপত্তি হবে না।

ব্যানার্জীদা কথা শেষ করতেই হোয়াটসআপে দুটো ছবি ঢুকলো। কাবেরীর পাশে অনু, শুভময়ও এসে দাঁড়িয়েছে। সবার চোখই এখন হোয়াটসআপের দিকে। ছবিটা লোড হচ্ছে। অনুই প্রথমে বললো, ওমা, দেখো কি মিষ্টি দেখতে মেয়েটাকে! শুভময় বললো, বেশ স্নিগ্ধ সৌন্দর্য তাই না?

Sahitya Chayan

কাবেরীর চোখের সামনে অহনার সাহসী চোখদুটো একবার উঁকি দিয়েই ফিরে গেল অবিশ্বাসের অন্ধকারে। মেয়েটাকে দেখতে সত্যিই বেশ মিষ্টি। তবে অহনার মত নজর কাড়ে না। অহনার থেকে গায়ের রং ফর্সা, নাক টিকালো, চোখ দুটো ভাসা ভাসা, যাকে এক কথায় সুন্দরী বলা চলে। সবেতেই হয়তো এই মিমি নামক মেয়েটা অহনাকে টেক্কা দিতে পারে কিন্তু আটকে যাবে একটা জায়গায়, যেখানে অহনাই হলো সম্রাজ্ঞী। ব্যক্তিত্ব, অহনাকে দেখলে সকলের মনে একটাই সমার্থক শব্দের উদ্ভব হবে, সেটা হলো ব্যক্তিত্ব। ওই এক জায়গায় জিতে অহনা হারিয়ে দেবে মিমিকে। ধুর, কাবেরী আবার কেন ভাবছে অহনার কথা! যে ভিডিও ক্লিপিংগুলো এখুনি দেখে নীল একটাই কথা বললো, কি মারাত্মক ব্যতিক্রমী সাহস দেখেছো মেয়েটার? ব্যাকগ্রাউন্ডটা খেয়াল করো, এখনো আগুন জ্বলছে জায়গাটায়, ওখানে দাঁড়িয়ে এই মেয়ে স্পষ্ট গলার স্বরে বাইট দিচ্ছে। কোনোরকম ভয়ের লক্ষণ নেই ওর চোখে। ঠিক যে কারণে অহনাকে পছন্দ নয় নীলের, সেই একই কারণে অহনাকে কিছুতেই ভুলতে পারছে না কাবেরী। অনু বললো, বৌদি কিছু বলো? মেয়েটাকে তো দুর্দান্ত দেখতে, আবার গুণের মেয়েও বটে। শুভময় বললো, রীতিমত সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ বলে কথা। আমি তো দেখতে গিয়ে একটা গান শুনতে চাইবই। কাবেরী খেয়াল করলো, সবাই বেশ মেতে উঠেছে নৈঋতের বিয়ের নতুন সম্বন্ধটা নিয়ে। নীল বললো, কাবেরী কেমন লাগলো বলো?

Sahitya Chayan

কাবেরী শান্ত স্বরে বললো, ভালো তো। আগের বার আমি ঠকেছি, তাই এবারে টুটাইয়ের বিয়ের দায়িত্ব তার বাবা, পিসি, পিসান নিলেই শান্তি পাবো আমি।

কাবেরী যে কেন অহনাকে কিছুতেই ভুলতে পারছে না কে জানে? ওর সঙ্গে অহনার পরিচয়টা নাটকীয়ভাবে হয়েছিল বলে, নাকি কফিশপে বসে খুব সহজেই ওরা দুজনে গল্প করতে করতে অসম বয়েসি বন্ধুত্বের বেড়াজালটা ডিঙিয়ে ফেলেছিল বলে! অহনার বলা সব কথার মধ্যে সেদিন একটা কথা কাবেরীর মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। এত বয়েসে এসেও তো কখনো এমন ভাবেনি কাবেরী। এই প্রথম ভাবতে বাধ্য করেছিল অহনা।

ওর একটা ছোট্ট প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বেশ কিছু মিথ্যে বলতে হয়েছিল কাবেরীকে। ঠিক মিথ্যে নয়, কিছু অগোছালো কথা বুনতে হয়েছিল যেগুলো পুরোটা সত্যি নয়। অহনা খুব ক্যাজুয়ালি জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা আন্টি আপনি আর আঙ্কেল তো একই অফিসে জব করতেন তাই না? আঙ্কেল কি আপনার থেকে সিনিয়র?

কাবেরী হেসে বলেছিল, হ্যাঁ, আমি যখন ক্ল্যারিক্যাল জব জয়েন করেছিলাম তখন ও এক ধাপ উঁচুতে ছিল। অফিসার ইনচার্জ।

অহনা কফিতে চুমুক দিয়ে কথাটা হালকা করে ভাসিয়ে দিয়েছিল, এখন তো আঙ্কেল এ ওয়ান অফিসার তাই না আন্টি? আপনি বোধহয় গ্রুপে বি তে আছেন তাই না?

Sahitya Chayan

কাবেরী ঘাড় নেড়ে বলেছিল, হ্যাঁ। নীল এখন অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। অহনা টিস্যু দিয়ে মুখ মুছে বলেছিল, কেন আন্টি? কেন আঙ্কেল এতগুলো প্রমোশন পেল, আর আপনি বোধহয়, দুটো কি তিনটে?

কাবেরী ধরা গলায় বলেছিল, আমি যখন প্রেগনেন্ট ছিলাম তখন একটা প্রমোশন পেপারে বসতে পারিনি। তারপর টুটাই হওয়ার পর থেকে তো জবটুকু করতেই হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। রাত জেগে প্রোমোশনের জন্য পড়বো কখন? অফিস, সংসার, বাড়ি সব সামলে আর হয়ে উঠলো না গো। আসলে কাবেরী জানে, নীলাদ্রিও তেমন চায়নি, কাবেরী আরও উঁচুতে উঠুক। কিন্তু এমন জোড়াতালি অসত্য বলতেই হয় কাবেরীকে। কারণ ওরা সুখী দম্পতি।

অহনা বেশ নরম অথচ দৃঢ় স্বরে বলেছিল, আন্টি সংসারটা আঙ্কেলের নয়? নৈঋত আঙ্কেলের ছেলে নয়? আসলে কি জানেন, মেয়েরা প্রথম থেকেই ভেবে নেয়, কেরিয়ার নিয়ে ভাবার অধিকার শুধু পুরুষদের আছে। মেয়েরা তো সংসার সামলাবে। যেসব ফ্যামিলি মেয়েদের জব করাটা মেনে নেয় সেইসব ফ্যামিলিকে সমাজ খুব উঁচু জায়গায় বসিয়ে দেয়। বেশ গর্ব করে বলে, আমরা ভীষণ রকম লিবারাল। সত্যিই কি লিবারাল? বউ অফিস থেকে একটু দেরি করে ফিরলে বাড়ির লোকজনের মুখ ভার হয় না? সন্ধের চাটুকু অন্তত সে ফিরে করবে এই প্রত্যাশাটা বোধহয় সকলেরই থাকে। সেই বাড়ির ছেলে যদি অফিস করে, ক্লাব হয়ে রাত বারোটায় ফেরে তাহলেও বাড়ির

Sahitya Chayan
লোকজন বলবে, আহা, ছেলেটার বড্ড কাজের প্রেসার। আসলে কি জানেন আন্টি, আমরা সমতা সমতা করে লাফাই ঠিকই, কিন্তু এর সঠিক অর্থ জানি না। কিছু মেয়ে মনে করে গোটা সংসার আমার হাতের মুঠোয়, এটাই তো স্বাধীনতা। কিছু মেয়ে ভাবে, অন্তর্বাসের ফিতে বের করে, হট প্যান্ট করে ঘুরছি, মানেই আমি সমতা পাচ্ছি। কিছুজন ভাবে আমি জব করছি, ব্যস আমি স্বাধীন। আসলে কি বলুন তো, সমতা শব্দের অর্থটা আমাদের মেয়েদের কাছেই ধোঁয়াশা। আমরা কোনোদিন পুরুষদের মত কেরিয়ারিস্টিক হতে পারবো না। কারণ অদ্ভুতভাবে সন্তানের দায়িত্ব, সংসারের সমস্ত দায়িত্ব কোনো এক অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী এসে পড়বে আমাদের একার কাঁধে। পুরুষরা একই সংসারে সেপারেট ঘরে বসে রাত জেগে পড়ে প্রমোশন পাবে কিন্তু আমাদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ডিনার টেবিল মুছে, রান্নাঘর পরিষ্কার করে, বেবির কেয়ার করে তবে আমরা কেরিয়ার নামক অলীক বস্তুর কথা ভাবার সুযোগ পাবো। ততক্ষণে ক্লান্ত শরীরে ঘুম নামবে। ভোরেও উঠতে হবে আমাদেরই আগে। এটাই নিয়ম হয়ে গেছে আন্টি। যে মেয়ে এই নিয়মের বাইরে যেতে চাইবে তাকেই অন্যরা বাচাল, অসভ্য, অভদ্র বলে দাগিয়ে দেবে। আসলে কি বলুন তো, ঘুনটা ধরেছে অনেক গভীরে, রুট খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তাই তো আপনি এখন গ্রুপ বি তে রয়ে গেছেন এবং আঙ্কেলের প্রোমোশনের পার্টিতে আনন্দ করেছেন, ইগোটুকুও হার্ট হয়নি। যদি উল্টোটা হতো আন্টি?

Sahitya Chayan

যদি আজ আপনি থাকতেন আঙ্কেলের জায়গায় আর আঙ্কেল আপনার জায়গায়? তাহলে? অমিতাভ বচ্চনের অভিমানটা কিন্তু বাস্তব গল্প, শুধু মুভি নয়।

অহনার কথাগুলো মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলো কাবেরী। এই মেয়েটা কি করে জানলো ওর গভীরের ক্ষতটার কথা? মেয়েটা কি ম্যাজিক জানে? কাবেরীর মাঝে মাঝেই কষ্ট হতো, মনে হতো ও তো পারতো, নীলাদ্রি যদি একটু সাপোর্ট করতো হয়তো পারতো। স্বপ্ন তো কাবেরীও দেখেছিলো গেজেটেড পোস্টের! নীল কখনো সংসারের কোনদিকে তাকায়নি, নিজের কাজ আর কেরিয়ার নিয়েই ব্যস্ত ছিল। কাবেরী অফিস সামলে সংসার, টুটাইকে নিয়েই কাটিয়ে দিলো গোটা জীবনটা। মনে মনে এই ভেবে শান্তি পেতো, ওর সংসার ওর দখলে। ভাবনাটাও যে ভুল ছিল সেটা বুঝতে পারলো টুটাইয়ের বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় যখন ওর দিকে দোষারোপের আঙুলটা উঠলো নির্দ্বিধায়।

অহনা বলেছিল, আন্টি আসলে কি বলুন তো, আমরা দিনরাত লড়াই করে যাচ্ছি, নিজের মনকে ফাঁকি দেওয়ার লড়াই, ভালো আছি জানানোর যুদ্ধ করেই চলেছি। আর যেসব মেয়েরা সমতা শব্দের মানে বোঝে তাদের মনে অনেকটা যন্ত্রণা। চোখের সামনে অন্যায় দেখেও মেনে নিতে বাধ্য হবার কষ্ট জমেই চলেছে অবিরত। "মেয়েদের একটু মানিয়ে নিতে হয়" শব্দগুলো শুনতে শুনতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, হারিয়ে যায় প্রতিবাদের ভাষা। তাই ঘুনপোকাটা ধীরে ধীরে গভীরে আরও গভীরে প্রবেশ

Sahitya Chayan

করে। সমাজ পাল্টাচ্ছে কথাটা তাই এখনো আমি মানতে পারি না আন্টি। ঐজন্যই তো মেয়ে রিপোর্টারের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে আপনাকে এত লড়তে হচ্ছে। তাই না?

কাবেরী সামলে নিয়ে বলেছিল, না না আমাদের ফ্যামিলির সকলের তোমায় পছন্দ, টুটাইয়ের বাবার, টুটাইয়ের, সকলের।

অহনা অল্প হেসে বলেছিল, মিথ্যে বললে অনেককে বেশ কিউট লাগে কিন্তু।

কাবেরী হেসে বলেছিল, বড্ড দুষ্টু তুমি, হবু শাশুড়ির সঙ্গে মজা হচ্ছে?

অহনা জিভ কেটে বলেছিল, এই রে ভুলেই তো গিয়েছিলাম, ঘোমটা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু জিন্স টপে ঘোমটা কোথায় পাবো?

মেয়েটার সরলতা ঘেরা সততা আর দৃঢ়তা মুগ্ধ করেছিল কাবেরীকে। অহনা যেন স্বচ্ছ আয়না, যার সামনে দাঁড়ালে বিবেক নামক বস্তুটি নড়েচড়ে বসে প্রশ্ন করতে শুরু করে। এমন এক ধারালো খাপ খোলা তলোয়ারকেই চেয়েছিল কাবেরী বউ হিসেবে।

কাবেরী অহনার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, কথা দিলাম, টুটাই আর তোমার মধ্যে কখনো ভেদ করবো না।

অহনা মিষ্টি করে হেসে বলেছিল, বেশ তাহলে ডান, ওই কথাই রইলো, বিয়ের পর কাবেরী বসুর আদরের সেভেন্টি পার্সেন্ট আমি পাবো, বাকি থার্টি তার পুত্র। আসলে এতকাল ধরে হান্ড্রেড তো নৈঋত একাই

Sahitya Chayan

পেয়েছে, তাই হিসেব বরাবর করার জন্য আপাতত বেশ কিছু বছর ওকে থার্টিতেই কাজ চালাতে হবে।

কি সুন্দর সাবলীল ছিল অহনার আদর চাওয়ার ভঙ্গিমা। কাবেরী এখনো ভাবতেই পারছে না, অহনা কোনো অন্যায় করতে পারে! অন্যমনস্ক কাবেরীর দিকে তাকিয়ে নীলাদ্রি বললো, কি হলো, এখনও কি রিপোর্টার তোমার মাথায় ভর করে আছে নাকি?

কাবেরী নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, না, কেউ নেই আমার মাথায়। তোমরা টুটাইয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করো, আমার আপত্তি নেই।

কাবেরীর কথা শেষ হবার আগেই বাড়ির গেটের সামনে একটা গাড়ির হর্ন শোনা গেল। অনু উৎসাহিত হয়ে বলল, বৌদিভাই বোধহয় টুটাই এলো। নীলাদ্রি একটু সচেতন গলায় বলল, আমরা কেউ কিন্তু ওকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করবো না। ওর যখন ইচ্ছে হবে উত্তর দেবে। শুভ বললো, আই এগ্রি উইথ দাদা।

গাড়ি থেকে নেমে টুটাই ড্রাইভারকে কিছু একটা বলছে এটুকু ব্যালকনি থেকেই দেখা যাচ্ছে, বোধহয় ড্রাইভারকে বাড়িতে আসার জন্য রিকোয়েস্ট করছে, কিন্তু গাড়িটা আর দাঁড়ালো না, বেরিয়ে গেল। টুটাই যেন একটু অস্বস্তি নিয়েই বাড়ির গেটটা খুললো। কাবেরী আর অনু দুজনেই নীচে নেমে গেছে। নীলাদ্রি আলগোছে বললো, ঠিক কি ভাবে ওর সঙ্গে শুরু করা উচিত শুভ?

শুভময় একটু ভেবে বললো, দাদা একটু টাইম দিন, সময় সব থেকে বড় মেডিসিন। ওকেই বলতে দিন,

Sahitya Chayan

আমরা প্রশ্ন করবো না। নীলাদ্রি ঘাড় নেড়ে বললো, চলো নীচে যাই।

নিচে নামতে নামতেই শুনলো, কাবেরী বললো, একটা ফোন করা যেত টুটাই, আমরা টেনশন করছিলাম।

টুটাই বললো, নিশ্চয়ই যেত কিন্তু কাল মাথায় আসেনি ফোন করে কি বলবো? আর আজ তো অনিরুদ্ধবাবু তোমাদের কল করে নিশ্চিন্ত করেছিলেন তাই আর করিনি। তাছাড়া আমি ফোনটা অফ রেখেছি, তোমরা ছাড়াও আরও তো ফোন আসার সম্ভবনা ছিল, সেগুলো এভয়েড করার জন্যই। এনিওয়ে, আই অ্যাম ফাইন নাও।

পিসিমণি, একটু কড়া করে চা খাবো তোমার হাতের। অনু বিগলিত হয়ে বলল, এখুনি আনছি টুটাই। তোর শরীর ঠিক আছে তো রে?

টুটাই কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, ফাইন।

কাবেরীর দিকে তাকিয়ে টুটাই বললো, জানি তোমাদের সকলের মনেই এখন প্রশ্নের বুদ্বুদ, কিন্তু আই নিড সাম টাইম প্লিজ। সব বলছি ডিনার টেবিলে। এনিওয়ে আজকে যে সমস্ত গেস্টদের ইনভাইট করা হয়েছিল, তাদের কি সব জানানো গেছে? নাকি এসে হাজির হবে? নীলাদ্রি সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিয়ে বললো, মোটামুটি নিমন্ত্রণ লিস্ট দেখে সকলকে কল করা হয়েছে। এরপরে যদি কেউ বাকি থেকে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই কারোর না কারোর মাধ্যমে সত্যিটা জেনেই গেছে।

নৈঋত অল্প হেসে বললো, দ্যাটস গুড। আমি একটু আসছি ঘর থেকে। পিমনি চা করে আনলে প্লিজ আমার

Sahitya Chayan

রুমে পাঠিয়ে দিও। কাবেরী ছেলের দিকে তাকিয়েছিল অপলক। কেমন যেন বদলে গেছে ছেলেটা এক রাতেই। টুটাই বরাবরই একটু চুপচাপ স্বভাবের, অনেকটা বাবার মত চাপা স্বভাবের সেটা ঠিক। কিন্তু কাবেরীর সঙ্গে কথা না বলে এমন ভাবে তো কখনো এড়িয়ে যায়নি ও। তবে কি শেষ পর্যন্ত এই ঘটনার জন্য মাকেই দোষী করলো টুটাই? হবে হয়তো। এটুকুই পাওনা বাকি ছিল কাবেরীর।

অনু টুটাইয়ের ঘরে চা দিয়ে এসে বললো, ফোন ঘাঁটছিলো অন্যমনস্ক ভাবে। হয়তো ওর কলিগদের গ্রুপেও কেউ কিছু বলছে।

কাবেরী ধীর গলায় বলল, আমি জানি টুটাইয়ের এখন প্রাইভেসি দরকার, তবুও আমায় একবার যেতেই হবে ওর কাছে।

কাবেরী নীলের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে এগোলো টুটাইয়ের রুমের দিকে। ঘরের বাইরে থেকেই শুনতে পেল, হ্যাঁ স্যার আমি পৌঁছে গেছি। শ্যামলদাকে বললাম, বাড়িতে এসে চা খেয়ে যেতে, বোধহয় সঙ্কোচের বশেই এলো না। আমার কোনো প্রবলেম হয়নি স্যার। তবে বাড়ির কারোর সঙ্গে এখনো কথা হয়নি। আপনার তিতির পাখির কি খবর?

সেকি, তখন থেকে ঘর বন্ধ করে বসে আছে? কিন্তু কেন? আপনি কথা বলুন। যা জেদ ওই মেয়ের! আচ্ছা স্যার, এখন রাখছি।

কাবেরী পরিষ্কার বুঝতে পারলো টুটাই অনিরুদ্ধবাবুর সঙ্গে ফোনে কথা বলছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললো,

Sahitya Chayan

টুটাই একবার আসবো?

টুটাই দরাজ গলায় বলল, এসো মা। কাবেরী নরম গলায় বলল, ক্ষমা করিস। তোদের নিমরাজির সুযোগ নিয়ে আমিই বিয়েটাতে উদ্যোগী হয়েছিলাম। বসু পরিবারের সম্মান, তোর, নীলের সকলের সম্মান নষ্ট হয়েছে, সেজন্য আমি দুঃখিত রে। টুটাইয়ের বিছানার কোণে বসেছিলো কাবেরী, টুটাই আধশোয়া হয়ে চা খাচ্ছিল।

আচমকা বললো, মা, বাড়ির সকলে কি অহনাকে দোষারোপ করছে এই ঘটনার জন্য?

কাবেরী ছেলের দিকে অপলক তাকিয়ে বলল, সেটা কি কিছু ভুল করছে টুটাই? অহনার খামখেয়ালিপনাতেই তো ভেঙে গেল বিয়েটা, অসম্মানিত হলাম আমরা সকলে। হ্যাঁ রে টুটাই, অহনা ঠিক কি বলেছিল রে তোকে, যে তুই ওই অপরিচিত জায়গায় পালিয়ে যাবার রিস্ক নিলি?

টুটাই হেসে বললো, অহনা বলেছিল, আমি নিরুপায় নৈঋত, বিয়েটা আমি আজ করতে পারছি না। আমাকে এখুনি বেরোতে হবে। আমার এক্স বয়ফ্রেন্ড ওয়েট করছে আমার জন্য, প্লিজ হেল্প মি।

জানো মা, আমিও বিশ্বাস করেছিলাম যে সত্যিই অহনার এক্স ওর জন্য ওয়েট করছে। কাবেরী বললো, তাহলে কোনটা সত্যি টুটাই?

টুটাই একটু জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, মা, অহনার এক্স বয়ফ্রেন্ড নেই, তবে কোনো একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে যেটা আমরা জানি না, সেই জন্যই ও শেষ

Sahitya Chayan

মুহূর্তে বিয়েটা ক্যানসেল করলো। সেই সত্যিটা ও জানাতে পারছে না, আবার মিথ্যেও বলতে পারছে না, তাই দ্বন্দ্বে ভুগছে মেয়েটা।

কাবেরী একটু অভিমানী গলায় বলল, অহনা আর আমি বন্ধু ছিলাম, ওর সব সমস্যার কথা ও আমায় বলতে পারতো টুটাই, কিন্তু বলেনি। আমার বিশ্বাসের অমর্যাদা করেছে। আরেকটা কথা বলতো, তুই কেন গেলি ওদের দেশের বাড়িতে। টুটাই রাইগঞ্জ স্টেশন থেকে আজকের ফেরা পর্যন্ত সবটুকু বললো মাকে, শুধু একটা কথা লুকিয়ে গেল। অহনার প্রতি ওর মনে সৃষ্টি হওয়া নতুন অচেনা অনুভূতির কথাটা গোপনে রেখে দিল নৈঋত সযত্নে, একান্তে।

কাবেরী বললো, টুটাই, তোর বাবা, পিসি একটা মেয়ের সঙ্গে তোর সম্বন্ধ ঠিক করছে, এ মাসেই তোর বিয়ে দিতে চায়। আসলে পরিবারের তো একটা সম্মান আছে? তাই...

তাছাড়া অহনাকে এ বাড়িতে আর কেউ কোনোদিন মেনে নেবে না। হয়তো আমিও না।

টুটাই মায়ের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে বলল, তোমরা আমায় ঠিক কি ভাব বলতো? মেরুদণ্ডহীন, অপদার্থ? এমন একটা ঘটনার পরেরদিন আরেকটা মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করবে আর আমি চুপচাপ গিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসে যাবো? আর ইউ ক্রেজি? মা প্লিজ, এদের এসব করতে বারণ করো। নাহলে কিন্তু এবারে সত্যিই আমি বিয়ের আসর থেকে উঠে যাবো। আই নিড সাম

Sahitya Chayan

টাইম। যদি তোমরা না দিতে চাও বলো, আমি কালই একটা ফ্ল্যাট রেন্টে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। প্লিজ স্টপ দিস টাইপ অফ ননসেন্স থিঙ্কিং। মা, আমি আপাতত কাউকে বিয়ে করছি না। এটা তুমি জানিয়ে দিও বাবাকে।

টুটাই কথা শেষ করার আগেই ওর ফোনটা ভাইব্রেট করে উঠলো। কাবেরী তাকিয়ে দেখল, স্ক্রিনে উঠলো....তিতির কলিং...

অহনার ডাক নাম তিতির সেটা কাবেরী জানে। ফোনের দিকে তাকাতেই টুটাই ফোনটা আড়াল করে বললো, মা আমি একটু রেস্ট নেব। তোমার সঙ্গে পরে কথা বলি আবার। তবে তোমাদের ওই ব্যানার্জীদাকে ইমিডিয়েট জানিয়ে দাও, আমি এখন বিয়ে করবো না। কাবেরী দৃঢ় স্বরে বললো, সে না হয় জানিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তুই জেনে রাখিস, তিতির বা অহনা আর বসুবাড়ির বউ হয়ে আসবে না, আমি মানবো না এমন খামখেয়ালিপনা।

একবার যার জন্য এ বাড়ির সকলের মাথাটা নিচু হয়ে গেছে, আমি নিজে সকলের সামনে অপমানিত হয়েছি, তাকে আমি অন্তত মেনে নেব না টুটাই। কথাটা বলার সময় গলাটা একটু ধরে এলো কাবেরীর। বড্ড আশা করেছিল মেয়েটাকে নিয়ে। আশাভঙ্গের কষ্টটা এখন জেদে পরিণত হয়েছে।

টুটাই স্থির তাকিয়ে বলল, মা, আমি তো বললাম আমি এখন বিয়েই করবো না, প্লিজ।

কাবেরী বেরিয়ে এলো, এসেই দেখলো ঘরের সামনে অনু আর নীলাদ্রি দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত সবটা শুনেছে

Sahitya Chayan

ওরা। নীলাদ্রি বললো, তাহলে আর কি, ব্যানার্জীদাকে বারণ করে দিই। মাঝে মাঝে মনে হয়, এই বাড়িতে আমি ঠিক আছি কেন? কখনো স্ত্রীর কখনো ছেলের ইচ্ছে মত নিজেকে চালনা করার জন্যই কি আছি এবাড়িতে? নীলাদ্রি আর কোনো দিকে না তাকিয়ে ঢুকে গেলো নিজের ঘরে। অনু হালছাড়া গলায় বলল, কত আশা করেছিলাম, ধুর, শুভকে বলি ফেরার ব্যবস্থা করতে। আর ভালো লাগছে না।

কাবেরী একা দাঁড়িয়ে থাকলো লম্বা বারান্দার শেষ প্রান্তে। মনের মধ্যে একটাই প্রশ্ন, অহনা কেন ফোন করছে টুটাইকে? আর টুটাই বা সেটা লুকাচ্ছে কেন ওর কাছ থেকে! মনের মধ্যে এলোমেলো বেশ কিছু প্রশ্ন নিয়েই ধীর ধীরে এগিয়ে গেলো নিজের ঘরের দিকে। যাওয়ার আগেই শুনতে পেল, টুটাই ফোনে কাউকে বলছে, হ্যাঁ বলো....

নৈঋত বাইরেটা একবার ভালো করে দেখে নিজের ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলো। এই মুহূর্তে বাড়ির কেউ যে অহনাকে মেনে নেবার জন্য প্রস্তুত থাকবে না সেটা ও আগেই বুঝতে পেরেছিল। তাই আপাতত অহনা সম্পর্কে এ বাড়িতে একটা শব্দও উচ্চারণ করা যাবে না। উষ্ণ বাতাসকে লীনতাপ গ্রহণ করার সুযোগ দিতে হবে। আগে বাড়ির আবহাওয়া শীতল হোক তারপর না হয় ভাবা যাবে অন্য কিছু। ফোনটা কেটে গেছে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে, তাই মা বাইরে বেরিয়ে যেতেই ডায়াল করলো

Sahitya Chayan

নৈঋত। ওপ্রান্তে স্থির অকম্পিত গলায় অহনা বললো, পৌঁছে গেছো? বাড়ির কেউ তোমায় দোষারোপ করেননি তো? নাকি আমি ফোন করে বলবো, যে তুমি নির্দোষ। নৈঋত হেসে বললো, দয়া করুন মহোদয়া! এই অর্বাচীনের ওপরে এত করুণা বৃষ্টি হলে ডুবে যাবার সমূহ সম্ভবনা। আপাতত বাড়ির সবাই অহনা নামের সমার্থক হিসাবে হিরোসিমায় পড়া পরমাণু বোমাটার তুলনা করছে, তাই আপাতত নো ফোন কল। তাছাড়া তোমার পিতৃদেব ফোনে সব বলে দিয়েছে।

এখন বলতো, তুমি কি ওই ঘরেই সমাধিস্থ হয়ে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করবে নাকি? আঙ্কেল বললেন, তুমি নাকি আমি চলে আসার পর থেকেই আমার বিরহে শয্যা নিয়েছ? এগুলো কি ঠিক অহনা? আমার জন্য যদি এমন পাগলামি করো তুমি, তাহলে তো স্যারের সামনে আমার লজ্জা করবে? ধুর, তুমি এমন মিস করবে জানলে, আজ রাতটা তোমার ঘরেই থেকে যেতাম। বাংলা সিনেমার মত মাঝে পাশবালিশের দেওয়াল রেখে।

অহনা হো হো করে হেসে বললো, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রফেসরগুলোর জন্যই বোধহয় ছেলেগুলো এমন বিছুটি টাইপ হয়, এবারে বুঝতে পারছি।

অহনার প্রাণ খোলা হাসি শুনে নৈঋত বললো, যাক আমার প্রচেষ্টা বিফলে যায়নি। এবারে বিজু কাকাকে ডেকে শীতের সন্ধেতে এক কাপ গরম কফি আর হালকা স্ন্যাকস হয়ে যাক। দেখো অহনা, তুমি যদি না খেয়ে থাকো, তাহলে স্যার ভাববেন, তুমি আমার জন্য মনখারাপ করে

Sahitya Chayan

খাচ্ছ না, তুমি বোধহয় সত্যিই আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ! তখন হয়তো নেক্সট লগ্নে আমার সঙ্গেই জোর করে তোমার বিয়েটা দিয়ে দিল, বুঝতেই পারছো সেটা তোমার জন্য ভালো হবে না। তাই আপাতত তুমি আমার জন্য যতই পাগল হয়ে যাও, স্বাভাবিক গলায় বিজু কাকাকে ডেকে গুডগার্লের মত খেয়ে নাও।

জানি জানি, আমাকে দেখার পর থেকে তোমার ক্ষিদে ঘুম সব উড়ে গেছে, তোমার কষ্টটা আমি বুঝতে পারছি অহনা, তবুও আপাতত যন্ত্রণা ভুলে খেয়ে নাও।

অহনা হেসে বললো, নৌটঙ্কি! বেশ, আমি খেয়ে নিচ্ছি।

নৈঋত গলাটা গম্ভীর করে বললো, জানি তুমি তোমার সামনের কোনো একটা কাজ নিয়ে ভীষণ চিন্তিত, তাই হয়তো মুড ভালো নেই তোমার। তবে সাহসী হয়ে একটা কথা বলি, এসব অনুভূতি তোমার হচ্ছে না জানি অহনা, কিন্তু আরেকজনের হচ্ছে। তোমার কাছ থেকে চলে আসার পর থেকেই সেই অদ্ভুত অনুভূতির তাড়নায় বারবার দগ্ধ হচ্ছে সে। বিলিভ মি, ভালো লাগছে জানো, কষ্ট পেতে ভাল লাগছে। এমন ভাবে যে কাউকে অনুভব করা যায়, মিস করা যায়, তার জন্য কষ্ট পাওয়া যায়...আমার কোনো ধারণাই ছিল না। তাই এই চিনচিনে যন্ত্রণাটাকে আমি উপভোগ করছি মন দিয়ে। মনখারাপি বাতাসটাকে নির্দেশ দিয়েছি, আমায় বুঝিয়ে দিয়ে যাস, ভালোবাসা আপেক্ষিক নাকি দীর্ঘস্থায়ী।

অহনা, প্লিজ, নিজেকে দোষী ভেবো না, এটা ডেস্টিনি। হয়তো আমার কপালে লাভ ম্যারেজ আছে, অ্যারেঞ্জড

Sahitya Chayan

ছিলো না। তাই ভেঙে গেছে। আরেকটা কথা, তোমার মাকে একটা কল করো। আমি বাড়ি ফিরে বুঝেছি সকলেই আমাদের বড্ড ভালোবাসে গো। হয়তো জেনারেশন গ্যাপের জন্য কিছু মতপার্থক্য হয়, কিন্তু ভালোবাসার কমতি হয় না তাতে। তাই কফি খেতে খেতে মাকে ফোন করো। আর যদি না খাও, বুঝবো তুমি আমায় বড্ড মিস করছো!

অহনা বললো, বলে বলে যে পোড়ো বাড়িকে ভূতুড়ে বাড়ি বানানো যায়, তোমায় না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না নৈঋত। আমি উঠলাম, তোমায় মিস করার থেকে বিজুকাকার তেল চপচপে বেগুনি অনেক নিরাপদ।

নৈঋত হেসে বললো, প্রয়োজনে কল করবে কিন্তু, কথা দিয়েছিলে।

অহনা বললো, যদি কখনো ডিপ্রেশন নামক অসভ্য রোগটা ধারেকাছে ঘেঁষতে চায়, অবশ্যই তাকে তাড়াতে ডাকবো তোমায়। ভালো থেকো নৈঋত।

ফোনটা কেটে দিয়েছে অহনা। নৈঋত ল্যাপটপ খুলে দেখছিলো রিপোর্টার অহনার পালের রিপোর্টিং ভিডিওগুলো। আর মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিল অহনার মুখের দিকে। কতক্ষণ কেটে গেছে কে জানে! হঠাৎই তুতানের ডাকে চমকে উঠলো নৈঋত। তুতান শান্ত স্বরে বললো, দাদাভাই লড়ে যা, আমি তোর পাশে আছি। হবু বৌদিভাইকে এবাড়িতে আনতেই হবে। তুতানের মাথায় হালকা করে একটা গাট্টা মেরে বললো, জানিস তুতান, ভাগ্যিস অহনার সঙ্গে আমার বিয়েটা ভেঙে গেল, তাই

Sahitya Chayan

তো আমি ওর প্রেমে পড়ে গেলাম। বিয়েটা যদি নির্দিষ্ট সময়ে হয়ে যেত তাহলে তো সম্পর্কের ঘেরাটোপে আর কর্তব্যের বেড়াজালে পড়ে গিয়ে ভালোবাসার প্রবেশ পথটা বন্ধ হয়ে যেত। এখন বরং অপেক্ষা আছে, আগ্রহ আছে, পাবার আকুতি আছে...আর এগুলো আছে বলেই ভালোবাসা নামক মহামূল্যবান অনুভূতিগুলো এসে ধরা দিচ্ছে আমার কাছে। তাই জেদ নয়, জিতে নেওয়ার লড়াইটা চালিয়ে যাবো আমি। তুতান হেসে বললো, দাদাভাই তোকে বড্ড নতুন লাগছে রে।

টুটাই মুচকি হেসে বললো, মনে হচ্ছে অহনা নামক নতুন ব্রান্ডের পারফিউমের সাইড এফেক্ট বুঝলি! তুতান বললো, দাদাভাই তুই আপসেট নোস দেখে আমি খুব খুশি হলাম রে। তোকে বিন্দাস মুডে দেখতেই অভ্যস্ত আমার চোখ দুটো, তাই ভয়ে ছিলাম, আপাতত নিশ্চিন্ত হলাম। এগিয়ে চল বন্ধু.... ঐতিহাসিক প্রেম তোমার অপেক্ষায় কমরেড। টুটাই বললো, বড্ড পেকেছিস দেখছি। তোর একটাই কাজ, গোটা বাড়ির সকলকে কনভিন্স করানো যে দাদাভাই নিড সাম টাইম। তাই এখন যেন ব্যানার্জীদার শালার মেয়ে, মুখার্জীদার বোনঝি এসব ঝঞ্ঝাট নিয়ে যেও না দাদাভাইয়ের সামনে। তাহলে হয়তো বিয়ে নামক শব্দটাকেই ভয় পেতে শুরু করবে দাদাভাই। বুঝলি, এটা বোঝানো তোর কাজ।

তুতান মুচকি হেসে বললো, ডোন্ট ওরি ব্রো, তোমার লক্ষ্মণ ভ্রাতা এখুনি কাজে বহাল হয়ে গেল। দায়িত্ব আমার। তুমি নিশ্চিন্তে দুর্গ ভেদ করার প্রচেষ্টা জারি রাখো।

Sahitya Chayan

।।২৭।।

বাবাই, তোমার কি মনে হয় একটা ফোন করলেই দুর্গ ভেদ করা যাবে? ভোরে উঠে আজও মর্নিং ওয়াকে যাওয়া হয়নি অনিরুদ্ধর। বাগানের ভিতরেই পায়চারি করছিল। তিতিরের গলায় চমকে উঠে বললো, কিসের দুর্গ তিতির? আর তুই এত ভোরে উঠেছিস কেন রে? ঠান্ডায় বেরিয়েছিস, গায়ে কিছু চাপিয়েছিস?

তিতির হেসে বললো, বাবাই মাঝে মাঝে আমার অবাক লাগে, তোমার ঠিক কি মনে হয় আমায়? আমি এখনো বাচ্চা আছি? তুমি জোর করে বৌটুপি পরিয়ে দিলেই পরে থাকবো? অনিরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, তুই যে কেন এত দ্রুত বড় হয়ে গেলি! তুই যদি ধীরে ধীরে বড় হতিস তাহলে আমিও এত তাড়াতাড়ি বুড়ো হতাম না। তাহলে আরও বেশ কিছুদিন তোর মা আমার দিকে নজর দিতো, বুড়ো হয়ে গেলাম বলেই না আর ফিরে তাকায় না! অনিরুদ্ধর গলায় মজার ছোঁয়া। মেয়ের সঙ্গে যখন অনি সময় কাটায় তখন মনেই হয় না এই মানুষটাই নামি সাংবাদিক, গোটা বিশ্ব তাঁর ঘোরা, নামি দামি সমস্ত ক্রিকেটারদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন অবলীলায়। গাম্ভীর্যের আড়ালের আসল মানুষটাকে তো খুঁজে পাওয়া যায় যখন তিতির সামনে থাকে। মেয়ে সামনে থাকলেই অনিরুদ্ধর গাম্ভীর্যের মেকি মুখোশ যায় খসে, তখন সে একেবারে দিলখোলা। তিতির আবার বললো, কি গো, দুর্গে কি এত সহজে প্রবেশ করা যাবে বলে তোমার মনে হয়? মানে ফোন করলেই ধরবে তোমার স্ত্রী?

Sahitya Chayan

অনিরুদ্ধ বললো, কাঠিন্য দেখলেই আমার স্ত্রী, আর আদরের সময় তো ম্যা ম্যা করে যাস তার বেলা? তিতির অন্যায়টা অন্যায়, সেটাকে আমিও সমর্থন করতে পারবো না। তুই যেটা করেছিস তারপর যদি সুচেতা তোকে ত্যাজ্য কন্যা করে আমার অন্তত কিছু বলার নেই। ফোন তুই করতেই পারিস, কথাটা বলেই তাকালো তিতিরের দিকে।

তিতিরের চোখ দুটো বেশ লাল। ভোরের ধোঁয়া ধোঁয়া আলোতেই সেটা দেখতে পাচ্ছে অনিরুদ্ধ। বাগান থেকে উঠে এসে তিতিরের কপালে হাত ছুঁইয়ে বললো, জ্বর এলো কখন রে? তিতির ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, এসেছে হয়তো, নাথিং সিরিয়াস। আসলে তোমার শ্রীমতি আমার ফোন রিসিভ করছেন না। আমি কাল রাতেও কল করেছিলাম। এখনও একবার করলাম, তিনি রিসিভ করলেন না, কোনো উপায় জানা থাকলে হেল্প করো।

অনিরুদ্ধ হেসে বললো, আপাতত আমিই তার আদালতে সব থেকে বড় অপরাধী। আমার কথা কি সে মানবে? তবুও দেখি চেষ্টা করে। শ্যামল তো বেরিয়ে গেছে কোন ভোরে, তোর মা আজ কলকাতা ব্যাক করবে বলেছিল।

এখন বোধহয় রাস্তায় আছে। অনিরুদ্ধ ফোনটা নিয়ে ডায়াল করলো সুচেতার নম্বরটা।

বেরিয়ে পড়েছো? সুচেতা একটু জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বললো, রাইগঞ্জের বাড়িটা দাদাকে স্ট্যাম্প পেপারে দানপত্র করে দিলাম। চুকিয়ে দিলাম ওবাড়ির সঙ্গে সবটুকু

Sahitya Chayan

লেনাদেনা। তুমি তো এটাই চেয়েছিলে তাই না অনি এতকাল? অনিরুদ্ধ স্থির গলায় বলল, হ্যাঁ চেয়েছিলাম। কারণ যে বাড়িতে তোমায় অসম্মানিত করা হয়েছিল, আমাকে অপমানিত করা হয়েছিল সে বাড়িতে তুমি আমার মেয়েকে নিয়ে বারবার ছুটি কাটাতে যাও এটা আমি চাইনি! এটাও কি আমার অপরাধ বলে গ্রাহ্য হবে সুচেতা? যাক এসব কথা। তিতিরের বোধহয় জ্বর এসেছে। ওর তো সব ওষুধ সুট করে না, কোন ওষুধ দাও ওকে জ্বর এলে?

সুচেতা অনিরুদ্ধকে কোনো উত্তর না দিয়েই বললো, শ্যামল, সূর্যপুর চলো। গাড়িটা ঘোরাও।

গজগজ করে বললো, এত আহ্লাদে জ্বর এসে গেল? জ্বরের আর দোষ কি, সে তো জানেই চূড়ান্ত অপরাধের পরেও তাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে, তাই আহ্লাদী শরীরে গিয়ে বাসা বেঁধেছে। তা তোমার রাজকুমারী কি এখনও ঘুমাচ্ছেন?

অনিরুদ্ধ গম্ভীর গলায় বলল, না ঘুমাতে পারেনি, চোখ লাল হয়ে রয়েছে। সুচেতা বললো, প্যারাসিটামল দিও না। ওর কাজ হয় না। ওষুধ আমার সঙ্গে আছে, আমি গিয়ে দিচ্ছি। আমি সবে নীলপুর পেরোচ্ছিলাম, পৌঁছে যাব খুব তাড়াতাড়ি। অনিরুদ্ধ ফোনটা কেটেই মুচকি হেসে বললো, চল ট্রিট দে। শোন ঔরঙ্গজেব কয়েক বছর চেষ্টা করেও গোলকুন্ডা ফোর্টে ঢুকতে পারেননি আর তুই মাত্র কয়েক সেকেন্ডে আমার দ্বারা ওই দুর্গের দরজা ভেদ করে ফেললি। তো ট্রিট তো বানতা হ্যায় রিপোর্টার! তোর মা

Sahitya Chayan

আসছে এখানে। বিজু মহারাজকে বলে রাখি বৌদিমণির পায়ের ধুলো পড়ছে, আজ যেন মাছের মাথা দিয়ে ডাল আর শুক্তোটা অন্তত করে। তিতির হেসে বললো, বাবাই, তোমাদের মধ্যে এখনো এত ভালোবাসা অবশিষ্ট আছে তাও কেন তোমরা আলাদা থাকছো বলবে? ওই কয়েকটা চিঠি আমার দেখে ফেলায় কি এমন বদলে গেল যে এমন একটা সিদ্ধান্ত নিতে হলো? অনিরুদ্ধ ধরা গলায় বলল, সিদ্ধান্ত আমি নিইনি তিতির, তুই আর তোর মা নিয়েছিস। আমি তো হাঁপিয়ে উঠেছিলাম তোদের ছাড়া ওই ফ্ল্যাটে থাকতে। তাই কাজ কর্ম ছেড়ে বাধ্য হয়ে এই বাড়িতে এসে লুকিয়ে আছি। এই বাড়িটা করার সময়েও তোর মায়ের ইন্সট্রাকশন মতই সামনে বড় বাগান, লন এসব করা হয়েছিল। ঘরের রংও ঠিক করেছিল তোর মা। ছুটিতে ছাড়া আসাই কম হয়েছে বলে তোর মায়ের স্মৃতি এখানে একটু হলেও কম আছে। তাই হয়তো থাকতে পারছি। কোলকাতায় তো সেই বিয়ের আগে থেকে ওই ফ্ল্যাটের দায়িত্ব তোর মা-ই নিয়েছিল। ওটা নামে মাত্র আমার ফ্ল্যাট, আসলে ওর সবটুকু তোর মায়ের সাজানো। পরে তোর মায়ের ইচ্ছে হয়েছিল, নিজের চাকরির টাকায় একটা ফ্ল্যাট কিনে রাখবে, তাই অন্যটা কিনেছিলো। ওটাতে কোনোদিন থাকবে এমন প্ল্যান কিন্তু ছিল না। হঠাৎ আমি এতটাই অপরাধী হয়ে গেলাম, যে তোর মা আমার সঙ্গে থাকতে পারছিল না। তাই তোরা চলে গেলি ওখানে। তিতির বললো, বাবাই আমি বাধ্য হয়েছিলাম। রোজ রোজ ওই একই ইস্যুতে ঝগড়া আমার আর ভাল

Sahitya Chayan

লাগছিলো না। আমি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তারপরে ওই চিঠিগুলোর মধ্যে দিয়ে যে হাজার হাজার প্রশ্নের জন্ম হয়েছিল আমার মনে সেগুলোর কোনটারই সদুত্তর তোমরা আমায় দাওনি। যাইহোক, সে উত্তর আমি খুঁজে নেব। তবে তোমাদের সমস্যাটা যদি এই উপলক্ষ্যে মিটে যায় তাহলে আমি খুব হ্যাপি হবো বাবাই। যাও যাও একটু সেজেগুজে নাও, প্রায় মাস দুয়েক পরে তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে তোমার সুচেতার, একটু সাজগোজ তো করা উচিত। অনিরুদ্ধ হেসে বললো, আগে তোর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার দিন আমি খুব কনফিউজড থাকতাম, কি রঙের শার্ট পরবো এই নিয়ে! কি সব পাগলামিতে ভরা দিন ছিল রে। কলেজস্ট্রিট, প্রেসিডেন্সি ক্যাম্পাস, তোর মার সঙ্গে দেখা করার উন্মাদনা....আমার কেরিয়ারের উঠতির দিক, তাই কাজের প্রেশারও থাকতো, তবুও দিনের শেষে একরাশ পাওয়াতে মনটা ভরে উঠতো। আসলে সেই সময়ের সুচেতাকে আর কোনোদিনই খুঁজে পেলাম না। পেলাম না নিজের একটা ছোট্ট ভুলে। তাই সুচেতাও সারাজীবন মানিয়ে নিয়েছে, ক্ষমা করেনি আমায়, আমি নিজেও ক্ষমা করতে পারিনি নিজেকে। বাঁধন ছিল, কর্তব্য ছিল, ভালোবাসাও ছিল শুধু মিসিং ছিল উচ্ছ্বাস, তাই পানসে চায়ের মত টেস্ট হয়ে গিয়েছিল আমাদের বিবাহিত জীবনটা। তুই ছিলিস আমাদের দুজনের সেতু। তোর জন্যই আমরা কাছে থাকতাম একে অপরের। আজও তোর জন্যই তোর মায়ের সঙ্গে এতদিন পরে দেখা হবে আমার। তিতির, বাবা হিসাবে একটাই কথা বলবো,

Sahitya Chayan
জীবনে যত বড় সত্যের সম্মুখীনই হোস না কেন, নিজেকে ভালোবাসাটা কমিয়ে দিস না। নিজেকে যদি উজাড় করে ভালোবাসতে পারিস, তবেই অন্যকে আপন করতে পারবি। নিজেকে কখনো ঘৃণা করবি না। জানবি তোর থেকে আপন তোর কেউ নেই। তাই সেই আমিটাকে আঁকড়ে ধরবি, দেখবি ওই এলোমেলো অগোছালো একান্ত আপন আমিটা কখনো তোকে ছেড়ে যাবে না। তাই অহনা নামক আমিটাকে আগলে রাখবি নিজের মধ্যে, একে কখনো অবহেলা করবি না।

বিজু এসে ট্রেটা রাখলো। দু-কাপ ব্ল্যাক কফি। তিতিরও দুধ কফি তেমন ভালোবাসে না, আর অনি তো খায় না। বিজুকে দেখে অনিরুদ্ধ বললো, এই যে বিজু মহারাজ, কদিন তো নাকে কাঁদছিলে, এ বাড়িতে নাকি ভূতের মত পড়ে থাকো। কেউ আসে না। আমি একমাস আছি, তাতেও নাকি তোমার ভরাট লাগছিলো না বাড়িটা। এবারে নাও, তোমার বৌদিমনি আসছেন। দিদিমণি তো আগেই এসে হাজির। লেগে যাও খাতির যত্নে। বিজু, একটা কথা বলতে ভুলেই গেছি, মাছের মাথা দিয়ে ডাল আর শুক্তো এই দুটো যেন রেখো মেনুতে। আর শোনো ডালে যেন ঝাল দিও না, সুচেতা ডালে ঝাল একেবারেই পছন্দ করে না। আমি খেতাম বলে মেনে নিতো।

তিতির তাকিয়ে দেখছিল তার চেনা বাবাইটাকে। বাইরে মারাত্মক রাশভারী আর ভিতরের ছেলেমানুষ মানুষটাকে তিতির শুধু ভালোবাসে না, সম্মান করে অনেক বেশি।

Sahitya Chayan

চাটা খেতে খেতেই বারদুয়েক ঘড়ির দিকে তাকালো অনিরুদ্ধ। একটু যেন অস্থির লাগছে ওকে। তিতির বললো, তুমি তো এমন ছটফট করছো যেন ফার্স্ট ডেটিং করছো। উফ, তোমাদের একটা বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে, সেটাও ভুলে গেলে নাকি প্রেমের জোয়ারে!

যাক গে, শোনো আমি এখুনি বেরোবো। জ্বরের ওষুধ আমি অলরেডি নিয়ে নিয়েছি। তোমার গিন্নির সঙ্গে আপাতত আমার দেখা হচ্ছে না। তাকে দিন দুই স্টে করতে বলো, আমি ফিরে সম্মুখীন হবো তার। এখন দেখা হলেই ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইলের শিকার হবো, তারপর আমার সব প্ল্যান মাঠে মারা যাবে।

অনিরুদ্ধ বললো, তুই চলে যাবি মানে? মজা নাকি রে? তোর মা এসে আমায় জ্যান্ত চিবিয়ে খেয়ে নেবে। তিতির হেসে বললো, আমি মাকে বলে দেব তুমি মাকে তারকা রাক্ষসী বলেছো।

অনিরুদ্ধ উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, তিতির তোর গায়ে জ্বর, এভাবে তুই যাবি না প্লিজ। আর শোন, তোর ওসব ভুলভাল প্রশ্নের উত্তর দুদিন পরে খুঁজতে গেলেও মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। বিয়েটা তো আপাতত ভেঙেই দিয়েছিস, তাই তোর হাতে অঢেল সময়।

তিতির একটু অন্যমনস্ক ভাবে বললো, নেই বাবাই, সময় বড্ড কম। মাত্র সাতদিন। বিয়ের জন্য যে ছুটিটা নেওয়া ছিল ঐটুকুই। আটদিনের দিন আমায় অফিস জয়েন করতে হবে মাস্ট। নাহলে চ্যানেল ছেড়ে কথা বলবে না।

Sahitya Chayan

তাছাড়া আমার নিজেরও প্রচুর কাজ পেন্ডিং, অ্যাসাইনমেন্ট ফুলফিল করতে হবে। তাই এই পাঁচদিন আমি বাড়িতে বসে নষ্ট করতে পারবো না। আমার ব্যাগ গোছানো কমপ্লিট। আমি একটু টিফিন খেয়েই বেরিয়ে যাবো। ইনফ্যাক্ট মা এন্ট্রি নেবার আগেই। তাই আপাতত উঠলাম, তুমি তোমার প্রেমিকা, তথা গিন্নি তথা ঝগড়া সঙ্গিনীর সঙ্গে টাইম স্পেন্ড করো।

অনিরুদ্ধ বিস্মিত হয়ে বলল, ব্যাগ নিয়ে কোথায় যাবি? মানে কদিনের জন্য যাচ্ছিস? আরে কিছু উত্তর তো আমিও ডিজার্ভ করি নাকি? তিতির স্পষ্ট গলায় বলল, না করো না। আমার ফোনে গত দশদিন ধরে মেসেজ এসেছে, চিরকুট পেয়েছি বিয়ের রাতে, তোমায় লেখা মায়ের চিঠিতে পেয়েছি কিছু অসঙ্গতি, মানসিক দ্বন্দ্বে শেষ হয়েছি আমি প্রতিনিয়ত... এত কিছুর উত্তর যখন আমি পাইনি, তখন তোমরাও কোনো উত্তর ডিজার্ভ করো না। তিতির উঠে চলে গেল নিজের ঘরে। যাওয়ার সময় বেশ জোরেই বলে গেল, বিজু কাকা, টোস্ট দিয়ে যেও আমার ঘরে। আমি বেরোবো, কুইক।

অনিরুদ্ধ জানে সুচেতা এসেই আক্রমন করবে ওকে, কেন ও তিতিরকে যেতে দিলো? কিন্তু ও জানে তিতির এমন একটা মেয়ে যাকে আটকে রাখা যায় না। ও অপ্রতিরোধ্য। লুকিয়ে রাখতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। যেমন সুচেতার লুকানোর জন্যই ভেঙে গেল বিয়েটা। সত্য খুঁজতে মেয়েটা বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

Sahitya Chayan

তিতিরের প্রশ্নের উত্তরগুলো হয়তো দিতে পারতো অনিরুদ্ধ, কিন্তু তাতে সুচেতাকে হারাত আজীবনের মত। তাই নিরুপায় হয়েই চুপ করে আছে। তিতিরের ফোনে কারা কি ধরনের মেসেজ পাঠাচ্ছে সেগুলোও দেখালো না তিতির! তবে অনিরুদ্ধর ভাবনা যদি সত্যি হয় তাহলে এই পৃথিবীতে এখনো ওর শত্রু বেঁচে আছে, তাকে যদি তিতির খুঁজে বের করে শাস্তি দিতে পারে, তাহলে মেয়েটার বাকি জীবনটা অন্তত নিশ্চিন্তে কাটবে। তিতির বেরিয়ে গেলেই একবার অভিরূপ স্যান্যালকে কলটা করে রাখতে হবে। অভিরূপের সোর্স দরকার হতে পারে অনির। তিতির হয়তো অভিমানে মুখ ফিরিয়ে আছে, কিন্তু বাবা হিসাবে ওকে দূর থেকে প্রটেক্ট করা ওর কর্তব্য। অভিরূপকে তিতিরের ফোন নম্বর আর ছবি সেন্ড করে রাখবে। যাতে ওরা ট্র্যাক করতে পারে। অনিরুদ্ধর এবারে বেশ চিন্তা হচ্ছে, তিতির কোনো ফাঁদে পড়তে চলেছে মনে হচ্ছে! কিন্তু সেই ছোট্ট থেকে মেয়েকে দেখেছে অনি, কোনো বিষয়ে যদি ওর মনে প্রশ্ন তৈরি হয় তাহলে ও সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ঝুঁকি নেবেই। মেয়েকে চেনে বলেই, সুচেতাকে বলেছিল বিয়েটা বছর খানেক পরে দাও। কোনো কারণে তিতির একটু চঞ্চল আছে এখন, তাই টাইম চাইছে। শোনেনি সুচেতা, জেদ করেই ডেট ফাইনাল করেছিল। এখন যদিও অনিই দোষী হয়েছে। অনিই নাকি তিতিরের মনে ওসব ভুলভাল প্রশ্নের বীজ বপন করার মূলে রয়েছে। কোনটা ভুল করেছে অনি? তিতির যখন সুচেতার চিঠি সামনে এনে জিজ্ঞেস করেছিল,

Sahitya Chayan

বাবাই এগুলো কি মায়ের লেখা চিঠি? তখন অনি বলেছিল হ্যাঁ। তিতিরের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল মায়ের চিঠিতে এসব কি লেখা আছে বাবাই? এগুলো কি সত্যি? মানে এমন সব ধোঁয়াশা কেন? অনি ঘাড় নেড়ে বলেছিল, হ্যাঁ সত্যি। তবে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর আমি তোকে দিতে পারব না, আমায় ক্ষমা করিস।

সুচেতা ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে অবিশ্বাস শুরু করেছে অনিরুদ্ধকে। ওর ধারণা অনিই নাকি তিতিরের মাথায় এসব প্রশ্নের বীজ বপন করেছে। অনিরুদ্ধ তো জানতেই পারেনি তিতিরের ফোনে কেউ এ বিষয়ে মেসেজ পাঠিয়েছে! সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই তিতির অনির পারসোনাল আলমারির ফাইল পত্র ঘেঁটে বের করেছিল।

মেসেজগুলো কে পাঠাতে পারে! অনির প্রফেশনাল কোনো শত্রু? নাকি তিতিরের কোনো কম্পিটিটর?

তিতির রেডি, পিঠে ব্যাগ নিয়ে জুতো পরতে পরতে বললো, বাবাই আসছি। ডোন্ট ওরি, প্রতিবারের মত এবারেও আমি জিতবো।

বেরিয়ে গেল তিতির, ঠিক কোথায় গেল তাও বলে গেল না।

সুচেতা ঢুকবে এখুনি, ঠিক কি উত্তর দেবে ওকে, সেটা নিয়েই অস্বস্তি হচ্ছে ওর। সুচেতা আবার ভুল বুঝবে অনিকে।

হ্যালো অভিরূপ? সকাল সকাল বিরক্ত করছি বলে সরি। আমায় একটা খোঁজ দিতে পারবে, পীযুষ বিশ্বাস, রাইগঞ্জ, নীলপুর অঞ্চলের বাসিন্দা, রঙের মিস্ত্রি....হ্যাঁ

Sahitya Chayan

একবার ইভ টিজিংয়ের জন্য অ্যারেস্টও হয়েছিল, এখন ঠিক কোথায় আছে বা কি করছে? একটু আর্জেন্ট অ্যান্ড পার্সোনাল, প্লিজ একটু তাড়াতাড়ি আমায় খবরটা দিতে পারবে?

অভিরূপ বললো, নিশ্চয়ই স্যার, আমি তোমার ফ্যান ছিলাম বরাবর, তাই এটুকু উপকার তো করতেই হবে। সে তোমাদের হাউজ যতই আমাদের কাজের সমলোচনা করুক। অভিরূপকে এই জন্যই এত ভালো লাগে অনিরুদ্ধর। মানুষটার মধ্যে একটা স্বচ্ছ মানসিকতা আছে।

অভিরূপকে কলটা শেষ করতেই বাইরে গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। প্রমাদ গুনলো অনি, সুচেতা যদি এসে দেখে তিতির নেই, কি যে হবে!

।।২৮।।

রেজিস্ট্রারের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে অনিকের। খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে দেবেন বলেছেন। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে না ওদের। প্রিয়াকে কলটা করতে হবে, ভেবেই ফোনটা পকেট বের করলো অনিক। প্রিয়ার মা মানুষটিকে অনিকের বড্ড পছন্দ হয়েছে। আন্টি ভীষণ বুদ্ধিমতী মানুষ। মহারানির মত অবুঝ নয়। যাক শেষপর্যন্ত যে মায়ের সঙ্গে বেনারসি কিনতে এসেছিলেন মহারানি তাতেই অনিক ধন্য। যা গোঁয়ার মেয়ে, এখুনি হয়তো বলে বসবে, করুণা করে বিয়ে করছিস, করবো না আমি বিয়ে। অনিক কি করে বোঝাবে প্রিয়াকে, ওকে যেদিন প্রথম দেখেছিলো অনিক সেদিন একটা কথাই মনে হয়েছিল, শ্যামলা রঙের রোগা রোগা অতি সাধারণ মেয়েকেও

Sahitya Chayan

সুন্দরী বলা চলে। কারণ সৌন্দর্য শব্দটাও উৎপত্তি হয় মানুষের অন্তরে। প্রিয়াকে ছাড়া যে অনিক ভীষণরকমের একা এটাও বোঝে না মেয়েটা। ধুর, বুঝতে হবে না প্রিয়াকে কিছু, আন্টি তো বুঝছে অনিক ওই পাগলীটাকে কতটা ভালোবাসে। তাই তো আন্টি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সেদিন ওদের বিয়ের ড্রেস কিনে দিয়েছেন। ফোনটা বের করে কল করতেই যাচ্ছিল প্রিয়াকে। সকাল থেকে কোনো মেসেজ করেনি মেয়েটা, ঘড়ির কাঁটা সকাল এগারোটার দিকে ছুটছে। প্রিয়াকে ফোনটা করার আগেই প্রিয়ার নম্বরটা স্ক্রিনে ফুটে উঠলো। ঠোঁটের কোণে হাসির ঝলক দেখা দিল অনিকের। ফোনটা রিসিভ করেই বললো, শোন না, গুড নিউজ আছে প্রিয়া। প্রিয়া উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, আমারও ভালো খবর আছে তোকে দেবার জন্য। তুই আগে বল। অনিক বললো, আগামী পরশু আমাদের রেজিস্ট্রি হবে। প্রিয়া উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, আমার পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে জবটা হয়ে গেল অনিক। এখুনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেলাম। অনিক প্রায় চিৎকার করে বললো, রিয়েলি? চল আজই ফ্ল্যাট বুক করবো। আমি খবর নিয়েছি, রাইগঞ্জে আশ্রয় কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে। চল দেখে আসি কালকে। প্রিয়া বললো, ডান। অনিক হাসতে হাসতেই বললো, পীযুষ বিশ্বাস হেরে গেল প্রিয়া তোর জেদের কাছে।

প্রিয়া কি বললো শোনার আগেই আরেকটি কণ্ঠস্বর কানে গেল অনিকের, পীযুষ বিশ্বাসকে আপনি চেনেন? কালিয়াগঞ্জ স্টেশন থেকে নেমে একটি চায়ের দোকানের

Sahitya Chayan

সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল অনিক। অফিসে সেকেন্ড হাফের আগে পৌঁছাতে পারবে না আজ। রেজিস্ট্রি অফিসে কিছু লাস্ট ডকুমেন্টস জমা দেবার ছিল। সেগুলো দিয়ে স্টেশনের দিকে এগোচ্ছিল ও। পিছন ঘুরে দেখলো, খুব পরিচিত একটা মুখ, কোথায় দেখেছে মনে করতে পারছে না অনিক, কিন্তু খুব চেনা লাগছে মেয়েটাকে। প্রিয়া ফোনের অন্যপ্রান্তে আছে ভুলে গিয়েই বললো, কোন পীযুষ বিশ্বাস?

মেয়েটা বললো, কোনো রঙের মিস্ত্রি বা এই টাইপ কাজ করে এমন কেউ আছে কালিয়াগঞ্জে? চেনেন?

প্রিয়া ওদিক থেকে হ্যালো হ্যালো করে চেঁচিয়েই যাচ্ছে, এদিকে অনিক আপ্রাণ মনে করার চেষ্টা করে চলেছে, এই মেয়েটাকে ও কোথায় দেখেছে। অবশেষে মনে পড়লো, টিভি চ্যানেলে দেখেছে। রিপোর্টার। অনিক বললো, আপনি তো রিপোর্টার তাই না? অহনা হেসে বললো, হ্যাঁ ভাই, আমি অহনা পাল। রিপোর্টার অফ ওয়েলকাম ইন্ডিয়া। অনিক ফোনটা কানে চেপে ধরে বলল, প্রিয়া কোনো একজন রিপোর্টার এসেছেন তোর বাবার খোঁজে, কি বলবো?

প্রিয়া একটু থেমে বললো, ওনাকে স্টেশনে ওয়েট করতে বল, আমি দশ মিনিটে আসছি। বাপ নামক জানোয়ারটা কোথাও নিশ্চয়ই গুল খেলে রেখেছে, নাহলে রিপোর্টার কেন আসবে। দাঁড়া আমি আসছি। বাবার নামে আরও কেলেঙ্কারি রটলে তোর বাড়ি থেকে কিছুতেই আমায় মেনে নেবে না। তার আগেই থামাতে হবে

Sahitya Chayan

মহিলাকে। একটু ওয়েট করতে বল ওনাকে। অনিক বললো, ওকে, তুই আয় আমি আছি। অহনা বেশ ক্যাজুয়াল গলায় বলল, পীযুষ বিশ্বাসের মেয়ে আসছেন নাকি? তাহলে চা খাওয়া যেতেই পারে। রিপোর্টারদের নো টি টাইম, ব্রেক পেলেই আমরা সেটাকে টি টাইম করে ফেলি।

অনিক আর অহনা বসলো একটা বেঞ্চে। চা হাতে নিয়ে অনিক বললো, যদি কিছু না মনে করেন তাহলে একটা প্রশ্ন করবো? পীযুষ বিশ্বাসকে খুঁজছেন কেন? অহনা চায়ে চুমুক দিয়ে বললো, দাদা আপনাদের এখানে কি রেশনে বস্তা বস্তা চিনি দেয় নাকি? উফ, এত শরবত বানিয়েছেন। আপনি আমাকে আরেক কাপ চিনি ছাড়া চা বানিয়ে দিন। হ্যাঁ, কি যেন নাম আপনার? অনিক প্রজাপতি বিস্কিটে কামড় দিয়ে বললো, অনিক। হ্যাঁ অনিক, আসলে পীযুষ বিশ্বাস লোকটা সম্পর্কে আমার কিছু তথ্য দরকার। মানে লোকটার পাস্ট লাইফ সম্পর্কে। অনিক একটু ভেবে বললো, সে আমি আপনার উপকার করতেই পারি কিন্তু বিনিময়ে একটা জিনিস চাইবো। পীযুষ বিশ্বাসকে যাই করুন ওর মেয়ের গায়ে কোনো আঁচ লাগবে না। অহনা মুচকি হেসে বললো, ফিঁয়াসে? অনিক লাজুক মুখে বললো, উডবি। তবে ম্যাম আপনি একেবারেই ভাববেন না, প্রিয়া বা দীপশিখা আন্টির সঙ্গে পীযুষ বিশ্বাসের কোনো মিল আছে। ওরা খুব ভালো, কিন্তু প্রিয়ার বাবা ওদের মারে, গালাগাল দেয়। ওই লোকটাই প্রিয়ার জীবনের অভিশাপ। অহনা বললো, এখন বলতো

Sahitya Chayan

অনিক, এই অঞ্চলের পুরোনো লোক কে আছে? যার কাছ থেকে আমি পীযুষের সব খবর পাবো? কথাটা শেষ হবার আগেই সাইকেল থেকে নামলো একটা অতি সাধারন চেহারার মেয়ে। যার পোশাকে বা চেহারায় নিম্নমধ্যবিত্তের চিহ্ন। স্কিনটাও শুষ্ক, জেল্লাহীন। তবে রোগা রোগা মুখে দুটো অদ্ভুত মায়াবী চোখ। চোখে একরাশ সাহসী চাউনি। জোরে সাইকেল চালিয়ে এসেছে বলেই হয়তো একটু হাঁপাচ্ছে। অনিক বললো, প্রিয়া ইনি হলেন রিপোর্টার অহনা পাল।

প্রিয়াঙ্কা হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গি করে বললো, আপনি ঠিক কি কারণে এসেছেন বাবার খোঁজে? অহনা চায়ের দাম মিটিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর বলল, একটু কনফিডেন্সিয়াল, আমি কি তোমায় বিশ্বাস করতে পারি প্রিয়াঙ্কা?

প্রিয়া গজগজ করে বললো, বলেছিলাম না অনিক, ও হারামি আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না। আমি আজ জব পেলাম, পরশু আমাদের রেজিস্ট্রি এসব হতেই দেবে না শান্তিতে। শোন বিয়ের আগেই এই জানোয়ারটাকে খুন করে দেব আমি, নাহলে এ আমাদের সংসার করতে দেবে না রে। আজ রিপোর্টার, কাল পুলিশ....শালা শুয়োরের জাতটাকে বাবা বলে পরিচয় দিতেই ঘেন্না হয় আমার। অনিক প্রিয়ার হাতটা চেপে ধরে বলল, কুল ডাউন। উনি কি বলতে চাইছেন আগে একটু শুনে নে।

অহনা, প্রিয়া আর অনিক একটা অমলতাস গাছের নিচে বাঁধানো বেদিতে বসলো। গ্রীষ্মকালে গাছটা হলদে

Sahitya Chayan

ফুলে ছেয়ে থাকে। গ্রামের দিকে লোকজন বলে বাঁদর লাঠি। কিন্তু কবিগুরুর দেওয়া নাম যেহেতু অমলতাস তাই অহনা ওই নামেই ডাকে গাছটাকে। প্রিয়া সামলে নিয়ে বললো, সরি ম্যাডাম, স্ল্যাং ইউজ করতে চাই না, কিন্তু ওই লোকটার নাম শুনলেই জিভের ডগা দিয়ে এসব শব্দই বেরিয়ে আসে। দুর্ভাগ্যবশত স্কুলে, কলেজে অভিভাবকের জায়গায় এই লোকটার নাম লিখতে হয়েছে ম্যাডাম। তাই ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ এভাবেই হয়ে যায়। বলুন ম্যাডাম, কি জানতে চান?

অহনা বললো, ম্যাডাম নয়, আমার নাম অহনা। তোমরা দুজনেই আমার থেকে ছোট তাই অহনাদি বলে ডাকতে পারো। আমি একটু বিস্তারিত বলি তোমাদের। গত একমাস ধরে আমার ফোনে বেশ কিছু কল আসতে শুরু করে। আমার বিয়ে ফাইনাল হবার পর থেকেই কলগুলো আসতে শুরু করে। যদিও আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, আমার ফোন নম্বরটা কি ভাবে এই লোকটা পেল? পরে অবশ্য বুঝলাম, ডেকোরেটররা মামার কাছ থেকে আমার ফোন নম্বর চেয়েছিল কয়েকটা ইনফরমেশন দেবে বলে, হয়তো সেখান থেকেই জোগাড় করেছিল লোকটা। দিনদুয়েক কল পাওয়ার পরই আমি এর নম্বর ট্র্যাক করি আমার সোর্স কাজে লাগিয়ে। তখনই জানতে পারি এই লোকটি কালিয়াগঞ্জ নামক জায়গার বাসিন্দা, নাম পীযুষ বিশ্বাস। রঙের মিস্ত্রি।

পীযুষ প্রায়ই আমায় ফোনে বলতে থাকে, আমি ওকে লাখ দশেক টাকা না দিলে ও নাকি আমার হবু শ্বশুরবাড়ি

Sahitya Chayan

থেকে আমার চ্যানেল সব জায়গায় ওর কাছে থাকা গোপন খবরটা ছড়িয়ে দেবে। যেটা আমার কেরিয়ার বা সম্পর্কের নাকি মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে! তখনও আমি এই রকম লেবার বেল্ট টাইপের লোকটাকে গুরুত্ব দিইনি। জানি এদের সামনে আসার ক্ষমতা কোনোদিনই নেই। কিন্তু হঠাৎই আমি আমার বাবা-মায়ের কিছু পুরনো চিঠি খুঁজে পাই, তাতেও দেখলাম এই লোকটার নাম লেখা রয়েছে। যদিও ওদের কাছ থেকে আমি কোনো রকম উত্তর পাইনি। কিন্তু এটুকু বুঝেছি এই লোকটার সাথে বাবার কোনো পুরনো শত্রুতা আছে।

আমি বিভিন্ন সোর্স কাজে লাগিয়ে লোকটার বর্তমান ঠিকানা অবধি জোগাড় করতে পেরেছি। আমার বিয়ের রাতে এই লোকটাই আমায় একটা চিরকুট পাঠায়। সেই চিরকুটে লেখা ছিল, বিয়ের আসরে বসলেই সত্য ফাঁস করে দেব। আমার টাকা না মিটিয়ে বিয়েতে বসা যাবে না। যদিও আমি এসব ব্ল্যাকমেইলারদের একেবারেই গুরুত্ব দিই না, কিন্তু এই লোকটাকে দিয়েছিলাম। কারণ আমার মনে হয়েছিল, এই লোকটার নিজস্ব সম্মান নেই, স্ট্যান্ডার্ড নেই তাই এ যে-কোনো মুহূর্তে এসে যা খুশি গুজব ছড়াতেই পারে, তখন আমার বাবা-মায়ের মানসম্মান নষ্ট হবে। আর মানুষ সত্য যাচাই না করে গুজবে বেশি বিশ্বাসী। আমি বিয়ের আসর থেকে বিয়ে না করে উঠে এসেছি প্রিয়া। আমার জন্য আমার পরিবার সাফার করছে। তবুও সত্যিটাকে খুঁজে বের করতে হবে আমায়। আজ লোকটার সঙ্গে রাইগঞ্জ স্টেশনে আমার মিট করার কথা,

Sahitya Chayan
লোকটা নাকি টাকা পেলেই আমায় সত্যিটা বলে দেবে। কিন্তু আমি এসব অন্যায়ের কাছে মাথা নিচু করার মেয়ে নই। এভাবে টাকা দিয়ে ব্ল্যাকমেইলারের মুখ বন্ধ আমি করবো না। আমি সত্যিটা জানতে চাই, তারপর সামনাসামনি মোকাবিলা হবে। প্রিয়া এতক্ষণ হাঁ করে শুনছিলো অহনার কথা। তারপর শুকনো গলায় বলল, বিয়ের আসর থেকে চলে এসেছো? অহনা হেসে বললো, হ্যাঁ, আজ আমার ফুলশয্যা ছিল। সে যাক গে, এখন বলতো পীযুষ বিশ্বাস সম্পর্কে তুমি আমায় কিভাবে হেল্প করতে পারবে?

প্রিয়া ঘাড় নেড়ে বললো, কিছুই পারবো না। আপনি যেটুকু জানেন এর বাইরে আমি শুধু জানি এই লোকটা আমাকে আর আমার মাকে রেগুলার গালাগাল দেয়। আমার মাকে রোজ রাতে রেপ করে, আমার বুকের দিকে তাকিয়ে মাপে সেটার সাইজ কত। লজ্জা পাবেন না, হ্যাঁ আমি এর ঔরসজাত। বাবা শব্দটা এই লোকটার সঙ্গে কিছুতেই বসে না অহনাদি, তবুও ওই শব্দটাকে নিয়েই এতগুলো বছর চলতে হয়েছে আমায়। আমি এতদিন ভাবছিলাম, আমার রেজিস্ট্রি বিয়ের আগে যেন কোনোরকম সমস্যাতে না জড়িয়ে পড়ি, কিন্তু এখুনি সিদ্ধান্ত নিলাম একে জেলে পাঠিয়ে তবেই বিয়ে করবো। অনিক তুই বল, পাশে আছিস তুই? অনিক আলতো করে হাতটা ধরে বলল, প্রিয়া তোর পাশে না থাকলে নিজেকে আয়নার সামনে দাঁড় করাবো কি করে? সব কিছুতেই আমায় পাশে পাবি তুই। তোর আর আমার এক ছাদের

Sahitya Chayan

নিচে চুলোচুলি করাটাও কেউ আটকাতে পারবে না। অহনার মনটা ভালো হয়ে গেল ওদের দেখে। এমন খাঁটি ভালোবাসা আজও আছে পৃথিবীতে? আচমকা নৈঋতের মুখটা মনের পথে এসে থমকে দাঁড়ালো।

প্রিয়া বললো, অহনাদি চলো, আমাদের বাড়িতে চলো। মায়ের সঙ্গে কথা বলবে। মা হয়তো তোমায় হেল্প করতে পারবে। কি তাড়াতাড়ি এরা আপন করে নিতে পারে একজন অপরিচিত মানুষকে। অনিকের ট্রেনটা বেরিয়ে গেলেই প্রিয়ার সাইকেলের পিছনে চেপে অহনা রওনা দিলো ওদের বাড়ির উদ্দেশ্যে।

পীযুষ বিশ্বাসের বাড়ির গেটে পৌঁছাতেই অহনার ফোনটা ভাইব্রেট করে উঠলো। স্ক্রিনে তাকিয়ে দেখল, পীযুষ ফোন করছে। অহনা বুঝলো, রাইগঞ্জে মিট করার টাইম পেরিয়ে যাচ্ছে বলেই ফোন করছে পীযুষ। ফোনটা ধরে খুব স্বাভাবিক গলায় অহনা বললো, আমি এখন পুলিশ স্টেশনে, পরে কল করি? ফোনটা কেটে দিলো পীযুষ। তার মানে পুলিশে ভয় আছে লোকটার। তাই আর অকারণ প্রশ্ন করলো না।

একটা দোকানের সামনে দিয়ে আসার সময় প্রিয়া বেশ জোরে জোরেই বললো, হ্যাঁরে, কলেজে একদিন যাবি সেই আগের মত? এই পিঙ্কি, কলেজে যাবি? চল ঘুরে আসি।

অহনা কিছু বোঝার আগেই বললো, ওই যে দোকানটা দেখছো, ওই ছেলেটা বাবার চর। এখুনি বাবাকে ফোন

Sahitya Chayan

করবে। তাই ওকে মিস ইনফরমেশন দিলাম। ও বাবাকে বলবে, আমার কোনো কলেজের বন্ধুর সঙ্গে ঘুরছি।

অহনা ওর পিঠে হাত দিয়ে বললো, তোমার তো প্রচুর বুদ্ধি প্রিয়া। প্রিয়াঙ্কা হেসে বললো, লড়াই করতে করতে শিখে গেছি। দিনরাত টিকে থাকার লড়াই। অবশেষে আজ জয়ের খবর এলো অহনাদি। আমি পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে জবটা পেয়ে গেলাম। ডিস্ট্রিক্ট পোস্ট অফিসে ডিউটি।

পীযুষ বিশ্বাসের বাড়ির অবস্থা দেখলেই বোঝা যায় লোকটা জীবনে যা রোজগার করেছে তার বেশিরভাগ অংশ মদ আর জুয়ায় উড়িয়েছে। নাহলে ওর মত ডিম্যান্ডিং রঙের মিস্ত্রির বাড়ির এমন পলেস্তরা খসা অবস্থা হত না। অহনা দেখলো, প্রিয়ার মতোই রোগা রোগা একজন মহিলা বেশ ভয়ে ভয়ে ওর দিকে তাকাচ্ছে। মহিলার চোখ দুটোতে সন্দেহের ঘনঘটা। উনি যেন ধরেই নিয়েছেন ওনার জীবনে আর ভালো কিছু হবার আশা নেই। নিরাশার চাউনি স্থির হয়ে রয়েছে চোখের পাতায়। লক্ষ্যহীন জীবনের দিকে হেঁটে চলেছেন কোনোমতে। তাই পা-দুটোকে নির্দেশ না দিয়ে যেন বলছেন, দোহাই তোদের যেদিকে খুশি নিয়ে চল আমায়, শুধু জানতে চাস না আমি কোথায় যেতে চাই! আমি লক্ষ্যহীন,পথভ্রষ্ট মানবী। পৃথিবীর আদিম বর্বতার শিকার, যাকে প্রতিনিয়ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষয় হতে হয়। রক্তপাত দেখানোর জায়গা নেই, তাই মাটি চাপা দেওয়া হয় আমার অনুভূতিদের। মানিয়ে নেওয়ার খেলা খেলতে খেলতে আমি ভুলেই গেছি

Sahitya Chayan

আমিও একজন মানুষ! অভ্যেস শব্দটাই একমাত্র সত্য আমার জীবনে।

প্রিয়া ফিসফিস করে বললো, মা উনি আমাদের সব কথা জানেন। অহনা দেখছিল মহিলাকে অপলক। কি বলবে বুঝতে পারছিল না। পীযুষের মত লম্পট লোকের বাড়িতে ঢুকে প্রিয়া আর দীপশিখার মত মানুষের দর্শন পাবে এটা বোধহয় বুঝতে পারেনি ও। আনমনে সম্পূর্ণ অপরিচিত দীপশিখাকে বলেই ফেললো অনুচিত কথাটা, বাঁচার ইচ্ছে না থাকলে আত্মহত্যা করা ভালো আন্টি, ওই একটা অধিকার বোধহয় আপনার নাগালেই আছে তাই না?

দীপশিখা একটু অবাক হয়ে বলল, না নেই, সেটাও নেই। যেদিন জানতে পারলাম, আমি একটা প্রাণ বহন করছি শরীরে, সেদিন থেকে ওই বিলাসিতাটুকুও কেড়ে নিলেন ভগবান। যেদিন বুঝতে পারলাম, আমি চলে গেলে আমার মেয়েটা তার বাবারই দ্বারা রেপ হতে পারে সেদিন মনে হলো আত্মহত্যা বড্ড বিলাসিতা। কথাটা ঝোঁকের মাথায় বলেই দীপশিখা বোধহয় সংকুচিত হয়ে গেল একটু। আসলে পীযুষ নামক লোকটার ভয়ে আধমরা হয়ে থাকে দীপশিখা। এখনও পর্যন্ত যে সব লোকজন ওদের বাড়িতে এসেছে তারা বেশিরভাগই পীযুষের লোক। তাই বোধহয় দীপশিখা ভাবতেই পারছে না ওদের কথা শুনবে বলে কেউ আসতে পারে! অহনা দেখলো দীপশিখা ভীতু নয়, বর্তমানে সাহস হারিয়েছে মাত্র। তবে কাউকে আপন করে নেবার মানসিকতা ষোলো আনা এখনও বর্তমান।

Sahitya Chayan

অহনা পিঠ থেকে ব্যাগটা খুলে বারান্দায় রেখে দীপশিখাকে প্রণাম করে বললো, যদি বাঁচার মন্ত্র শিখিয়ে দিই, শিখবেন?

আপনাকে দেখে আমি ভাবতেই পারিনি আপনি এতটা কঠিন ধাতুতে গড়া। আপনি বাঁচবেন আন্টি, জীবনটাকে দেখবেন জীবিত হয়ে, আধমরা হয়ে নয়।

মায়ের দিকে তাকিয়ে প্রিয়া বললো, মা অহনাদি একজন রিপোর্টার। ওয়েলকাম ইন্ডিয়া বলে একটি চ্যানেলের রিপোর্টার। অহনা বললো, আমি ডেস্ক ওয়ার্ক করি না, আমি স্পট ওয়ার্ক করি। সেই সূত্রেই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আসা।

দীপশিখা বললো, আমার সঙ্গে? অবিশ্বাস্য। সে যাক কথা পরে হবে। আগে কিছু খেয়ে নিন।

অহনা হেসে বললো, আপনার মেয়ের থেকে হয়তো আমি বছর চারেকের বড় হবো তাকে এমন আপনি-আজ্ঞে করবেন বুঝি?

দীপশিখা হেসে বললো, বেশ অহনা, কিছু খেয়ে নাও। তারপর শুনবো তোমার সব কথা।

অহনাকে কিছু বলতে না দিয়েই দীপশিখা রান্নাঘরের দিকে গেল। প্রিয়ার সঙ্গে কথা বলছিল অহনা। অনিকের সঙ্গে ওর পরিচয় পর্বের আর প্রেম পর্বের গল্প করতেই মেয়েটা একমাত্র স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, বাবার কথা উঠলেই গুটিয়ে যায়,অস্বস্তি এসে ঘরে ধরে প্রিয়াকে। সেটা এইটুকু সময়েই খেয়াল করেছে অহনা। দীপশিখা দুটো রুটি, পেঁপের তরকারি আর সুজির বরফি এনে সামনে রাখলো

Sahitya Chayan

অহনার। একটু সংকোচের সঙ্গেই বললো, আমরা এমনই খাই, তোমার হয়তো অসুবিধা হবে।

অহনা হেসে বললো, আন্টি আমিও এমনই খাই, মা বেশি স্পাইসি খাবার খেতেই দেয় না। পীযুষ বিশ্বাস লোকটা সম্পর্কে ঠিক যতটা ঘৃণা জন্মেছিল অহনার মনে, তার থেকেও অনেক বেশি শ্রদ্ধা তৈরি হলো ওর মেয়ে আর বউকে দেখে। এই মানুষ দুটো জানে ঠিক পীযুষ কেমন লোক, তারপরেও এরা হাসছে, লড়াই করছে বাঁচার জন্য। শুধু তাই নয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চায় বলেই, অহনাকে সাহায্য করতে সম্মত হয়েছে প্রিয়া।

দীপশিখা বললো, তুমি যে সময়ের কথা বলছো সেই সময় আমার পীযুষের সঙ্গে বিয়েই হয়নি। আমার বিয়ে হয়েছে তারও কিছু পরে। শ্বশুরবাড়িতে আমায় নিয়েই যায়নি প্রিয়ার বাবা। ওকে ঠিক কেন ওদের বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেছিল তার সঠিক কারণ আমি আজও ঠিকমত জানি না। শুনেছি মদ আর অসভ্যতামির জন্যই বাড়ি ছাড়া হয়েছিল। আমি ওর সংসারে আসার পর যা যা ঘটেছে সেগুলো তো বললাম আমি তোমায় কিন্তু তার আগে তো আমি কিছুই জানি না। অহনা বললো, আচ্ছা ওর কোনো নিজস্ব জিনিসপত্রের ফাইল আছে? প্রিয়া বললো, আছে একটা ব্রিফকেস, ওই তো মায়ের ঘরের ঢালাইয়ে তোলা। মাকে আর আমাকে কোনোদিন ওতে হাত দিতে বারণ করেছে। আমাদেরও জাস্ট কোনো ইন্টারেস্ট নেই। অহনা বললো, আন্টি আমি একবার

Sahitya Chayan

দেখতে চাই ওগুলো। অহনা ভয়ে ভয়ে তাকালো প্রিয়ার দিকে। তারপর আস্তে করে বললো, যদি বুঝতে পারে, খুব মারবে যে। অহনা দৃঢ় গলায় বলল, মারবে না। আর কখনো পীযুষ বিশ্বাস আপনাদের কাউকে মারবে না। আমি অহনা পাল কথা দিলাম। কিছু হয়তো আছে অহনার চেহারায় বা কথায় নাহলে দুজন অপরিচিত মহিলা কেন নিজেদের বিপদ উপেক্ষা করে সাহায্য করবে অহনাকে?

প্রিয়া একটা টুলের ওপরে উঠে নামিয়ে আনলো ব্রিফকেসটা। ধুলো ঝেড়ে তিনজনেই বসলো ওটাকে ঘিরে। খুলতেই এক গাদা খবরের কাগজের কাটিং বেরোলো। অবাক হয়ে গেল অহনা। স্পোর্টস পাতার খবর, সব খবরের নিচেই লেখা নিজস্ব সংবাদদাতা অনিরুদ্ধ পাল।

তার মানে লোকটা আজ থেকে পঁচিশ বছর আগেকার কাগজের কাটিং যত্ন করে রেখে দিয়েছে, কিন্তু কেন? বাবাইয়ের সঙ্গে লোকটার ঠিক কি সম্পর্ক? পীযুষ বিশ্বাসের যা লেভেল তাতে এই লোকটা বাবাইয়ের ধারে কাছে আসার কোনো কাল্পনিক চিত্রও আঁকা বেশ কষ্টকর। তাহলে কি? কিছু তো একটা কানেকশন আছেই বাবাইয়ের সঙ্গে, আর সেই জন্যই এই লোকটাকে নিয়ে বাবাই মাকে চিঠিতে সাবধানও করেছিল সম্ভবত। যদিও চিঠিটা মা টেনে নেওয়ায় পুরোটা পড়াও সম্ভব হয়নি। তবে এরকম কিছু লেখা ছিল বোধহয়, পীযুষ বিশ্বাস লোকটা কিন্তু ওই এলাকার লোক, তাই সুচেতা একটু সাবধান। মনে রেখো তুমি এখন একা নও, তোমার সঙ্গে আরেকটা প্রাণ বাড়ছে।

Sahitya Chayan

তার মানে তিতিরের কথাই বলা হয়েছে সেটা স্পষ্ট। সেই তখন থেকে বাবা চেনে এই লোকটাকে, তাই মাকে সাবধান করেছিল। সবই তো ঠিক আছে, কিন্তু ও যখন জিজ্ঞেস করেছিল, কে এই পীযুষ? তখন মা মারাত্মক রেগে গিয়েছিল। বাবা বলেছিল, ওসব জানার দরকার নেই। তিতির জেদ ধরে বলেছিল, তুমি একটা কথা বলতো বাবাই, ওই লোকটা কি সত্যিই আছে? বাবা ঘাড় নেড়ে বলেছিল হ্যাঁ আছে। সেই থেকেই ফোনের মেসেজ, কল এগুলোর সঙ্গে কানেক্ট করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল অহনা। মায়ের রাগের কারণ, বাবার উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া, বাবা-মায়ের মধ্যে দারুণ গন্ডগোল, বিয়ের রাতে চিরকুট পাওয়া সব মিলিয়ে তিতির এটুকু বেশ বুঝেছে এই লোকটার সঙ্গে ওদের ফ্যামিলির একটা কোনো গোপন শত্রুতা আছেই। আর সেই কারণেই লোকটা দায়িত্ব নিয়ে ওকে ব্ল্যাকমেইল করে যাচ্ছে। আবার মুঠো শক্ত করলো অহনা। কাগজের কাটিং, বাবা মায়ের একটা যৌথ ছবি, তিতিরের একটা এখনকার ছবি এসব এর সংগ্রহে রয়েছে। এছাড়াও সুচেতা বসুর নামে আসা অনিরুদ্ধ পালের দুটো চিঠিও এর দখলে রয়েছে। ওপরে রাইগঞ্জ পোস্ট অফিসের ছাপ রয়েছে। তার মানে পোস্টমাস্টারকে হাত করেছিল লোকটা। ওই ভাবেই ওদের খবর জোগাড় করতো লোকটা, কিন্তু কেন? এই কেনটার উত্তর খুঁজতে হিমশিম খাচ্ছে অহনা। চিঠি দুটো জিন্সের পকেটে ভরে প্রিয়াকে বলল, তুলে রেখে এসো।

Sahitya Chayan

দীপশিখা বললো, একজন বলতে পারবে ওর ব্যাপারে সবকিছু। বিয়ের আগের সবকিছু বলতে একজনই পারবে। অহনা আচমকা দীপশিখার হাতটা চেপে ধরে বললো, প্লিজ হেল্প করুন আন্টি। এই এলোমেলো শব্দগুলো সাজাতে না পারলে আমি যে পাজেলটাকে কিছুতেই সলভ করতে পারছি না। আই নিড হেল্প।

দীপশিখা বললো, বেশ চেষ্টা করে দেখি, উনি আদৌ এ বাড়িতে আসতে রাজি হন কিনা! পীযুষের বড়দা, পেশায় শিক্ষক। খুবই সজ্জন মানুষ। তাই ভাই বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পান একে। সেই জন্যই সম্পর্ক নেই কারোর সঙ্গে। তবুও চেষ্টা করে একবার দেখি।

দীপশিখার বার তিনেক ফোনের পরে রিসিভ করলেন ফোনটা। স্কুলে আছেন এখন। দীপশিখার কথা শুনে বললেন, জানোয়ারটা এখন বাড়িতে নেই তো? তাহলে স্কুল থেকে ফেরার পথে একবার ঘুরে যাবো। তবে খেয়াল রেখো বৌমা, বেইজ্জত যেন না হতে হয় ওই কুলাঙ্গারের কাছে। দীপশিখা আয়নায় সামনে দাঁড়িয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। নিজেকেই নিজে চিনতে পারছে না যেন। ওর ভিতরেই ছিল এমন সাহস? এমন নিয়ম ভাঙার শক্তি এত দিন পরেও জীবিত ছিল ওর মধ্যে। বাবা বলতেন, দীপা মা, কেন তোর নাম দীপশিখা দিলাম জানিস? তোর মধ্যে যেন আগুনের মত শক্তি থাকে, ধ্বংসের জন্য নয়, অন্যায়কে পুড়িয়ে দেবার মত লেলিহান শিখা যেন ঈশ্বর তোকে দেন। দীপশিখা তো নিজের মধ্যে কোনোদিন সেই লেলিহান শিখার দেখা পায়নি, তেলবিহীন প্রদীপে

Sahitya Chayan

সলতেটা একটু উস্কে গেলেই মার খেতে হয়েছে পীযুষের। তাই শুকনো সলতে পোড়ার গন্ধ শুকেছে নিজের মধ্যে, তাকে কোনোদিন জ্বালিয়ে দিতে পারেনি। কদিন ধরেই সেই নিভে যাওয়া সলতের উত্তাপ টের পাচ্ছিলো শরীরে, তাই বোধহয় অনিকের সঙ্গে প্রিয়ার বিয়ের ব্যবস্থা করার কথা ভাবতে পেরেছে, পীযুষের চোখে ধুলো দিয়ে ওর তিলতিল করে জমানো টাকায় ওদের বিয়ের পোশাক কিনতে যেতে পেরেছিল। আজ অহনার সঙ্গে পরামর্শ করে পীযুষকে জেলে ঢোকানোর ব্যবস্থা করতে চাইছে। এতদিনের অত্যাচারে শরীর জুড়ে কালসিটেগুলো বোধহয় বিদ্রোহ করে উঠছে, প্রিয়ার জীবনটা দীপশিখার মত হতে দেবে না ভেবেই এতটা সাহসী হতে পেরেছে দীপশিখা। এর আগে নিজেকে নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করেনি কখনো শিখার। বিজয়ের চলে যাওয়া আর ওর স্বেচ্ছামৃত্যু বোধহয় একই মুহূর্তে ঘটেছিল। তাই তো এতগুলো বছর নির্জীবের মত কাটিয়ে দিতে পেরেছে এই চার দেওয়ালের নরকের মধ্যে।

যাকগে, ভগবান সুযোগ বারবার দেয় না। প্রিয়ার চাকরি, অনিকের সঙ্গে বিয়ে সব যোগ যখন এই সময়ে এসেছে তখন দীপশিখার মনের সুপ্ত ইচ্ছেটা বোধহয় এতদিনে পূরণ করবে ভগবান। কতদিন ওই অমানুষিক অত্যাচারের পর মদ্যপ অবস্থায় আঁচড়ে কামড়ে দিয়েছে লোকটা, গোটা গায়ে ব্যথা নিয়ে শুরু করতে হয়েছে সংসারের হাজারো কাজ। ঘুমন্ত লোকটাকে দেখে বহুবার মনে হয়েছে রান্নাঘর থেকে বঁটিটা গলা বরাবর চালিয়ে

Sahitya Chayan

দিতে, তারপরেই সিনেমায় দেখা জেলের অন্ধকার কুঠুরি আর প্রিয়ার অসহায় মুখের কথা ভেবে পিছিয়ে গেছে। আজ যদি অহনার মত নামি রিপোর্টারকে ব্ল্যাকমেইল করার অপরাধে লোকটার জেল হয়, তাহলে অন্তত কয়েকটা দিন গায়ে হাওয়া লাগবে। লোকের বাড়িতে রান্নার কাজ করে চালিয়ে নেবে, তবুও একটু শান্তি চায়। যদিও এখন আর লোকের দুয়ারে হাত পাততে হবে না, প্রিয়া সরকারি চাকরি পেয়ে গেছে। তাই অহনার দেওয়া এই সুযোগটা কিছুতেই নষ্ট হতে দেবে না দীপশিখা। শুধু একটু খেয়াল রাখতে হবে, কোনোমতেই যেন কাজ মেটার আগে লোকটা বাড়িতে না ফেরে।

দীপশিখা ইচ্ছে করেই ফোনটা করলো পীযুষকে।

পীযুষ ফোনটা ধরেই বললো, কি রে খানকি মাগী আবার কি টাকা চাই নাকি? কি জন্য ফোন করছিস? আমার মটকা প্রচুর গরম আছে, এখন রাখ ফোন। দীপশিখা নরম গলায় বলল, টাকা আছে। বাড়ি ফিরবে না এখন? আজ রাতে ভাবছিলাম লুচি করবো তাই জিজ্ঞেস করলাম।

পীযুষ আরও দুটো সস্তার গালাগাল দিয়ে বললো, সোহাগ উথলে উঠছে মাগির। কেন রে, আমি বাড়িতে নেই, ঘরে নাগর আসছে না? তাকে লুচি গেলা। আমি বাড়ি ফিরবো এখনো সপ্তাহ খানেক পরে। ততদিন, মা-মেয়ে মিলে জুটিয়ে নিস কাউকে।

এত গালাগাল শুনতে ইচ্ছে করে না দীপশিখার। বাবার শেখানো মালকোষের সুর মনে পড়ে মাঝে মাঝে। কিন্তু

Sahitya Chayan
এখন মালকোষের সুর ছাপিয়ে পীযুষের গালাগালিতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে ওর শ্রবনেন্দ্রিয়। যাইহোক, এত নোংরা কথার মধ্যে থেকে আসল কথাটুকু জেনে নিয়েছে দীপশিখা, আপাতত পীযুষের ফেরার সম্ভবনা বেশ কম। এক যদি শয়তানি না করে। সচেতন অবশ্যই থাকতে হবে।

অহনা ল্যাপটপ খুলে বসে পীযুষ সম্পর্কে ওর সোর্সদের দেওয়া ইনফর্মেশনগুলো মেলাচ্ছিলো, লোকটা এই মুহূর্তে রাইগঞ্জে রয়েছে। "আশ্রয়" নামক কোনো একটা কোম্পানির আন্ডারে কাজ করছে। আশ্রয়ের কাজ সম্পর্কে সার্চ করলো অহনা। মেইনলি মফঃস্বলে ফ্ল্যাট কালচার চালু করাই এদের মোটিভ। দুজন ওনার আছে এই কোম্পানির। তাদের নাম এবং টেলিফোন নম্বর জোগাড় করা কমপ্লিট। যতবার ওর টিমের কঙ্কনা আর গৌরবকে ও কাজ দিয়েছে ততবার দেখেছে ওরা হান্ড্রেড পার্সেন্টেজের জায়গায় হান্ড্রেড টোয়েন্টি কাজ করেছে। কুড়ি পার্সেন্ট ওরা বেশি ইনফর্মেশন জোগাড় করে দিয়েছে অহনাকে। যবে থেকে ও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ও সফট বিটে নয় পলিটিক্যাল বিটে জব করবে তবে থেকেই একটা জিনিস মাথায় রেখেছে নিঃশব্দে ইনফর্মেশন জোগারের পদ্ধতি। ও পিটিটিআই(সারাদেশের রিপোর্টিং-এর দায়িত্ব) নয় ঠিকই কিন্তু ফিল্ড ওয়ার্ক করাটাও কম রিস্কের নয়। সে তুলনায় ওদের ডেস্ক ওয়ার্ক করা ফ্রেন্ডরা অনেকটাই নিরাপদ। অন্ততঃ বিপদজনক পরিস্থিতিতে পড়তে হয় না

Sahitya Chayan

ওদের মত। অবশ্য অহনা ইচ্ছে করেই ফিল্ড ওয়ার্ক চুজ করেছিল, কারণ থ্রিল ওর বরাবরই পছন্দের বিষয়।

একটা মেসেজ ঢুকলো ফোনে। চেক করতে গিয়ে দেখল, কঙ্কনা পাঠিয়েছে, রাইগঞ্জে একটা বড় কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে, সেখানেই রঙের কন্ট্র্যাক্ট পেয়েছে পীযুষ। ওর সঙ্গে কপিল, সুনীল আর বাপ্পা বলে তিনটে ছেলে আছে। এছাড়াও আরও কিছু লোক কাজ করে ওর টিমে।

তবে পীযুষকে একবার ইভটিজিং জাতীয় কেসে থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল। দিন সাতেক পরে এই আশ্রয় কোম্পানির ওনার ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছেন নিজের স্বার্থে। সেই থেকেই পীযুষ এর সঙ্গে কাজ করে।

তার আগে পর্যন্ত ও কোনো কোম্পানির আন্ডারে কাজ করতো না। দুটো ছেলে নিয়ে লোকের বাড়ি রং করতো। ওর হাতের কাজ প্রশংসা পেলেও, মানুষ হিসাবে অঞ্চলে সুনাম নেই একেবারেই। বাড়ি রাইগঞ্জ আর নীলপুরের মাঝে। বাড়ির সকলেই শিক্ষিত, ভদ্র, তাই এই লোকটা বাড়িছাড়া। দীপশিখার সঙ্গে বিয়েটা হয়েছিল কাকতলীয় ভাবেই। দীপশিখার যার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল তার অল্প বয়সের ছবি অবধি জোগাড় করেছে কঙ্কনা। কোনো একটা কারণে বিজয়চাঁদের সঙ্গে বিয়েটা ভেঙে যায় তখন পীযুষ বিয়ে করে দীপশিখাকে। দীপশিখা একজন সংগীত শিক্ষকের মেয়ে। বিজয়চাঁদও দীপশিখার বাবার কাছে গান শিখত। অত্যন্ত ভদ্র পরিবার ওদের।

দীপশিখার বাবা, দিদিদের ছবির সঙ্গে যার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা ছিল তার ছবিটাতে এসে চোখটা আটকে

Sahitya Chayan
গেলো অহনার। বিজয়চাঁদ....নামটাও তো মিলে যাচ্ছে। মুখটা নেহাতই বছর পঁচিশের একজন তরতাজা যুবকের। ছবিটাও বেশ অস্পষ্ট, বহু পুরোনো। স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলো অহনা, ওর রিপোর্টার চোখে ধুলো দেওয়া এতটাও সহজ নয়। এতো বিজুকাকা!

অহনা মুচকি হেসে মনে মনে বললো, পৃথিবীটা বড্ড ছোট, আর গোলও। তাই বিজুকাকার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল দীপা আন্টির বাড়িতে। মা বলে অহনার মাথায় নাকি দুষ্টু বুদ্ধির বাসা। নৈঋতও সেদিন এই বলেই ওকে সার্টিফিকেট দিয়েছে। সেই দুষ্টু বুদ্ধির তাড়নায় অহনা বেশ জোরেই ডাকলো, আন্টি একটু জল দিন না।

দীপা আন্টি দু-মিনিটের মধ্যে জলের গ্লাস হাতে ঢুকলো ওর ঘরে।

অহনার ল্যাপটপে তখন বিজুকাকার অল্প বয়েসের ছবিটা বেশ বড়সড় করে স্ক্রিন জুড়ে খোলা রয়েছে। দীপা আন্টি সেদিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল। কেঁপে উঠলো যেন গ্লাসের জলটুকু। ক্ষীণ গলায় বলল, তুমি একে চেনো বুঝি?

অহনা খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, চিনি তো। ইনি হলেন চিরবিরহী পাবলিক। বিয়ে থা করেননি, সংসার করেননি। কাকে নাকি লগ্নভ্রষ্টা করেছেন সেই পাপবোধ নিয়ে বাড়ি, গ্রাম সব ছেড়েছিলেন। তারপর এদিক ওদিক টুকটাক কাজ করতে করতে একদিন বেচারা দোষ না করেও পকেটমার বলে মার খেতে যাচ্ছিলেন।

Sahitya Chayan

দীপা বলে উঠলো, কিছুতেই না, বিজয়দা কোনোদিন চুরি করতেই পারে না। অহনা ওর কথাটা না শোনার ভান করে বললো, আমার বাবা দেখেছিলো, বিজুকাকা কিছুই করেনি, লোকের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। আজ থেকে প্রায় ছয় বছর আগে বিজু মহারাজের আমাদের দেশের বাড়িতে আগমন ঘটেছে। সেই থেকেই বাগান করা, বাড়ির সব দেখাশোনা করা দায়িত্বের সঙ্গে পালন করে যাচ্ছে। সত্যি বলতে কি আমাদের পরিবারের একজন হয়ে গেছে। বিয়ে থা করেনি ভদ্রলোক, কোনো এক কালে বোধহয় গান টান গাইতো তারপর গানকে অভিশাপ ভেবে ছেড়ে দিয়েছে। কাকে নাকি লগ্নভ্রষ্টা হতে হয়েছে ওর জন্য, তাই প্রতিদিন একটু একটু করে পাপ স্খলন করতে নিজের মাইনের টাকা কন্যা দায়গ্রস্ত পিতাদের দান করে আসছে এত বছর ধরে।

ভদ্রলোকের একটাই শখ, গান শোনা। আর বাগান করাটা বোধহয় শখ নয়, নিজেকে নানা কাজে ব্যস্ত রেখে অতীত থেকে পালানোর চেষ্টা। অহনা খেয়াল করলো, দীপাআন্টির দু-গাল বেয়ে জল ঝরছে। ইচ্ছে করেই একটু কাঁদতে দিলো ওকে। এত বছরের জমানো বরফ গলছে, জল তো পড়বেই। বিজুকাকা যদিও অহনাকে কোনো কথাই বলতে চায়নি, কিন্তু অহনা ওকে অনবরত খুঁচিয়ের খুঁচিয়ে বের করেছিল কিছুটা। আজ পুরোটা পরিষ্কার হলো। দীপাআন্টি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললো, চিরকালের কম বোঝা মানুষ ছিল। কবে থেকে এত বুঝদার হয়ে গেল কে জানে! বিয়ে থা না করে এমনি

Sahitya Chayan
করে কাটিয়ে দিলো জীবনটা! অমন গানের গলাও নষ্ট করলো? তাহলে আর অভিমান করে লাভ কি হলো! নিজেকে কষ্ট দিতে গিয়ে তো তাকেও দিয়ে ফেললাম যে। পীযুষকে বিয়ে করার কারণই যে ছিল তাকে দেখানো। শেষে বিজয়কে দেখাতে গিয়ে ওকেই এমন যাযাবর করে দিলাম আমি। জানো অহনা, ও খুব অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলে। মল্লিক বাড়ির বড় বড় ব্যবসা, জমি সব আছে।

অহনা বললো, তাহলেই বুঝুন আন্টি সেসব ছেড়ে সেই মানুষটা যার জন্য এমন ভবঘুরে জীবন কাটালো তার কি দায়িত্ব নেই, শেষ জীবনটা অন্তত তাকে একটু শান্তি দেওয়া, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া।

অহনার হাত দুটো চেপে ধরে দীপশিখা বললো, আমায় একটিবার নিয়ে যাবে তার কাছে। গোধূলিতে তার গলায় আবার পুরবী শুনবো, ভোরে শুনবো ভৈরবী... নিয়ে যাবে অহনা। তাকে একবার অনুরোধ করে আসবো, যেন গানটা সে না ছাড়ে। বাবা তো গুরুদক্ষিণা চায়নি, মেয়ে হিসাবে এটুকু দাবি তো করতেই পারি।

অহনা হেসে বললো, সব হবে, হয়তো বাকি জীবনটা আপনি আর বিজুকাকা একসঙ্গে কাটালেন! কিন্তু তার আগে পীযুষের ব্যবস্থা করতে হবে। দীপা বললো, লোভ দেখিও না অহনা। এমনিতেই সে শুধু আমার কথা মনে রেখে জীবনে দ্বিতীয় নারী প্রবেশ করায়নি শুনেই লোভে বুকটা পরিপূর্ণ হয়ে গেল, আর লোভ দেখিও না। পা পিছলে যেতে কতক্ষণ! দীপার কথা শেষ হবার আগেই প্রিয়া বাইরে থেকে ডাকলো, মা জেঠু এসেছে। দীপশিখা

Sahitya Chayan

বললো, এসো বাইরে এসো। উনি বারান্দায় বসেন, তারপর চলে যান। ভিতরে আসেন না। আজ বোধহয় কত বছর পরে এলেন কে জানে! প্রিয়া যখন ছোট ছিল একবার দেখতে এসেছিলেন। ভাইয়ের অমন গুণের জন্যই সম্মান হারানোর ভয়ে এদিকে আসেন না।

দীপশিখা ভদ্রলোকের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললো, কেমন আছেন দাদা? আপনি তো স্কুল থেকে আসছেন, আমি বরং খাবার আনি, আপনি অহনার সঙ্গে একটু কথা বলুন। ও একজন টিভির রিপোর্টার।

পীযুষের দাদাকে একটুও সময় না দিয়ে অহনা বললো, নমস্কার স্যার। আসলে পীযুষ বিশ্বাস সম্পর্কে আমার কয়েকটা ইনফর্মেশন চাই।

ভদ্রলোক ভ্রু কুঁচকে বললো, আমি প্রায় ছাব্বিশ বছর ওর সঙ্গে সম্পর্ক বহির্ভূত, আমার কাছে কোনো খবর তো নেই ওর।

অহনা ওনার কথার সূত্র ধরেই বললো, স্যার, আমি ঐ ছাব্বিশের আগের খবরটুকু জানতে চাইছি। প্লিজ, হেল্প মি। আপনাকে ছাড়া এতদিন আগের খবর বের করার সোর্স আমার নেই। আই নিড ইউর হেল্প, প্লিজ।

ভদ্রলোক প্রিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, কি পড়ছিস এখন? প্রিয়া বোধহয় একটু হলেও খুশি হয়েছে অহনার সামনে ওর শিক্ষক জেঠু আসায়। মদ্যপ, জুয়াখোর, ব্ল্যাকমেইলার বাবার পরিচয়ে ভারাক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। ওর একজন ভদ্র আত্মীয় আছে, ওর ধমনিতে একজন শিক্ষিত মানুষের রক্ত বহন করছে ভেবেই

Sahitya Chayan
বোধহয় একটু হলেও গ্লানিমুক্ত হয়েছে। তাই প্রিয়ার মুখটা উদ্ভাসিত লাগছে। প্রিয়া ঢিপ করে প্রণাম করে বললো, জেঠু আমি জব পেয়েছি। পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে। এই তো আমাদের ডিস্ট্রিক্ট পোস্টঅফিসেই আমার পোস্টিং হয়েছে। ভদ্রলোক বেশ তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, যাক বিশ্বাস বাড়ির পরের প্রজন্ম মাথা উঁচু করে বাঁচবে সমাজের বুকে। পরিচয়ের লজ্জা নিয়ে নয়।

প্রিয়া, বৌমাকে বল আমি একটু পড়ে খাবো। আগে ওনার সঙ্গে কথাটা শেষ করে নিই। প্রাইভেসি দরকার বুঝেই প্রিয়া বললো, জেঠু তুমি আর অহনাদি আমার ঘরে বসে কথা বলো। অহনা প্রিয়ার ঘরে ঢুকেই আচমকা প্রশ্ন করলো, রাইগঞ্জের শিক্ষক সুশোভন মিত্রকে চেনেন?

ভদ্রলোক অকস্মাৎ প্রশ্নে একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, তুমি কি করে তাকে চিনলে? তিনি তো বহু বছর হলো মারা গেছেন।

বলুন তো, সুশোভনবাবুর সঙ্গে পীযুষের ঠিক কি সম্পর্ক?

ভদ্রলোক মাথা নামিয়ে বললেন, সুশোভনবাবু আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। অমন মানুষ হয় না। স্বয়ং ঈশ্বর যেন। যদিও আমি ওনার রিটায়ার্মেন্টের কয়েক বছর আগেই জয়েন করেছিলাম। তবুও কাছ থেকে ওনাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

দাদাইয়ের সম্পর্কে এই কথাগুলো মায়ের আর মামুর মুখে বহুবার শুনেছে অহনা, তবুও অপরিচিত তৃতীয় ব্যক্তির মুখে কথাগুলো শুনে গর্ব অনুভব করছিল

Sahitya Chayan
সংগোপনে। ফোকাস অন্যদিকে যেতে না দিয়েই অহনা বললো, এবারে বলুন, সুশোভনবাবুর সঙ্গে পীযুষের ঠিক কি সম্পর্ক ছিল? আমি একজন রিপোর্টার, তথ্য গোপন করবেন না। আপনার নাম সামনে আনবো না, এটা আমি আমার পার্সোনাল ইন্টারেস্ট থেকে করছি, প্রফেশনাল নয়।

ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে বললেন, আসলে দোষটা আমার। সুশোভনবাবুর অকস্মাৎ মৃত্যুর দায় বোধহয় কিছুটা হলেও আমার। চমকে উঠলো অহনা! কিছু ঝাপসা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে যে এত গভীরে লুকিয়ে থাকা রুটে পৌঁছে যাবে ভাবতে পারেনি ও। পীযুষের দাদা শ্রী পলাশকান্তি বিশ্বাস নিজেই স্বীকারোক্তি দিচ্ছে সেই নাকি দায়ী সুশোভনবাবুর কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের জন্য! তার মানে অহনার অগোচরে বাবা-মা দুজনেই একটা দীর্ঘ চিত্রনাট্যকে লুকিয়ে রেখেছিলো সংগোপনে।

পলাশবাবু মাথা নিচু করে বললেন, হেডস্যার চিরকালের আত্মভোলা মানুষ ছিলেন। বাড়ি-ঘর, সংসার কোনোদিকেই মন ছিল না তেমন। সোহম আর সুচেতা দুজনেই শিক্ষকতা পাওয়ার পর পর বোধহয় উনি রিটায়ার করেছিলেন। বহু বছর আগের কথা তো, সময়টা সঠিক মনে করতে পারছি না। আমারও তো বয়েস হলো, আর তো বছরখানেক চাকরি আছে। আগের কথাগুলো মনে থাকলেও সময়গুলো গুলিয়ে যায় ইদানিং।

অহনা বললো, প্লিজ বলুন।

সুশোভনবাবু রিটায়ার্মেন্টের পরেও স্কুলে যেতেন, থাকতে পারতেন না বাড়িতে। ছাত্র তৈরি করাই ছিল

Sahitya Chayan

উদ্দেশ্য। পীযুষ তখন পড়াশোনায় ইতি টেনেছে। কম বয়েস থেকেই ইভটিজিং, মদ, গাঁজায় শেষ করছিল নিজেকে।

তারপর সেই মদের টাকা তোলার জন্যই বিশ্বাস বাড়ির ছোট ছেলে হয়ে রঙের মিস্ত্রির কাজ শিখতে গেল। আমরা ভাবলাম, নোংরামি বন্ধ করে যদি মন দিয়ে কিছু করে সেটাই ভালো। আমি তখন সদ্য স্কুলের চাকরিতে ঢুকেছি। পীযুষ একদিন বাড়ি ফিরে বলেছিল, তার হাতের কাজ দেখে নাকি সবাই প্রশংসা করছে। তাই সুশোভন স্যার যখন বলেছিলেন, বাড়িটা রং করাতে হবে পলাশ, ভালো কোনো রঙের মিস্ত্রি জানা আছে নাকি? তখন পীযুষকে কাজটা ধরিয়ে দিয়েছিলাম। বুঝতে পারিনি, পীযুষ কোনোদিন বদলাবে না। যেখানে ওখানে পাঠানো হবে সেখানেই নোংরামি করে আসবে।

অহনা বিমূঢ় হয়ে শুনছিলো পলাশবাবুর কথা। এমনও ঘটে! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাচ্ছিল ও।

অহনা একাই প্রিয়ার ঘরে বসে আছে নিশ্চুপ হয়ে। পলাশবাবু চলে গেছেন অনেকক্ষণ আগে। আজকে রাতেই ব্যাক করবে মনে করেছিল সূর্যপুর। কিন্তু দীপাআন্টি রাতে কিছুতেই বেরোতে দেবে না। তাই কাল সকালে যাবে ও। তবে সূর্যপুর নয়, যাবে সোজা রাইগঞ্জে। পীযুষ বিশ্বাসের সঙ্গে হিসেবটা কমপ্লিট করতে হবে। একা যাওয়াটা কি ঠিক হবে? নাকি অভিরূপ আঙ্কেলের হেল্প নেবে?

Sahitya Chayan

আচমকা নিজের সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেললো অহনা, না ও একাই যাবে। দেখাই যাক কত নিচে নামতে পারে মানুষ!

প্রিয়া এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে। ধীর গলায় বলল, জেঠু কি এমন বললো দিদি, যে তুমি এমন নিস্পৃহ হয়ে গেলে?

দীপাআন্টি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, আমি জানি না দাদা তোমায় ঠিক কি তথ্য দিয়েছেন, তবে এটুকু বলতে পারি, যাই হোক না কেন, নিজেকে শক্ত রেখো। অভিমানের বশে এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিও না যাতে আমার মত ভুল করে ফেল।

অহনা তাকিয়ে দেখছিল দুজন প্রবঞ্চিতা মানুষকে। পীযুষ এদের দিনের পর দিন মিথ্যের পর মিথ্যে বলে ঠকিয়ে গেছে আর এরা সরল বিশ্বাসে সেগুলো বিশ্বাস করেছে। ভেবেছে পীযুষ হয়তো শুধু মদ খেয়ে গালাগাল দেয়, এরা এখনও জানেই না, পীযুষ বিশ্বাস কত বড় ক্রিমিনাল। অহনা হাতের মুঠো শক্ত করলো, পীযুষকে জেলের ঘানি টানাবে অহনা, মিডিয়ার সামনে এনে নেকেড করবে লোকটাকে। যাতে লোকটার বেঁচে থাকার ইচ্ছেটুকুও নষ্ট হয়ে যায়।

প্রিয়া বললো, দিদি, তুমি আমার বিয়ের দিন এসো না গো। অহনা হেসে বললো, না আসতে পারলেও ফোন করবো ওইদিন। অনিক ইস এ গুড গাই, নাইস চয়েস ফর ইউ। প্রিয়া একটু লজ্জা পেল যেন। অহনা অনামিকা থেকে একটা আংটি খুলে প্রিয়ার আঙুলে পরিয়ে দিয়ে বললো, এটা বিয়েতে দিদির গিফট। তবে নতুন একটা গিফট

Sahitya Chayan
পাওনা থাকলো তোমার, সেটা নেক্সটবার যখন আসবো নিয়ে আসবো। দীপাআন্টি বললো, তাকে বলো, আমি খুব ভালো আছি, মরার আগে একবার দেখতে চেয়েছি। অহনা ঘাড় নেড়ে বললো, নিশ্চয়ই বলবো বিজুকাকাকে। আমি বাড়ি ফিরেই ডেকে নেব তোমাদের আমাদের বাড়িতে। ওখানেই দেখা হবে বিজুকাকার সঙ্গে।

।।২৯।।

আমি কি জানতে পারি আমায় এভাবে এখানে ডেকে আনার অর্থটা ঠিক কি? অহনা কোথায়? তুমি যে বললে ওর খুব জ্বর এসেছে! অনিরুদ্ধ গম্ভীর হয়ে বলল, তোমাদের মা-মেয়ের ইগো প্রব্লেমটা এত বছরেও আমার মাথায় ঢুকলো না। তিতির তো তোমায় কাল কল করেছিল, তুমি তো রিসিভ করোনি শুনলাম।

সুচেতা গম্ভীর ভাবে বললো, বেশ করেছি রিসিভ করিনি। আমার সম্মান নিয়ে ছেলেখেলা করার সময় মনে ছিল না তোমার তিতিরের? তোমার লজ্জা করে না অনি, তুমি এখনও ওর হয়ে ওকালতি করছো? অনিরুদ্ধ খেয়াল করেছে যখন সুচেতা খুব রাগী মুডে থাকে তখন অনিরুদ্ধকে অনি বলে ডাকে। আমি জানতে চাই সে গেল কোথায়?

অনিরুদ্ধ ঠান্ডা গলায় বলল, তুমি এখানে আসছো জেনে ভোরবেলায় ব্যাগ গুছিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। কলকাতায় নয় মনে হলো। বললো তো, সত্যি খুঁজতে যাচ্ছি, আমার প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়ে গেলেই ফিরে আসবো। সুচেতা মাথাটা নিচু করে বললো, উত্তরগুলো

Sahitya Chayan

তুমি এখনও দাওনি ওকে? সেকি, এতবড় একটা সুযোগ হাতছাড়া করলে কেন? অনিরুদ্ধ বেশ জোরেই বললো, বিজু ব্ল্যাক কফি নিয়ে এসো। বৌদিমনির জন্যও গরমই নিয়ে এসো, মাথা গরম দেখে ঘোলের শরবত করতে বসে যেও না। কফিই এনো। সুচেতা বিরক্ত হয়ে বলল, আমার এখন মজা করার মুড নেই। ক্রমাগত মিথ্যে শুনতে শুনতে বিশ্বাসটা হারিয়ে যাচ্ছে আমার। অনিরুদ্ধ বললো, মিথ্যে নেই এর মধ্যে। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম তিতিরের গায়ে জ্বর। তাই ওষুধ জানতে তোমায় কল করেছিলাম। তুমিই জ্বর শুনে উতলা হলে, তাই চলে এলে। আমি তিতিরকে বহুবার বলেছিলাম, মা আসছে শুধু তোর জন্য, একবার অন্তত দেখা করে যা। তিতির বললো, সম্মুখীন হলেই নাকি তুমি ওকে আটকে দেবে, তাই তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেল। ইদানিং এতটাই জেদ বেড়েছে মেয়েটার যে আমার কথাও শোনে না।

সুচেতা ব্যঙ্গাত্মক হেসে বললো, প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে কোন জায়গায় নিয়ে গেছো বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই। অনিরুদ্ধ নরম গলায় বলল, সুচেতা, তিতির অবাধ্য হলো ঠিকই, কিন্তু অসৎ ও নয়। লক্ষ্যে স্থির, নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকাটা কি ভুল?

সুচেতা ভাঙা গলায় বলল, সত্যিটা ওর সামনে আসলে সামলাতে পারবে তো?

কফিতে চুমুক দিয়ে অনি বললো, আমার তিতিরের ওপরে পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আশাকরি ও সবটুকু বুঝবে।

সুচেতার মুখটা কদিনের ধকলে বেশ ক্লান্ত লাগছে।

Sahitya Chayan

কতদিন পরে আবার সুচেতা ওর সামনে বসে আছে।

কিন্তু এই আছে তবুও নেই অনুভূতিটা বড্ড বেদনাদায়ক।

সুচেতার চোখে উদাসীন অন্যমনস্ক চাউনি, শরীরটাকে এখানে রেখে ও যেন পাড়ি দিয়েছে দূরের ভুবনে। ওর ছোট্ট নৌকাখানিতে জায়গায় অকুলান বলেই হয়তো অনির জায়গা হয়নি। একাই বাইছে খেয়া। নিজের ভার কাউকে এতটুকুও দেবে না বলে পণ করেছে যেন। অনি দাঁড়িয়ে আছে নদীর একপ্রান্তে, সুচেতার ডিঙিটা ছোট হতে হতে মিশে যাচ্ছে দূরে। অনি হাত বাড়িয়ে ডাকতে চাইছে, কিন্তু একবারও পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না সুচেতা।

ধড়ফড় করে উঠলো অনিরুদ্ধ। সুচেতাকে চিরতরে হারিয়ে ফেলার চিন্তাটা অস্থির করে তোলে ওকে বরাবরই। সেই বিয়ের আগে থেকে এখনও পর্যন্ত এই ভয়টা কেমন যেন মনের এক কোণে গুটিয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝেই শিরশিরে ভয়টা অনিরুদ্ধর মেরুদন্ড দিয়ে খুব ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়। তখনই একলা হয়ে যাবার উপলব্ধিটা ওকে নিঃস্ব করে দেয়।

সূচী, আমার খুব ভয় করছে। গলাটা কেঁপে উঠলো অনিরুদ্ধর। সুচেতা গভীরভাবে তাকালো অনির দিকে। এমন গলায় এমন কথা অনি বলেছিল ওদের বিয়ের আগে একবারই। তারপর থেকে সুচেতা দেখেছে ভয় শব্দটা ওর মধ্যে একেবারেই নেই বরং অনিকে সবসময় ফ্রন্টে খেলতেই দেখে এসেছে সুচেতা। আজ কি এমন ঘটল যে

Sahitya Chayan

ওর ভয় করছে। চোখে একরাশ বিষণ্ণতা নিয়ে অনি আবার বললো, আমার ভয় করছে সূচী।

মানুষটাকে এমন ভেঙে পড়তে দেখলে নিজের ভিতরের সব শক্তিটুকু যেন খুইয়ে ফেলে সুচেতা। যতই ঝগড়া হোক, মান অভিমানে দূরে থাকার শর্ত চলুক, সুচেতা জানে ওর ডাক পেলে সব অভিমান ভেঙে অনি এসে দাঁড়াবেই। সেই অধিকারবোধের জোরেই সুচেতা শক্তিশালী। এই মানুষটা ভয় পেলে সুচেতা যাবে কোথায়! অনিরুদ্ধর হাতের ওপরে নিজের হাতটা রেখে বললো, কিসের ভয়? তোমাদের দুজনকে হারিয়ে ফেলার ভয় সূচী। সুচেতা গাঢ় গলায় বলল, আমাকে হারিয়ে ফেললেও তোমার আদরের মেয়ে তোমার কাছেই ফিরে আসবে যখন আসল সত্যিটা জানবে। অনি বললো, যদি না আসে। অলরেডি তিতির আমায় বলেছে আমি নাকি ওর চোখে বেশ কিছুটা নেমে গেছি। কারণ সেই সময়ের ঘটে যাওয়া ঘটনার আমি কোনো প্রতিবাদ করিনি, এমনকি মিডিয়ার সামনেও কেন ওই ক্রিমিনালটাকে আনিনি সেটা নিয়ে ওর মনে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। সুচেতা বিষন্ন গলায় বলল, ও কি সবটা জানে? অনিরুদ্ধ বললো, না জানে না। হয়তো কিছুটা গেস করেছে। ওই লোকটা যে কিভাবে আমাদের সব ভেঙে দিতে চেয়েছিল সেটা এখনও ভাবতেই পারছে না। ও মনে করছে আমি একজন অ্যান্টিসোশ্যালকে জেলে ঢোকাইনি কেন! সে ঠিক কি কি করেছে সেটা ও জানে না সূচী। সুচেতা বললো, সেইজন্যই উত্তর খুঁজতে বেরিয়েছে তাই তো! এসবের থেকে ওকে সত্যিটা বলে দিলেই তো

Sahitya Chayan

ভালো করতে অনি। তাহলে আর মেয়েটাকে ঘুরে ঘুরে মরতে হত না। অনিরুদ্ধ ঘাড় নেড়ে বললো, হয়তো বিশ্বাস করত না, ভাবতো বানিয়ে বলছি। অথবা আমাদের দুজনকে ভুল বুঝতো, কেন ওর কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছি বলে দোষারোপ করতো। তাই ওকে নিজেকে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে দাও সূচী। আমি জানি আমি যেভাবে আমার তিতিরকে বড় করেছি তাতে ও খুব দুর্বল মনের নয়। সত্যের সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা ওর আছে। আমার মনে হয়েছে সবটা জানার পরে ও আমাদের কাছে ফিরে আসুক। তাহলেই পরিপূর্ণ হবো আমরা। সুচেতা নির্বিকারভাবে বললো, জানি না কি হবে। তবে তোমার বয়েস হচ্ছে, এভাবে টেনশন কোরো না। প্রেসার, সুগারগুলো কন্ট্রোলে থাকবে না। মেয়ে বড় হয়েছে, এবারে যা ইচ্ছে করুক।

সুচেতার দিকে তাকিয়ে অনিরুদ্ধ বললো, এ তোমার অভিমানের কথা সূচী। তিতির আমাদের সন্তান, যতই বড় হয়ে যাক, বিয়ে হয়ে যাক আমাদেরই থাকবে।

হালকা গলায় অনি বললো, জানো, নৈঋত তিতিরের প্রেমে পড়েছে। পড়েছে শুধু নয়, রীতিমত হাবুডুবু খাচ্ছে। কিন্তু মেয়েটা তো হয়েছে তোমার মত আনরোমান্টিক, তাই পাত্তাই দিচ্ছে না নৈঋতকে। আমি শেষে হাল ধরলাম। নৈঋতকে দায়িত্ব নিয়ে শেখালাম প্রেম কি করে করতে হয়। আর যুদ্ধ করে কি করে সংযুক্তাকে জয় করতে হয়। আমাদের প্রেসিডেন্সি ক্যাম্পাস থেকে

Sahitya Chayan

কলেজস্ট্রিট সব গল্প শুনে ছেলে পুরো চাঙ্গা হয়ে গেল। এখন তো বড়ি ফেলে দিয়েছে তিতিরের জন্য।

সুচেতা ভ্রু কুঁচকে বললো, মানুষের বয়েস হলে ভীমরতি হয় শুনেছিলাম কিন্তু ঊনষাটেই কারোর চূড়ান্ত ভীমরতি হয় জানতাম না। হবু জামাইয়ের কাছে উনি নিজেদের প্রেমকাহিনী বর্ণনা করেছেন গর্ব করে। মিনিমাম লজ্জাটুকু তো ছিল বলে জানতাম, গত দু-মাসে কি সেটাও ত্যাগ করেছ?

অনি সুচেতার দিকে অপলক তাকিয়ে বলল, সূচী তুমি আজও বড্ড সুন্দর জানো, সেই কলেজস্ট্রিটে প্রথম দেখা মেয়েটার মত। আচ্ছা সূচী, সেই হারটা আছে তোমার কাছে? ওই পেন্ডেন্টটা গো, যেটা ওই দুঃসাহসিক পকেটমারটা চুরি করেছিল তোমার গলা থেকে। সুচেতার গালে বাগানের ডালিয়ার লালচে ছোপ। নরম গলায় বলল, আছে।

অনিরুদ্ধকে যেন আজ কথায় পেয়েছে। পুরোনো স্মৃতির স্রোতে নিজেও ভেসে যাচ্ছে, ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সুচেতাকে। অনি ধীরে ধীরে বললো, সূচী পারলে এ জীবনেই আমায় ক্ষমাটুকু করে দিয়ে যেও। অপরাধের বোঝা বড্ড ভারী গো, ওপারে বয়ে নিয়ে যাওয়া খুব কষ্টকর। সেদিন যদি লন্ডনের ফ্লাইটটা ডিলে না করতো, যদি ঠিক সময় মত তোমাদের বাড়িতে পৌঁছাতে পারতাম, যদি....

সুচেতা বললো, ডেস্টিনি অনি। সবটাই কপাল। তাইতো তিতিরের বিয়েটাও ভেঙে গেল। ভেবেছিলাম সুষ্ঠুভাবে

Sahitya Chayan

বিয়ে দেব মেয়েটার, কিন্তু হলো না।

অনিরুদ্ধ একটু থেমে বললো, আমি রাইগঞ্জের বাড়িতে ঢুকবো না জেনেও তুমি জেদ করলে ওখান থেকেই বিয়ে দেবে...অনিকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সুচেতা বললো, তুমি জানো আমি কেন ওখান থেকে বিয়ে দিতে চেয়েছিলাম অহনার। যাকগে এসব আলোচনা এখন থাক। আপাতত আমি এখানেই কদিন স্টে করি। অহনা ফিরলে একসঙ্গেই তিনজনে কলকাতা যাবো। অনিরুদ্ধ বললো, কোন ফ্ল্যাটে ফিরবে?

অনির এই ছেলেমানুষিগুলোর জন্যই বারবার ক্ষমা করে দেয় সুচেতা ওকে। সুচেতা এত টেনশনে মধ্যেই হেসে বললো, দুটোই তো আমার ফ্ল্যাট। একটা আমার টাকায় কেনা আর একটা আমার নামে। তাই যেটায় ইচ্ছে ফিরলেই হবে। অনিরুদ্ধ হেসে বললো, তার মানে ভাব হলো আমাদের তাই তো?

সুচেতা চলে যেতে যেতে বললো, বিজুদা, দাদাবাবু কি আজকাল সিগারেটের মধ্যে আফিং খাচ্ছে নাকি? একটু খেয়াল রেখো। অনিরুদ্ধ উঠে গিয়ে সিঁড়ির শেষ ধাপে সুচেতাকে আটকে বললো, ওপরে যাওয়ার আগে একটি বার এসো, একটা জিনিস দেখাবো।

সুচেতা প্রশ্ন না করেই নেমে এলো বাগানে। ওই দেখো বাতাবিলেবুর গাছ। দেখো কয়েকটা ফুল রয়েছে। নতুন বসিয়েছি। তোমায় বলেছিলাম না সূচী, তোমার চুল থেকে বাতাবিলেবুর ফুলের গন্ধ পাই আমি। যে গন্ধটা আমাকে বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়। মাটি ভেজা ফুলের গন্ধটা

Sahitya Chayan

ক্রমশ সরে যাচ্ছিল জীবন থেকে, তাই এবারে এসে কলমের বাতাবির গাছ কিনে লাগিয়েছি বাগানে। এই গন্ধটা থেকে যাতে বঞ্চিত না হই সেই জন্যই।

সুচেতা মুচকি হেসে বললো, সে ভালোই করেছ, কচি গাছ, সদ্য ফোটা ফুলের গন্ধ তরতাজা করবে তোমায়। অনিরুদ্ধ না বুঝেই বললো, ঠিক তোমার গায়ের গন্ধের মত। সুচেতা একটু গম্ভীর স্বরে বললো, সাবস্টিটিউট যখন পেয়েই গেছো তখন আর এ অর্বাচীন এই বাড়িতে কি করছে! হনহন করে দোতলায় উঠে গেল সুচেতা। বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো অনিরুদ্ধ। বিজু পাস থেকে বললো, দাদাবাবু ভুল বল ছুঁড়ে ফেলেছেন। মেয়েদের মন বোঝা আমাদের কম্ম নয়। অনিরুদ্ধ খড়কুটোর মত বিজুকে আঁকড়ে ধরে বলল, ব্যাপারটা কি হলো বলো তো?

বিজু বেশ বিজ্ঞের মত বললো, আমিও আগে বুঝতাম না পরে বুঝেছি মেয়েরা বড্ড হিংসুটে হয়। ওই যে আপনি বৌদিমনিকে ছেড়ে বাতাবির চারাতে মন দিয়েছেন ওতেই হিংসে হলো বুঝলেন?

অনিরুদ্ধ মুচকি হেসে বললো, বিজয়চাঁদের মগজ তাহলে পুরো নিরেট নয়, সেখানেও সূক্ষ্ম অনুভূতির খেলা ধরা পড়ে। যাক, আজও যে ওর কাছে আমি গুরুত্ব হারাইনি এটা জেনেই খুশি হলাম। বিজু বললো, এ এক অদ্ভুত ব্যাপার দাদাবাবু। ওরা দুরছাই করলে দোষ নেই, আমরা একটু এদিক ওদিক করলেই মুশকিল। বাতাবি গাছ থেকে পোষা পাখি সবাইকে হিংসে করবে তখন। অনিরুদ্ধ হেসে বললো, নারী চরিত্র বেজায় জটিল, সমীকরণ,

Sahitya Chayan

সমাধান কিছুই না খুঁজে ভালোবাসে যাওয়াটাই বোধহয় সহজ পথ।

সুচেতা ওপর থেকেই ডাকলো, একবার ওপরে এসো।

অনিরুদ্ধর যেন মনে হচ্ছে এই দু-মাসের ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে ফেলার এটাই সুযোগ, শুধু দু-মাসের কেন সারাজীবন ধরে সুচেতার যা যা অভিযোগ ওর বিরুদ্ধে সেগুলোও মিটিয়ে ফেলতে হবে। কাজের প্রেসার আর ওর প্রফেশনের জন্য সেভাবে সময় দেওয়া হয়নি সুচেতাকে, তারপরেও সূচী ওকে নিজের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছে। সেগুলোর ঋণও যতটা সম্ভব সুদে আসলে পূরণ করতে চায় অনি। সুযোগ হয়নি সেভাবে। সূর্যপুরের নিরিবিলিতে না হয় দু-দিন সম্পূর্ণভাবে সুচেতার ইচ্ছা অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করলোই অনি, তাতেও কি ঋণ শোধ হবে? হবে না, কারণ এতদিন ধরে অনিরুদ্ধর দেওয়ার খাতা প্রায় শূন্য, নেওয়ার খাতাটা ভর্তি হয়ে গেছে সেই কবেই।

ওপরে উঠতেই দেখলো, সুচেতা অনিরুদ্ধর বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ ঝাঁঝালো গলায় বলল, তখনই বলেছিলাম, গিজারের সুইচটা শুধু কমপ্ল্যান খাওয়া মানুষদের জন্য কোরো না, অনেকেই নাগাল পাবে না। শুনলে না কিছুতেই, পাক্কা ছয়ফুট হাইটের মানুষের জন্য টং-এ গিজারের সুইচ হলো। লম্বা ইলেকট্রিক মিস্ত্রি এসে যা বলেছে, তুমি সবেতে হ্যাঁ করে গেছো। অনিরুদ্ধ সুইচটা অন করে দিয়ে বললো, ভাগ্যিস উঁচুতে করেছিলাম, তাই তো কেউ সামান্য প্রয়োজনে ডাকলো

Sahitya Chayan
আমায়। আর তাছাড়া এই বাড়িটা করার সময় তুমি কদিন এসেছো সূচী? তুমি জানতে অনেক ভুল থেকেই যাবে, তবুও আসোনি। সুচেতা বললো, তুমি বোধহয় ভুলে গেছো, ওই ছোট কটেজটা ভাগে পেতেই তোমার মাথার পোকা নড়েছিলো, সাত তাড়াতাড়ি ঐ কটেজের জায়গায় দোতলা বাড়ি বানাতে হবে। তাই তুমি তড়িঘড়ি শুরু করে দিয়েছিলে। আমার তখন স্কুলের অ্যানুয়াল এক্সাম চলছিল। আমি কি করে আসতাম! তাও আমি তোমায় ইন্সট্রাকশন দিতাম, কিন্তু তুমি যে শোনোনি সেটা তো দিনের আলোর মতই পরিষ্কার।

অনিরুদ্ধ হেসে বললো, জল গরম হয়ে গেছে, ফ্রেস হয়ে নাও। আমি তো রইলাম সূচী, চূড়ান্ত ভুলে ভরা, দোষে পরিপূর্ণ একটা মানুষ। সময় নিয়ে চোখে আঙুল দিয়ে আমার দোষগুলো নাহয় ধরিয়ে দিও। আমি সময় নিয়ে শুনবো বিশ্বাস করো। সুচেতা আলগা হেসে বললো, সময়? সেকি! ওটাই যে বড় মূল্যবান তোমার কাছে। অকাতরে বিলিয়ে দিও না প্লিজ। অনিরুদ্ধ জানে গোটা জীবনে এই একটা জিনিসই সূচী চেয়েছিল ওর কাছে যেটা ও দিতে পারেনি।

অনিরুদ্ধ অসহায় গলায় বলল, খুনের আসামিকেও দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হয় সূচী, আমাকে কি ক্ষমা করে দেওয়া যায় না?

সুচেতা বললো, ক্ষমা করার আমি কে বলো? আমায় কি খুব প্রয়োজন আছে তোমার জীবনে?

Sahitya Chayan

অনি বহুদিন পরে আচমকা জড়িয়ে ধরলো সুচেতাকে। থরথর করে কাঁপছে সুচেতা। অভিমানের পারদগুলো গলছে ধাপে ধাপে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সুচেতা। তিতিরের মা, অনিরুদ্ধর যৌবন, মধ্যবয়েস আর প্রৌঢ়ত্বের একমাত্র সঙ্গী, যাকে অনি চেনে বেশ কঠিন মনের সাহসী মহিলা হিসাবে, সেও ওর বুকে মুখ গুঁজে বাচ্চাদের মত কেঁদে চলেছে। সময় দিলো অনি, পারদ নামুক, বরফ গলে যাক, দীর্ঘ বছরের জমা অভিমান গলতে সময় লাগবে। অনি ওর ফুলে ফুলে ওঠা পিঠে হাত রাখলো। কানে কানে বললো, দেখো বুকে কান দিয়ে, বুড়ো বয়সেও নিজের নামই শুনতে পাবে। দোষ আমি অনেক করেছি, কিন্তু ভালোও যে বেসেছি সাধ্যমত। তাই আরেকটা সুযোগ দিয়ে দেখো, দ্বিতীয় ইনিংসে ভালো খেলবো, নট আউট থাকবো কথা দিলাম। সুচেতা দু-হাত দিয়ে অনিকে জড়িয়ে ধরে বলল, সেই প্রেসিডেন্সির সূচীকে তুমি ফেরত চাও তাই না অনি? বারবার সুচেতার মধ্যে তাকেই খুঁজে ফেরো। কখনো ভেবেছো কত কি ঘটে গেছে সেই ইনোসেন্ট মেয়েটার জীবনে?

অনিরুদ্ধ বললো, ভেবেছি, তারপরেও কিন্তু তুমি আর আমি একই আছি, একসঙ্গে আছি। তাই নিজেকে এতটা বদলে না ফেললেও পারতে।

বিজুদা বললো তুমি নাকি আজ সব আমার পছন্দের মেনু রান্না করতে বলেছো, সত্যি?

অনি ঘাড় নেড়ে বললো, সত্যি।

Sahitya Chayan

সুচেতা অন্যমনস্কভাবে বললো, যদি নতুন করে শুরু করতে চাই, তাহলে কি তিতিরকে আর পাবো অনি? নাকি ও দূরে চলে যাবে আমাদের থেকে?

অনিরুদ্ধ একটু জোরেই বললো, আলবাৎ পাবো, তিতির আমাদের মেয়ে, ও সবটা বুঝবে। আরেকটা কথা শোনো, নৈঋতই তোমার জামাই হবে। নৈঋত এখন আমার কাছেই লাভ ম্যারেজ করার ট্রেনিং নিচ্ছে।

সুচেতা হালকা হেসে বললো, ছেলেমানুষিটা আর গেল না। ছাড়ো, আমি বাথরুমে ঢুকবো।

বহুদিন পরে অনিরুদ্ধ আবার সেই বাতাবি লেবুর ফুলের গন্ধটা পেলো। প্রাণ ভরে টেনে নিল নিঃশ্বাসটা।

ফোনটা বাজছে পায়জামার পকেটে। বের করতেই দেখলো নৈঋত। রিসিভ করতেই বেশ উদ্বিগ্ন গলায় বলল, অহনা কোথায় আঙ্কেল? আমি ফোন করলাম নট রিচেবেল বলছে কেন? ও কি বাড়িতে নেই?

অনিরুদ্ধ ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো। ফোনের সংলাপ যেন কোনোভাবেই শুনতে না পায় সুচেতা। সবে একটু স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করছে ও, এর মধ্যেই তিতিরের টেনশন ঢুকলে হয়তো খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে, দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে ঘরে।

বাইরে বেরিয়ে এসে বললো, হ্যাঁ নৈঋত, তিতির বাড়িতে নেই। কোথায় গেছে বলে যায়নি। ফোন করতে বারণ করে গেছে আমায়। কোনো একটা কাজে বেরিয়েছে এটা আমি জানি, তবে ঠিক কোথায় গেছে জানি না।

Sahitya Chayan

আঙ্কেল আমি বিকেলে একবার কল করবো, পেলে ভালো নাহলে একবার পুলিশে রিপোর্ট করা দরকার। খামখেয়ালিপনার একটা লিমিট থাকা উচিত, বাকিদেরও যে চিন্তা হয় এটা বুঝতে হবে ওকে।

নৈঋত ফোনটা রেখে দিয়েছে। অনিরুদ্ধ মনে মনে ভাবলো, তিতির বরাবরই এমন জেদি, সেটা আর কেউ না জানুক ও জানে ভালো করেই। তাই নৈঋত বা সুচেতার কাছে যেটা অস্বাভাবিক লাগছে অনির কাছে লাগছে না। বরং ওই মেসেজ আর চিঠিগুলো দেখার পরে যদি তিতির শান্ত হয়ে থাকতো তাহলেই ভয় করতো অনির। এখন ও নিশ্চিন্ত, সত্যিটা তিতির খুঁজে বের করবেই, কারোর কোনো হেল্প ছাড়াই করবে, আর তারপর আবার ফিরে আসবে শান্ত মনে। বিপদে পড়লে তার থেকে বেরোনোর রাস্তা ও নিজেই খুঁজে বের করবে। সবটা বোঝার পরেও বড্ড অস্থির লাগছে ওর। কোনো বিপদ হল না তো মেয়েটার! আর ভেবে বোধহয় তেমন কিছু লাভ নেই।

সুচেতার মনের অবস্থা ভালো নয়, ওকে সামলে রাখতে হবে।

দুপুরের লাঞ্চে বসেও সুচেতা বললো, কে জানে মেয়েটা কি খাচ্ছে! এর আগেও কাজের সূত্রে বহুবার বাইরে গেছে তিতির তখন সুচেতাকে এতটা অস্থির হতে দেখেনি অনি। বিয়ে ভেঙে যাওয়াটাকে অশুভ মনে করছে সূচী, তাই ভাবছে হয়তো তিতিরের কোনো বড় বিপদ হবে। অনিরুদ্ধ তাও বললো, তিতির কিন্তু মার্শাল আর্ট জানা মেয়ে, বুঝতেই পারছো আর পাঁচটা মেয়ের থেকে ও

Sahitya Chayan

অনেকটা বেশি শক্তিশালী। তাই এত দুশ্চিন্তা না করে মন দিয়ে খেয়ে নাও। বিজু মহারাজ তোমার প্রশংসা শুনবে বলে কতক্ষন অপেক্ষা করছে খেয়াল করো।

সুচেতা স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বললো, বিজুদা সব রান্না খুব ভালো হয়েছে। এবারে তুমি খেয়ে নাও।

অনি, তুমি সব মনে রেখেছো, আমার পছন্দের সব মেনু....সুচেতার চোখের কোণে জল টলটল করছে দেখেই মজা করে অনিরুদ্ধ বললো, মনে না রেখে উপায় আছে কিছু? আমার জীবনের একমাত্র নারী, যাকে চিরদিন নতুন লাগে, আজও অস্তগামী সূর্যের মত রহস্যময়ী লাগে। শীতের শেষে নতুন পাতার মত চিরহরিৎ লাগে, তার সব কিছু মনে রাখবো সেটাই তো স্বাভাবিক।

সুচেতা হাসছে, চোখে জল নিয়ে হাসছে। ঠিক এভাবেই নিজের ভালো লাগার উপলব্ধি প্রকাশ করতো সূচী।

চাটনি খেতে খেতে বলল, অহনার বিয়েতে এবারে কিন্তু তুমি কন্যাসম্প্রদান করবে। তোমার মেয়ে, তুমি উপস্থিত থাকলেই সব নির্বিঘ্নে হবে। অনি একটু থমকে বললো, সম্প্রদান করবো? কেন আমার মেয়ে কি গবাদি পশু নাকি, যে সম্প্রদান করবো? ওসব নিয়ম পালন আমি করতে পারবো না সূচী। আমার মেয়েকে আমি নৈঋতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে সাহায্য করবো, ওদের জীবনসঙ্গী হয়ে ওঠার জন্য হেল্প করবো, কিন্তু আমার তিতিরের ওসব সম্প্রদান হবে না। তিতির সদর্পে যাবে ওর আরেকটা

Sahitya Chayan

বাড়িতে। সুচেতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, বড্ড লাকি তোমার তিতির পাখি।

।।৩০।।

মামাই, দাদাভাই এখন বিয়ে করতে রাজি নয়। তুতান ড্রাইয়িংরুমে এসে বোমাটা ফাটিয়ে দিলো। অনু আর শুভ মুখ চাওয়া চাওয়ি করে বললো, এখন বিয়ে করবে না বলেছে নাকি কোনোদিনই করবে না বলছে রে তুতান?

দেখেছো বৌদি, ছেলেটা এমন আঘাত পেয়েছে যে বিয়ে শব্দটাকে পরমাণু বোমা ভাবতে শুরু করেছে। শুভ স্থির গলায় বলল, আহা, অনু তুমি একটু চুপ করবে। ব্যাপারটা বুঝতে দাও। নীলাদ্রি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, বোঝার তো কিছু নেই, আমি ব্যানার্জীদাকে কল করে বলে দিয়েছি, মিমিদের বাড়িতে কিছু জানানোর এখুনি দরকার নেই। নৈঋত একটু অফ মুডে আছে, ঠিক হলে আমরা যোগাযোগ করবো। ব্যস, আমার দায়িত্ব শেষ। ছেলের ব্যাপারে কোনোদিনই আমাকে খুব একটা দায়িত্ব কেউ দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়নি। তাই আজ নতুন করে এই জটিলতায় না ঢোকাই ভালো। ছোট থেকে ছেলে যার কাছে মনের কথা বলতো, সেই দায়িত্ব নিলে ভালো হয়। আমি চিরকালের দর্শক হয়েই রইলাম না হয়। নীলাদ্রির গলার স্বরে অভিমান না বিরক্তি নাকি ব্যঙ্গোক্তি সেটা ভালো করে বোধগম্য হলো না কাবেরীর। শুভ বললো, তুতান, কি বলেছে টুটাই পরিষ্কার করে বলতো আমাদের।

তুতান রামচন্দ্রের ভাই লক্ষ্মণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। টুটাইয়ের শিখিয়ে দেওয়া বক্তব্যের সঙ্গে নিজের

Sahitya Chayan

বুদ্ধি পাঞ্চ করে বলতে শুরু করল। আসলে কি বলতো বাবা, দাদাভাই এই মুহূর্তে খুব ডাউন আছে। এখন যদি বিয়ে নিয়ে তোমরা জোর করো তাহলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তার থেকে আবার সবকিছু স্বাভাবিক হবার সময়টুকু অন্তত দাদাভাইকে দিতে হবে।

দাদাভাই একটাই কথা বললো, বাড়িতে বলে দিস তুতান, এবারে আমি বিয়ে করলে লাভ ম্যারেজ করবো, অ্যারেঞ্জড নয়। নিজের পছন্দকে গুরুত্ব দেব আমি।

নীলাদ্রি নড়েচড়ে বসে বললো, লাভ ম্যারেজ? হোয়াট? এতদিন ওর লাভার কোথায় লুকিয়ে ছিল? তাহলে অহনার সঙ্গে বিয়েতে রাজিই বা হয়েছিল কেন?

অনু ভ্রু কুঁচকে বললো, দাদা, আমার তো মাথায় কিছুই ঢুকছে না রে। টুটাই পালিয়ে এসেছিল না অহনা বাধ্য করেছিল। ধুর, সব বড্ড গোলমেলে দেখছি। শুভ একটু থমকে বললো, তুতান তুই জানিস দাদাভাইয়ের প্রেমিকার কথা? কে সে? তুতানের পেটের মধ্যে হাসির বুদ্বুদের ঢেউ উঠছে, তবুও গম্ভীর মুখে ও বললো, নো আইডিয়া। দাদাভাই এই নিয়ে কিছু বলেনি আমায়। শুধু বলেছে, আমার জীবনটা এবার থেকে আমি বুঝে নেব।

যদি বাড়ির সকলে বেশি প্রেসার দেয় বিয়ে নিয়ে তাহলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। হিমালয় না আল্পস কোথায় যাবে সেটা এখনো ডিসাইডেড নয়।

অনু সবেতেই একটু বেশিই রিয়্যাক্ট করে। হিমালয়ের নাম শুনে প্রায় কঁকিয়ে বললো, না না কেউ বিয়ের জন্য জোর করবে না। বৌদিভাই, তুমি আর জোর কোরো না।

Sahitya Chayan

বাড়ির ছেলে বাড়িতে থাকুক, সন্ন্যাসী হয়ে যাবে এ তো ভাবতেই পারছি না গো। নীলাদ্রি বিরক্ত হয়ে বলল, জীবনটা যেন প্রহসন হয়ে গেল।

কাবেরী হিসেব কষছিলো মনের মধ্যে। বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেছে টুটাই বাড়িতে ফিরেছে অথচ কাবেরীকে একবারের জন্যও দোষারোপ করেনি, একবারও বলেনি, মা তুমি আমার জন্য কেন এমন একটা মেয়ে পছন্দ করলে যার বিয়ে করার ইচ্ছেটাই নেই। অথবা যার স্টেডি বয়ফ্রেন্ড আছে তাকে কেন আমার জন্য পছন্দ করলে? এসব কথা শোনার জন্য রেডি হয়েছিল কাবেরী। কারণ ছোট থেকে স্কুলের টিফিন বক্স খুলে যদি খাবার পছন্দ না হত তাহলেও টুটাই এসে কাঁদতে কাঁদতে বলতো, মা পচা টিফিন কেন দিয়েছিলে আমায়। কাবেরীর পছন্দ করা টিশার্টের কালার যদি টুটাইয়ের পছন্দ না হত তাহলেই বিদ্রোহ করতো। এমন চুপচাপ মেনে নেওয়াটা একটু অস্বাভাবিক।

টুটাই শান্ত, ভদ্র, বাধ্য, পরিবারের সম্মান সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন কিন্তু নিজের পছন্দ না হলে ওকে দিয়ে কোনো কাজ করানো যায় না। সেক্ষেত্রে অহনা বিয়েটা ভেঙে দেওয়ার পর, ওর সোশ্যাল পজিশন নষ্ট হবার পরও মাকে দোষী না করার কারণটা আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে কাবেরী! এতক্ষণে তো হুলুস্থুল হওয়ার কথা। কেন কাবেরী এমন মেয়ে পছন্দ করেছিল বলে তাণ্ডব করার কথা টুটাইয়ের, সেসব কিছুই হচ্ছে না। উপরন্তু বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে ঠান্ডা হয়ে বসে আছে টুটাই। কাবেরী

Sahitya Chayan

মনে মনে ভাবল, অহনাকে ফোন করে পৌঁছানোর সংবাদ দেওয়ার মধ্যে কি অন্য গল্প আছে? গল্পের মধ্যে গল্প বলেই হয়তো পরিষ্কার হচ্ছে না বিষয়টা। নজরে রাখতে হবে ছেলেটাকে। কিছু তো একটা চলছে টুটাইয়ের মধ্যে। সেটা যে ঠিক কি সেটাই বুঝতে পারছে না কাবেরী। টুটাইকে এ বাড়িতে যদি সব থেকে বেশি কেউ চিনে থাকে তাহলে সেটা কাবেরী। তারপরেও এত ধোঁয়াশা লাগছে কেন! নিজের ছেলেটাকেও যেন ঠিক করে চিনে উঠতে পারছে না ও। ব্যর্থতা, চূড়ান্ত ব্যর্থতা। টুটাইয়ের মনের খবর ওকে পেতে হচ্ছে তুতানের কাছ থেকে। কাবেরী হালছাড়া ভাবটা পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো, ছেলেটার সঙ্গে একটু কথা বলতে হবে, কিন্তু বাড়ির সকলের অলক্ষ্যে বলাটা জরুরি।

সবার মুখে বিরক্তির ছায়া, অনুষ্ঠান বাড়ির আমেজ হারিয়ে গিয়ে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে দোষারোপ আর ব্যঙ্গক্তি। পরিবেশটাই কেমন যেন বিষিয়ে রয়েছে। আগে চলছিল টুটাইকে ফিরে পাওয়ার আগ্রহ, ওকে নিয়ে একটা অজানা আতঙ্ক কাজ করছিল সবার মনে। তারপরেই যখন টুটাই সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছে এবং অহনার দোষ প্রতিপন্ন হয়েছে তখন থেকেই শুরু হয়েছে নতুন প্ল্যান। ইমিডিয়েট টুটাইয়ের একটা বিয়ে দিয়ে পরিবারের সম্মান বাঁচানোর লড়াই।

সত্যিই তো এইসব কিছুর মাঝে টুটাইয়ের মনের অবস্থা ঠিক কি সেটাই তো খোঁজ নেওয়া হয়নি মা হিসাবে। এতটা স্বার্থপর কবে হয়ে গেল কাবেরী! আজ

Sahitya Chayan

দুপুরে লাঞ্চে বসেও ছেলেটা খাবার নাড়াচাড়া করে উঠে গেছে, ঠিক করে খেতেও পারেনি। সোশ্যাল রেসপেক্ট ফিরে পেতে গিয়ে কাবেরী বোধহয় নিজের সন্তানকেই সব থেকে বেশি অবহেলা করছে। অনু রণে ভঙ্গ দেবার ভঙ্গিতে বললো, শুভ রিটার্ন টিকিট কেটে ফেলো, শুধু শুধু তোমার অফিস, তুতানের কলেজ কামাই করে লাভ কি হবে। টুটাই তো পরিষ্কার জানিয়েই দিয়েছে, এখন বিয়ে করবে না। নীলাদ্রি সোফা থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বললো, যাই বইপত্র ঘাঁটি একটু। নিজেকে অন্যমনস্ক রাখতে হবে বুঝলে শুভ, তাই বই পড়তে হবে।

শুভ ফিসফিস করে বললো, বৌদিভাই, তুমি কিন্তু টুটাইয়ের সঙ্গে সফট ভাবে একটু কথা বলো, দেখো যেন ছেলেটা ডিপ্রেশনে না চলে যায়। কাবেরী একাই সোফাতে বসেছিলো, বাকিরা যে যার ঘরে চলে গেছে।

সকলে চলে যাবার পরেই টুকটুক করে টুটাইয়ের ঘরের দিকে এগোলো কাবেরী।

ঘরের দরজায় সামনে দাঁড়িয়েই শুনলো ফোনে কথা বলছে টুটাই। যদিও কারোর পার্সোনাল কথা শোনাটা অত্যন্ত অন্যায় তবুও অহনা নামটা টুটাইয়ের মুখে শুনে পা দুটো থমকে দাঁড়িয়ে গেল কাবেরীর। অভব্যতা হচ্ছে জেনেও সরে এলো না দরজার সামনে থেকে।

টুটাই বলছে, তোমায় আমি কাল দুপুর থেকে কল করছি, নট রিচেবেল কেন বলছিলো? কোথায় তুমি?

এই অহনা চুপ করে কেন আছো? প্লিজ বলো, কি হয়েছে? বাড়ি থেকে তো গতকাল বেরিয়েছিলে, এখনও

Sahitya Chayan

ফেরনি কেন? কোথায় আছো বলবে কিছু? বুঝলাম তুমি কাজে আছো, কিন্তু কোথায় আছো? কলকাতায় এসেছো কি?

তাহলে কোথায়? ওই কালিয়াগঞ্জ নাকি একটা জায়গার নাম করেছিলে সেদিন ট্রেনে, ওখানে গেছো? প্লিজ অহনা, ফর গড সেক কিছু বলো! তোমার নিস্তব্ধতা আমায় কষ্ট দিচ্ছে অহনা। শুধু নিঃশ্বাসের আওয়াজ পাচ্ছি আমি, আর তাতেই বুঝতে পারছি মন ভালো নেই তোমার। একবার বলেই দেখো পারি কিনা! অ্যাড্রেস দাও কাল সকালেই বান্দা হাজির হয়ে যাবে তোমার কাছে। কাবেরী বেশ বুঝতে পারলো, টুটাই কেন অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। মুচকি হেসে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল ও।

নৈঋত বললো, তোমার মন ভালো করার টোটকা আছে আমার কাছে।

অহনা গাঢ় নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, নৈঋত সত্য অপ্রিয় নিশ্চয়ই শুনেছ, কিন্তু সত্য যে ভয়ঙ্কর সেটা কি কখনো শুনেছ? ধর সেই ভয়ঙ্কর সত্যের সামনে তুমি একা দাঁড়িয়ে আছো, কূলের হদিশ নেই তখন কি করবে নৈঋত? দিশেহারা হয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দেবে বুঝি?

নৈঋত বললো, ঝাঁপ তো অবশ্যই দেব তার আগে সাঁতারটা শিখে নিতে হবে। সে তোমার জন্য আমি সাঁতার কাটতেও রাজি।

অহনা নিঃস্পৃহ গলায় বলল-

একদিন আমি পাখি হতে চেয়েছিলাম।

আকাশকে ছুঁয়ে ফেলবার তীব্র কামনায়।

যতবার আকাশকে ছুঁতে গেছি ..

ততবার সে সরে গেছে কয়েক যোজন দূরে।

আমার আকাশকে স্পর্শ করা আর হয়ে ওঠেনি।

আমি বৃষ্টি হতে চেয়েছিলাম।

সিক্ত হতে চেয়েছিলাম আপন খেয়ালে।

যতবার ভিজিয়ে দিতে চেয়েছি নিজেকে,

ততবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি মেঘের থেকে।

মেঘের সাথে সিক্ততা আর হয়ে ওঠেনি।

আমি ফড়িং হতে চেয়েছিলাম,

চেয়েছিলাম নগণ্য জীব হয়ে

সকলের দৃষ্টির আড়ালে স্বাধীনভাবে বাঁচবো।

ছোট্ট বাচ্চারা তাদের খামখেয়ালি খেলার বশে

আমার পায়ে সুতো বেঁধে কেড়ে নিলো আমার স্বাধীন থাকার ইচ্ছেদের।

অমলকান্তিও রোদ্দুর হতে পারেনি।

আমিও পারিনি ডানা মেলে উড়তে।

অদৃশ্য সুতোর টানে ঘুড়ির মতোই

বারবার ফিরতে হয়েছে ধরা বাঁধা জীবনে।

নৈঋত প্রায় চিৎকার করে বললো, কার লেখা অহনা?

অহনা একটু থেমে বললো, আমার। অগোছালো এলোমেলো আমির গল্প এটা।

Sahitya Chayan

অহনা, তুমি একটা সুযোগ দাও আমায়, আমি তোমায় আপাদমস্তক সিক্ত করি আমার ভালোবাসা দিয়ে। যখন ছটফট করতে করতে তুমি বলবে আমি ভিজে গেছি প্রেমে, তখন নিস্তার পাবে। তখন বুঝবে অসহ্য রকমের ভালো লাগা কার নাম! আর স্বাধীনতা? ওটা তোমাকে কারোর কাছ থেকে ভিক্ষে করতে হবে না, ওটা তুমি নিজেই ছিনিয়ে নেবে এই সমাজের কাছ থেকে।

অহনা, একটা কথা সত্যি করে বলো তো, আমি যখন চলে আসছিলাম তোমাদের বাড়ি থেকে তখন তোমার চোখের কোণে বিষণ্ণতার ধূসর রং লেগেছিল। আমি কি স্পর্ধা করে ওই বিষণ্ণতার এক টুকরো আমার জন্য তৈরি হয়েছে এমন ভাবতে পারি? নাকি ওই বিষণ্ণতার ওপরে আমার কোনো অধিকার নেই, ও শুধুই তোমার একান্ত ব্যক্তিগত!

অহনা যেন সুদূর আরব সাগরের তীর থেকে ক্ষীণ স্বরে বললো, নৈঋত আমি সত্যের খুব কাছে এসে গেছি, জানি না এই সত্য তোমার সামনে এলে তুমি কি বলবে! ভালোবাসা পাওয়ার জন্য ছটফট করবে নাকি আমার থেকে দূরে যাওয়ার জন্য কাতর হবে।

নৈঋত অল্প হেসে বললো, অহনা, আকাশের তারা গোনা আমার কাজ নয়। চন্দ্র, সূর্যের হিসেব নেওয়াও আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি শুধু ওই বিশাল আকাশকে চিনি। যে কখনো উজ্জ্বল নীল, কখনো মেঘের ভারে বিষণ্ণ থাকবে, কখনো আবার বৃষ্টিতে ভিজবে প্রাণ ভরে।

Sahitya Chayan

যাই পরিবর্তন হয়ে যাক না কেন সে আকাশই থাকবে। তার বুকে যদি তারারা না ওঠে, সূর্য যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, চাঁদ যদি অভিমান করে সরে যায় দূরে, তবুও আকাশ কিন্তু একই থাকবে তার বিশালতা নিয়ে।

অহনা ধীরে ধীরে বললো, কিন্তু সূর্য না উঠলে যে অন্ধকার হয়ে যাবে আকাশ।

নৈঋত গাঢ় গলায় বলল, আমি সেই ঘন অন্ধকারেও আকাশকে ঠিক চিনে নেব। কেন জানো, কারণ সে মিশে যাবে না ভিড়ে। তাই অহনা তুমি আমার এক্সাম নিয়ে দেখো, সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও আমার হাতের মুঠোতে থাকবে তোমার হাত। ভয় পেয়ে যেও না, মুঠো আলগা করবো না আমি। প্লিজ অহনা, এভাবে দূরে ঠেলে দিও না আমায়। একটা সুযোগ দিয়ে দেখো, ব্যর্থ হলে চলে আসবো কোনো প্রশ্ন না করে।

অহনা বললো, বেশ তাহলে আগামীকাল চলে এসো রাইগঞ্জের আশ্রয় কমপ্লেক্সে, আমি কাল ওখানেই যাবো। আপাতত দুটো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সারছি, দুটো ইনফরমেশন পেলেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাবো, আমার ধারণা সত্যি না অমূলক। মাত্র দুটো মেলের জন্য ওয়েট করে আছি। যদি সত্যি হয়, তাহলেও তুমি আমার পাশে থাকো কিনা সেটাও পরখ করা যাবে। নৈঋত হেসে বললো, ম্যাডাম আমি জীবনের সব এক্সামে ভালো নম্বর পেয়েছি, আশা রাখি এ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হবো সাফল্যের সঙ্গে। আসলে কি বলো তো অহনা, এটা জেদ নয় এটা আগ্রহ, তাই জিতে যাবো।

Sahitya Chayan

সাবধানে থেকো প্লিজ। আগামীকাল দেখা হবে।

অহনা কেটে দিলো ফোনটা। নৈঋত মনে মনে বললো, নিজের মনের পরিবর্তন নিজেই বুঝতে পারছে ভালো করে, এমন অদ্ভুত অনুভূতি তো এর আগে কখনো হয়নি!

যতক্ষণ অহনার সঙ্গে কথা বলছিল ততক্ষণ যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। ফোনটা কেটে যেতেই মনখারাপি বাতাস এসে একটু একটু করে ছেয়ে দিচ্ছে নৈঋতের অবুঝ মনটাকে। এই অদ্ভুত অনুভূতির নাম ঠিক কি, সেটাই তো জানে না নৈঋত। বিয়ের আসর থেকে চলে আসার সময় মারাত্মক রাগ হয়েছিল মেয়েটার ওপরে। যখন ওর সঙ্গে ট্রেনে চেপেছিলো জোর করে, তখনও ভেবেছিল শেষ দেখে ছাড়বে। এই মেয়েকে দিয়ে ঘাড় ধরে বলাবে, আমার দোষ, নৈঋত নির্দোষ। তারপর কখন, ঠিক কখন যে নৈঋত ভেসে গেল চোরাস্রোতে সেটা ও নিজেও জানে না। যখন বুঝতে পারলো ও ভাসছে তখন দেখলো সমুদ্রের মাঝখানে অবস্থান ওর। সাঁতার না জানা নৈঋত হাবুডুবু খেতে খেতে বুঝেছিলো, অহনাই ওর ডেস্টিনি। অহনাকে না পেলে কিছুতেই ভালো থাকতে পারবে না ও। ঠিক তখন থেকেই অহনার সরিয়ে দেওয়া হাতটা শক্ত করে ধরে রাখার চেষ্টায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে ও। মেয়েটা এখন সত্য মিথ্যে নিয়ে চরকা কাটছে, বুঝতেই পারছে না, নৈঋতের জীবন সংশয় ওকে ছাড়া। এই অনুভূতিগুলো কাকে বোঝাবে ও? ইস, রিপোর্টাররা যে এমন আনরোম্যান্টিক হয় জানা ছিল না নৈঋতের। কি আর করা যাবে, এখন ফেরার উপায় নেই। কারণ নিজের

Sahitya Chayan

ব্যক্তিত্বের জোরে নৈঋতের হৃদয়ে পার্মানেন্ট জায়গা করে নিয়েছে অহনা। ওকে সরানো নৈঋতের সাধ্যের বাইরে।

কেউ একটা দরজায় নক করে বললো, একবার আসতে পারি? নৈঋত প্রমাদ গুনলো। মা এভাবে ফরম্যালিটি করছে মানেই কিছু নিয়ে আলোচনা করতে চায়। কাবেরী বসুর চোখকে ফাঁকি দেওয়ার ক্ষমতা ও এখনো অর্জন করে উঠতে পারেনি।

তাও খুব স্বাভাবিক গলায় নৈঋত বললো, এসব কি হচ্ছে? চলে এসো।

কাবেরী এসে বসলো নৈঋতের বিছানার এক কোণে। সেই সুযোগে ও বললো, মা কাল আমায় একবার বেরোতে হবে। ফিরতে হয়তো রাত হবে। একটু পার্সোনাল কাজ আছে। কাবেরী কোনো ভণিতা না করেই বললো, অহনার সঙ্গে দেখা করতে যাবে? একটা কথা মনে রেখো, এই ফ্যামিলির কেউ কিন্তু আর অহনাকে মেনে নেবে না। এটা ভেবেই এগোচ্ছ নিশ্চয় তুমি? মা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সময় টুটাইকে তুমি বলে সম্বোধন করে, এটা ওর খুব একটা অস্বস্তির জায়গা। তবুও আজ শান্ত স্বরেই বললো, মা আজ তোমার অবাধ্য হয়েই বলছি, আমি অহনাকে ভালোবেসে ফেলেছি। সুপরিকল্পিতভাবে নয়, নেহাতই আকস্মিক। হয়তো তুমি হাসবে আমার ভালোবাসার দিনের সংখ্যা গুনে। তবুও আমি বলবো, মুহূর্তের হিসাবে ভালোবেসেছি ওকে, তাই সময়টা নেহাত কম নয়।

Sahitya Chayan

কাবেরী অপলক তাকিয়ে দেখছে টুটাইকে। কবে থেকে টুটাই এত স্পষ্ট ভাবে নিজের মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে শিখলো? এটা একেবারেই অজানা ছিল কাবেরীর কাছে। নাকি এই দুদিনে অহনার সংস্পর্শে এসে বদলে গেছে টুটাইয়ের ভাবনাচিন্তা। জীবন সম্পর্কে এত স্পষ্ট ধারণা কি ওকে অহনাই দিয়েছে!

কাবেরী বেশ পরিষ্কারভাবে বললো, আমিও কিন্তু পাশে থাকবো না তোমার। সম্পূর্ণ একা বসু পরিবারের বিরুদ্ধে অহনার জন্য লড়তে পারবে তো টুটাই? ভালো করে ভেবে নিও। টুটাই স্মিত হেসে বললো, পারবো মা। এটা একান্ত আমার উপলব্ধি, অহনাকে ছাড়া অন্য কাউকে স্ত্রী হিসাবে মেনে নিতে পারবো না। আচ্ছা মা, বাবাকে ছাড়া অন্য কারোর সঙ্গে বিয়ে দিলে তুমি মানতে পারতে? বোধহয় পারতে না, তাই ওয়েট করেছিলে পিমনির বিয়ে হওয়া পর্যন্ত। তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে, একজনের স্থানে অন্যজনকে জোর করে বসালে মেনে নিতে নিতে জীবনটাই ফুরিয়ে আসে। ফুরিয়ে যায় বেঁচে থাকার রসদগুলো। শুধু মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়ার লড়াই করতে করতে কাটিয়ে দিতে হয় গোটা জীবনটা। তুমি কি চাও, তোমার টুটাই সেভাবে কাটাক বাকি জীবনটা? যদি অহনা ওর জীবনে আমায় স্থান না দেয় তবে আমি তোমার টুটাই হয়ে রয়ে যাবো মা। ভালোই তো হবে, আমার বউকে ভাগ দিতে হবে না আমার। কাবেরী হেসে বললো, আমি টিপিক্যাল শাশুড়ি নই রে টুটাই। বিয়ের পরেও তুই আমার সন্তানই থাকবি, আর তোর বউয়ের স্বামী। কোনো

Sahitya Chayan

লড়াই থাকবে না এই দুটো সম্পর্কে। কিন্তু টুটাই, অহনা যেটা করলো তারপরে....

মাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই নৈঋত বললো, মা ও নিরুপায় ছিল। ও যে সত্যি ঢেকে এগোতে পারে না, তাই পারলো না বিয়েটা করতে। কাবেরী চিন্তাগ্রস্তভাবে বললো, আমারও তাই মনে হয়েছিল জানিস টুটাই। অহনা এরকম মেয়ে নয়। নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর কারণ আছে। হ্যাঁ রে টুটাই, তুই কিছু আন্দাজ করতে পেরেছিস?

মা আবার তুইতে ফিরে আসায় নিশ্চিন্ত লাগছিলো নৈঋতের। একটু থেমে বললো, ঠিক আন্দাজ করতে পারিনি, তবে এই কাজটা ওর প্রফেশনাল নয়, পার্সোনাল বলেই মনে হলো। মে বি, ওর বাবা মায়ের মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের কারণটা ও খুঁজে পেয়েছে আর সেই তৃতীয় ব্যক্তিটিকে আইডেন্টিফাই করার জন্যই এমন করলো। হয়তো ও চেয়েছিল ওর বাবা বিবাহবাসরে উপস্থিত থাকুক। তাই সমস্যাটা মেটানোর জন্য এমন একটা মারাত্মক সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলো। কাবেরী বললো, সবেতেই তো তুই "হয়তো", "যদি", "মে বি" বসাচ্ছিস। তার মানে তোর কাছে কংক্রিট কোনো আনসার নেই, তাই তো?

টুটাই একটু ভেবে বললো, মা একটা জিনিস অত্যন্ত ক্লিয়ার। ওর বাবা বাইরে কোথাও যায়নি, কলকাতার বাইরে রাইগঞ্জের খুব কাছে দেশের বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলো নিজের একমাত্র মেয়ের বিয়ের সময়, এটাই কি যথেষ্ট নয় একটা কিছু গন্ডগোল আছে বুঝতে। আবার

Sahitya Chayan
দেখো, তিতিরকে যে ওর বাবা ভালোবাসে না তা নয়। পাপা কি পরি সে। তাই জন্যই এমন একটা ভুল কাজ করার পরেও বাবার কাছেই ছুটে গেল। কারণ ও জানতো, যাই ঘটে যাক বাবা আমায় ফেরাবে না। বুঝতে পারছ আমি কি বলছি? আবার আমি নিজের কানে শুনেছি তিতিরের বাবা ওর মাকে ফোনে আশ্বাস দিচ্ছে, অহনার কিছু হয়নি, ও ভালো আছে, তুমি চিন্তা কোরো না। তার মানে ডিভোর্সি নয়। রিলেশন ভালোই আছে। হয়তো একটা ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছে, এবং সেটা খুব রিসেন্ট। অহনা কথায় কথায় বলেছিল, এই তো মাস তিনেক আগে ও যখন বাইরে গিয়েছিল কাজে তখন ওর বাবা আর মা দুজনেই ছিল কলকাতাতে ফ্ল্যাটে, তাই দুজনের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ফোনের ভারে নাকি ও পাগল হতে বসেছিল। দুজনে নাকি প্ল্যান করে কল করতো। একজন সকালে, আরেকজন রাতে। আর ফোন করেই ওর বাবা বলতো, সকালে তো মায়ের সঙ্গেই কথা বললি, আমার সঙ্গে তো কথাই হলো না, তাই এখন করলাম।

অহনা বলছিলো, আসলে ও বাইরে গেলে দুজনেই টেনশন করে, অথচ ও রেগে যাবে বলে ঘনঘন কল করতেও পারে না। তাই এমন যৌথ প্ল্যান চালাত ওর ওপরে। তাহলে বলো মা, তিনমাস আগেও ওর বাবা-মা একসঙ্গে ছিল। হঠাৎ মেয়ের বিয়ের আগে কি এমন ঘটে গেল যে এমন আলাদা থাকবে?

কাবেরী বললো, ঠিকই বলছিস। তোর বাবা যখন কথা বলতে গিয়েছিল মাস দুয়েক আগে তখন ভদ্রলোক তো

Sahitya Chayan

এমন কোনো ইঙ্গিতও দেননি। যদিও তোর বাবার মনে সন্দেহ তৈরি হয়েছিল। তার মানে এই ঘটনা মাস দুয়েকের। কিন্তু বাবা-মায়ের এই সমস্যা জেনেই তো অহনা বিয়েতে বসতে যাচ্ছিল, তারপর ঠিক কি হলো!

নৈঋত বললো, মা আমিও ঠিক এইখানে এসেই থমকে যাচ্ছি। যুক্তিগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। তবে একটা কথা বিশ্বাস করি, অহনা মিথ্যেবাদী নয়, প্রবঞ্চক নয়। তাই সত্যিটা জানতে পারলে ও আমায় জানাবেই।

কাবেরী ফিসফিস করে বললো, তাহলে আমার পছন্দ তোকে কুপকাত করলো কি বল? একেবারে ভাসছিস তো।

ঘরের বাইরে একটা পায়ের আওয়াজ পেয়েই কাবেরী বললো, শোনো টুটাই, আমি আর তোমার বিয়ের ব্যাপারে নেই। তোর বাবা, পিসি যা বলবে সেটাই হবে। আমি এসব নিয়ে কোনো কথাই বলতে চাই না। নিজে যেটা সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই করবে। দয়া করে লোক হাসিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যেও না।

অনু বাইরে থেকেই বললো, বৌদি আসবো?

পিসিমণি ঘরে ঢুকেই টুটাইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, বৌদি একদম ঠিক বলেছে টুটাই। তোর যাকে পছন্দ তুই বিয়ে করিস, না ইচ্ছে হলে করিস না। কিন্তু বাড়ি ছাড়ার কথা ভাববি না। আমরা কেউ তোকে বিরক্ত করবো না রে। নৈঋত বললো, আহা, তুমি এত কাঁদো কেন পিমণি? তুমি কি ক্রাইং মেশিন? আমি কোথাও যাচ্ছি না। একটু সময় দাও, আমার বিয়েতে তুমি কাঞ্চিপুরম

Sahitya Chayan

পরেই সাজবে, বুঝলে? অনু চোখে জল নিয়ে হেসে বললো,সত্যি? বেশ বাবা, তুই তোর পছন্দের মেয়েকেই বিয়ে করে আনিস, বৌদি বরণ না করলে আমি করবো। আমি তোর মা নই যে জোর করে কাউকে তোর ওপরে চাপিয়ে দেব। কাবেরী মুচকি হেসে বললো, অনু, তোমাদের প্রশ্রয়েই ছেলেটা এমন বিগড়ে গেল। অনু ভ্রু কুঁচকে বললো, টুটাইয়ের মত ছেলে আরেকটা খুঁজে নিয়ে এসো দেখি?

কাবেরী গম্ভীর ভাবে বললো, অনু, এখন যদি টুটাই অহনাকে বিয়ে করে বাড়িতে ঢোকে মেনে নেবে ওই মেয়েকে? বিয়ে ভেঙে দিয়ে ওই মেয়ে এই বাড়ির সম্মান হানি ঘটিয়েছে, তাও মেনে নেবে?

অনু একটু থমকে বললো, দেখো বৌদিভাই আমি অত হিসেব বুঝি না, টুটাই যাতে ভালো থাকবে তার জন্য সব মেনে নেব।

কাবেরী ছদ্ম গাম্ভীর্যে বললো, কিন্তু ওই মেয়েকে আমি মেনে নেব না কিছুতেই। অনু রাগ করে বললো, তুমি বোধহয় ভুলে যাচ্ছ টুটাই আমারও ভাইপো। তাই ওর ওপরে আমারও অধিকার আছে। তুমি মেনে না নিলেও বিয়ে হবে, আমি দাঁড়িয়ে থেকে দেব। আমি বললে দাদাও অমত করবে না। অনু উঠে দাঁড়িয়ে বললো, টুটাই আমি তোর পাশে আছি। তুই যাতে ভালো থাকবি সেটাতেই মত দেব আমি, দাদা আর তোর পিসে। নিশ্চিন্তে থাক তুই।

Sahitya Chayan

চিরকালের জেদি মানুষ একটা....কাবেরীর উদ্দেশ্যে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল অনু।

কাবেরী বললো, দাদার চামচা। চিরটাকাল দাদা আর বোন দুজনে দুজনের তালে তাল মেলানো পাবলিক। তবে মনটা ভালো অনুর। আর তোকে ভালোবাসে খুব। তুতান ঢুকে বললো, দাদাভাই একটা মিরাক্যাল ঘটেছে। মা গিয়ে বাবাকে বলছিলো, টুটাই যদি অহনাকেও বিয়ে করে আনে তাতেও আমার অমত নেই। বৌদি যদি মেনে না নেয়, আমি বরণ করবো। টুটাইয়ের ভালো থাকাটাই জরুরি। কাবেরী বললো, বেচারি পাঁচটা শাড়ি কিনেছিলো ভাইপোর বিয়েতে পরবে বলে, তাই বোধহয় তাড়াহুড়ো করছে। তুতান একটু বোকার মতন তাকিয়ে থাকলো নৈঋতের দিকে, তারপর কারোর খুব একটা উচ্ছ্বাস নেই ওর এমন একটা এক্সাইটিং খবরে সেটা বুঝতে পেয়েই পায়ে পায়ে বেরিয়ে গেল।

কাবেরী বললো, তুই কাল বেরোবি তো? কোথায় যাবি, কেন যাবি, জিজ্ঞেস করব না, শুধু বলবো, তোর ইচ্ছেপূরণ হোক। নৈঋত মায়ের কোলে মুখটা ডুবিয়ে বললো, তুমি হলে ওয়ার্ল্ডের বেস্ট মম। কাবেরী ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, উঁও তো ম্যা হুই।

কাবেরী বেরিয়ে যেতে যেতে বললো, অহনার বাবাকে বেশ হ্যান্ডু দেখতে তাই না রে?

নৈঋত হেসে বললো, তা হ্যান্ডু আছে, কিন্তু বড্ড বউ হ্যাংলা। দিনরাত নিজেদের প্রেমের গল্প করে যাচ্ছে। কাবেরী মজার গলায় বলল, তার মানে চান্স নেই বলছিস?

Sahitya Chayan
কি আর করা যাবে, পরকীয়া সকলের কপালে থাকে না বুঝলি? যাই, আমার ব্যক্তিগত ভদ্রলোক কেমন মুডে আছে একবার পরখ করে আসি। যদিও তাহার ভগিনী এতক্ষণে আমার কার্যের অর্ধেক সম্পন্ন করিয়া দিয়েছেন। মাকে এই মুডে অনেকদিন পরে দেখলো নৈঋত। তার মানে মাও ওর মত অহনার ব্যক্তিত্বের জাদুতে ফিদা, এটুকু মানতেই হবে। তাই অহনার এবাড়িতে আসার সম্ভাবনা আছে জেনেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছে। বেশ মজার মুডে আছে মা, যাক মুখের ওপর থেকে অপমানের গ্লানিটা অন্তত নামাতে পেরেছে নৈঋত। অহনা যে ইচ্ছে করে মাকে অপমান করেনি, এটা জেনেই ফুলফর্মে ফিরে এসেছে কাবেরী বসু।

নৈঋত পিঠের ছোট্ট ব্যাগটাতে টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস গুছিয়ে নিলো। গাড়ি ড্রাইভ করে যাবে, ট্রেনে আর নয়। তাই গুগুল ম্যাপটা খুলে রুটটা দেখতে লাগলো। দুদিন আগেও অহনা ছিল না ওর জীবনে, এখন এই নামটাই কতটা জুড়ে আছে, ভেবেই ঠোঁটের কোণে নরম হাসি ফুটলো নৈঋতের। ট্রেনে ওই ছেলেগুলোকে অহনার বলা কথাগুলো মনে পড়ে হো হো করে হেসে উঠলো নৈঋত। বাপরে, কি সাংঘাতিক মেয়ে। শান্তশিষ্ট মুখটা দেখে বোঝার উপায় নেই এমন মারকুটে টাইপ অহনা। ঠিক নৈঋতের বিপরীত, আর সেই জন্যই ওর প্রতি এতটা আগ্রহ তৈরি হয়েছে মনে। শুধুই আগ্রহ বলে ওড়াতে চাইলেও ওড়াতে পারছে না নৈঋত, বেশ বুঝতে পারছে এটা ভালোবাসা। ভালোবাসার সঠিক সংজ্ঞা জানা নেই।

Sahitya Chayan

তাই সমীকরণে ফেলতে পারছে না ঠিকই কিন্তু অচেনা অনুভূতিরা ক্রমাগত ইঙ্গিত করছে ভালোবাসার দিকেই। অহনা যে ওকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করে ডেকেছে ওর কাজে, সেটাই তো পরম পাওয়া, যা গোঁয়ার অনিরুদ্ধ পালের মেয়েটা, বাপরে। মুচকি হেসে পাশ ফিরলো নৈঋত। মনে মনে বললো, প্লিজ তিতির, আজ রাতে স্বপ্নে এসো আমার। তোমার লুকানো ডানাদুটো দিয়ে উড়তে উড়তে এসো আমার স্বপ্নে। সারারাত অনেক গল্প করি। কথা দিলাম, নো দুষ্টুমি, অনলি গল্প আর কবিতা।

সকালে উঠে রেডি হতে হতে শুনলো, বাবা মাকে জিজ্ঞেস করছে, তুমিও জানো না টুটাই কোথায় যাচ্ছে? মা শান্ত গলায় বলল, না জানি না। আমায় বলেছে কি একটা কাজ আছে পারসোনাল। তাই আমি জিজ্ঞেস করিনি। মায়ের গলাটা একটু কেঁপে গেল বোধহয়, মিথ্যে একেবারেই বলতে পারে না মা। সত্যের জন্য লড়াই করে কিন্তু মিথ্যা বলা একেবারেই অভ্যেস নেই কাবেরীর। নৈঋত বেশ বুঝতে পারছিল, বাইরে বেরোলেই নীলাদ্রি বসুর প্রশ্নটা ধেয়ে আসবে ওর দিকে তাই উত্তর রেডি করে তবে যেতে হবে ড্রয়িংয়ে, না হলে মুশকিল।

নৈঋত বেরোতেই বাবা জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাচ্ছিস এত সকালে? ও রেডি হয়েই ছিল। বললো, কলেজের একটা কাজ আছে, যেতে হবে। নীলাদ্রি একটু সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, কদিন পরে যেতে পারতিস তো, এখনই কলেজে গেলে হয়তো কলিগ বা স্টুডেন্টরা এই নিয়ে কিছু মজা করবে। নৈঋত হেসে

Sahitya Chayan

বললো, দুদিন পরে গেলে কি সত্যিটা মিথ্যে হয়ে যাবে বাবা? বরং সত্যিটা অপ্রিয় হলেও ফেস করতে হবে। শুভময় ঘাড় নেড়ে বললো, এই জন্যই টুটাই আমার এত প্রিয়। স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড, মুখ লুকিয়ে বসে থাকার ছেলে ও নয়। ভদ্রতা মেইনটেইন করে সঠিক কথা বলতে ও জানে। কাবেরী এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বললো, যেকোনো প্রব্লেমে পড়লে কল করবি, বুঝলি? ফোন সুইচ অফ করে রেখে দিও না, আমি টেনশনে থাকবো। নৈঋত ঘাড় নেড়ে বললো, করবো, ডোন্ট ওয়ারি।

গুগল ম্যাপ দেখে গাড়ি চালাচ্ছিল নৈঋত। পৌঁছাতে প্রায় ঘণ্টা তিনেক তো লাগবেই। একবার অহনাকে কল করে বলে দেবে কি, যে ও বেরিয়ে পড়েছে। ভাবতে ভাবতেই অনিরুদ্ধবাবুর নামটা ফুটে উঠলো গাড়ির স্ক্রিনে। রিসিভ করতেই বেশ উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, অহনার কোনো খোঁজ পেয়েছো নৈঋত। আমি তো ওকে ফোনে পাচ্ছি না।

নৈঋত সাবধানে বললো, হ্যাঁ ওর সঙ্গে কাল কথা হয়েছে আমার। ও যেখানে আছে সেখানে সিগনাল একটু খারাপ, তাই অনেক সময় ঘরের মধ্যে থাকলে ফোন নট রিচেবেল বলছে। তবে ভালো আছে।

বেশ জোরেই দীর্ঘশ্বাসটা ছাড়লেন অনিরুদ্ধবাবু, তারপর শান্ত স্বরে বললেন, যাক তোমার সঙ্গে কথা বলেছে এই শান্তি। আমাদের ফোন তো রিসিভই করছে না। জানি না, আমাদের ওপরে ওর কিসের এত অভিমান জমলো! নৈঋত একটা রিকোয়েস্ট করবো? যতদিন না মেয়েটা বাড়ি

Sahitya Chayan
ফেরে ততদিন একটু খোঁজ খবর নিও, আর আমায় একটু জানিও, তাহলে অন্তত দুশ্চিন্তাটা কমে। নৈঋত বললো, টেনশন করবেন না স্যার, আমি জানাবো আপনাকে।

।।৩১।।

কপিল, বাপ্পা, সুজয় তোরা রেডি তো, মাগিটা আজ আসবে বলেছে। একটু আগেই ফোনে জানিয়েছে। দুজন স্টেশনে যাবি আর দুজন তিনতলার ওই কোণের ঘরটাতে আমাদের বিছানাটা পেতে রাখবি।

সুজয় হেসে বললো, গুরু চাখা যাবে? নাকি টাকার জন্য নিরামিষ থাকতে হবে। পীযুষ হেসে বললো, সে ধীরে সুস্থে চাখবি খন। আগে তো টাকাটা হাতাই। জুয়ায় হেরে গিয়ে বহু টাকা বাজারে ধার হয়ে গেছে রে। তাই প্রায় মাস দুয়েক ধরে গুটি সাজিয়েছি। কম খবর জোগাড় করতে হয়েছে, কম লোককে টাকা খাওয়াতে হয়েছে? সেসব আগে তুলে নিই ওই সাংবাদিক বাপটার কাছ থেকে তারপর না হয় দেখে শুনে মেয়েটাকে ভোগ করিস তোরা।

এখন কথা না বাড়িয়ে যা দেখি, অটো আমি ভাড়া করেই রেখেছি। চলে আসবে সকাল সকাল। চা ফা খেয়ে রেডি হয়ে যা। কোনোরকম ভুল হলে কিন্তু জেলে থাকবি হারামিগুলো, তাই খুব সাবধানে। কপিল ঘাড় নেড়ে বলল, চিন্তা করো না গুরু। তোমার কাজ হাসিল হলে আমরাও তো পেসাদ পাবো।

ভাড়া করা অটোতে চেপে স্টেশনে চলে গেছে। বিশ্বনাথবাবু বা উৎপলবাবু আজ-কাল আসবে না আশ্রয়

Sahitya Chayan

কমলেক্সে। সিকিউরিটির ওপরে দায়িত্ব দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত আছে দুজনেই। এই মোক্ষম সুযোগটা অবশ্য যেচেই এসেছে পীযুষের হাতে। সুশোভন মাস্টারের নাতনির বিয়ের খবর থেকে মেয়েটার ফোন নম্বর সবটাই পীযুষ জোগাড় করেছে অত্যন্ত সচেতনভাবে। তবে এমন একটা মুখরোচক খবর যে লুকিয়ে ছিল এতদিন সেটা অবশ্য বুঝতে পারেনি। সেটা জানার পর থেকেই মনটা নেচে উঠেছে পীযুষের। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলার বান্দা ও নয়। এখন শুধু মেয়েটাকে এখানে এনে ফেলার অপেক্ষা, ব্যস কেল্লা ফতে। আসল সত্যিটা চাপা দেওয়ার জন্য বড়লোকগুলো কত টাকা খরচ করতে পারে তা ওর ভালোই জানা আছে। অনিরুদ্ধ পাল হয়তো পীযুষকে বাড়িতে ডেকে পাঁঠার মাংস খাওয়াতে খাওয়াতে হস্ত জোর করে বলবে, এ খবর কাউকে দিও না পীযুষ, বল কত চাই? আর অনিরুদ্ধর সুন্দরী বৌটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে আর পাখার বাতাস করবে পীযুষকে। চোখ বন্ধ করেই স্বপ্নটা দেখছিল পীযুষ, বিড়িতে সুখ টান দিতে দিতে। সুজয় এসে বললো, গুরু ওরা নীচে এসে গেছে।

বিড়িটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো পীযুষ।

মাগিটাকে টিভিতে দেখেছে কপিল, পীযুষ অবশ্য দেখেনি, পীযুষ শুধু ছবি দেখেছে, অবিকল সুচেতার অল্প বয়েস, তবে সুচেতার মত ফর্সা নয়, একটু যেন শ্যামলা গায়ের রংটা। কপিল বলছিলো, বেশ রাগী রাগী মুখটা। জামার বোতামগুলো লাগিয়ে নিয়ে লিফটের মুখটাতে দাঁড়ালো পীযুষ। একটুও বিশ্বাস করে না ও ওর দলের

Sahitya Chayan

ছেলেগুলোকে। সব কটা ক্যালানে, হয়তো দেখা গেল অহনা পালের জায়গায় ধরে এনেছে অনন্যা পালকে। এদের দিয়ে রঙের কাজ করাতেই হিমশিম খেয়ে যায় পীযুষ, কিছুতেই শেডের খেলা বোঝে না। এদের দিয়ে এসব ব্ল্যাকমেইলিং-এর কাজ করাতে মোটেই সাহস পাচ্ছিলো না ও। কিন্তু ভাড়া করা গুন্ডার চার্জ বেশি, তারপর সব কটার পুলিশের খাতায় নাম আছে। রাস্তাঘাটে দেখলেই পাবলিক চিনে ফেলে এদের। একটা মেয়েকে সঙ্গে করে আনছে দেখলে হয়তো দেবে পুলিশে খবর দিয়ে। সে তুলনায় বেঁটে কপিল আর রোগা পটকা বাপ্পা অনেক সুবিধাজনক। এদের দেখে মনেই হবে না এরা কোনো খারাপ কাজ করতে পারে। চিরদুঃখী মুখ চোখ নিয়ে জন্মেছে। ভিখিরির বাচ্চাগুলো এক বোতল মদের জন্য সব করতে পারে। বুকের ভিতরটা একটু দিপদিপ করছে পীযুষের। দীপশিখার সঙ্গে বিয়ের পর আর নিজের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার পর মেয়েছেলের কোনো লাফরায় আর পড়েনি ও। পীযুষ হাড়ে হাড়ে জানে জুয়া, সাট্টা, মদ, গাঁজাতে কোনোদিন এমন বিপদ হয় না যেটা মেয়েছেলেকে উত্যক্ত করলে হয়। শালা দেশের আইন আজকাল বড্ড মেয়েছেলেদের দিকে। দীপশিখার যেহেতু ওকে পছন্দ নয় তাই বিছানায় কোনোদিনই পীযুষকে জড়িয়ে ধরে সোহাগ করেনি। বরং প্রতি রাতে প্রায় জোর করে রেপ করেছে পীযুষ। তাই রেপের মজাটাও পায় রোজই। দীপশিখা কাঁদে, ছটফট করে, পীযুষ উপভোগ করে। ঐজন্যই অন্য পুরুষদের মত একঘেয়ে লাগে না।

Sahitya Chayan

আবার কখনো নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে বিছানায়, পীযুষের অবশ্য ওকে কষ্ট দিতে পারলেই আনন্দ, শরীরের সবটুকু আক্রোশ মিটিয়ে নিতে পারে।

যন্ত্রনায় ছটফট করে দীপশিখা, পীযুষ তৃপ্তি পায়, একটা বন্য তৃপ্তি। তারপর দীপার মুখে এক থ্যবরা থুতু ফেলে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে ও। বহুদিন শুকনো হয়ে পড়ে আছে আশ্রয় কমপ্লেক্সে। এই রিপোর্টারের কাছ থেকে টাকাটা পেলেই সাতদিনের জন্য ফিরবে বাড়ি। বহুদিন দীপার গায়ের কালসিটে দেখেনি পীযুষ, মনটা অস্থির লাগছে ওর। দীপার গায়ে মেরে কালসিটে ফেলতে পারলে তবে নিজেকে পুরুষ মনে হয়। মারতে মারতেই তো শক্ত হয়ে ওঠে ওর পুরুষাঙ্গ।

কপিল আর বাপ্পা মেয়েটাকে নিয়ে এলো। পীযুষ একটা রং লাগা টুল এগিয়ে দিয়ে বললো, বসো বসো। আসতে কোনো সমস্যা হয়নি তো?

আরে তোরা হাঁ করে বসে আছিস কেন? যা, ম্যাডামের জন্য ঘন দুধের চা আর মদনের দোকানের কচুরি নিয়ে আয়। অহনা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল লোকটার দিকে।

পীযুষ বিশ্বাস। রাইগঞ্জ এলাকার নামকরা রঙের মিস্ত্রি। দীপশিখার স্বামী, প্রিয়ার বাবা.....কালচে দাঁত বের করে হাসছে লোকটা। চোখের তলায় শরীরের ওপর নিদারুণ অত্যাচার করার ফলেই গভীর কালি। এককালে হয়তো পেটানো চেহারা ছিল, কাঠামোটা তাই চওড়া হলেও বয়েসের ভারে বা অতিরিক্ত মদ্যপানে চেহারা ভেঙেছে।

Sahitya Chayan

বয়েস আন্দাজ বছর পঞ্চান্ন তো হবেই। কিন্তু চোখের চাউনিটাতে গাটা গুলিয়ে উঠলো অহনার। হাতের ঘড়ি, আংটি এগুলো ধীরে ধীরে নিজের ব্যাগে চালান করতে থাকলো অহনা। পীযুষ ছাড়াও ওদের দলে আরও পাঁচজন লোক আছে সেটা ও লিফটে ওঠার সময়েই টের পেয়েছে। ট্রেন থেকে নামতেই যে দুটো লোক ওকে নিতে এগিয়ে এসেছিল তাদের কথাবার্তায় বেশ পরিষ্কার এরা পীযুষের আন্ডারে কাজ করে। পীযুষ হলো হেডমিস্ত্রি। কন্ট্র্যাক্ট ওই ধরে, এই ছেলেগুলো ওর ইন্সট্রাকশনে কাজ করে। তাই এরা পীযুষকে বেশ ভয় পায়। তার মানে অহনাকে লড়তে গেলে একা পীযুষের সঙ্গে লড়লে চলবে না। আরও পাঁচজনকে ঘায়েল করতে হবে। মনে মনে ছক কষছে অহনা। ওদের দাঁড়ানোর পজিশনগুলো লক্ষ্য করছিল, ওকে কোথায় দাঁড়াতে হবে সেটাই বোঝার চেষ্টা করছিল, যাতে সব কটাতে একসঙ্গে কভার করতে পারে ও। ওদের স্যার বলতেন, মার্শাল আর্ট একটা বিদ্যা। গায়ের জোর নয় মানসিক সংযোগ জরুরি। মনটাকে যদি স্থির করা যায় তাহলে সব শত্রুকে ঘায়েল করা সম্ভব। যদি মন চঞ্চল থাকে তাহলে এই বিদ্যা ব্যর্থ হবে। ওদের মার্শাল আর্ট স্কুলে প্রতিদিন নিয়ম করে প্রাণায়াম করানো হতো। বহুদিন প্র্যাকটিস প্রায় হয় না বললেই চলে অহনার। রিপোর্টারের কাজ করতে করতে ক্লাস করা হয়ে ওঠে না। ওই উইকএন্ডে নিজের ঘরে যেটুকু হয়। বাবা বলেছিল, একটা স্কুল খুলে দি তিতির, তুই স্টুডেন্টদের শেখা তাহলে তোরও প্র্যাকটিস হয়ে যাবে, আর কিছু ছেলে মেয়েও

Sahitya Chayan

শেখার সুযোগ পাবে। না হয় অল্প মাইনেতেই শেখাবি। মনস্থির করেও ফেলেছিল অহনা। তারপরে কাজের প্রেসারে আজ ঝাড়গ্রাম কাল পুরুলিয়া করে সময়ই করে উঠতে পারেনি, তাই মার্শাল আর্টের স্কুল গড়ার স্বপ্নটা আর পূরণ হয়নি অহনার।

টুলে বসতেই পীযুষ বললো, খবরগুলো লিক করিনি কারণ আমি জানতাম তোমরা ভদ্দরলোকের ফ্যামিলি, চারিদিকে সম্মানহানি হবে। তারপরে আবার টিভি কাগজের লোক বলে কথা, আগুনের মত ছড়িয়ে যাবে। এমন বিপদ আমি কি করে করতে পারি তোমাদের বলো? তাছাড়া সুচেতা মেয়েটা বড্ড নরম ছিল গো। শুধু শরীরটা নরম ছিল এমন নয়, মনটাও নরম ছিল। গাটা জ্বলছে অহনার, এই লোকটার মুখে মায়ের নামটা শুনে।

তাহলে খবরগুলো বলি?

অহনা হেসে বললো, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, আমি বরং বলি খবরগুলো। পীযুষ একটু অবাক হয়েই বললো, আরে, তুমি সব জানো বুঝি? তা বলো দেখি ঠিক কি কি জানো?

অহনা স্থির গলায় বলল, সুশোভন মিত্রের বাড়িতে রঙের মিস্ত্রি হয়ে ঢুকেছিলিস তারপর তার মেয়ে সুচেতাকে রেপ করিস। একবার নয়, বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ তিন তিনবার রেপড হয় সুচেতা মিত্র।

না, সুচেতা ওর দাদা-বাবা কাউকে বলেনি এসব কথা। নিজেদের সম্মানের জন্য। কিন্তু তুই ছাড়ার পাত্র নোস। সারা রাইগঞ্জে রটিয়ে দিয়েছিলিস তোর সঙ্গে সুচেতার

Sahitya Chayan

প্রেম চলছে। তুই ওকে রোজ ভোগ করছিস। সুচেতো তখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছিল। অনিরুদ্ধ পাল লন্ডনে একটা স্পোর্টসের রিপোর্ট করতে গিয়ে আটকে গিয়েছিল। বৃষ্টির জন্য খেলা ডিলে হয়েছিল, তাই রাইগঞ্জে আসবো বলেও আসা হয়ে ওঠেনি তখনও। সুচেতা তখন অনিরুদ্ধর সংগে সংসার পাতার স্বপ্নে বিভোর। ঠিক তখনই তুই ওর সব স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছিলিস। সুশোভনবাবু, সোহম কেউ বাড়ির বাইরে পা রাখতে পারছিল না তোর জন্য। এর আগেই তুই ইভটিজিং এর জন্য জেলও খেটেছিস। কিন্তু মিত্র বাড়ির অপরিণামদর্শিতা আর সমাজের ভয়ের জন্য তোর নামে কোনো কেস হয়নি। সেই সুযোগটা তুই নিয়েছিলিস।

পীযুষ হাঁ করে দেখছিলো অহনাকে। কি নির্বিকারভাবে ওকে তুই তোকারি করছে হাঁটুর বয়েসি মেয়েটা।

অহনা বললো, কারণ তোর মত শুয়োরের বাচ্চারা তো জন্মায়ই নোংরামি করার জন্য। সুচেতার দুর্বল মানসিকতার সুযোগে তুই বেঁচে গেলি। যেহেতু সুচেতা তখনও অনিরুদ্ধর কথা বলেনি বাড়িতে তাই ওকে ওর বাবা-দাদা অবিশ্বাস করতে শুরু করলো। সুচেতা তখন একটা স্কুলের শিক্ষিকা। গরমের ছুটিতে বাড়ি এসেছিল। কেস করলে খবরটা আর শুধু রাইগঞ্জে সীমাবদ্ধ থাকবে না। কলকাতা অবধি পৌঁছে যাবে। ওর স্কুলে যাওয়া দুস্কর হয়ে যাবে। কারণ তোর মত জানোয়াররা এই সমাজে বাস করে বলেই, রেপিস্টের থেকে বেশি লজ্জা পায় ভিকটিম। যেন দোষটা তার! অত্যাচারিত হলো সে, লজ্জা পেল সে, তার

Sahitya Chayan

চরিত্রেই লাগলো কালি, তার পোশাক নিয়ে উঠলো প্রশ্ন, আর রেপিস্ট সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে করলো। আমি যদি তোর মায়ের জায়গায় থাকতাম না, তাহলে তোকে শুধু বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতাম না, আমি তোকে গলা টিপে মেরে দিতাম রে কুত্তা। শোন পীযুষ, তুই বরং আমায় রেপ কর, আমি তোকে কলার ধরে কোর্টে তুলবো, কোর্টে দাঁড়িয়ে তোর জামাকাপড় খুলবো শুয়োরের বাচ্চা। আমি সুচেতা নই। তুই এখনো নারীশক্তি কার নাম দেখিসনি। দীপশিখা, সুচেতা এদের দেখেছিস কিনা, তাই জানিস না কাকে বলে মহিলা? তোর ভাষায় মেয়েছেলে!

পীযুষ বেশ ঘাবড়েছে অহনার কথা শুনে, এমন যে কেউ বলতে পারে এটাই তো ধারণা ছিল না। ও জানতো, সুচেতার রেপের ঘটনা শুনে অহনা ভেঙে পড়বে, হাতে পায়ে ধরে বলবে খবরটা চেপে দিতে। দিয়ে ওর হাতে টাকা দেবে। সেসব ছক উল্টে যাচ্ছে।

অহনা বললো, বাকিটা শুনে নে। সুচেতার গোটা পরিবার ওর বিরুদ্ধে চলে গেল। সুচেতার জন্যই নাকি ওই বাড়ির সম্মানহানি হয়েছে। কি করে একজন শিক্ষিকা হয়ে, শিক্ষকের মেয়ে হয়ে ও তোর মত মানুষের সঙ্গে প্রেম করতে পারে সেটা নিয়েই গোটা পরিবার ব্রাত্য করলো সুচেতাকে। তুই রীতিমত তৈরি হয়েই এসেছিলিস। তাই সুচেতার ছেঁড়া জামাকাপড়, রক্তাক্ত যোনির ছবিও তুলেছিলিস, মেয়েটা যখন প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল তখন তুই অন্য ছকে এগিয়েছিলিস।

Sahitya Chayan

বড়লোক বাড়ির জামাই হবার ইচ্ছে পেয়ে বসেছিলো তোকে। তাই ওই ছবি দেখিয়ে তুই সুশোভনবাবুকে রীতিমত ব্ল্যাকমেইলিং করতে শুরু করিস। ওনার শরীর ভেঙে পড়তে থাকে। রাইগঞ্জে মুখ দেখাতে পারে না ওরা। সেই অবস্থায় সুচেতার দাদা সিদ্ধান্ত নেয়, তোর সঙ্গেই সুচেতার বিয়েটা দেবে। দিয়ে ওরা তোর কিছু একটা ব্যবসা করে দেবে। এছাড়া আর কোনো অপশন ছিলো না ওদের হাতে। সুচেতা তখন একটা ট্রমার মধ্যে ছিল। বাহ্যজ্ঞান শূন্য। হাসিখুশি মেয়েটা নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। তোর সঙ্গে বিয়ের ডেটও প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিলো। ওই ঘটনার মাস তিনেক পরে তোর সঙ্গে বিয়ের ডেট ফাইনাল হয়। এদিকে অনিরুদ্ধ চিঠির পর চিঠি লিখতে থাকে ওকে। কারণ তখনও রাইগঞ্জে টেলফোন আসেনি। পিয়োনকে হাত করে সেইসব চিঠি তুই রেখে দিয়েছিলিস। অনিরুদ্ধর উত্তর না পেয়ে সুচেতা সিদ্ধান্ত নেয় ও আত্মহত্যা করবে। ও বেঁচে থাকতে তোকে বিয়ে করবে না। তোদের বিয়ের ডেটের ঠিক তিনদিন আগে অনিরুদ্ধ সুচেতার কোনো খোঁজ না পেয়ে পৌঁছায় রাইগঞ্জে। সুচেতার মেস, স্কুলের কলিগ সকলেই জানায় ও তিনমাস আসেনি।

রাইগঞ্জে পা দিয়ে সুচেতার খোঁজ করতেই অনিরুদ্ধ শুনতে পায়, ওর বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। একটা রঙের মিস্ত্রীকে প্রেম করে বিয়ে করছে মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে। আকস্মিক ধাক্কায় চমকে ওঠে অনিরুদ্ধ। তবুও বিশ্বাস করতে পারেনি এটা ঘটতে পারে। তাই হাজির হয়েছিল

Sahitya Chayan

সুচেতার বাড়িতে। সুচেতা অনিরুদ্ধকে দেখে অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কেন এত দেরি করে এসেছে ভেবেই হয়তো কথা বলেনি। সুচেতার বাবা-দাদা ওকে তাড়িয়ে দেয় বাড়ি থেকে। অনিরুদ্ধ হাল ছাড়ার পাত্র নয়। রাইগঞ্জের অলিতে গলিতে খুঁজে খুঁজে বের করে আসল সত্য। এমনকি তোর বাড়ির লোকও অনিরুদ্ধকে আসল সত্যিটা বলেছিল। ওখানে বসেই অনিরুদ্ধ চিঠি দিয়েছিল সুচেতাকে। কেউ একটা গিয়ে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল সেই চিঠি। তাতে লেখা ছিল, পীযুষের সঙ্গে কিছুতেই যেন সূচী বিয়ে না করে। সুচেতার উত্তর না পেয়ে অনিরুদ্ধ গিয়েছিল আবার ওদের বাড়িতে। দেখেছিলো একটা মৃতপ্রায় মেয়ের গায়ে হলুদ হচ্ছে। মেয়েটা যেন বসে থাকতেই পারছে না। সন্দেহ হয়েছিল অনিরুদ্ধর। পুলিশ ডেকে নিয়ে গিয়ে সুচেতাকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে তুলে এনেছিল ওদের বাড়ি থেকে। মিডিয়ার সিনিয়ার রিপোর্টারের হাতে এটুকু ক্ষমতা থাকেই। সুচেতাকে নিয়ে সোজা গিয়েছিল রাইগঞ্জ হসপিটালে। সুচেতা ঘুমের ওষুধ খেয়েছিল অনেকগুলো। সেগুলো ওয়াশ করা হয়। ওকে নিয়েই অনিরুদ্ধ চলে গিয়েছিলো কলকাতায় নিজের ফ্ল্যাটে। সোহম হুমকি দিয়েছিল, অনিরুদ্ধ এভাবে মেয়েটার বিয়ে ভেঙে দেওয়ার অপরাধে কেস করবে ওরা। অনিরুদ্ধ যেন ও বাড়িতে না ঢোকে।

কলকাতায় এসে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করে ওরা, সম্ভবত মন্দিরেও বিয়ে করে। অনিরুদ্ধ চেয়েছিল রেপ কেসটা নিয়ে মুভ করতে। তাকে শাস্তি দেবে বলেই, সুচেতাকে

Sahitya Chayan

কলকাতায় রেখে রাইগঞ্জে এসেছিল অনিরুদ্ধ। থানায় ডাকা হয়েছিল তোকে। তখনই খবর এসেছিল সুশোভনবাবু হার্টফেল করেছেন। অনিরুদ্ধ কেস ফেলে ছুটেছিলো সুচেতাকে আনতে। তুইও গা ঢাকা দিয়েছিলিস রাইগঞ্জ থেকে। সুচেতা বাড়িতে বাবার মৃতদেহের পাশে বসতে পেলেও অনিরুদ্ধ ঢুকতে পারেনি, সোহম ঢুকতে দেয়নি। ওর ধারণা হয়েছিল, অনিরুদ্ধর কারণেই বাবা মারা গেছে। ওভাবে সুচেতার চলে যাওয়াটা মানতে পারেনি বাবা। এরপর সুচেতা দাদার বাড়িতে এলেও অনিরুদ্ধ কোনোদিন আসেনি রাইগঞ্জে। আর তোর নামে কেস করতেও বারণ করেছিল সুচেতা, সম্মানের ভয়ে।

অহনা দম নিয়ে বললো, কিরে সব ঠিক বলছি তো?

অহনা কিছু বোঝার আগেই পীযুষ বলল, হ্যাঁ ঠিক বলছিস। সেই জন্যই তোকে আটকে রেখে তোর মায়ের কাছ থেকে টাকা আদায় করবো আমি। খবর যখন সবই জানিস তখন তো আর নতুন নেই কিছুই, তাই তুই হবি আমার টোপ। অনিরুদ্ধ পাল এসে আমায় পায়ে টাকা দিয়ে যাবে। দুটো ছেলে এগিয়ে আসার আগেই পজিশন নিয়েছিল অহনা। তিনজনকে একসঙ্গে ধরাশায়ী করেছিল বেশ কয়েকটা কিকে। পীযুষ গালাগাল দিয়ে বলেছিল, শালা মায়ের দুধ খাসনি শুয়োরের বাচ্চা, একটা মাগির কাছ মার খেয়ে কাতরাচ্ছিস! পীযুষের দিকে এগোচ্ছিল অহনা, একে ধরে থানায় নিয়ে যাবে অহনা। কিন্তু মাথার পিছনে একটা শক্ত কিছুর আঘাতে ও চোখে অন্ধকার দেখলো। সম্ভবত পীযুষের চার নম্বর সঙ্গী পাশের ঘর

Sahitya Chayan

থেকে এসে অহনার মাথায় বাঁশ জাতীয় কিছু দিয়ে আঘাত করেছে। এরপর আর কিছুই মনে নেই অহনার। এখন চোখ মেলে দেখলো একটা ঘরের মধ্যে ও একা রয়েছে। ওর ফোনটা পর্যন্ত নেই সঙ্গে।

দরজার দিকে ছুটে গিয়ে দেখল, দরজাটা বাইরে থেকে লক। ব্যালকনিতে যাওয়ার দরজাটাতে একটা তালা ঝুলছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল সূর্য অস্তগামী। শীতের সূর্য বেশ তাড়াতাড়িই ডুবতে চলেছে।

বুঝতে পারলো পুলিশ সঙ্গে না এনে একা আসাটা ঠিক কতটা বোকামি হয়েছে! এখন ফোনটাও নেই সঙ্গে। কারোর সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ করা যাবে না। বাবাইকে জানানোও হয়নি ও কোথায় আসছে। পীযুষের দাদার সঙ্গে কথা বলার পর থেকে একটা তীব্র অভিমান দানা বেঁধেছিল মনে। বাবাই, মা কেন সব বললো না ওর কাছে? কি মনে করে ওরা অহনাকে? ও অবুঝ, আর পাঁচটা বাঙালি মেয়ের মত ইমোশনাল হয়ে যাবে? ভুল কিছু সিদ্ধান্ত নেবে? এত দিনে এই চিনলো বাবাই তার তিতিরকে? একরাশ অভিমানে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাবাই আর মায়ের এমন একটা লড়াইয়ের কথা কেন কেউ বললো না ওকে, তাই তো এখানে আসার পর বাবাইয়ের কোনো ফোন রিসিভ করেনি অহনা। ও যে আজ রাইগঞ্জের আশ্রয় কমপ্লেক্সে আছে এই কথাটা শুধুমাত্র নৈঋত যানে। তাছাড়া এখানে পরপর তিনটে ব্লক রেডি হচ্ছে। অহনা আছে বি ব্লকে, নৈঋত এগুলো তো জানে না। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো ও প্রায় পাঁচ ছয়তলা

Sahitya Chayan

ওপরে আছে। ওপর থেকে ডাকলে কেউ শুনতেও পাবে না। তাছাড়া জায়গাটা রাইগঞ্জ মেইন মার্কেট থেকে বাইরে, জিটি রোডের ধারে। এখানে লোকবসতি নেই বললেই চলে। এখনো জায়গাটা বেশ ফাঁকা। হয়তো ধীরে ধীরে কলকাতার রাজারহাটের মতই ভর্তি হয়ে যাবো জায়গাটা। আপাতত এই কমপ্লেক্স ছাড়া তেমন বাড়ি তো চোখে পড়লো না অহনার।

অবশ্য এইটুকু জানলা দিয়ে কতটাই বা দেখা সম্ভব?

বেশ ক্ষিদে পেয়েছে অহনার, মাথাটাও কাজ করছে না।

নিশ্চুপ হয়ে বসে পড়লো অহনা। একা এসে কতটা বোকামি করেছে এখন বুঝতে পারছে। হয়তো পীযুষ এতক্ষণে বাবাইকে কল করে ওর মুক্তিপণ দাবি করে ফেলেছে। এই একটা ব্যাপারে অনিরুদ্ধ পাল বড্ড বেশি আবেগপ্রবণ, তার তিতিরের ব্যাপারে। পীযুষ যদি দশ লাখের বদলে কুড়িও চায়, বাবাই দিয়ে দেবে এটা তিতির জানে। সেই জন্যই নিজের ওপরে আরও রাগ হচ্ছিল। পীযুষ যখন দেখলো, অহনার কাছে সব খবরই ওপেন হয়ে গেছে, গোপন কিছুই নেই, তখন বুঝতে পেরেছিল অহনার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারবে না। তাই ওকে কিডন্যাপ করার সেকেন্ড প্ল্যানটা কার্যকর করলো ও।

চোখ বন্ধ করে ভাবছিলো অহনা। হঠাৎই দরজার বাইরে নৈঋতের আওয়াজ শুনলো।

ছুটে গিয়ে দরজার ভিতর থেকে হাত দিয়ে জোরে জোরে আওয়াজ করলো। দুমিনিটের মধ্যেই দরজাটা

Sahitya Chayan

খোলার আওয়াজ পেলো অহনা।

নৈঋত ঢুকলো প্রথমেই, ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো অহনাকে। থরথর করে কাঁপছিল অহনা। নৈঋতকে চেপে ধরে বলল, পীযুষকে পালিয়ে যেতে দিও না।

নৈঋত শান্ত স্বরে বললো, তোমার বাবার বন্ধু অভিরূপ আঙ্কেল হেল্প করেছেন। উনিই রাইগঞ্জ থানায় খবর দিয়ে রেখেছিলেন। কোনোরকম প্রবলেম হলে যেন ওরা হেল্প করে। আমি তো সেই দুপুর বারোটাতেই পৌঁছে গেছি এই কমপ্লেক্সে। তোমায় বারবার ফোন করেও কন্ট্যাক্ট করতে পারলাম না। তখন সিকিউরিটিকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার ছবি দেখিয়ে। সে একটু থমকে "হ্যাঁ" বলতে গিয়েও "না" বললো দেখেই সন্দেহটা বাড়ল।

দেখলাম মেইন গেটে আমার পাশ দিয়ে কয়েকজন লোক উত্তেজিত হয়ে কিছু আলোচনা করছে। বার দুই রিপোর্টার শব্দটা উচ্চারণ করলো লোকটা। তখন আর দেরি না করে সোজা থানায় গেলাম। অহনা পাল নামটা করতেই ওসি বললেন, ডিএসপি অভিরূপ সান্যাল নাকি ওনাদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, অহনার কোনোরকম সমস্যায় হেল্প করতে। তারপর থানার মেজবাবু, তিনজন কনস্টেবল নিয়ে এলেন এখানে। ওদের দেখেই ভয়ের চোটে সিকিউরিটি বলে দিল, পীযুষ বিশ্বাস বলে একজন রঙের মিস্ত্রির দুজন হেল্পারের সঙ্গে এই মেয়েটি বি ব্লকে ঢুকেছিলো। আমরা বি ব্লকের প্রতিটা ঘর, ব্যালকনি খুঁজতে খুঁজতে শেষে এসে পৌঁছালাম এই ঘরে।

অহনা, আর ইউ অল রাইট?

Sahitya Chayan

অহনা আবারও বললো, পীযুষ বিশ্বাস কোথায়? ওর কথা শুনেই একজন কনস্টেবল বললেন, পীযুষ আর ওর সাঙ্গপাঙ্গরা ফার্স্ট ফ্লোরে ছিল। আমরা সকলকে আটকে রেখেছি। অ্যারেস্ট করবো সকলকে। অহনা বললো, অফিসার আমি পীযুষকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাই। আপনাকে সাহায্য করতে হবে। আপনি যদি বলেন আমি অভিরূপ অঙ্কেলকে জানাচ্ছি, উনি পারমিশন করিয়ে দেবেন।

মেজবাবু বললেন, যতক্ষণ না আপনি ডায়রি লেখাচ্ছেন ততক্ষণ ওর নামে কোনো লিখিত কেস হয়নি। তাই অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট নেই। আমি স্পেশাল ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, দুজন পুলিশ দিয়ে পুলিশ ভ্যানেই পাঠানো হচ্ছে ওকে। নৈঋত অহনার হাতটা ধরে বলল, চলো গাড়িতে ওঠো। তুমি কি বাবার কাছে যাবে?

অহনা ঘাড় নেড়ে বললো, না নৈঋত আমি সোজা কলকাতা যাবো। নৈঋত বললো, তোমার ব্যাগ আর ফোন দুটোই এখন আমার কাছে। কলকাতায় কি নিজের ফ্ল্যাটে ফিরবে?

অহনা ঘাড় নেড়ে বললো, হ্যাঁ, আজ রাতটা ঢাকুরিয়ায় থাকবো, কাল সকালে একটা কাজ আছে আমার। নৈঋত একটু গম্ভীর ভাবেই বললো, আমিও তাহলে আজ রাতে তোমার সঙ্গেই থাকবো। সরি, তোমার কোনো বারণ আর আমি শুনছি না।

অহনা কিছু বলার আগেই নৈঋত বললো, গাড়িতে ওঠো।

Sahitya Chayan

পুলিশ অফিসার বললেন, আমি পীযুষ বিশ্বাসকে কাল সকালে পাঠাচ্ছি ম্যাডাম। আপনি যেখানে বলবেন সেখানেই নিয়ে যাওয়া হবে ওকে। আজ রাতটা এ থানার কাস্টাডিতে থাকুক। ততক্ষণে আমি একবার ওসির সঙ্গে কথা বলে নিই। অহনা ঘাড় নেড়ে বললো, ওকে সকাল দশটায় আমার কলকাতায় চাই। কোথায় নিয়ে যাবেন, অভিরূপ আঙ্কেল আপনাকে জানিয়ে দেবে রাতেই।

গাড়িতে উঠেই অহনা বললো, খুব ক্ষিদে পেয়েছে। নৈঋত স্টিয়ারিং-এ হাত দিয়ে বললো, সামনের বক্সটা খোলো, খাবার রাখা আছে তোমার, খেয়ে নাও। নৈঋত যেন আজ একটু বেশিই গম্ভীর। অহনা দেখলো, প্যাটিস, মিষ্টি এসবের একটা প্যাকেট রাখা আছে। নৈঋত বললো, আপাতত এটা খাও, রাস্তায় কোনো রেস্টুরেন্টে দাঁড়িয়ে পরে খেয়ে নিও। অহনা খেতে খেতেই বললো, তুমি কি আমার ওপরে রেগে আছো?

নৈঋত অবসন্ন গলায় বলল, অহনা এমন একটা রিস্কি কাজে কেউ যে এভাবে একা আসতে পারে আমার ধারণা ছিল না! একবার ডেকেই দেখতে পারতে, একসঙ্গে তো আসতে পারতাম। যদি ওরা তোমায় সেন্সলেস করে কোথাও সরিয়ে নিয়ে যেত, যদি খুঁজে না পেতাম আর, যদি মেরে ফেলতো.... অহনা, একটা কথা বোধহয় খুব সত্যি, একতরফা ভালোবাসায় আর যাই থাকুক অধিকারবোধ থাকে না। কারণ অপর দিকের মানুষটার কোনো ফিলিংসই নেই আমার প্রতি।

Sahitya Chayan

অহনা প্যাটিসটা শেষ করে বললো, বাই দ্য ওয়ে তুমি কি পারফিউম ইউজ করো বলতো? গন্ধটা বড্ড সফট, ম্যানলি কিছু ইউজ করবে এবার থেকে, যাতে বুকে মুখ গুঁজলে অন্যরকম অনুভূতি হয়।

নৈঋত হাঁ করে তাকিয়েছিল অহনার দিকে। অহনা বললো, ওদের হাত থেকে তো বেঁচে ফিরছি, কিন্তু তুমি মনে হচ্ছে বাঁচিয়ে কলকাতা নিয়ে যেতে পারবে না বুঝলে? আমার দিকে তাকিয়ে না থেকে রাস্তায় কনসেনট্রেট করো। আমার মুখে মোনালিসার কারুকার্য নেই, মন দিয়ে গাড়ি চালাও। নৈঋত মুচকি হেসে বললো, মোনালিসার কারুকার্য না থাক ভীতু চোখে অপার মুগ্ধতা আছে। অহনা প্রতিবাদ করে বললো, আমি মোটেই ভীতু নই।

হর্নটা একটু জোরে বাজিয়ে নৈঋত বললো, সাহসী মেয়ে যখন মুহূর্তের বিপদে ভয় পায়, তখন তার চোখে যে ভীতু চাউনিটা ফোটে ওটাই তো অমূল্য, আজ আমি ওটা দেখেছি। আচ্ছা অহনা, অতগুলো পুলিশের সামনে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে তোমার লজ্জা করলো না। ইস, আমার তো লজ্জা করছিল।

নৈঋত আড়চোখে দেখলো, অহনার গালে সন্ধে নামার লজ্জা এসে ভিড়ে করেছে।

কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, তুমি কি লজ্জাবতী লতা? আর এই যে আজ এখানে এলে, বাড়িতে কি বলে এসেছো শুনি?

নৈঋত বললো, বলেছি কলেজের কাজ আছে।

Sahitya Chayan

অহনা মুচকি হেসে বললো, এগুলো হলো একতরফা প্রেমের লক্ষণ। বাড়িতে মিথ্যে বলা, উড়ুউড়ু মন, সাড়ে তিনঘণ্টা টানা ড্রাইভ করেও ক্লান্ত না হওয়া....এইসব আরকি।

নৈঋত দেখলো, অহনা সহজ হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে তবুও ওর চোখ দুটোতে একমুঠো কষ্ট ঘোরাঘুরি করছে। ওই কষ্টটুকুকে মুছে দিতে হবে, তাই এর উৎস জানতেই হবে ওকে। অহনা যে বড্ড বেশি চুপচাপ হয়ে আছে, কি জন্য গিয়েছিল ওরকম একটা গ্যাংএর কাছে কিছুই যে বলছে না। নৈঋত প্রাইভেসিতে বিশ্বাসী। যেটা বলতে চাইছে না সেটা নিয়ে জোর করা ওর পছন্দ নয়। তাই বারবার জিজ্ঞাসাও করা যায় না।

একটা রেস্টুরেন্টের সামনে গিয়ে গাড়িটা পার্ক করালো ও। অহনা বোধহয় ঘুমিয়ে গেছে। কিছু অবাধ্য চুল এসে পড়েছে ওর ঘুমন্ত চোখের ওপরে। ক্লান্ত ঠোঁটে অব্যক্ত কষ্টেরা নিশ্চুপ, টিকালো নাকে ছোট্ট একটা হীরক বিন্দু ঝিকমিক করে নিজের আভিজাত্য জানান দিচ্ছে, কানের লতিতে দুটো ছোট্ট টপ নিজেদের জায়গায় স্থির, চেকস শার্টের কলারটা একটু উঠিয়ে বোঝাতে চাইছে আমি স্বাধীনচেতা, আমি নিজের মর্জির বাদশা। ঘন নিঃশ্বাসে ওঠা নামা করছে অহনার সুগঠিত স্তন, শ্যামলা রঙের উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত ওর শরীর। নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে নৈঋত, এর থেকে বেশি সৌন্দর্য কি আদৌ আছে পৃথিবীতে? নাকি বিশ্বকর্মা বড্ড যত্নে বানিয়েছে তার মানসকন্যাকে!

Sahitya Chayan

হালকা গলায় ডাকলো নৈঋত, তিতির...এই তিতির...অহনা নয়, এখন তিতির বলেই ডাকতে ইচ্ছে করছে নৈঋতের। যেন একটা পাখি বাসায় ফিরে অবসন্ন হয়ে ঘুমাচ্ছে। ওর ডাকে ছটফট করে উঠলো অহনা।

নৈঋত বললো, ভয়ের কিছু নেই, চলো কিছু খেয়ে নিই। কলকাতা পৌঁছাতে এখনো ঘণ্টাখানেক লাগবে।

অহনা গাড়ির বেল্ট খুলে নেমে এলো। ফিসফিস করে বললো এখানে ওয়াশরুমে পাবো কি? নৈঋত হেসে বললো, আছে ওয়াশরুম, আমি গেটের সিকিউরিটিকে জিজ্ঞেস করেই তোমায় ডাকতে গেলাম।

অহনা মুচকি হেসে বললো, তোমার বউ যে হবে সে খুব লাকি হবে বুঝলে! এত কেয়ারিং হাজবেন্ড পাবে।

নৈঋত বললো, আমারও তাই মনে হয়, আমার বউ রিয়েলি খুব লাকি হবে, কারণ সে এতটাই অমূল্য যে তাকে কেয়ার করতে হবেই। অহনা লজ্জা পেয়ে চলে গেল ওয়াশরুমের দিকে। নৈঋত সেই সুযোগে ফোন করতে শুরু করলো।

হ্যাঁ স্যার, আমরা আপাতত একটা রেস্টুরেন্টে আছি। অহনা ওয়াশরুমে ঢুকেছে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ও আপনার ওখানে যাবে কিনা, বললো না কলকাতা যাবে। সম্ভবত ঢাকুরিয়ার ফ্ল্যাটে যাবে বললো। আমি বলেছি এই ঘটনার পরে আমি কিছুতেই তোমায় একা ছাড়বো না। আমিও থাকবো।

হ্যাঁ, অনিরুদ্ধ আঙ্কেল আপনার দেওয়া উপদেশ মাথায় নিয়েই লড়ে যাচ্ছি, দেখি জয় করতে পারি কিনা। না,

Sahitya Chayan

টেনশন করবেন না। আমি কল করবো বা মেসেজ করবো। তবে আপনার মেয়েটিকে তো চেনেন, যদি জানে আমি আপনাদের খবর পাচার করছি তো ডিরেক্ট শুট করে দেবে আমায়। অহনা আসছে, আমি রাখলাম স্যার।

আপনার মেয়ের কোনো বিপদ হবে না, ডোন্ট ওয়ারি।

।।৩২।।

কি গো, কি বললো নৈঋত? অহনা কোথায় কোনো খোঁজ পেয়েছে? সুচেতা চিন্তিত মুখে বললো।

অনিরুদ্ধ গম্ভীরভাবে বললো, সুচেতা তুমি বড্ড ব্যাকডেটেড ছিলে বুঝলে? প্রেসিডেন্সির মেয়ে অমন ব্যাকডেটেড হলে হয়? আর আমাদের বিয়ের আগেই তো আমার ফ্ল্যাটটা হয়ে গিয়েছিল, তাহলে তুমি মেসে কেন থাকতে? মানে আমরা তো একসঙ্গেও থাকতে পারতাম?

সুচেতা চমকে উঠে বললো, বিয়ের আগেই? একসঙ্গে থাকতাম? তুমি নির্লজ্জ সেটা আমি বরাবরই টের পেয়েছি, তাই বলে এতটা সেটাও ভাবিনি।

অনিরুদ্ধ হেসে বললো, আমি যে নির্লজ্জ কবে বুঝতে পেরেছিলে?

সুচেতা মুচকি হেসে বললো, তিতির যখন ঘুমাতো চুপিচুপি আমাকে নিয়ে পাশের রুমে যাওয়ার সময়েই টের পেয়েছিলাম, তুমি বড় নির্লজ্জ।

অনিরুদ্ধ গম্ভীরভাবে বললো, না না, ভারতীয় সংবিধানের কোন ধারায় লেখা আছে যে মেয়ের বাপ হয়ে গেলে আর বউকে আদর করা যায় না? ইনফ্যাক্ট এটাও

Sahitya Chayan

লেখা নেই যে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে আর বউকে জড়িয়ে ধরা যায় না?

সুচেতা চোখ পাকিয়ে বললো, বয়েসটা বাড়ছে, ভুলে যাও কেন?

অনিরুদ্ধ হেসে বললো, শ্বশুর হয়ে গেলে তার মানে রোম্যান্স চলে যাবে? এ কেমন যুক্তি সূচী। যাইহোক, তখন কিন্তু আমরা লিভ ইন করতে পারতাম। মানে তুমি যখন মাস্টার্সের ফাইনাল ইয়ার তখন থেকেই থাকতে পারতাম একসঙ্গে। কতগুলো বছর অকারণে নষ্ট করলাম আমরা।

তোমার মেয়ে কিন্তু তোমার মত ব্যাকডেটেড হয়নি। তিনি আজ আমাদের ঢাকুরিয়ার ফ্ল্যাটে থাকবেন নৈঋতকে নিয়ে! সুচেতা অবাক হয়ে বলল, মানে? এই নৈঋত কি করে সবসময় অহনার কাছে থাকছে আমায় একটু বুঝিয়ে বলবে? অনিরুদ্ধ বললো, যাই বলো না কেন ছেলেটা কিন্তু ইন্টিলিজেন্ট আছে। মানে আমি পাঁচ ছয় বছর পরিশ্রম করে যেটা করতে পারলাম না ছেলেটা মাত্র তিনদিনে সেটা করে ফেললো? ভাবা যায়! নৈঋত আজ তিতিরের সঙ্গে ঢাকুরিয়ার ফ্ল্যাটে থাকবে। সুচেতা বিস্মিত হয়ে বলল, করতে কি চাইছে ছেলেমেয়েগুলো! বিয়ে দিচ্ছিলাম, দুজনেই পালিয়ে গেল। এখন দুজনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নাইট স্টে করবে ফাঁকা ফ্ল্যাটে। এগুলো ঠিক কি হচ্ছে গো অনি! এখনকার ছেলেমেয়েগুলো এমন উল্টো কেন? এদের কি সোজা পথে হাঁটলে পায়ে কাঁটা ফোটে? তাই একই রাস্তা ঘুরপথে হাঁটে!

Sahitya Chayan

অনিরুদ্ধ বললো, ওদের মত করে চিনতে দাও নিজেদের, দেখবে ভুল বোঝাবুঝি কম হবে। সুচেতা বললো, কিন্তু পাশের ফ্ল্যাটের মিসেস দেবযানী তো দিনরাত তাকিয়ে থাকে গো আমাদের ফ্ল্যাটের দিকে, ও তো দেখবে।

এর থেকে ওই ফ্ল্যাটটাতে গেলে ভালো করতো।

সদ্য মাসখানেক গেছি ওখানে কারোর সঙ্গে চেনাই হয়নি এখনো। অনিরুদ্ধ হেসে বললো, তোমার ফ্ল্যাটের চাবি বোধহয় তিতিরের কাছে নেই।

সুচেতা মাথা নিচু করে বললো, না নেই। কারণ অহনা চায়নি। বলেছিল, বাবার ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেটটা আমার কাছে আছে, তাই আপাতত দরকার নেই। আসলে আমার ওপরে রাগ করেই নেয়নি। বাপসোহাগী কিনা!

অনিরুদ্ধ বললো, সূচী কেন যে আজ বারবার মনে হচ্ছে আমরা অনেকগুলো বছর নষ্ট করে ফেলেছি, কে জানে!

সুচেতা অনিরুদ্ধর হাতটা চেপে ধরে বলল, আমায় ক্ষমা করো। আমি শুধু তোমায় ভুল বুঝেই গেলাম। রাইগঞ্জ থেকে যেদিন তুমি আমায় কলকাতা নিয়ে এলে সেদিনই যদি আমি ওখানেই ওই অ্যাক্সিডেন্টটা ভুলতে পারতাম, তাহলে হয়তো আমাদের জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলো নষ্ট হতো না। নিজেকে স্বাভাবিক করে উঠতেই কাটিয়ে দিয়েছি কতগুলো বছর।

তুমি অনবরত বলতে, সূচী ওটা জাস্ট একটা অ্যাক্সিডেন্ট। কোনো বিকৃতি হয়নি তোমার শরীরের। তুমি

Sahitya Chayan

আমার সেই সুচেতাই আছো। ওই দুঃস্বপ্নটুকু ভুলে যাও প্লিজ। পারতাম না জানো, তুমি গায়ে হাত রাখলেও চমকে উঠতাম, রেগে যেতাম। ঘৃণা হতো নিজের ওপরে। মনে পড়ে যেতে ওই লোকটার বিকৃত, হিংস্র মুখটা। দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙে বসে থাকতাম রাতের পর রাত।

অনিরুদ্ধ বললো, আমারও দোষ আছে গো, ভগবানের আসনে বসিও না আমায়। আমিও সময় দিতে পারিনি ওই ক্রাইসিস টাইমে। তখন আমি কলকাতাতেই ছিলাম না। নিউজ করতে এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি। কেরিয়ার কেরিয়ার করে ক্ষেপে উঠেছিলাম। সবাইকে পিছনে ফেলে শীর্ষে ওঠার মারাত্মক লোভ পেয়ে বসেছিলো আমায়।

সুচেতা বললো, গর্ব আমারও হতো তোমায় নিয়ে। কাগজ খুলেই ছুটে যেতাম খেলার পাতায়। নিজস্ব প্রতিনিধির নামটুকু দেখেই শান্তি পেতাম। কিন্তু তোমাকে যে ওই সময়টাতে কাছে চাইতাম আমি। তিতির তখন পেটে, বোধহয় সাত মাস হবে। রাতে ভয়ে কুঁকড়ে উঠেছিলাম। রাত দুটোর সময় তোমায় বারংবার ফোন করছিলাম, তুমি রিসিভ করোনি। নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে গিয়েছিলে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অনি আমি যে একা ফ্ল্যাটে ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিলাম।

অনিরুদ্ধ সুচেতার পিঠে হাত দিয়ে বললো, জানি সেসব অপরাধের ক্ষমা হয় না, তবুও আমি কিন্তু তোমার সেই অনিই আছি। হাজার ব্যস্ততার ফাঁকেও তোমার মুখটা মনে পড়তো বারবার। তখন যে মোবাইল ছিল না সূচী, তাই যোগাযোগ করাটাও এত সহজ ছিল না জানো।

Sahitya Chayan

সুচেতা বললো, যাকগে নিজেদের খারাপ-ভালোর সংসার অনেক হয়েছে, এবারে মেয়েটার ব্যবস্থা করো দেখি। দিনরাত উদ্ভট সব কাজ করে বেড়াচ্ছে। পলিটিক্যাল বিটের রিপোর্টার হওয়ার কি দরকার ছিল?

সফট বিটে কাজ করতে পারতো?

অনিরুদ্ধ বললো, টেনশন কোরো না সূচী। আজকাল আর আগের মত হয় না। মিডিয়াকে কিনে রাখে রাজনৈতিক দলগুলো। তাই তাদের মত মতই খবর পেশ করতে হয় রিপোর্টারদের। একেকটা চ্যানেল একেক রাজনৈতিক দলের। ওই জন্যই তো সাধারণ মানুষের মিডিয়ার লোকদের ওপরে খুব আক্রোশ। ওরা ভাবে কেন আমরা সঠিক খবরটা দিচ্ছি না! ওরা জানে না দেওয়া সম্ভব নয়। তাহলে পরের দিন রেজিগনেশন পেপার রেডি করে রাখবে কোম্পানি। তাই বংশবদ হয়ে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেই বাঁচিয়ে রাখতে হয় জবটাকে। তবে তিতির যে চ্যানেলে কাজ করে ওটা তবুও বেশ স্বচ্ছ। তাই তিতিরের বিপদের সম্ভবনা হয়তো একটু বেশি। কিন্তু আমি জানি আমার তিতির পাখি সব বিপদ রিকভার করতে পারবে।

সূচী রাগ করে বললো, বড্ড বেশি প্রশয় দাও তুমি মেয়েটাকে।

অনিরুদ্ধ হেসে বললো, কারণ আমি ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। ও সত্যের জন্য লড়বে, ও সাবধানী, ও ব্যতিক্রমী। আর পাঁচজনের মত একই বাঁধাছকে ওকে

Sahitya Chayan

ফেলো না সূচী। তাহলে ও দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে। ওকে বাঁধতে যেও না, ওকে খোলা আকাশে উড়তে দাও।

সুচেতা বললো, তাই বলে এতবড় একটা ঘটনা ঘটানোর পরেও তার এতটুকু গিল্টি ফিলিংস থাকবে না?

এখন নৈঋতের বাড়ির লোকেরা ওকে মেনে নিলে তবে তো! নৈঋত একাই তো ওর পরিবার নয়। আমি কাবেরীর জায়গায় থাকলে কি করতাম অনি? পারতাম এভাবে বিয়ের আসর থেকে চলে যাওয়া একটা মেয়েকে মেনে নিতে! জানি না গো দুশ্চিন্তাটা কিছুতেই মন থেকে যাচ্ছে না।

অনিরুদ্ধ একটু ভেবে বললো, সূচী তোমার মনে আছে তিতির কোন চিঠিটা খুলে পড়ছিল?

সুচেতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আমি ঠিক জানি না গো, সবগুলোও পড়তে পারে আবার একটাও না। আমি যখন ঘরে ঢুকলাম তখন দেখলাম, তোমার আলমারি খোলা বোধহয় নিজের পাসপোর্টটা খুঁজে পাচ্ছিলো না বলে তোমার আলমারিতে খুঁজছিলো। আমি ঢুকতেই জিজ্ঞেস করলো, মা পীযুষ কে? বাবা কেন লিখেছে, পীযুষকে ছেড়ে দেওয়াটা অন্যায়? কেন লিখেছে ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট? এই লোকটা কে? তোমরা চেন একে?

আমি ওর কোনো কথার উত্তর না দিয়ে চিঠিটা কেড়ে নিয়েছিলাম।

অনিরুদ্ধ বললো, তুমি মনে করলে এমনিই ও অন্যের চিঠি পড়তে গিয়েছিল? না, তা নয়। বেশ কিছুদিন ধরে

Sahitya Chayan

নাকি পীযুষ ওর ফোনে মেসেজ পাঠাচ্ছে, কল করছে। তিতির নম্বর ট্র্যাক করে বের করেছিল লোকটার নাম পীযুষ বিশ্বাস, রাইগঞ্জ, নীলপুর অঞ্চলের বাসিন্দা। তাই ও আমাদের চিঠিতে ওর নাম দেখে জানতে চেয়েছিল। আমিও জানতাম না, ভেবেছিলাম হয়তো চিঠিগুলো পড়েই ওর মনে সন্দেহ জন্মেছে। কিন্তু এবারে এখানে এসে এগুলো শোনার পর বুঝতে পারলাম, ওই জন্যই ও আমার সঙ্গে এই লোকটার কোনো পুরোনো শত্রুতা আছে কিনা সেটা খুঁজতে গিয়েছিল। তাই আমার আলমারি খুলে কিছু ডকুমেন্ট জোগাড় করার চেষ্টা করেছিল সম্ভবত।

সুচেতা বললো, তার মানে পীযুষ অহনার সব খবর রাখে? এমনকি ফোন নম্বরও জানে? ও যে আমাদের মেয়ে সেটাও? এখন কি হবে অনিরুদ্ধ?

আমি তো শুনেছিলাম, সে বিয়ে-থা করে সংসারী। রাইগঞ্জে তাকে আর কেউ দেখেনি কোনোদিন। এতগুলো বছর পরে আবার কেন অনি? কি চায় সে? আমার মেয়ের জীবনটাও শেষ করে দিতে চায়!

অনিরুদ্ধ একটু শান্ত গলায় বলল, বারবার বারণ করেছিলাম রাইগঞ্জে মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত কোরো না। ওটাই তো ঘাঁটি ওর। তুমি সামার ভ্যাকেশনে যে কদিন যেতে তিতিরকে নিয়ে ঐবাড়িতে, আমি আশঙ্কায় থাকতাম। ভয় করতো আমার।

সুচেতা অভিমানী গলায় বলল, দাদা-বৌদি তারপর তোমায় অনেকবার বলেছিল ওই বাড়িতে যেতে, তুমিই জেদ করে যাওনি।

Sahitya Chayan

অনি চেঁচিয়ে বললো, না যাইনি। সোহম কি করে ওই রেপিস্টটার সঙ্গে জোর করে বিয়ে দিচ্ছিল তোমার? সেদিন যদি ঠিক সময়ে না পৌঁছাতাম আমি তো তোমায় হারিয়ে ফেলতাম সূচী। কি করতাম আমি সারাটা জীবন?

রাইগঞ্জ হসপিটালের ডক্টর বলেছিলেন, আরেকটু দেরি হলে হয়তো.... তারপরে আমি তোমার দাদাকে ক্ষমা করতে পারিনি সূচী। পারবোও না কোনদিন। তাই ওই বাড়ির সঙ্গে কোনোদিন আমার সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে পারে না। এসব পুরনো কথা থাক এখন। এত বছরে এগুলোতে পলি পড়েছে, এখন আর এগুলো খোঁচাখুঁচি না করাই ভালো।

সুচেতা বললো, কিন্তু ওই জানোয়ারটা যে অহনাকে টার্গেট করেছে, এখন কি হবে? অনিরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, তিতিরকে সবটুকু সত্যি জানতে দাও সূচী। তারপর ও যা সিদ্ধান্ত নেবে সেটা আমরা মাথা পেতে নেব। সত্যিটা জানার অধিকার ওর আছে। এভাবে লুকিয়ে রাখাটা আমাদেরই ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। সুচেতা নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল বাইরের বাগানের দিকে তাকিয়ে।

অনিরুদ্ধর হোমথিয়েটারে বাজছে.....

ছোট ছোট দিন আলাপে রঙিন নুড়িরই মতন..
ছোট ছোট রাত চেনা মৌ তার পলাশের বন....
অগোছালো ঘর খড়কুটোময় চিলেকোঠা কোণ ....

।।৩৩।।

আলো আলো রং জমকালো চাঁদ হয়ে যায়

Sahitya Chayan

চেনাশোনা মুখ জানাশোনা হাত ছুঁয়ে যায়
আজও আছে গোপন ফেরারী মন
বেজে গেছে কখন সে টেলিফোন.

কি হলো গানটা বন্ধ করলে কেন নৈঋত? কারণ আমরা এখন ঢাকুরিয়ায় তোমার ফ্ল্যাটের সামনে পৌঁছে গেছি। অহনা বন্ধ চোখ খুলে বললো, আমি কদিন ধরেই ভাবছিলাম আমাদের ড্রাইভার শ্যামলকাকুকে ছাড়িয়ে দেব, অন্য কাজে ইনক্লুড করবো, একটা বেশ ইয়ং দেখে ড্রাইভার রাখবো। ভাবছিলাম একটা ইন্টারভিউ ডাকবো। এখন মত পরিবর্তন করলাম, ইন্টারভিউ আর ডাকবো না। আমি পাকা ড্রাইভার পেয়ে গেছি। যে সাড়ে তিনঘণ্টার রাস্তা পাঁচ ঘণ্টায় নিয়ে এলো।

নৈঋত বললো, হে হে... আরেকজন যে ওয়াশরুমে পাক্কা আধঘণ্টা আর রেস্টুরেন্টে হাত চাটতে একঘণ্টা লাগালো সেটা বুঝি ড্রাইভারের টাইমের মধ্যেই ধরা হবে? যাক, কালই গিয়ে কলেজে একটা রেজিগনেশন দিয়ে আসবো। বলবো, আমি পার্মানেন্ট জব পেয়ে গেছি, আমৃত্যু ড্রাইভারের জব।

অহনা ঠোঁট টিপে বললো, ড্রাইভার যে গুগলের ডান দিকে যান আর বাঁ দিকে যান শুনতে শুনতে এসে পৌঁছেছে সেটাই অনেক।

নৈঋত বললো, শুনুন ম্যাডাম, আমি ঐ রাইগঞ্জে এই প্রথম গাড়ি চালিয়ে গেলাম। আর যেদিন সন্ধেতে গিয়েছিলাম সেদিন তো আমি চালাইনি। আমি সুখস্বপ্নে

Sahitya Chayan
বিভোর হয়ে ফুলসজ্জিত গাড়িতে গিয়েছিলাম। বুঝতেও পারিনি ফুলশয্যা ডিরেক্ট শরশয্যা হয়ে যাবে! অহনা নৈঋতের মুখে হাত চাপা দিয়ে বললো, কি হচ্ছে, এত ভুলভাল কেন বকো? বাংলা শব্দের মানে জানো না নাকি? নৈঋত ওর হাতটা চেপে ধরে বলল, তোমার বর কিন্তু দারুন লাকি হবে, এত সাবধানী বউ পাবে বলে। অহনা হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললো, শোনো, আমি গিয়ে চাবি খুলছি তুমি নিচের ওই দোকান থেকে পিৎজা কিনে নিয়ে ফ্ল্যাটে ঢোকো। তাহলে দেবযানী আন্টি ভাববে পিৎজা বয় এসেছে। তাই খেয়াল করবে না। নাহলে আজ রাতেই মায়ের কানে চলে যাবে। মহিলার সারাদিনে একটাই কাজ। নৈঋত কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, জো আজ্ঞা মহারানী।

অহনা উঠে গেছে ফ্ল্যাটে। নৈঋত এখানেই এসেছিল অহনাকে দেখতে আজ থেকে মাস তিনেক আগে। জানে কোন ফ্লোরে ওদের ফ্ল্যাটটা। পিৎজা অর্ডার দিয়ে মাকে ফোনে ধরলো। মা হয়তো টেনশন করছে।

কাবেরী ফোনটা ধরেই বললো, হ্যাঁ বল। আমি একাই আছি বল। অহনা আর তুই কোথায় আছিস?

নৈঋতের কথা শুনে মা বললো, মানে? তুই আর অহনা একা থাকবি ফ্ল্যাটে? শোন টুটাই, কোনোরকম অসভ্যতামি কোরো না যেন। ওর বাবা-মা যেন আমার শিক্ষার বদনাম করতে না পারে। নৈঋত মজার গলায় বলল, বিয়েটা হলে তো ফুলশয্যা মিটে যেত মা।

কাবেরী গম্ভীর ভাবে বললো, হয়নি তো বিয়েটা। তাই সেটুকু মেইনটেইন করো।

Sahitya Chayan

নৈঋত মায়ের ফোনটা রেখে একচোট হেসে নিলো। মা ওকে ঠিক কি ভাবে কে জানে! বাংলা সিনেমার ভিলেনের মত অহনাকে একা বাড়িতে পেয়ে ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে? ভালোবাসাটা কৃপণের মত খরচ করতে নৈঋত জানে। আর তাছাড়া ওর মার্শাল আর্ট জানা হবু বউ একটা কিক মারলে ওকে আর গাড়ি চালিয়ে বাড়ি যেতে হবে না, ওই কিকেই পৌঁছে যাবে যাদবপুর।

বেল বাজাতেই ঘরোয়া পোশাকে দরজাটা খুলে দিল অহনা। ভিতরে চলে এসো। ভিতরে ঢুকতেই অহনা বললো, তোমার কি কিছু পোশাক আছে ওই ব্যাগে, নাকি বাবাইয়ের ড্রেস বের করে দেব। বলতো আমার প্লাজোও পরতে পারো।

নৈঋত হেসে বললো, আবার তোমার ড্রেসের চক্করে যাতে না পরতে হয় তাই একসেট পোশাক আমার ব্যাগেই আছে।

অহনা ওর হাত থেকে পিৎজাবক্সটা নিতে নিতে বললো, তুমি করে খেতে পারবে বুঝলে? কখনো যদি কলেজে ছাত্রীদের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে চাকরিটা খুইয়ে ফেলো তাহলে পিৎজাবয়ের জবটা তো পাক্কা।

নৈঋত সোফায় বসে বললো, সেদিনও তো এই পজিশনেই আমি বসেছিলাম। তুমি ভদ্র মেয়ের মত এসে আমার অপজিটে বসেছিলে। দেখে মনে হচ্ছিল রবীন্দ্র যুগের কোনো শান্ত নায়িকা পথ ভুলে এসে পড়েছে। গত তিনদিনে বুঝলাম, তুমি সাক্ষাৎ ব্ল্যাক উইডো টাইপ।

Sahitya Chayan

অহনা সামনের সোফায় বসে বললো, আচ্ছা বলো, তুমি আমার জন্য কি কি করতে পারো? শুনি তোমার সাহসী প্রেমের নমুনা।

নৈঋত একটু ভেবে বললো, ধরো তোমার সঙ্গে কাটিয়ে ফেলেছি একটা যুগ। বহুদিন পরে আবার দেখা আচমকা এক শীতের সন্ধেতে।

'মনে পরে অহনা,
আবদারে তোমার,
হারিয়েছিলাম সবুজঘেরা দ্বীপে।
প্রশ্রয়ে তোমার,
ডুবিয়েছিলাম শীতল জলে পা।
বায়নায় তোমার,
হেঁটেছিলাম ধু ধু বালির মাঠ।
তোমার মিষ্টি হাসিতে,
ভেসেছিলাম মাঝদরিয়ায়।
তোমার আদুরে ডাকে,
কালবৈশাখী উপেক্ষা করে
ছুটেছি অনেক পথ।
তোমার অভিমানী চোখে,
চারটে সি এল বরবাদ।
তোমার প্রশ্নবানে,
ধুমজ্বরে কলেজস্ট্রিট।
তোমার আস্কারায়,
ফুচকার টকজলে বদহজম।

Sahitya Chayan

তোমার উড়ন্ত চুলের মায়ায়,

ট্যাক্সি খরচ বাঁচিয়ে আইনক্সের টিকিট।

তোমার অপেক্ষায়,

এই বয়সে বাবার অপমান।

এবার আমার ম্লান প্রশ্ন-

পারিনি কি বাসতে ভালো তোমায়?'

অহনা আবেশ জড়ানো গলায় বলল, তোমার কবি হওয়া উচিত ছিল নৈঋত। তোমার বউ সত্যি লাকি হবে।

নৈঋত বললো, আর যদি আমার বউ তুমি হও?

অহনা বললো, লোভ হয়, তোমায় নিজের করে পেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু কদিন পরে টিভিতে আমাদের চ্যানেলে আমার একটা এক্সকুসিভ প্রোগ্রাম থাকবে, ওটা দেখার পরে সিদ্ধান্ত নিও আমায় বিয়ে করবে কিনা। তার আগে নয়।

নৈঋত হেসে বললো, কিছু কিছু সিদ্ধান্ত জীবনের চরম মুহূর্তে নেওয়া হয়ে যায়, সেটা আমৃত্যু পাল্টায় না। তাই আমি নিশ্চিত তোমার প্রোগ্রাম দেখার পরেও আমার সিদ্ধান্ত একই থাকবে।

অহনা প্রসঙ্গ পাল্টে বললো, তুমি ফ্রেশ হয়ে এসো, খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়তে হবে, ভীষণ টায়ার্ড দুজনেই। নৈঋত বললো, আমি একেবারে ফ্রেশ আছি। তোমার সঙ্গে রাত জাগতে রাজি। অহনা বললো, আমি রাজি নই। আমার কাল সারাদিন কাজ, তাড়াতাড়ি যাও। তুমি বাবা-মায়ের ঘরে শুয়ে পড়। গেস্টরুমে থাকতে হবে না।

Sahitya Chayan

নৈঋত পিছন ফিরে বললো, আমার তোমার ঘরে থাকতেও অসুবিধা নেই। আমি বড্ড ভালো ছেলে।

অহনা মুচকি হেসে বললো, আমি ভীষণ খারাপ। তুমি তাড়াতাড়ি যাও।

হাসতে হাসতে চলে গেল নৈঋত।

নৈঋত চলে যেতেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কল সেরে নিলো অহনা। অভিরূপ আঙ্কেল আশ্বাস দিলো, আগামীকাল ঠিক সময়ে অহনার বলা হসপিটালে পুলিশ কনস্টেবল পৌঁছে দেবে পীযুষকে। অহনা ডায়রি করলেই পীযুষকে ওরা জেলে চালান করবে, কিডন্যাপিংয়ের চার্জ দিয়ে।

অভিরূপ আঙ্কেলের সঙ্গে কথা শেষ করেই, ওয়েলকাম ইন্ডিয়ার ডিরেক্টারকে কল করলো অহনা। অরুন্ধতী ম্যাম ফোনটা রিসিভ করেই বললেন, অহনা কবে জয়েন করছো অফিস? অহনা খুব সাবধানে বললো, ম্যাম আমাদের চ্যানেলের ওই "রিয়েল লাইফ" শিরোনামে যে অনুষ্ঠানটা হয় ওখানে যদি আমি একটা নিজস্ব ঘটনা শেয়ার করতে চাই তাহলে কি স্লট পাবো?

অরুন্ধতী ম্যাম এমনিতেই অহনাকে বেশ পছন্দ করেন। কোনো কাজে অহনা না বলে না বলেই হয়তো পছন্দ করেন। একটু ভেবে উনি বললেন, আসলে ওই অনুষ্ঠানে তো আমরা অতি সাধারণ থেকে সেলিব্রিটি সবাইকেই আনি, তাদের জীবনের যে-কোনো একটা সত্যি ঘটনা তারা শেয়ার করে দর্শকদের সঙ্গে। কখনো তো নিজের চ্যানেলের কোনো এমপ্লয়ী আসেনি গেস্ট হিসাবে, তাই

Sahitya Chayan

আমাকে একবার "রিয়েল লাইফ" এর পরিচালক অর্ধেন্দুর সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে। ও যেহেতু এটার দায়িত্বে আছে তাই ওর অনুমতিটা আমার দরকার। যদি অর্ধেন্দুর কোনো প্রবলেম না থাকে, তাহলে আমার নো প্রবলেম। কবে স্লট চাও তখন জানিয়ে দিও।

অর্ধেন্দুর সঙ্গে অহনার মৌখিক পরিচয় আছে। চ্যানেলের বার্ষিক অনুষ্ঠানের সময় এসে নিজেই পরিচয় করছিল। বলেছিল, আপনিই তো গ্রেট সাংবাদিক অনিরুদ্ধ পালের মেয়ে তাই না? পরিচয় করার ইচ্ছে ছিল। আপনার রিপোর্টিং আমি দেখেছি, ভীষণ রকম বোল্ড। অনেক উন্নতি করবেন। অহনাও বলেছিল, আপনার রিয়েল লাইফ আমি সুযোগ পেলেই দেখি। দুর্দান্ত পরিচালনা করেন আপনি। লাইভ হয় বলে ইন্টারেস্টিং লাগে দেখতে। অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য হেসে বলেছিল, ম্যাডাম আপনি নিশ্চয়ই জানেন লাইভের সমস্যাটা। কোনো এডিটিং থাকে না, তাই কখনো কখনো সমস্যায় পড়তে হয় বৈকি।

কখনো ইচ্ছে হলে আসতে পারেন তো নিজের জীবনের সত্যি ঘটনা নিয়ে আমার অনুষ্ঠানে। অনিরুদ্ধ পালের মেয়ে, তাই টি.আর.পি বাড়বে বৈ কমবে না।

অহনা হেসে বলেছিল, ফিলিং ভি.আই.পি। নিশ্চয়ই যাবো একদিন।

তখন অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে মোটেই সিরিয়াস ছিল না ও। কিন্তু এখন ওর যাওয়ার প্রয়োজন আছে এই অনুষ্ঠানটাতে। অরুন্ধতী ম্যাম বললে, নিশ্চয়ই অর্ধেন্দু না

Sahitya Chayan

বলবে না। ও নিজেই তো বছর দুই আগে ইনভাইট করেছিল ওকে। তখন অবশ্য অনুষ্ঠানটা নতুন নতুন শুরু হয়েছে। এখন যে হারে এর পপুলারিটি তাতে আদৌ কি রাজি হবে চ্যানেলের কাউকে অ্যালাও করতে! দেখা যাক। নাহলে অন্য কিছু ভাবতে হবে।

অহনার বন্ধু রাজদীপের দাদা "সরলা" নার্সিংহোমের ডক্টর। ওনার হেল্প দরকার। রাজদীপকে ফোন করবে বলেই নিজের ঘরে ঢুকলো অহনা। নৈঋত আছে ফ্ল্যাটে, ফোনগুলো তাড়াতাড়ি সারতে হবে।

রাজদীপের কাছ থেকে ওর দাদার নম্বরটা নিয়ে রাখলো, রাজদীপ বললো, তুই টেনশন করিস না, আমি দাদাকে বলে রাখবো তোকে সমস্তরকম হেল্প করতে। তুই পেশেন্টকে নিয়ে কাল চলে যাস।

নৈঋত বাইরে থেকে ডাকলো, পিৎজা তো গরম খায় বললেই জানতাম, অবশ্য যাদের মেজাজ খুব গরম তারা ঠান্ডাও খায়। অন্যমনস্ক অহনা কিচেনে গিয়ে দুটো প্লেটে পিৎজা দুটো সাজিয়ে নিয়ে আসতে আসতেই বললো, মিডিলটা নাও নি? এত বেশি কেন? কে খাবে এত?

নৈঋত বললো, আমি আর তুমি।

অহনা বললো, এত?

নৈঋত হেসে বললো, আমি তো জানতাম যারা মার্শাল করা পাবলিক তারা নাকি বেশি খায়। তাই বেশি করে আনলাম। মানে মুখ আর হাত দুটো একসঙ্গে চালাতে হয়তো তাই।

Sahitya Chayan

অহনা স্বাভাবিক গলায় বলল, শোনো সেদিন ট্রেনে ওই লোফারগুলোকে যে গালাগাল দিয়েছিলাম সেগুলো কি তুমি কাবেরী আন্টিকে বলেছো?

নৈঋত গম্ভীর হয়ে বলল, না বলিনি, কারণ বললে মা ভাবত আমিও অসৎ সঙ্গে পড়েছি। অহনা মুখ বেঁকিয়ে বললো, আহা, উনি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্টুডেন্ট ছিলেন, এখন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রফেসর উনি যেন কোনো কিছুই জানেন না। যত বাজে কথা। নৈঋত বললো, কে বলল জানি না। বলতে শুরু করলে রাত ভোর হয়ে যাবে। কিন্তু অমন ফ্লুয়েন্টলি ইউজ করতে পারি না। জিভটা ঠিকমত ছোলা নেই এসব ব্যাপারে তাই। অহনা একটু ভেবে বললো, তুমি বাড়ি ফেরার পরে কি কি ঘটলো? নৈঋত খেতে খেতে বললো, এই দোকানের পিৎজাটা কিন্তু দারুন। ভবিষ্যতে শ্বশুরবাড়ি এলে শ্বশুরের ঘাড় ভেঙে খাবো। ভেবেই কেমন একটা উত্তেজনা হচ্ছে বুঝলে অহনা। অহনা হেসে বললো, তুমি কি একটু সিরিয়াস হতে পার না? বলো না, তোমাদের বাড়ির সবাই কি বলছিলো আমার নামে? নৈঋত সিরিয়াস মুখ করে বললো, সবাই বলছিলো, টুটাই ওই মেয়েকে আর এবাড়ির বউ করে আনা হবে না। ভালো করে মাথায় ঢুকিয়ে নাও। আর বাবা, পিমনি, পিসেমনা এরা তো আমি বাড়ি ফেরার আগে মেয়েও দেখে নিয়েছিল। বাবার অফিসে কলিগের শালার মেয়ে। তিনিও মিউজিকের লেকচারার।

Sahitya Chayan

অহনা মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে বললো, তা বিয়েটা কবে হচ্ছে? ছবি আছে নাকি তোমার কাছে তার?

নৈঋত টেবিল থেকে বাঁ হাতে করে মোবাইলটা তুলে বললো, পাসওয়ার্ডটা দাও তো বাঁ হাতে করে, আমার শুধু ডান হাতের আঙুলের ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেট করা আছে।

খাওয়ার সময় অসুবিধা হয়।

অহনা গম্ভীরভাবে বললো, পাসওয়ার্ড বলো।

নৈঋত বললো, Titirpakhi

টাইপ করতে করতেই থমকে গেল অহনা। নৈঋত বললো, হু স্পেস নেই কিন্তু। তিতির আর পাখি একসঙ্গে লেখো তবেই খুলবে।

অহনা ফোনটা আনলক করে এগিয়ে দিল ওর দিকে। নৈঋত বাবার পাঠানো মিমির ছবিটা খুলে বললো, এই যে এনাকে।

অহনা একটু সামলে নিয়ে বললো, এত রীতিমত সুন্দরী। রূপকথার নায়িকার মত। তোমার পাশে মানাবে ভারী।

নৈঋত খেতে খেতেই বললো, জানি তো মানাবে, কিন্তু মানতে পারবো না। তাই বারণ করে দিয়েছি বাড়িতে। অকারণ একটা মেয়ের কাছে ভুল বার্তা যাক সেটা আমি চাই না। অন্তত আমার কারণে তো নয়ই।

তবে বাড়িতে সবাই স্ট্রেইট জানিয়ে দিয়েছে, অহনাকে বিয়ে করা আর যাবে না।

ভুল দেখছে কি নৈঋত? অহনার চোখের কোনটা যেন একটু চিকচিক করে উঠলো মনে হলো।

Sahitya Chayan

ওর জন্য কোনোরকম ফিলিংস কি আদৌ তৈরি হয়েছে অহনার মনে! নাকি এখনও ওকে শুধুই বন্ধু ভাবছে!

অহনা বললো, প্লিজ বাড়ির সকলের কথা শোনো। ওরা কেউ কিন্তু অন্যায় কিছু বলছেন না। আমার জন্য একটা রেপুটেড ফ্যামিলির ইমেজ ম্যালাইনড হবে এটা আমি কোনোভাবেই চাই না।

তাই প্লিজ, তুমি কাল ফিরে যাও বাড়ি, আর এসো না কখনো।

নৈঋত হেসে বললো, ভাগ্যিস এই রাতেই তাড়িয়ে দিচ্ছ না।

এই অহনা, তোমার কোনো ফ্রেন্ড কখনো বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করেছে?

মানে ব্যাপারটা কি এক্সাইটিং নাকি গো? কোনোরকম ধারণা আছে তোমার?

অহনা অন্যমনস্কভাবে বললো, না নেই। নৈঋত তুমি শুয়ে পড়। আমার কয়েকটা কাজ আছে, ল্যাপটপ খুলে বসবো একবার, তারপর ঘুমাবো। চলো তোমায় বাবাইয়ের ঘরে বিছানাটা ঠিক করে দিই।

নৈঋত ঘাড় নেড়ে বললো, আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ। নিজের বিছানা নিজেই ঠিক করি রেগুলার। রাজাধিরাজ নই, বা টিপিক্যাল পুরুষ মানুষ নই যে আমার বিছানা অন্যকে করে দিতে হবে। ডোন্ট ওয়ারি, তুমি কাজ করো, আমি আজ অনিরুদ্ধ স্যারের বিছানায় শুয়ে সেলিব্রিটি ফিলিংস নিয়ে ঘুমিয়ে যাই।

Sahitya Chayan

নৈঋত বেসিনে হাত ধুয়ে টেবিল থেকে একটা জলের বোতল তুলে নিয়ে বললো, যদি প্রয়োজন হয়, নির্দ্বিধায় ডেকো। আজ তোমার ওপর দিয়ে যা গেছে, ট্রমাটা কাটতে একটু সময় লাগবে। আমি আছি তোমার সঙ্গে।

নৈঋত শুভ রাত্রি জানিয়ে চলে গেল। ঘড়ির কাঁটা দুটো প্রতিযোগিতা করে ম্যাচ ড্র ঘোষণা করেছে এগারোটার ঘরে এসে।

নিজের ঘরে ঢুকে ল্যাপটপ খুলে পরপর এখনো পর্যন্ত পাওয়া ডকুমেন্টগুলো সব মেলাচ্ছে অহনা।

এখনও দুটো গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাকি ওর। একটা আগামী কাল আরেকটা সপ্তাহখানেক পরে, এই দুটো কাজ কমপ্লিট হলে ও নিশ্চিন্তে কদিন ছুটি কাটাবে নিজের মত। ছুটি? দেবে কি চ্যানেল ওকে?

নৈঋতকে বড্ড ভালো লাগছে অহনার। ছেলেটার মধ্যে একটা পজেটিভ ভাইভস ছড়ানোর ক্ষমতা আছে। যতক্ষণ সঙ্গে থাকছিলো ততক্ষণ অহনা ভুলে থাকছিলো বাস্তবের জটিল পরিস্থিতিটাকে। ওর সঙ্গে মজা করলে মনের অনেক স্ট্রেস কমে যায়। ভালোবাসা কিনা জানে না অহনা, তবে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না ওকে। মনে হচ্ছে নৈঋত থাকুক ওর এই লড়াইয়ে। ওকে বিশ্বাস করা যায়, রেসপেক্ট করা যায়। কিন্তু নিজের প্রয়োজনে একবার নয় দুবার ওকে ব্যবহার করেছে অহনা, তাই আর নয়। এই লড়াইটা ওর একার। নৈঋতকে এর মধ্যে আর জড়াবে না কিছুতেই। নৈঋত সামনে এলেই দুর্বল হয়ে পড়ছে অহনা। ওর কথাগুলো অদ্ভুতভাবে রক্তে শিহরণ জাগাচ্ছে, ভালো

Sahitya Chayan

লাগার আবেশ ছড়িয়ে দিচ্ছে ওর ক্লান্ত শরীরে। তাই অহনা ভালো করেই বুঝতে পারছে, বাবা-মায়ের মতোই নৈঋতও ওর মনের একটা দুর্বল অংশ দখল করতে চলেছে খুব তাড়াতাড়ি। তাই কাল সকালে উঠে অহনার কাজ হবে, খুব শক্ত মন নিয়ে নৈঋতকে বাড়ি পাঠানো। একে তো ও কাবেরী আন্টির বিশ্বাস ভেঙেছে, আবার তার একমাত্র সন্তানকেও জড়িয়ে ফেলছে নিজের জীবনের সঙ্গে, এর থেকে অন্যায় আর হয় না। নৈঋতকে ফিরিয়ে দিতে হবে বাড়ি।

ল্যাপটপটা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করলো অহনা।

চোখের সামনে ভেসে উঠলো, পীযুষের কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি। চোখ দুটো জ্বলে উঠলো ওর। চোখের কোণে জমে উঠলো বাষ্প। বাষ্পটাকে কিছুতেই জল না হতে দেবার জন্য আপ্রাণ লড়াই করছিল অহনা। মাঝে মাঝে ও বুঝতে পারে ওর মধ্যেও একটা অতি সাধারণ মেয়ে লুকিয়ে আছে। যে মার্শাল আর্টে ব্ল্যাক বেল্ট নয়, যে ইউনিভার্সিটি টপার নয়, যে স্বেচ্ছায় নামী জবের অফার অগ্রাহ্য করে রিপোর্টারের অস্থায়ী জীবন বেছে নেওয়া সাহসী মেয়েটা নয়। রাজনৈতিক নেতার সামনে আগুনের গোলার মত প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া মেয়েটাও নয়, ভীষণ সাধারণ নরমসরম একটা মেয়ে। যে অনিরুদ্ধ পাল আর সুচেতা পালের কন্যা, যে নৈঋতের স্ত্রী হয়েই খুশি থাকতে চায়। যে অকপটে হাউহাউ করে কাঁদতে পারবে, যাকে নিজের কাঠিন্য বজার রাখার জন্য লুকাতে হবে না

Sahitya Chayan

নোনতা জলের ধারাদের। কোনোদিন যদি এই ব্যতিক্রমী তকমাটা ছেড়ে সাধারণ অহনাটাকে সকলের সামনে দেখাতে পারে, সেদিন কাঁদবে ও বালিশ ভিজিয়ে।

।।৩৪।।

কি হলো, কাঁদছিস কেন প্রিয়াঙ্কা? আজ কি কাঁদার দিন? দেখ, আমার মাও এসেছে তোকে আশীর্বাদ করবে বলে। অনিকের দৃষ্টি অনুসরণ করে প্রিয়াঙ্কা ঝাপসা চোখে দেখলো, অনিকের মা বসে আছে গাড়িতে। দীপশিখা আজ খুব সুন্দর করে সেজেছে। প্রিয়া সকালেই বলেছে, যতই সাজো তোমায় শাশুড়ি শাশুড়ি লাগছে না কিন্তু, বড়জোর জ্যেষ্ঠ শ্যালিকা বলে চালানো যেতে পারে। মেয়ের কথায় হেসে গড়িয়েছে দীপশিখা। আজ তার বড্ড আনন্দের দিন। মেয়ে চাকরি পেয়েছে, দীপা দাঁড়িয়ে থেকে প্রিয়ার পছন্দের মানুষের হাতে ওকে তুলে দিতে পারবে, অনিক বেশ ভালো ছেলে। প্রিয়াকে ভালোও বাসে খুব। তাছাড়া আরেকটা মানুষ যে আজও ওর স্মৃতি আঁকড়ে বসে আছে ভেবেই নিজেকে এ পৃথিবীতে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে শুরু করেছে।

অনিক একটা চারচাকা ভাড়া করে এনেছে। প্রিয়ার বাড়ির সামনে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে।

প্রিয়া গাড়িতে উঠতেই অনিকের মা বললো, তোমাদের বিয়ে হবে, আমি না এসে থাকতে পারি? জানি অনির বাবার মত হয়তো ও পাবে না এখুনি, তবে আমি আছি তোমাদের জীবন শুরুর মুহূর্তে। প্রিয়ার পরনে লাল বেনারসি। গলায় সিটিগোল্ডের হার, হাতে দুটো

Sahitya Chayan

সিটিগোল্ডের চুড়ি। দীপশিখার যেটুকু গয়না ছিল সবই পীযুষ কেড়ে নিয়েছে, তাই মেয়েকে দেবার মত কিছুই নেই ওর হাতে। অহনার দেওয়া আংটিটা প্রিয়ার আঙুলে আর কানে দুটো সোনার কানের দুল। প্রিয়া গাড়িতে ওঠার আগেই অনিকের মায়ের পা ছুঁয়ে বললো, আপনি আমার মনের দ্বিধা কাটিয়ে দিলেন। কেমন যেন অপরাধবোধ কাজ করছিল, অনিক ওর বাড়ির সকলকে লুকিয়ে আসছে ভেবেই তৈরি হচ্ছিলো খারাপ লাগাটা। আপনার আশীর্বাদ পেলে তবেই পূর্ণ হবে আজকের দিনটা। অনিকের মা হেসে বললেন, না বেয়ান, ছেলের আমার পছন্দ আছে। কি মিষ্টি মেয়ে, কেমন সুন্দর জীবনবোধ। পীযুষ বিশ্বাসের মেয়ে শুনেই নাক সিঁটকেছিলাম, এখন মনে হচ্ছে ছেলের আমার চোখ আছে। অনি, তাড়াতাড়ি চল। এগারোটা দশে একটা ভালো সময় আছে। আমি ঠাকুরমশাইকে জিজ্ঞেস করেছি। ওই সময় তোরা সই করবি। আর বাজারের মোড় থেকে দুটো ফুলের মালা কিনে নিবি। সিঁদুর আমি সঙ্গে এনেছি। ঠাকুরের পায়ে ছোঁয়ানো সিঁদুর।

প্রিয়ার যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না। এমন সুখও ছিল ওর জীবনে! মদ্যপ বাবার গালিগালাজ শুনতে শুনতে মনটাই তো শুকিয়ে গিয়েছিল। মরুভূমির মত শুকনো ছিল ওর চোখ দুটো। যেন মনে হতো, চোখের সব শিরা উপশিরারা মৃত। বাবার মারের আওয়াজ, মাকে গলা ধাক্কা দেওয়া, ওকে নোংরা ভাষায় গালি শুনতে শুনতে পুরুষ জাতিটার প্রতি একটা ঘৃণা জন্মেছিল। সেই ঘৃণাকে ধুয়ে মুছে ভালোবাসার রঙে রাঙানো সহজ কাজ ছিলো না।

Sahitya Chayan

অনিকের মত জাদুকর ছিল বলেই হয়তো প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস করেছে, পুরুষ মানে নির্ভরতা, পুরুষ মানে প্রতিশ্রুতি রাখার একান্ত চেষ্টা। অনিক দুই মায়ের চোখ এড়িয়ে প্রিয়ার হাতটা চেপে ধরে বলল, এই যে মহারানি, এবার থেকে তুই কিন্তু প্রিয়াঙ্কা অনিক বসু হতে চলেছিস, মেয়েবেলা শেষ করে বউবেলা শুরু হবে। প্রেমিকা হিসাবে কিছু বলার আছে তোর? বউবেলায় তো আমাকে দুবেলা শাসন করবি সে আমি জানি। প্রেমিকাবেলার শেষ মুহূর্তের দাবিটুকু শুনে নিই।

প্রিয়াঙ্কা বললো, সারাজীবন প্রেমিকা থাকবো তোর। সকলের সামনে তোমার বউ, আর আড়ালে তোর প্রেমিকা।

অনিক মুচকি হেসে বললো, তথাস্তু, মনে রাখবে এই অর্বাচীন। প্রিয়া তোকে না পেলে জীবনের অর্থ বড্ড এলোমেলো হয়ে যেত রে। ভাগ্যিস তুই করুণা করলি।

প্রিয়া মনে মনে বললো, পাগল একটা, কি যে দেখেছে ওর মধ্যে কে জানে!

একটা আননোন নম্বর থেকে দীপশিখার ফোনে ফোনটা ঢুকলো। হ্যালো বলতেই, বললো, রাইগঞ্জ থানা থেকে বলছি। পীযুষ বিশ্বাসকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। অহনা পালকে কিডন্যাপিংয়ের দায়ে। ওনার স্ত্রী হিসাবে আপনি কি জামিনের আবেদন করতে চান?

দীপশিখা বললো, না চাই না। আরও কয়েকটা চার্জ যোগ করতে চাই ওর সঙ্গে। ফোনটা রেখে দিয়েছে দীপশিখা।

Sahitya Chayan

খবরটা এখুনি দেওয়া যাবে না কাউকে। আগে ভালোয় ভালোয় প্রিয়ার বিয়েটা মিটুক।

প্রিয়ার সিঁথিতে অনিক সিঁদুর পরিয়ে দিলো। অনিকের মা একটা সোনার চেন প্রিয়ার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললো, আমার একটাই ছেলে, তাই তার বউকে আমি অনুষ্ঠান করেই ঘরে নিয়ে যাবো। কয়েকটা দিন সময় দাও মা।

অনিক আর প্রিয়ার রেজিস্ট্রি ম্যারেজ কমপ্লিট।

একটা রেস্টুরেন্টে খাওয়াদাওয়া করে ওরা ফিরে যাবে যে যার বাড়ি।

অনিক বললো, প্রিয়া কদিনের মধ্যেই কিন্তু যাবো ফ্ল্যাট বুক করতে, রেডি থাকিস।

দীপশিখা আর প্রিয়া ফিরে এসেছে বাড়িতে। প্রিয়ার গালদুটো রঙিন। খুশি খুশি মুখে আনন্দ উপচে পড়ছে।

অনিককে নিজের করে পাওয়ার আনন্দে আত্মহারা ও।

দীপশিখা স্থির গলায় বলল, তোর বাবাকে অ্যারেস্ট করেছে পুলিশ। আমার ফোনে কল এসেছিল থানা থেকে। জামিনের জন্য যাবো কিনা জিজ্ঞাসা করছিল।

প্রিয়া একটু অবাক হয়েই বললো, অ্যারেস্ট করেছে, কিন্তু কেন? মানে চার্জটা ঠিক কি? দীপশিখা বললো, অহনাকে কিডন্যাপিং করার চার্জে।

প্রিয়া হাততালি দিয়ে উঠলো। তার মানে অহনাদি কথা রেখেছে। শেষ পর্যন্ত ওই জানোয়ারটার হাত থেকে আমরা রক্ষা পেতে চলেছি মা। দীপশিখা দৃঢ় স্বরে বললো, আরও কয়েকটা চার্জ ওর নামে হওয়া দরকার রে। রোজ রাতে আমাকে যে মারত, ফিজিক্যাল হ্যারজমেন্টের চার্জ

Sahitya Chayan

আনবো আমি ওর বিরুদ্ধে। যাতে আমি বেঁচে থাকতে আর ওর মুখ দেখতে না হয় প্রিয়া। তুই আমার নিয়ে যাবি রাইগঞ্জ থানায়?

প্রিয়া বললো, মা তার আগে আমি একবার অহনাদিকে কল করে পুরো বিষয়টা জেনে নিই তারপর তুমি, আমি আর অনিক যাবো। ওই লোকটাকে সারাজীবন অন্ধকারে রাখতে চাই আমিও।

দীপশিখা বললো, প্রিয়া আমায় একবার সূর্যপুর নিয়ে যাবি? অনিরুদ্ধ পালের বাড়ি।

প্রিয় মায়ের স্থির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, নিশ্চয়ই যাবো মা তোমায় নিয়ে। তোমার এইটুকু ইচ্ছে যদি পূরণ করতে না পারি তাহলে আর সন্তান কিসের! আমি আর অনিক কাল ফ্ল্যাট বুক করতে যাবো, দিন তিনেক পরে রবিবার করে নিয়ে যাব তোমায়।

দীপশিখা বললো, শান্তি বড্ড শান্তি। বহুবছর পরে আমি আজ নিশ্চিন্তে ঘুমাবো প্রিয়া। আমার চোখ দুটোতে অনেক ঘুম জমে আছে জানিস। প্রিয়া মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, ঘুমাও মা, আজ আর আতঙ্কে থাকতে হবে না তোমাকে, কখন মারবে, কখন সিগারেটের ছ্যাঁকা দেবে, সেই ভয়ে জেগে থাকতে হবে না রাতের পর রাত। আর বেল্টের আঘাতের যন্ত্রণায় কাঁদতে হবে না তোমায় মা। তুমি ঘুমিয়ে পড়, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। দীপশিখা ধীরে ধীরে চোখ বুজলো।

বিজয়দা গান গাইছে মালকোষের সুর....ওর দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে, লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছে দীপশিখা।

Sahitya Chayan

।।৩৫।।

নৈঋত বললো, মা আজ ওয়েলকাম ইন্ডিয়ার "রিয়েল লাইফ" অনুষ্ঠানটা আমাদের বাড়ির সকলকে দেখতে অনুরোধ করেছে অহনা। কাবেরী বললো, গত দশদিন তুই অহনার সঙ্গে দেখা করিসনি? কথাও হয়নি তোদের? সেদিন ওদের ফ্ল্যাট থেকে ফেরার পর থেকেই দেখছি তুই বড্ড মনমরা হয়ে আছিস। কথাও বলছিস না ঠিক করে, কি হয়েছে বলবি? দেখ টুটাই, সকলেরই অফিস শুরু হয়ে গেছে, তাই বাড়িতে আর বেশি টাইম দেওয়া হচ্ছে না। তাই বলে তোর কোনো সমস্যা হলে আমি শুনবো না তা কিন্তু নয়।

নৈঋত একটা জার্নাল ওল্টাতে ওল্টাতে বললো, কলেজে প্রথম যেদিন গেলাম সেদিন কলিগ থেকে স্টুডেন্ট সকলের চোখেই কৌতূহল ছিল। আমিই ক্লাসে ঢুকে বেশ ব্রেভলি বললাম, তোমরা নিশ্চয়ই এতদিনে জেনে গেছো আমার বিয়েটা হয়নি। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে আগুনের আগে খবর ছড়ায়, তাই নিশ্চয়ই জানো। তাই সকলের চোখের দৃষ্টিতে অনেক প্রশ্ন জমেছে দেখতে পাচ্ছি। আমি একে একে পরিষ্কার করছি। আমাদের দুজনের আচমকা মনে হয়েছে আমাদের বিয়েটা বন্ধুত্ব ছাড়াই হচ্ছে। পরে হয়তো দুজনের মাঝে সমস্যা হবে। তাই আমরা সেদিন এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। নিজেদের মাস খানেক সময় দিয়েছি, যদি দেখি দুজনের মনের মিল আছে তাহলে বিয়েটা হবে, আদার ওয়াইজ হবে না।

Sahitya Chayan

স্টুডেন্টরা বোধহয় মুখচোরা স্যারের কাছ থেকে এতটা স্পষ্ট ভাষায় কথা বলা এক্সপেক্ট করেনি। তাই সকলে একবাক্যে চুপ করে গেছে। দু-চারজন পক্ক ছেলেমেয়ে বলেছে, স্যার ব্রেভ ডিসিশন, অ্যান্ড রাইট অলসো।

কলিগদেরও একই গল্প দিতে বাধ্য হয়েছি, তাই দ্বিতীয় দিন থেকে কলেজে আর কোনো প্রবলেম হয়নি। আসলে কি বলতো মা, এখন জেট যুগ, কারোর সময় নেই কাউকে নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবার। তাই একটু গুঞ্জন উঠেই থেমে যায়। কাবেরী বললো, এটা তুই ঠিক বলছিস, আমিও খুব টেনশনে ছিলাম হয়তো অফিসে অনেকেই জিজ্ঞেস করবে। তুই জাস্ট ভাবতে পারবি না, যাদের নিমন্ত্রণ ছিল তারা পর্যন্ত কিছু জানতে চায়নি। বরং আগের মত নরম্যাল কথা বলছে। হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি।

তোর বাবাও বলছিলো, দু-একজন খুব ক্লোজড ছাড়া তেমন কারোর প্রশ্নবানের সম্মুখীন হতে হয়নি। জানিস টুটাই হয়তো লোকে পিছনে আলোচনা করছে একটু আধটু, তবে সামনে যে করছে না এতেই স্বস্তি।

নৈঋত বললো, জানো মা, অহনা কিছু একটা বলতে চাইছে আমায় কিন্তু কিছুতেই পারছে না। পারছে না বলেই দূরে চলে যাচ্ছে একটু একটু করে। অনিরুদ্ধ আঙ্কেল আর আন্টি নাকি ওদের সূর্যপুরের বাড়িতেই এখনো আছেন। আন্টির স্কুল শুরু হয়ে গেছে, তাই নাকি ছুটিতে আছেন উনি। অহনা নাকি এ কদিন একাই থাকতে চেয়েছে ঢাকুরিয়ার ফ্ল্যাটে। আঙ্কেল আন্টি দুশ্চিন্তা করলেও কিছুই করার নেই। এমনকি আমি ফোন করলেও হাই

Sahitya Chayan

হ্যালো করে রেখে দিচ্ছে। ঠিক কি যে ওর প্রবলেম সেটাও শেয়ার করছে না। এদিকে তো দেখলাম জব জয়েন করেছে। গতকাল সন্ধেতে সর্দার এভিনিউয়ের মিটিং কভার করেছে। টিভিতে খবরের সময় ওকে দেখালোও। কিন্তু কারোর সঙ্গে কথা বলতে ওর যে কিসের সমস্যা কে জানে। আমিও ওর প্রাইভেসিটাকে গুরুত্ব দিয়েই বিরক্ত করিনি। দেখি না একটু অপেক্ষা করে। যদি ওর কোনোরকম ফিলিংস তৈরি হয়ে থাকে আমার প্রতি তাহলে নিশ্চয়ই ও নিজেই কল করবে। নাহলে সরে আসবো আমিই ধীরে ধীরে। কাবেরী ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, কষ্ট হচ্ছে না রে? আসলে অহনা এমনিই ব্যতিক্রমী চরিত্র যাকে সাধারণ ছাঁচে ফেলতে গেলেই সব ওলটপালট হয়ে যায়।

তাই ধৈর্য্য তোকে ধরতেই হবে। জানিস অহনাকে আমার কেন পছন্দ হয়েছিল? অহনার মধ্যে সততা আছে স্বচ্ছতা আছে, লুকানোর প্রবণতা একেবারেই নেই। সর্বজনসমক্ষে ও সত্যি বলতে ভয় পায় না, তাতে ওর ইমেজ ম্যালাইন হলেও নয়। আমরা পারবো বল?

নৈঋত বললো, এই যে কলেজে স্টুডেন্টদের সামনে গিয়ে কনফেস করলাম টিজিংয়ের আগেই এর কারণ কিন্তু অহনা। ওই বলেছিল, সত্যিটা নিয়ে লোকজন একদিন আলোচনা করবে, কিন্তু মিথ্যে নিয়ে ফিসফিস চলে আজীবন। তাই সাময়িক ভয় করলেও স্পষ্ট অপ্রিয় সত্যের পক্ষে সব সময় থেকো নৈঋত। কলেজে গিয়ে সত্যিটা বলবে, দেখবে কেউ তোমার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে

Sahitya Chayan

তাকাবে না পরের দিন থেকে। জানো মা ভয় করছিল, খুব অস্বস্তি হচ্ছিল, মনের মধ্যে চলছিল দোলাচল। তারপর ভাবলাম দেখাই যাক না, অহনার পরামর্শ মত চলে কি হয়। দেখলাম, অদ্ভুত রকমের সাকসেসফুল হলাম আমি। এ কদিন নিশ্চিন্তে কলেজ যাচ্ছি। কোনো সংকোচ নেই, নেই লুকোচুরি, বরং স্বাভাবিক হয়ে গেছে সবাই। যদিও অহনার মত আমার সাহস নেই, নেই সত্যি বলার ক্ষমতা। তাই সেদিন বিয়ের আসরের অরিজিনাল ঘটনাটা বলতে পারিনি অহনার নির্দেশ মত। মিথ্যেই বলেছি কিছুটা, বলতে পারো ঢেকে রেখে। কিন্তু তবুও ফেস তো করতে পেরেছি এই পরিস্থিতিকে, এর পিছনে কিন্তু মহারানির অবদান আছে। কাবেরী হেসে বললো, জানি রে অহনার সঙ্গে যারা মিশবে তারা ওকে ভুলতে পারবে না।

জানো মা, মেয়েটার কি অসম্ভব জেদ গো। একার লড়াই একা লড়বে। হয়তো ওকে ডিজার্ভ করি না, হয়তো ও আমার লাইফ পার্টনার হবে না, তবুও আমি ওকে রেসপেক্ট করবো আজীবন। কাবেরী মনখারাপি গলায় বলল, খুব ইচ্ছে ছিল জানিস, এমন একটা নিয়ম ভেঙে নিয়ম গড়ার কারিগরকে নিয়ে আসবো মেয়ে করে। তাই তো গোটা বাড়ির বিরোধিতা করেও অহনার সঙ্গে তোর বিয়ে ঠিক করেছিলাম। অহনা আমাকে বুঝিয়েছিলো, কম্প্রোমাইজ আর অ্যাডজাস্টমেন্টের মধ্যে পার্থক্য কোথায়। খুব ফাইন একটা লাইন আছে জানিস ওই দুটো শব্দের মধ্যে, তাই বারবার কম্প্রোমাইজকে আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট ভেবে ভুল করি। অহনাই আমায় প্রথম

Sahitya Chayan

বললো, আন্টি তোমার তো সব যোগ্যতা ছিল তাহলে কেন আজ আঙ্কেলের এতগুলো প্রমোশন হলো তোমার নয়, কারণ তুমি একতরফা কম্প্রোমাইজ করে গেছো। সংসারের জন্য, সন্তানের জন্য, যে সংসার বা সন্তানটা তোমাদের দুজনেরই। জানিস টুটাই, মেয়েটার মধ্যে না ছক ভেঙে ভাবার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। আমাদের ভাবনা যেখানে গিয়ে ঠোক্কর খেয়ে থমকে যায়, সমাজ, লোকলজ্জার ভয়ে গুটিয়ে যায়, ওর ভাবনা সেখান থেকে সমস্ত জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে সূর্যের আলোর মত প্রকট ভাবে।

ওই ঘটনার পর অহনা একদিন কল করেছিল আমায়, বোধহয় ক্ষমা চাইবে বলে। আমি ফোনটা রিসিভ করিনি, আসলে ওর গলায় অপরাধী কণ্ঠস্বরটা ঠিক মানায় না, তাই শুনতে চাইনি। একদিন ফোন করতে হবে মেয়েটাকে। নৈঋত নরম গলায় বলল, কাবেরী আন্টির প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা।

অনু, শুভ, তুতান ছিল কদিন বাড়িটা বেশ ভরে ছিল বল, চলে যাওয়ার পর আমাদের যে কে সেই। যে যার মত ব্যস্ত। ওহ, অহনার প্রোগ্রামটা আছে অনুকে একবার ফোন করে বলিস। পরে নাহলে আবার ঠোঁট ফোলাবে। আমি তোর পাশে না থাকলেও ও নিজে দাঁড়িয়ে অহনার সঙ্গে তোর বিয়ে দেবে বলে গেছে। এমনকি তার দাদার মাথাতেও কিছু ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে বোধহয়। নীলাদ্রিও সেদিন বললো, টুটাই কি অহনাকেই বিয়ে করবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে? আর যেন লোক হাসায় না, প্লিজ। "ও মেয়ে

Sahitya Chayan

এবাড়িতে ঢুকবে না''র মত বিদ্রোহী গলা আর নেই তোর বাবারও।

।।৩৬।।

আপনারা? আপনাদের তো ঠিক চিনলাম না। সুচেতা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দীপশিখার দিকে।

অনিক সপ্রতিভ হয়ে বলল, আসলে মিস অহনা পাল আমাদের ইনভাইট করেছিলেন, উনি কি আছেন?

সুচেতা কিছু বলার আগেই অনিরুদ্ধ বললো, আপনারা যখন অহনার গেস্ট তখন ভিতরে আসুন। আমি অহনার বাবা অনিরুদ্ধ পাল। অনিক হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গিমা করে বললো, আমি আপনাকে বিলক্ষণ চিনি স্যার। যারা ক্রিকেট দেখে ক্রীড়া সাংবাদিক হিসাবে আপনার নাম জানে না এমন মানুষ কমই আছে।

সুচেতা খেয়াল করলো, দীপশিখার চোখ দুটো গোটা বাড়িটাতে ঘুরছে। কাউকে যেন খুঁজছে। অনিরুদ্ধ বললো, অহনা তো এখন এই বাড়িতে নেই, সে কলকাতার বাড়িতে আছে। প্রিয়া বললো, জানি স্যার। অহনাদি আজকে ''রিয়েল লাইফ'' প্রোগ্রামে লাইভে আসবে, আমি জানি। আমি ফোন করেছিলাম গত পরশু। আমাদের সকলকে লাইভটা দেখার জন্য রিকোয়েস্ট করেছে। অনিরুদ্ধ আর সুচেতা একটু অবাকই হয়ে গেল।

দীপশিখা, প্রিয়াঙ্কা আর অনিকের নাম কখনো অহনার মুখে শোনেনি। তাছাড়া এদের দেখেও মনে হয় না এরা অহনার খুব ক্লোজ কেউ। প্রিয়াঙ্কা সুচেতার দিকে নিজের

Sahitya Chayan

অনামিকাটা তুলে দেখিয়ে বললো, এটা দিদি আমায় দিয়েছে।

অনিরুদ্ধ বুঝতে পারলো অহনা এদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তাই সামনের সোফায় বসে বললো, আপনারা কোথা থেকে আসছেন বলুন তো? মানে অহনা তো আমাকে ফোন করে কিছু বলেনি।

দীপশিখা ধীর গলায় বলল, আমি পীযুষ বিশ্বাসের স্ত্রী।

অহনা কদিন আগেই আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল। ওর বেশ কিছু পুরোনো কথা জানার ছিলো, তাই আমার ভাসুরের কাছ থেকে সে সব জানে। আমায় ও কথা দিয়েছিল পীযুষকে ও জেলে ভরবেই। আমায় সমস্ত রকম অত্যাচার থেকে মুক্ত করবে। ও কথা রেখেছে, পীযুষ এখন জেলে।

সুচেতা নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে।

তার মানে অহনা পীযুষের বাড়ি অবধি পৌঁছে গিয়েছিল। বাবার এক জুনিয়র কলিগ ছিল পীযুষের বড়দা, তার কাছ থেকেই বোধহয় অহনা সবটুকু জেনেছে। ওই ভদ্রলোক সবটুকু জানতো, একদিন বাবার কাছে এসে ক্ষমাও চেয়ে গিয়েছিল। ওর কথাতেই নাকি পীযুষকে বাড়ি রঙের কাজটা দিয়েছিল বাবা। ওই ভদ্রলোকই পীযুষকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

অনিরুদ্ধ সুচেতার দিকে তাকিয়েই বুঝলো ওর মনের মধ্যে কি চলছে। মেয়ে সবটুকু জেনে গেছে বুঝতে পেরেই মুখটা সাদা হয়ে গেছে সুচেতার। অহনা যে ওইটুকু সূত্র ধরে এতদূর পৌঁছে যাবে এত কম সময়ের মধ্যে সেটা

Sahitya Chayan
অবশ্য ভাবতেই পারেনি অনিরুদ্ধ। আসলে পলিটিক্যাল বিটে কাজ করার জন্যই অহনার সোর্সগুলো কাজে দিয়েছে এক্ষেত্রে। তাই ও পীযুষকে খুঁজে বের করে ফেলেছে।

অনিক বললো, আমরা আসলে এখানে বিজয়চাঁদ অধিকারীর সঙ্গে মিট করতে এসেছিলাম। অহনাদি বলেছিল, উনি আপনার বাড়িতেই আছেন তাই....

অনিরুদ্ধ অন্যমনস্ক ভাবে বললো, বিজু? ও একটু বাজারে গেছে, এখুনি ফিরবে। আপনারা কি ওকে চেনেন? দীপশিখা বললো, চিনি, আমাদের একই পাড়ায় বাড়ি ছিল।

সুচেতা ফিসফিস করে বললো, অনি আমি কলকাতা ব্যাক করবো এখুনি। আমি অহনার কাছে যেতে চাই, প্লিজ।

অনিরুদ্ধ শান্ত গলায় বলল, সন্ধেতে অহনার প্রোগ্রাম আছে, তাই আমরা গেলেও ওর সঙ্গে দেখা হবে সেই রাতে। একটার মধ্যে লাঞ্চ করে নিয়ে স্টার্ট করবো, তাহলে পাঁচটার মধ্যে ঢুকেও যাবো ফ্ল্যাটে। ওর লাইভটা দেখতে হবে সূচী। ও নিজে যখন ফোন করে সকলকে দেখতে বলছে তখন অবশ্যই ওটা গুরুত্বপূর্ণ। সুচেতা বললো, হ্যাঁ আমাকেও পরশুদিন বললো, মা আমাদের চ্যানেলে 'রিয়েল লাইফে' আমি লাইভে আসছি, তুমি আর বাবা যেন দেখো। কেন গো অনিরুদ্ধ, ও হঠাৎ রিয়েল লাইফে আসছে কেন? তবে কি এসব সত্যি ঘটনা বলবে বলে?

Sahitya Chayan

অনিরুদ্ধ বললো, আমার কিন্তু তা মনে হয় না। হয়তো চ্যানেল থেকে ওকে রিকোয়েস্ট করেছে, তাই।

অনিরুদ্ধর গলায় সেই জোরটা আপাতত নেই। অহনা যা সাহসী মেয়ে, হয়তো সবই বলতে শুরু করলো। সোশ্যাল স্ট্যাটাসের কথা কি একবারও ভাববে না মেয়েটা! মাথাটা বড্ড ঘেঁটে যাচ্ছে অনিরুদ্ধর। কি করতে চলেছে অহনা সেটা নিয়ে যথেষ্ট ভাবনায় পড়েছে অনিরুদ্ধ।

বিয়ের আসর থেকে উঠে আসা, পীযুষ বিশ্বাসকে খুঁজে আনা, অভিরূপ সান্যালের হেল্প নিয়ে পীযুষকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া... সব হিসেব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। অনিরুদ্ধ ভেবেছিল, সুচেতার কষ্টটুকু ও জানুক। সত্যিটা জানুক ও। তার মানে এই নয় যে মিডিয়াতে কভার করবে বিষয়টা!

বিজয় বাজারের ব্যাগ হাতে ঢুকছিল বাড়িতে। দেখলো ড্রয়িংয়ে কয়েকজন বসে আছে। দেখেই আন্দাজ করলো দাদাবাবুর কাছে কেউ এসেছে। হয়তো কোন ক্লাবের ফিতে কাটতে যেতে হবে তার আব্দার নিয়ে। দাদাবাবু যে এখন এখানে ও তো কাউকে বলেনি, এ নিশ্চয়ই মানদার কাজ। একটা কথা যদি ওর পেটে থাকে! মনে মনে গজ গজ করতে করতেই ড্রয়িংয়ে ঢুকলো বিজু।

ব্যাগটা রান্নাঘরে রাখার আগেই গোটা ড্রয়িংয়ে ছড়িয়ে পড়লো সবজি, মাছ। ও কি ঠিক দেখছে? চেহারায় বেশ একটা পরিবর্তন এসেছে ঠিকই কিন্তু ওই চোখ, থুতনির তিল এগুলো যে এখনও একইভাবে অপরিবর্তিত। দীপশিখা? দীপার ঠোঁটটা কাঁপছে, কিছু কথা বলতে চাইছে হয়তো, পারছে না। প্রিয়াঙ্কা সবটা বুঝেই বললো,

Sahitya Chayan

আঙ্কেল অহনাদি বলছিলো আপনাদের লাইব্রেরিটা নাকি দেখার মত, একবার দেখাবেন প্লিজ। সুচেতা ধীর পায়ে ওপরে উঠে গেল। অনিরুদ্ধ বললো, এসো।

অনিককে ইশারা করতেই ও চললো প্রিয়ার পিছন পিছন।

প্রিয়া পিছন ঘুরে তাকিয়ে দেখল মায়ের ঠোঁটে ফিরে পাওয়ার হাসি আর চোখে হারিয়ে ফেলেছিলামের কষ্ট।

বিজয়কাকু অস্ফুটে বলে উঠলো, দীপা?

ওপরে লাইব্রেরিতে বসে দীপশিখা আর বিজয়চাঁদের জীবনের সবটুকু শুনলো সুচেতা আর অনিরুদ্ধ। শুনলো পীযুষ কি ভাবে দীপশিখাকে দিনের পর দিন অত্যাচার করেছে, কিভাবে প্রিয়াকে গালিগালাজ করেছে, মেরেছে।

অহনা নাকি ওদের বাড়িতে গিয়ে কথা দিয়ে এসেছিল, পীযুষকে আজীবন জেলে থাকার বন্দোবস্ত করবে, সেটাই করেছে। দীপশিখা বলেছে ওই কেসকে আরও জোরদার করতে এতদিনের অত্যাচারের জন্য মামলা করবে পীযুষের বিরুদ্ধে।

সুচেতা স্খলিত গলায় বলল, অনি, দীপশিখা যা পারলো, অহনা যা পারলো আমি কেন পারলাম না? যদি পারতাম তাহলে বোধহয় আমার জীবনটা অনেক সুন্দর হতো। একটা অপরাধী বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভেবে ভেবেই রাতের ঘুম, জীবনের সুখ সব নষ্ট করেছি আমি। অনিরুদ্ধ বললো, আমি জানি, ঐজন্যই কেসটা মুভ করতে চেয়েছিলাম। তুমি তখন শোননি। যদি শুনতে তাহলে আমাদের রঙিন দিনগুলোকে ধূসর করে দিতে না ওই

Sahitya Chayan

একটা রেপিস্টের জন্য। যা হবার হয়ে গেছে সূচী, তুমি যা পারনি তোমার মেয়ে তো তা পেরেছে।

সুচেতা বললো, কিন্তু অনি সেদিন যদি আমি রুখে দাঁড়াতাম তাহলে তো দীপশিখার জীবনটা এভাবে শেষ হতো না। প্রিয়ার মত একটা বাচ্চা মেয়ের বাবা সম্পর্কে ঘৃণা জন্মাত না। এগুলো সব ঘটেছে শুধু আমার একটা ভুল সিদ্ধান্তে। আচ্ছা আমি দীপশিখা বা প্রিয়ার জন্য কিছু করতে পারি না?

অনিক আর প্রিয়া লাইব্রেরিতে ঘুরছিল, ঘরে ঢুকে বললো, সত্যি আঙ্কেল, দারুণ কালেকশন।

সুচেতা প্রিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি যে অনিককে বিয়ে করেছ সে তো তুমি বললে! তাহলে দীপশিখা এখন কোথায় থাকবে?

প্রিয়া বললো, মা আমাদের কাছেই থাকবে। আমরা একটা নতুন ফ্ল্যাট বুক করেছি রাইগঞ্জে। ওখানেই নিয়ে যাব। সুচেতা অনির দিকে তাকাতেই অনিরুদ্ধ বললো, প্রিয়াঙ্কা আমরা এই বাড়িটাতে থাকি না। ওই বছরে একবার হয়তো আসি। তুমি যদি চাও তাহলে তোমার মা বাকি জীবনটা বিজয়ের সঙ্গেও থাকতে পারে।

অনিক আর প্রিয়া চোখাচোখি করে বললো, এক্ষেত্রে মায়ের সিদ্ধান্তই গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে। মা গোটা জীবনটা বড্ড কষ্ট করেছে, এখন যদি মা তার গানের সঙ্গীকে খুঁজে পেয়ে ভালো থাকতে চায় আমাদের আপত্তি নেই। সুচেতা একটু হেসে বললো, দীপশিখা যদি রাজি

Sahitya Chayan

থাকে তখন তুমি আর অনিক সপ্তাহে একদিন করে না হয় এসো মায়ের কাছে।

অনিরুদ্ধ ঘাড় ঘোরাতেই দেখলো, বিজু কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। অনিরুদ্ধ বিজুকে একটু অপ্রস্তুত করার জন্যই বললো, বলো, কি আর্জি তোমার? কাজে বরখাস্ত দেবে নাকি?

বিজয় ততোধিক কাঁচুমাচু করে বললো, দাদাবাবু বড্ড অন্যায় করেছি দীপার সঙ্গে। ভগবান যখন এই বয়েসে এসে দেখা করিয়েই দিলেন তখন বাকি জীবনটা ভৈরবী, ইমন, ভূপালি নিয়েই কাটাবো ঠিক করলাম আমরা দুজনে।

তাই .....

অনিরুদ্ধ বললো, তাই এবাড়ি ছেড়ে চলে যাবে নাকি?

বিজয়চাঁদ হাত কচলাতে কচলাতে বললো, যদি আপনি অনুমতি দেন তবে।

অনিরুদ্ধ হেসে বললো, যদি অনুমতি না দিই তবে কি করবে, দীপশিখাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে?

বিজয় কিছুই না বলে দাঁড়িয়ে ছিল।

অনিরুদ্ধ অনিকের দিকে তাকিয়ে বলল, ইয়ংম্যান আমি আজই কলকাতা বেরিয়ে যাচ্ছি, তাই আমার একটা কাজ তোমায় করে দিতে হবে। সূর্যপুর বাজার থেকে একটা খুব ভালো কোয়ালিটির স্কেলচেঞ্জার হারমোনিয়াম তোমায় কিনে এনে দিতে হবে। আমি টাকা দিয়ে যাচ্ছি।

আমার এই শখের বাড়িতেই যেন সকাল সন্ধে গানের রেওয়াজ চলে। বিজু একটু অবাক হয়ে বলল, দীপাও

Sahitya Chayan

থাকবে এখানে? অনিরুদ্ধ বললো, দেখো বিজয়চাঁদ এসব আমার প্ল্যান নয়, এসব এবাড়ির কর্ত্রীর আদেশ। যা বলার বৌদিমনিকে বলো।

দীপশিখা কোনো কথা না বলে সুচেতার হাতটা ধরে বলল, কে বলে মেয়েরা মেয়েদের শত্রু? মেয়েরাই তো মেয়েদের অন্তরের উপলব্ধি বুঝতে পারে।

অনিক বিজয়কে বললো, কাকু আমি নিজে আন্টিকে পৌঁছে দিয়ে যাবো মাস খানেক পরে, কারণ আমরা যতদিন না ফ্ল্যাটটা পাচ্ছি, ততদিন বাড়িতে প্রিয়া একা থাক এটা আমি চাই না। আমাদের ফ্ল্যাটটা পেতে হয়তো এখনো একমাস মত লাগবে। যদিও রেডি ফ্ল্যাট বুক করেছি আমরা, তবুও পজেশন পেতে এইটুকু সময় লাগবেই। বিজয় হেসে বললো, ততদিনে আমাকেও তো গানটা মন দিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে, নাহলে মাস্টারমশাইয়ের মেয়েকে শোনাবো কি?

সুচেতা কোনোদিন বিজুদাকে এত খুশি হতে দেখেনি, আজ যেন হাসি উপচে পড়ছে মুখে। দীপশিখার চোখের কোণে জল টলটল করছে। মনে হচ্ছে রাজ্য জয় করে ফেলেছে। ভালোবাসার মানুষটাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ ভাগ করে নিতে চায় সকলের সঙ্গে। কত অল্পে খুশি এরা। এই মেয়েটাকে বিয়ে করে তিলতিল করে ধ্বংস করার সুযোগই পেত না পীযুষ, শুধু সুচেতার সাহসের অভাবে, কলঙ্কের ভয়ে ওই লোকটা এতদিন ঘুরছে খোলা হাওয়ায়। আর ও নিজে দিনের পর দিন আতঙ্কে শিউরে উঠেছে পুরোনো স্মৃতির দৌরাত্মে। দীপশিখার এই খুশিটুকু

Sahitya Chayan

ফিরিয়ে দিতে পেরেছে শুধু অহনার জন্য। মেয়েটাকে একটিবার জড়িয়ে ধরে সূচী বলতে চায়, আমি কেন তোর মত করে ভাবতে পারিনি রে তিতির?

অনিরুদ্ধ বললো, বিজু, সকলের লাঞ্চের ব্যবস্থা করো তাড়াতাড়ি। আমরা আজই কলকাতা ব্যাক করছি।

দীপশিখা বিজুকে বললো, কবে থেকে এত দায়িত্ববান হলো বেখেয়ালে গানপাগল লোকটা?

বিজয় সকলের অগোচরে ওর হাতটা ধরে বলল, যবে থেকে তুমি চলে গেছো তবে থেকেই বুঝেছি, দায়িত্ব না নেওয়ার ফল কি হয়!

দীপশিখা বললো, আসলে কি জানো, অনাদর কষ্ট দেয় না, যন্ত্রণা হয় তখন যখন অসহ্য আদর পাওয়ার পরে অনাদর পাওয়া যায়। তোমার আদরে, আব্দারে থাকতে থাকতে বুঝতেই পারিনি অনাদর কার নাম, অবহেলা কাকে বলে? প্রিয়ার বাবার সংসারে গিয়ে বুঝলাম অবজ্ঞার যন্ত্রণাটা কি বীভৎস হয়।

বিজু বললো, পুরোনো কথা থাক। প্রিয়াঙ্কা তোমার মেয়ে, শুধু তোমার, তাই ও আমারও মেয়ে। দীপা আবার আমরা মালকোষের সুরে ভৈরবীর কথায় নতুন ভোর দেখবো। পুরোনো সব ভুলে বাঁচবো।

দীপশিখা বললো, অহনা মেয়েটা সাক্ষাৎ দেবী জানো, ওই আমাদের মিলিয়ে দিলো বুড়ো বয়েসে।

বিজু হেসে বললো, আমি একাই বুড়ো হয়েছি তুমি এখনো সেই ছোট্ট দীপা, যে আমার সাইকেলের সামনে

Sahitya Chayan

দাঁড়িয়ে থাকতো চুলের ফিতের আব্দার করবে বলে। দীপা সেই তরুণী বেলার মত ফিক করে হেসে বললো, ধ্যাৎ।

অনিক বললো, প্রিয়া, আন্টিকে এত খুশি দেখে আমার যে কি ভালো লাগছে তোকে কি বলবো। প্রিয়া ধরা গলায় বলল, দীপশিখার দীপটা বোধহয় এতদিনে একটু সাহস করে জ্বললো। ফিসফিস করে বললো, ভালো থেকো মা। সারাটা জীবন তো শুধু আমায় বাঁচিয়ে রাখার জন্য লড়াই করে গেলে, এবারে নিজের স্বপ্নগুলো একটু দেখো।

।।৩৭।।

অর্ধেন্দু সামনে এসে বললো, আর ইউ রেডি অহনা? আমরা স্টার্ট করতে পারি? অহনার গলাটা শুকিয়ে আসছে। হাতের তালু ঘামছে। ও জানে ওয়েলকাম ইন্ডিয়ার এই রিয়েল লাইফ অনুষ্ঠান মারাত্মকভাবে পুপুলার। ইনফ্যাক্ট ওদের চ্যানেলের সব থেকে হাইয়েস্ট টিআরপি যুক্ত প্রোগ্রাম এটা। তাই প্রায় গোটা বাংলা দেখছে ওকে। বুকের ভিতর ভয়টা শিরশির করে উঠলো। পিঠের শিরদাঁড়া দিয়ে শীতল লোহিতকনিকারা ধীরে ধীরে ধাবিত হচ্ছে নিচের দিকে। নিজেকে সামলে নিলো অহনা। মায়ের মুখটা মনে পড়লো ওর। সবসময় চোখের কোণে একটা কষ্ট দানা বেঁধে থাকে মায়ের, ওই কষ্টের হদিশ ও এতদিন পায়নি। এখন বুঝতে পারছে মায়ের কষ্টটা কোথায়। শক্ত হলো অহনা।

অর্ধেন্দু আবার বললো, রেডি অহনা? আমাদের অ্যাঙ্কর রেডি। প্রান্তিক অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করবে।

ক্যামেরা ওপেন হয়ে গেল।

Sahitya Chayan

প্রান্তিক বলতে শুরু করলো, রিয়েল লাইফ অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকের অতিথি বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক অনিরুদ্ধ পালের সুযোগ্য কন্যা অহনা পাল। উনি নিজেও একজন সাংবাদিক। আমাদের ওয়েলকাম ইন্ডিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন উনি। আজ উনি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন ওনার জীবনের গোপন কিছু কথা।

অহনা, পেশায় রিপোর্টার হয়েও কখনো কি মনে হয়নি, আপনি ব্যর্থ, জনগণের সামনে সঠিক নিউজ পৌঁছাতে পারছেন না কোনো বিশেষ কারণে?

অহনা বলতে শুরু করলো, শুধু রিপোর্টার নয়, সমস্ত মানুষই ভীষণভাবে ব্যর্থ পরিস্থিতির সামনে। মানুষের জীবনে এমন কিছু বাঁক আসে যখন সে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে যায় পরিস্থিতির সম্মুখে এসে। আমার বাবা অনিরুদ্ধ পালের জীবনেও এসেছিল এমনই একটা অন্ধকার সময়। যখন তিনি নামি রিপোর্টার হয়েও খুব অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। ভালোবাসার কাছে নত হতে বাধ্য হয়েছিলেন।

নীলাদ্রি বললো, মেয়েটার বলার ভঙ্গিমাটা কিন্তু ভারী সুন্দর, ঔদ্ধত্য নেই, অহংকার নেই কিন্তু আত্মনির্ভরতা প্রকট। কাবেরী ধমক দিয়ে বললো, চুপ। এটা লাইভ হচ্ছে, পরে আর শোনার উপায় থাকবে না, চুপ করে শোনো।

কাবেরী ইচ্ছে করেই টুটাইকে ড্রয়িংরুমে ডেকে এনেছে। ওই ঘটনার পরে বাবা-ছেলের সম্পর্কের বরফটা

Sahitya Chayan

এখনো ঠিকমত গলেনি। তাই কাবেরী চেয়েছিল, অহনাকে তিনজনেই একসঙ্গে দেখতে। তারপর যা সিদ্ধান্ত নেবার তিনজনে একসঙ্গে নেবে। টুটাই বলেছিল, আমি আমার ঘরের টিভিতে দেখি মা। বাবার সামনে ইমোশনাল হয়ে পড়বো সেটা কি ঠিক হবে। আবার হয়তো বাবা এমন কিছু বলবে যে বিতর্ক হবে। তার থেকে তোমরা দেখো ড্রয়িংয়ে আমি ঘরেই দেখি। কাবেরীই জোর করে টুটাইকে এনে বসিয়েছে নীলের পাশে।

অনিরুদ্ধ পাল তখনও সেলিব্রিটি নন, তবে সিনিয়র সাংবাদিক। তার সঙ্গে আলাপ হয় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রী সুচেতা মিত্রের। সুচেতা রাইগঞ্জ নামক মফস্বলের মেয়ে। বাবা স্কুলের প্রধান শিক্ষক। কৃতী ছাত্রী হিসাবে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। এই অবস্থায় পরিচয় হয় অনিরুদ্ধর সঙ্গে, দীর্ঘ বছর প্রেমের পর যখন দুজনে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখছে তখনই সুচেতার জীবনে নেমে আসে মারাত্মক বিপর্যয়।

মা, অহনাদি কি বলছে গো? বাবা অহনাদির মাকে রেপ করেছিল? ছি ছি ওই লোকটার আর কি কি গুন আছে বলতে পারো? অনিকের সামনে দাঁড়াতেই যে লজ্জা করছে আমার। প্রিয়াঙ্কার দিকে তাকিয়ে দীপশিখা বললো, আমাকেও তো ওই মানুষটা সারাটা জীবন রেপ করেই গেলো রে। সুচেতাকে বিয়ের আগে আর আমাকে সার্টিফিকেট নিয়ে রেপ, এটুকুই যা পার্থক্য।

আসলে কি জানিস, এই মানুষটার বেঁচে থাকার অধিকার নেই। প্রিয়াঙ্কা টিভির দিকে চোখ রেখে মায়ের

Sahitya Chayan

কোল ঘেঁষে বসলো। মা, আমার কেমন একটা ভয় ভয় করছে।

দীপশিখা বললো, আর ভয় কি রে, ওই যে টিভিতে দেখেছিস না স্বয়ং মা দুর্গা এসেছেন। ওই তো বধ করবে পীযুষরূপী অসুরগুলোকে।

প্রান্তিক বিস্মিত গলায় বলল, তারপর? অনিরুদ্ধ পাল বা শিক্ষিকা সুচেতা মিত্র কোনো কেস করেননি ওর বিরুদ্ধে? এমন জঘন্য ক্রাইম মেনে নিয়েছিলেন একজন মিডিয়ার মানুষ হয়ে? গলাটা ঝেড়ে নিয়ে অহনা বললো, বললাম না মানুষ কখনো কখনো এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন যখন সে সবচেয়ে অসহায়। অনিরুদ্ধ যখন জানতে পারেন সুচেতার ওপরে এমন একটা অন্যায় হয়েছে তখন রাইগঞ্জ থানায় পৌঁছেছিলেন, পীযুষ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কেস করবেন বলে। নিজের স্ত্রীর ওপরে হওয়া অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে আগ্রহী ছিলেন অনিরুদ্ধ, নিজের সম্মানের ভয় না করেই। কিন্তু ঠিক সেদিনই সুচেতার বাবা মারা যান, সেরিব্রাল অ্যাটাকে।

সোহম টিভির দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বললো, চিরটাকাল আমি সূচীকে ভুল বুঝে গেলাম। সূচীও কোনোদিন মুখ ফুটে বলেনি, দাদা তুই অন্যায় করছিস আমার কোনো দোষ নেই। নিজেদের সম্মান বাঁচাতে ওই লম্পটটার সঙ্গে নিজের বোনের বিয়ে দিচ্ছিলাম আমি! একবারও তলিয়ে ভাবিনি, পীযুষ কখনো সূচীর মত শিক্ষিত মেয়ের পছন্দ হতে পারে না। এমনকি অনিরুদ্ধর মত ভালো ছেলেটাকেও ভুল বুঝেছিলাম। কেন আমি

Sahitya Chayan

এমন করলাম গো? সোহমের স্ত্রী উদাস গলায় বললো, আসলে মেয়েদের মনের খবর কেউ নেয় না। দাদা, বাবা, প্রেমিক, স্বামী কেউ নয়। তবুও তো সূচী খুব লাকি, যে অনিরুদ্ধদার মত স্বামী পেয়েছে। সোহম নিজের চুলের মুঠিতে হাত ঢুকিয়ে বললো, সেই ছোট্ট থেকে সূচীটা কেবল সহ্য করেই গেল। ক্ষমা করিস বোন।

বাবার মৃত্যু সংবাদে ভেঙে পড়েছিলো সুচেতা। তারপর সে চায়নি তার শিক্ষিকার ইমেজে কালি পড়ুক। কারণ আজও আমাদের সমাজে রেপিস্টের সবটুকু দায় ভিক্টিমকেই বইতে হয়। আঙুল ওঠে তার পোশাকের দিকে অথবা তার চরিত্রের দিকে। পুরুষের বিকৃত কামের দোষ তো আইন আদালতে মাথা খুঁড়ে পেতে হয়। মানুষের আদালতে তো দোষী সাব্যস্ত হয়েই যায় মেয়েটা। তাই সুচেতা আর চায়নি পীযুষকে নিয়ে কাটাছেঁড়া করতে।

কাবেরী বললো, বলেছিলাম না কোনো কারণ ছাড়া অহনা বিয়ের আসর ছাড়েনি। এই সত্যিগুলো খুঁজে বের করে সকলের সামনে স্পষ্ট গলায় বলার জন্য যে ক্ষমতার দরকার হয় সেটা সকলের থাকে না। ও চায়নি আমাদের লুকিয়ে যেতে, তাই বাধ্য হয়েছিলো বিয়েটা ভেঙে দিতে।

নীলাদ্রি বললো, তুমি চুপ করবে? ওর কথাগুলো শুনতে দাও। আমি শুধু মেয়েটার সাহস দেখছি। এমন অকপটভাবে বলছে কি করে?

নৈঋত মনে মনে বললো, এগুলো আমাকে বললে কি খুব অন্যায় হতো? কি ভেবেছিলে? হাতটা ছেড়ে দেব?

Sahitya Chayan
বড্ড স্বার্থপর তুমি তিতির, ভালোবাসার দাবিটুকুও বোঝ না।

এরপর খুব স্বাভাবিক ছন্দেই চলছিল অনিরুদ্ধ আর সুচেতার জীবন। সুচেতা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছিল, অনিরুদ্ধর ভালোবাসাই ওকে ঘন অন্ধকারের স্মৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করছিল। অনিরুদ্ধ আর সুচেতা মেতে ছিল নিজেদের কর্মজগৎ আর তাদের একমাত্র মেয়ে আমাকে নিয়ে। এতক্ষণ পর্যন্ত আমার উপস্থিতি ছিল না আপনাদের সামনে, এবারে আমি বলবো আমার কথা। ছোট্ট থেকে মায়ের শাসনে আর বাবার আদরে আমি বড় হয়েছি। লোকে বলে আমি জেদি, ব্যতিক্রমী। আমি বলি, মানুষ সাদা চোখে যেটা দেখতে অভ্যস্ত নয় সেটাকেই ব্যতিক্রমী বলে চিহ্নিত করে দেয়। আসলে দিনের পর দিন একই ধারায় জীবন কাটাতে কাটাতে মানুষ ভুলে গেছে কোনটা করা উচিত। তাই কেউ সামান্য সত্যি কথা বললে তাকে সাহসী বলা হয়। কেউ অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তাকে বলা হয় প্রতিবাদী। মিথ্যের আবরণে আর মেরুদণ্ডহীনতার মুখোশে ঢেকে রাখতে রাখতে মানুষ ভুলেই গেছে মিথ্যে বলাটা অন্যায়, তার জন্য সাহস লাগে, সত্যি বলার জন্য সাহসী হতে হয় না, সৎ হলেই চলে।

যাই হোক, আমি ছোট থেকেই সাহসী আর প্রতিবাদী নামেই পরিচিত হচ্ছিলাম, তাই আমার বাবা হয়তো ভয়ে ভয়েই আমায় নাচ-গানের পরিবর্তে মার্শাল আর্টে ভর্তি করে দেন। জানি না কেন ইউনিভার্সিটি টপার হয়েও

Sahitya Chayan

গভরমেন্ট সার্ভিসের ইচ্ছে বাদ দিয়ে রিপোর্টার হওয়ার ইচ্ছে জাগলো! আমার মা বলে, আমি নাকি বাবার দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হই। তাই বাবার পেশাটাকেই বেছে নিয়েছিলাম নিজের পেশা হিসেবে। আমার বাবা অনিরুদ্ধ পাল ইস এ রিয়েল সুপার হিরো, তাই তাকে অনুসরণ করবো সেটাই স্বাভাবিক।

অনিরুদ্ধর দিকে তাকিয়ে সুচেতা বললো, চিরকালের বাপসোহাগী মেয়ে। অনিরুদ্ধর চোখে জল। কত বড় হয়ে গেল আমার মেয়েটা, কি সুন্দর গুছিয়ে বলছে দেখো। ঋজু ভাঙ্গিমায়। সুচেতা অনিরুদ্ধর হাতটা ধরে বলল, আমার তিতির তাহলে আমায় ভুল বোঝেনি বলো? নিশ্চয়ই বুঝেছে ওকে কেন কিছু বলতে চাইনি। অনিরুদ্ধ বললো, এমন বুদ্ধিমান মেয়ে কি ভুল বুঝতে পারে গো?

আমার মা একজন কলেজের প্রফেসরের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করলো। রেপুটেড ফ্যামিলি, অত্যন্ত ভদ্র ছেলে। আমি বিয়েটা করতে চাইনি। বলেছিলাম, আর কয়েকদিন পরে করবো। কিন্তু মায়ের খুব ইচ্ছে ছিল, তাই আমিও রাজি হয়ে যাই। বিয়ে ঠিক হবার কদিন পর থেকেই আমার ফোনে আসতে শুরু করে কল আর মেসেজ। আমার জীবনের এমন গোপন ঘটনা নাকি সে জানে যেটা শুনলেই আমার বিয়েটা ভেঙে যাবে। তাই তাকে দশলক্ষ টাকা দিতে হবে মুখ বন্ধ রাখার জন্য। অনিরুদ্ধ পালের কাছে দশলক্ষ টাকা হয়তো তেমন কিছুই নয়, কিন্তু আমি চাইনি কাউকে জানাতে। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করা আমার স্বভাবে নেই। যদি সত্যিই কিছু থাকে আমার

Sahitya Chayan

অতীতে সেটাকে সামনে আনা আমারই কর্তব্য। তাই সমস্ত সোর্স কাজে লাগিয়ে জোগাড় করি পীযুষ বিশ্বাসকে। পীযুষের সূত্র ধরেই জানতে পারি এই এতক্ষণের বলা সমস্ত ঘটনাগুলো।

বিয়ের রাতে একটা ছোট্ট চিরকুট পাই, আমার শ্বশুরবাড়ির লোককে নাকি জানিয়ে দেবে আমার মায়ের কেচ্ছা। বিয়ের আসর থেকে উঠে আসি। সিদ্ধান্ত নিই সত্যিটা জানবো কারোর সাহায্য ছাড়াই। খুঁজতে খুঁজতে আমি দেখতে পাই, যে রাতে সুচেতাকে নিয়ে যাওয়া হয় রাইগঞ্জ হসপিটালে এবং অনেকগুলো ঘুমের ওষুধ খাওয়ার জন্য ওর স্টমাক ওয়াশ করা হয়, তখনই ওর গর্ভাশয়ে একটি ভ্রূণের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন ডক্টররা।

সেইমত প্রেসক্রিপশনও লেখা হয়। হসপিটালের পুরনো স্টাফের কাছ থেকে আমি আবিষ্কার করেছি তার কপি।

আমার সন্দেহ ঘনীভূত হয়। কারণ সুচেতা আর অনিরুদ্ধর রেজিস্ট্রি ম্যারেজের ডেট এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে।

ভেবেছিলাম, যেহেতু সুচেতা আর অনিরুদ্ধর বিয়ের দীর্ঘদিন আগে থেকেই সম্পর্ক ছিল, তাই হয়তো ওই ভ্রূণ তাদের ভালোবাসারই ফসল। তবুও সন্দেহ রয়েই গিয়েছিল। কারণ অনিরুদ্ধ প্রায় দুমাস দেশের বাইরে ছিল। পীযুষ বিশ্বাস আমায় ব্ল্যাকমেইল করতে শুরু করে, শেষে কিডন্যাপ পর্যন্ত। আমি ওকে অ্যারেস্ট করাই। এবং পীযুষ বিশ্বাসের সঙ্গে নিজের ডি এন এ টেস্ট করাই সরলা নার্সিংহোমে।

Sahitya Chayan

সুচেতা অনিরুদ্ধর বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠে বললো, কি বলবে মেয়েটা? আমি আর পারছি না অনি।

অনিরুদ্ধ স্থির প্রস্তরমূর্তির মত তাকিয়ে আছে টিভির দিকে। বুকের ভিতরটা থর থর করে কাঁপছে।

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, পীযুষ বিশ্বাসের সঙ্গে আমার ডি এন এ ম্যাচ করে। অনিরুদ্ধ পাল আমার বায়োলজিক্যাল ফাদার নয়। কিন্তু আমার বাবা পীযুষ বিশ্বাস নয়। একটা সাময়িক অ্যাক্সিডেন্টের ফলেই আমি এসেছিলাম আমার মায়ের গর্ভে, কিন্তু তার মানে এই নয় আমি অযত্নের সন্তান। আমার বাবা-মা আর দ্বিতীয় সন্তান নেননি কারণ আমি যাতে কোনোভাবে নেগলেক্টেড না হই। আমি অনিরুদ্ধ পাল আর সুচেতা মিত্র পালের অত্যন্ত আদরের সন্তান। আমার বাবা আমার জন্য নিজের জীবনটা দিতে পারে, আমার মা আমায় হত্যা করেনি অবাঞ্ছিত ভেবে। বরং দুজনে একটা কথাই ভেবেছিল আমি একটা রক্তের ডেলা, আমাকে যে পাত্রে রাখা হবে তেমনিই আকার ধারণ করবো। তাই আমার সব আচরণ আমার বাবা অনিরুদ্ধ পালের মতই। আমায় দেখতে সুচেতা মিত্রর মত। আই রিপিট, আমি অহনা পাল, অনিরুদ্ধ পাল এবং সুচেতা মিত্রর একমাত্র সন্তান। রেপিস্টের একটাই পরিচয় সে একজন অপরাধী, সে বাবা হতে পারে না।

পীযুষ বিশ্বাসের নামে আপাতত গোটা তিনেক কেস সাজাতে পেরেছি, সুচেতা মিত্রর রেপ কেস, আমায় কিডন্যাপিং, ব্ল্যাকমেইলিং আর দীপশিখা মানে পীযুষের

স্ত্রীর ওপরে ফিজিক্যাল টর্চার। দেখা যাক আমাদের দেশের আইন ওকে কত বছর জেল দেয়!

আজকে রিয়েল লাইফে আসার একটাই উদ্দেশ্য, ক্রাইমকে চেপে রেখে বাড়তে দেবেন না কলঙ্কের ভয়ে। তাতে দিনদিন ক্রাইম বাড়বে, তাই অপরাধীকে শেষ করুন, সত্যের মুখোমুখি হন। সত্যি লুকিয়ে রাখা কঠিন, সামনে আনা সহজ। এরপর হয়তো আমাকে অনেকেই ব্রাত্য করবে, হয়তো আমার আড়ালে চলবে ফিসফাস কিন্তু তবুও অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আমি করবোই।

প্রান্তিক একটু ধরা গলায় বলল, হ্যাটস অফ ম্যাডাম। এগিয়ে চলুন, আমরা সকলে আছি আপনার সঙ্গে। লাইভ শেষ।

অর্ধেন্দু এগিয়ে এসে হ্যান্ডসেক করে বললো, আপনি আমাদের সাংবাদিকদের গর্ব। রিপোর্টারদের এমনই সাহসী হতে হয়, কিন্তু আমরা পারিপার্শ্বিক চাপে ক্রমাগত গুটিয়ে নিচ্ছি নিজেদের। স্যালুট অহনা।

কি হলো, কোথায় যাচ্ছিস টুটাই?

ঢাকুরিয়ায় যাবো মা।

নীলাদ্রি গম্ভীর স্বরে বললো, তোমাকে আর একা যেতে হবে না, আমরাও যাবো। কাবেরী রেডি হয়ে নাও।

কাবেরী শাড়ি পরতে পরতেই দেখলো, অনুর ফোন। রিসিভ করতেই কাঁদতে কাঁদতে বললো, বৌদি মেয়েটা কি ভালো গো। তুমি আর অমত কোরো না। অহনার সঙ্গেই টুটাইয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করো পরের মাসে।

কাবেরী গম্ভীর হয়ে বলল, অনু তাহলে স্বীকার করলে আমার পছন্দ ভুল নয়।

অনু একটু রাগ দেখিয়েই বললো, হ্যাঁ বাপু করলাম।

নৈঋতের মুখটা থমথম করছে। গাড়ি ড্রাইভ করতে করতেই বললো, অহনা আমাকে অপমান করেছে মা। ও আমাকে খুব চিপ ভেবেছে। এর উত্তর ওকে দিতেই হবে। ওকে এমন ভাবার সাহস কে দিলো?

নীলাদ্রি বললো, এখন মাথা গরম করার সময় নয় টুটাই। অহনা এই মুহূর্তে খুব সেনসেটিভ পজিশনে আছে, তাই ওকে কোনো রুড ওয়েতে কথা বলো না প্লিজ।

কাবেরী দেখছিল নীলাদ্রির পরিবর্তনটা। মনে মনে বললো, তুমি কি জাদুকর অহনা, তুমি এভাবে মানুষের মনটাকে বদলে দিতে পারো?

নৈঋত ঠোঁটটা টিপে কষ্টটুকুকে গিলে নিলো। মনে পড়ে যাচ্ছিল ঢাকুরিয়ার ওদের ফ্ল্যাটের সেই সকালটা। ঘুম থেকে উঠে নৈঋতই অহনাদের কিচেনে গিয়ে দু-কাপ চা বানিয়ে অহনাকে নক করেছিল। অহনার চোখ লাল, বোঝাই যাচ্ছিল রাতে তেমন ঘুমায়নি। ওকে দেখে হালকা হেসে বলেছিল, গুড মর্নিং নৈঋত। রাতে ডিপ স্লিপ হয়েছিল? অনেকের নিজের বেড ছাড়া ঘুমই আসে না।

নৈঋত কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল, আমি সুখী মানুষ, যেখানে ফেলবে স্বপ্নে চন্দ্রভ্রমণ করে সাক্সেসফুলি ফিরে আসবো।

অহনা চায়ে চুমুক দিয়ে বলেছিল, বাহ, দারুণ চা বানাও।

নৈঋত মজা করে বলেছিল, বুঝতেই পারছো, আমার বউ কত লাকি হবে।

অহনা মজায় সাড়া না দিয়েই গম্ভীর স্বরে বললো, নৈঋত তুমি সকালেই ফিরে যাও বাড়ি। আমি আমার সঙ্গে তোমাকে আর জড়াতে চাই না। কারণ আমি জানি সত্যিটা জানলে তুমি হয়তো সরে যাবে, তখন অপমানিত হবো আমি। প্লিজ, আমি রিকোয়েস্ট করছি চলে যাও। কাবেরী আন্টির দৃঢ় বিশ্বাস একবার ভেঙেছি আমি, দ্বিতীয়বার তোমাদের পরিবারের রেপুটেশন নষ্ট করতে পারবো না। নৈঋত স্তব্ধ হয়ে দেখেছিলো অহনাকে। এতটুকু কাঁপেনি ওর গলা। অভিমানে বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে ছিল ও। তারপর বলেছিল, অদ্ভুত আইন তো? সত্যিটা জানার সুযোগ না দিয়েই আমি কি ভাববো তার রায় ঘোষণা করে দিচ্ছেন মাই লর্ড!

অহনা দৃঢ় গলায় বলেছিল, সত্যিটা জানার উপায় আমিই করে দেব তোমায়। তার আগে আর যোগাযোগ কোরো না। আমি ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছি খেয়ে যেও।

নৈঋত শুধু বলেছিল, নো থ্যাংকস, আমি বাড়ি ফিরেই খাবো।

সেদিনের পর অজস্রবার অহনার হোয়াটসআপ চেক করেও একটা মেসেজ পাঠাতে পারেনি ও। শুধু অপেক্ষা করেছে, ধৈর্য্য ধরে থেকেছে অহনার ফোনের প্রতীক্ষায়।

অবশেষে গত পরশু ফোন করে শুধু বললো, "ওয়েলকাম ইন্ডিয়ায়" সন্ধে সাড়ে সাতটায় "রিয়েল

লাইফ" প্রোগ্রামে লাইভ আসছি। বাড়ির সকলকে দেখতে বলো কিন্তু। আর তুমি তো অবশ্যই দেখো।

নৈঋত ব্যঙ্গাত্মক গলায় বলেছিল, আমায় মনে রেখেছো জেনে খুশি হলাম। তো সত্যিটা জানার পরেও যদি আমার হাতটা বাড়ানোই থাকে তাহলেও কি ফিরিয়ে দেবে?

অহনা একটু হেসে বলেছিল, সত্যিটা ঠিক কতটা ভয়ঙ্কর সেটা তো আগে শোনো, তারপর বাড়ানো হাতটা গুটিয়ে নেবে, না এগিয়ে দেবে সেটা ঠিক করো! নৈঋত ফাঁকা রাস্তায় একটু জোরেই হর্ন দিলো। মনে মনে বললো, আমার হাতটা বাড়ানোই আছে অহনা, তবে মনে জমেছে অভিমানের পর্দা। সেটা কিন্তু তোমাকেই ছিঁড়তে হবে।

নীলাদ্রি বললো, টুটাই এই ফুলের দোকানের সামনে একটু দাঁড়াস তো, আর কোনো চকলেটের দোকান পেলে বলিস।

কাবেরীর মনে পড়ছে অহনার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার মুহূর্তটা। মেয়েটা যেন কালবৈশাখী ঝড়। সব চলতি নিয়মকানুনকে ভেঙে তছনছ করে দিয়ে গড়বে নিজের মত করে। কতটা সাহস থাকলে তবে গোটা দুনিয়ার সামনে এভাবে এক্সপোজড হতে পারে! কাবেরী মনে মনে বললো, এমন সাহস কেন ওর ছিল না?

ছোট পিসেমশাই যখন ক্লাস ফোরে ওর বুকে হাত দিয়েছিল তখন গাটা গুলিয়ে উঠেছিলো ওর। কেন ভয়ে, লজ্জায় কাউকে বলতে পারেনি! কেন এক্সপোজ করে দিতে পারেনি পিসেমশাইয়ের আসল রূপটা! কারণ কাবেরী অহনা নয়। সবাই অহনা হতে পারে না।

নীলাদ্রি ফুল আর চকলেট কিনে গাড়িতে উঠলো।

বেল বাজাতেই দরজা খুললেন অনিরুদ্ধবাবু।

তিনজনকে এই অসময়ে একসঙ্গে দেখে বোধহয় একটু ঘাবড়ে গেছেন। নীলাদ্রিই বললো, কুটুম্বিতা করতে এলাম। ফিরিয়ে দেবেন না।

সুচেতাও এগিয়ে এসেছে। বিধ্বস্ত চেহারা। গালে এখনো শুকনো জলের রেখা। তাও ভদ্রতা করে বললো, ভিতরে আসুন প্লিজ।

কাবেরী ঢুকেই বললো, মহারানি কি এখনো ফেরেননি চ্যানেল থেকে?

অনিরুদ্ধ বললো, আমি কল করেছিলাম, বললো, গাড়িতে আছে, ফিরছে।

কাবেরী বেশ তৎপর হয়ে বলল, সুচেতা এসো তো একটু হাত লাগাও।

নীল অনেক ফুল কিনেছে। চলো বাড়িটা একটু সাজিয়ে ফেলি। তাকে ওয়েলকাম করার জন্য।

সুচেতার ঠোঁটে নরম হাসি খেলে গেল। বললো, আগে তোমাদের জন্য একটু কিছু স্ন্যাকসের ব্যবস্থা করি।

নৈঋত গম্ভীর ভাবেই বললো, আমি সুইগিতে অর্ডার করে দেব আন্টি। আপনারা বরং ধুপ, প্রদীপ, ফুল এসব দিয়ে ওই জেদি একগুঁয়ে মেয়েটাকে বরণ করার ব্যবস্থা করুন। নীলাদ্রি বললো, আঃ টুটাই কি হচ্ছে?

নৈঋত বললো, ভুল কি বললাম বাবা? বারংবার বলেছিলাম সঙ্গে রাখো, একা সবটা করতে যেও না। কে শোনে কার কথা।

অনিরুদ্ধ পিঠে হাত রেখে বললো, নৈঋত রাগ কোরো না, ওর মনের অবস্থাটা একবার বোঝো। আমরা যে এতবছর ওকে কিছুই বলিনি, এত বছর পরে ও জানতে পারছে আমি ওর বায়োলজিক্যাল ফাদার নই। বুঝতে পারছ কষ্টটা?

নৈঋত বললো, শুনুন আঙ্কেল আপনি মোটেই ওর পক্ষ নেবেন না। আমার মনের অবস্থাও যথেষ্ট খারাপ। কম টেনশন গেছে এই কদিন? আমার কাছে ওর একটাই পরিচয় ও অহনা, যাকে আমি ভালোবাসি, ব্যস।

বেলটা বাজছে দেখেই নৈঋত ঢুকে গেলো অহনার ঘরে।

করুক আদিখ্যেতা ওকে নিয়ে সবাই। কিছু করার দরকার নেই ওর।

অহনার ঘরের সামনের দেওয়ালে ওর একটা বেশ বড় ছবি টাঙানো আছে। অহনা মিষ্টি করে হাসছে তাতে। নৈঋত সেদিকে তাকিয়ে বলল, মোটেই তুমি এত মিষ্টি নয়, বড্ড ঝাল।

অহনা ফ্ল্যাটে ঢুকে একটু অবাকই হয়ে গেল। গেটের সামনে থেকে সুন্দর করে ফুল আর প্রদীপ দিয়ে সাজানো। রংবেরঙের কয়েকটা বেলুন ঝুলছে।

কাবেরী আন্টি বললো, আগে ওই চালের ঘটিটা উল্টে দাও অহনা, সৌভাগ্য উপচে পড়ুক এই সংসারে।

ফুলবিছানো রাস্তা দিয়ে হেঁটে অহনা ঝাঁপিয়ে পড়লো বাবার বুকে। ফুঁপিয়ে উঠে বললো, বাবাই, তুমিই আমার বাবা, ওই রেপিস্টটা নয়। অনিরুদ্ধ বললো, ওমা এটা তো

সবাই জানে। কাঁদছিস কেন পাগল মেয়ে। তোর মাকে জিজ্ঞেস করে দেখ, কচি বেলায় যখন তোর মা কিছুতেই কান্না থামাতে পারতো না তোর তখন আমি কি করতাম?

আমার হেড়ে গলায় গান গাইতাম আর তুই ফিকফিক করে হেসে ফেলতিস। তোর মা বলতো, অমন গান শুনে তোমার মেয়ে বোধহয় ভয় পেয়ে গেছে। সবাই তো জানে তুই বাপ সোহাগী মেয়ে। এ জন্য অবশ্য তোর মায়ের হিংসার শেষ নেই। সে যাকগে, কে হিংসা করছে দেখে আমাদের লাভ নেই। আমরা আমাদের গোপন সব পরামর্শ চালিয়ে যাব। সুচেতাকে জড়িয়ে ধরে অহনা বললো, তোমার আর কষ্ট নেই তো মা? গোপন করে রাখার বোঝাটা কমেছে? অপরাধীকে শাস্তি না দিতে পারার যন্ত্রণাটা কমেছে একটু?

সুচেতা মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বলল, এর নামই প্রাপ্তি রে অহনা। আমি যেটা পারিনি সেটা তুই পেরেছিস। তৃপ্তি পেলাম শয়তানটা শাস্তি পাবে জেনে।

কাবেরী বললো, অহনা এখানে আরেক সেট বাবা-মাও উপস্থিত। বল, আমাদের বাড়ি পার্মানেন্টলি যাবি কবে?

অহনা চোখের জল মুছে বললো, মা, ডেটটা তুমি ফাইনাল করো। নীলাদ্রি অহনার মাথায় হাত রেখে বললো, আমাদের পুরোনো ভাবনার মূলে আঘাত করে চেতনা ফেরানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ অহনা। আমরা সবাই আছি তোমার পাশে। অহনা নিলাদ্রীকে প্রণাম করে বললো, তোমরা ডেট ফাইনাল করো...আমি চেঞ্জ করে আসছি।

ঘরে ঢুকেই দেখলো নৈঋত ওর ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। অহনা এগিয়ে বললো, রাগ করে আছো? সরি, তোমাদের বুঝতে আমারই ভুল হয়েছিল।

কি হলো, কথা বলবে না? হাতটা বাড়াবে না আমার দিকে? আমি অপেক্ষায় আছি....

নৈঋত ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, দেখো তো নতুন পারফিউম ইউজ করেছি, স্মেলটাতে কোনো ফিলিংস আসে কিনা?

অহনা মুচকি হেসে নৈঋতের বুকের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে বললো, একটাই অনুভূতি হচ্ছে, কেউ আমায় বড্ড ভালোবাসে।

নৈঋত ফিসফিস করে বললো,

রূপকথার রাজকন্যা নও তুমি
রূঢ় বাস্তবের নারী।
আমার স্বপ্নে এসো না তুমি লাল ঢাকাই পরে।
এসো কলমের আঁচড়ে সত্যের ছবি আঁকতে।
সাধারণ তুমি, তবুও অনন্যা।
রামধনুর আবেশে জড়ানো নও তুমি।
সূর্যের মত প্রখর, তপ্ত।
শুধু প্রেমে বা ভালোবাসায় নয়,
নিজের অস্তিত্বে মিশিয়ে নিতে চাই তোমায়।
আমার প্রতিটি রক্তকণিকায় মিশে যাক তোমার
শিরা উপশিরারা।

আমার নিত্যদিনের অভ্যাসে থাকুক তোমার একাধিপত্য।

অহনার ফোনটা বেজে উঠলো আচমকা....

তোর এ সকাল ঘুম ভেঙে দিতে পারি,
তোর এ বিকেল ঘুড়ি ছিঁড়ে দিতে পারি,
তোকে আলোর আলপিন দিতে পারি।
তোকে বসন্তের দিন দিতে পারি,
আমাকে খুঁজে দে জল ফড়িং.....

চমকে উঠে ফোনটা ধরতেই শুনলো, বাবা বলছে, একবার বাইরে আসবি তিতিরপাখি, আমরা তোদের জন্য ওয়েট করছি।

অহনা লজ্জায় লাল হয়ে বলল, ছাড়ো, বাবা ডাকছে, চলো বাইরে চলো।

নৈঋত অহনার হাতটা ধরে বলল, তোকে খুঁজে দেব জলফড়িং।

সমাপ্ত